কাউকে বিশ্বাস করিও না
কখনো পেছনে তাকাইও না
এম্পায়ার অভ্ দ্য
মোগল
দ্য সার্পেন্টস্ টুথ
অ্যালেক্স রাদারফোর্ড
BanglaBook.org
অনুবাদ : জেসি মেরী কুইয়া

অ্যালেক্স রাদারফোর্ড-এর উপন্যাসের প্রশস্তি গীতি :

'বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহে পরিপূর্ণ মনোহর বর্ণনা ও ভয়ংকর অথচ জমকালো নিষ্ঠুরতায় ভরা অ্যাকশন। লেখনী যতটা ক্ষুরধার, ঘটনাসমূহ ততই সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। এক পৃষ্ঠা থেকে আরেক পৃষ্ঠায় যেতে আগ্রহের তাই কমতি হয়নি আমার।'

উইলবার স্মিথ

'কন ইগুলডেন ও সাইমন স্ক্যারো'র সারিতে... শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনা।'

ম্যান্ডা স্কট, বৌদিকা'র লেখক

'নিজেকে অসম্ভব উচ্চতায় নিয়ে গেছেন অ্যালেক্স রাদারফোর্ড।'

ডেইলি মেইল

'এই গ্রীষ্মে যদি কোন অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজ করে থাকেন, মাথা সোজা করে চলে যান কাছাকাছি কোন এক বইয়ের দোকানে... মহাশক্তিধর মোগল গর্জন শুরু করেছে.... পৃথিবীর ৬ষ্ঠ তম জনসংখ্যাধিক্যের উপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তারকারী সম্রাটদের নিয়ে অ্যালেক্স রাদারফোর্ডের অ্যাকশনে ভরা সিরিজ চমকপ্রদ... আর আগ্রার বাষ্পীয় সমভূমিতে তাপমাত্রা যাচ্ছে বেড়ে... ঐতিহাসিক গাঁথার পরিপূর্ণ রক্তাক্ত যুদ্ধ, নির্মম হত্যা আর ষড়যন্ত্র মহাকাব্যিক ঢঙে আর বাস্তবতার মিশেলে বলা হয়েছে সময়হীন দাঙ্গা একটি কাহিনী।'

ল্যাঙ্কাশায়ার ইভনিং পোস্ট

নতুন মোগল সম্রাট শাহজাহান একশত মিলিয়ন আত্মা নিয়ে গর্বিত অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী একটি সাম্রাজ্যে রাজত্ব করে গেছেন। সিংহাসন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন পূর্বপুরুষদের ভয়ংকর 'সিংহাসন অথবা কফিন,' ঐতিহ্য : চেঙ্গিস ও তৈমুরলেইনের বংশধর। মোগলরা ভারতে আসার পর থেকে ভাই-ভাইয়ের আর পুত্র লড়েছে পিতার সাথে পুরস্কারের আশায় আর শাহজাহানও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

রাজত্বকালের প্রারম্ভেই শাহজাহানের জন্য সময় হয়ে পড়ে সিংহাসন সুরক্ষার জন্য শত্রুদেরকে নির্মূল করে দেয়ার। এর পরিবর্তে, সুন্দরী পত্নী মমতাজের মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে ধ্যান-জ্ঞান দিয়ে শুরু করেন তাদের নিপুণ ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ এক মহাকাব্যিক স্তম্ভ নির্মাণ কাজ : তাজমহল।

দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পুত্রদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন শাহজাহান। তাই তাদের মাঝে গড়ে ওঠা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বস্তুত ঘৃণার আঁচ পাননি তিনি, এরপর সম্রাট অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ—নির্মম, নিষ্ঠুর আর নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য—সাম্রাজ্যের ভিত্তি কেঁপে ওঠা শুরু করে।

অ্যালেক্স রাদারফোর্ড আসলে একটি ছদ্মনাম। বাস্তবে পর্দার আড়ালে রয়েছেন দুজন। তারা হলেন ডায়ানা প্রেস্টন এবং মাইকেল প্রেস্টন। এরা স্বামী-স্ত্রী এবং যুক্তরাজ্যের নাগরিক। 'এম্পায়ার অভ্ দ্য মোগল' সিরিজের পাঁচটি বই তাদের সম্মিলিত উদ্যোগে রচিত হয়েছে।

অনুবাদক

জেসি মেরী কুইয়া পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগ থেকে শেষ করেছেন স্নাতকোত্তর।

মূলত বই পড়ার আনন্দ থেকেই লেখালেখি করার আগ্রহ।

প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থসমূহ : *দ্য শারলোকিয়ান, দি অটোমান সেঞ্চুরিস্, দৌজ্ ইন পেরাল্, ঈগল ইন দ্য স্কাই*। এছাড়াও ভবিষ্যতে মৌলিক রচনা লেখার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

jasy_1984@yahoo.com

এম্পায়ার অভ্ দ্য মোগল
দ্য সার্পেন্টস্ টুথ

অ্যালেক্স রাদারফোর্ড

অনুবাদ : জেসি মেরী কুইয়া

এম্পায়ার অভ্ দ্য মোগল
দ্য সার্পেন্টস্ টুথ
মূল : অ্যালেক্স রাদারফোর্ড
অনুবাদ : জেসি মেরী কুইয়া

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০১৪

রোদেলা ৩২৭

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মূল বইয়ের প্রচ্ছদ অবলম্বনে অনন্ত আকাশ

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭ ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪৮০.০০ টাকা মাত্র

Empire of the Moghul The Serpent's Tooth by Alex Rutherford
Translated by Jasy Mary Quiah
First Published November 2014
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web www.rodela prokashani.com

Price : Tk. 480.00 only US $ 10.00
ISBN : 978 984 91083 3 7 Code : 327

অনুবাদকের উৎসর্গ

যারা অনুবাদ বই
পড়তে ভালোবাসেন

শাহজাহানের সমসাময়িক
সাম্রাজ্যের খসড়া
ফারগানা
সমরকন্দ
অক্সাস নদী
হিমালয়
বাল্খ
হিন্দু কুশ
হিরাত
আফগানিস্তান
কাবুল
কাবুল নদী
কাশ্মির
শ্রীনগর
সিন্ধু নদ
গজনি
ঝিলাম নদ
রাভী নদী
হেলমন্দ নদী
কান্দাহার
লাহোর
শতদ্রু নদ
পারস্য
বালুচিস্তান
যমুনা নদী
গঙ্গা নদী
পাঞ্জাব
দিল্লি
সিন্ধু নদ
ফতেহপুর
শিক্রি
সিন্ধু
সামুগড়
আম্বর
(জয়পুর)
আগ্রা
যোধপুর
রাজাস্তান
গোয়ালিওর
ভারানাসী
গঙ্গা নদী
গোয়ার
পাটনা
এলাহাবাদ
বিহার
চম্বল নদী
গুজরাট
মান্দু
নর্মদা নদী
হুগলি
চম্পানীর
বাংলা
আশিরগড়
বোরহানপুর
সুরাট
তাপ্তি নদী
দাক্ষিনাত্য
বিজাপুর
গোলকোণ্ডা
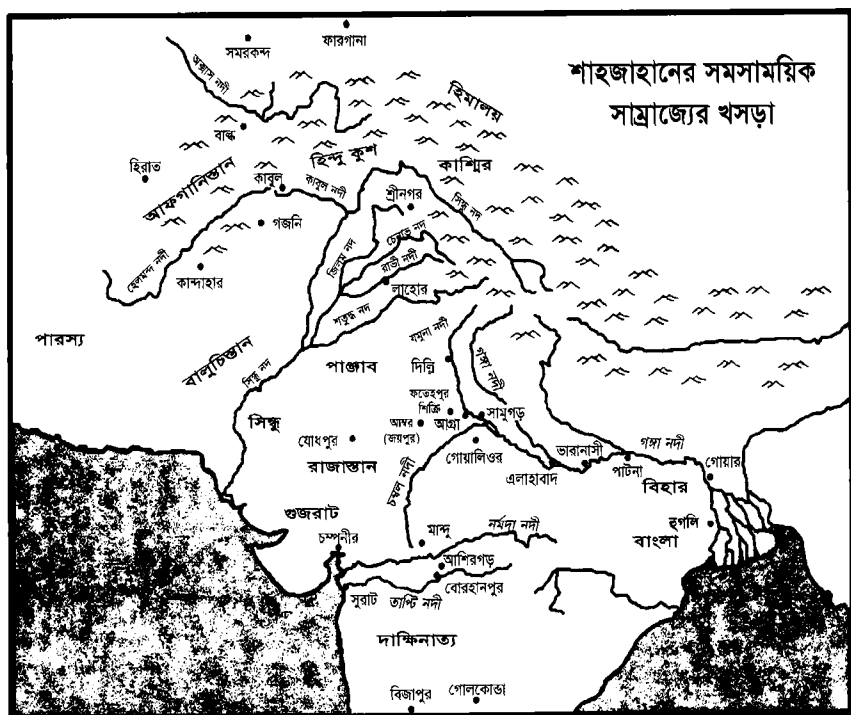
প্রথম পর্ব

'হাজারো বার শুভ রাত্রি!

রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট

অধ্যায়-০১

আগ্রা দুর্গ, উত্তর-পশ্চিম ভারত, ১৬২৮

একেবারে শেষ মুহূর্তে শাহজাহানের চোখে পড়ল সূর্যের আলো পড়ে ঝিক করে ওঠা ছোরার ফলা। গলা বাঁচাতে ডান হাত তুলে ধরতেই অনুভব করলেন কনুইয়ের ঠিক নিচের পেশীতে ঢুকে গেছে ধারালো ব্লেড। রুপালি সিংহাসনের উপর গড়িয়ে পড়তে লাগল রক্তের ফোঁটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সিংহাসন হেলে পড়তে লাগল পিছন দিকে, তারপরেও আবারো আঘাত করার আগেই ধরে ফেললেন আততায়ীর হাত। সর্বশক্তি দিয়ে ছুড়ে মারলেন লোকটাকে। লোকটা গিয়ে অল্পের জন্য মার্বেলের বেদী ছুঁতে গিয়েও পারল না, পড়ে গেল। এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে সিংহাসন। মার্বেলের গায়ে ধাক্কা খেতেই লোকটার মাথা থেকে পড়ে গেল বেগুনি পাগড়ি আর হাতে থাকা ছোরা। শাহজাহান এত জোরে আততায়ীর হাত দু'টোকে পিছনে টেনে ধরলেন যে কব্জি ভাঙ্গার শব্দ পাওয়া গেল স্পষ্ট। লোকটার হাতের ছোরা কেড়ে নিয়ে দুই হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন আততায়ীর বুকের উপর। এরই মাঝে পৌঁছে গেল ওনার সবুজ পোশাকের দেহরক্ষীর দল। কিন্তু তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন যে তাঁকে রক্ষা করার মত যথেষ্ট দ্রুত ছিল না সেই দল।

আবারো উঠে দাঁড়াতেই শাহজাহানের স্যান্ডেলের নিচে পড়ল সিংহাসন থেকে খুলে পড়া রুবি আর টারকোয়াজ। কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন আততায়ীর দিকে। দেহরক্ষীর দল প্রথমে লোকটাকে দাঁড়

করিয়ে হাত দুটো বেঁধে ফেলল পিছমোড়া করে। তারপর লাথি মেরে বাধ্য করল হাঁটু গেড়ে বসতে। শাহজাহানের মনে হল যেন চিনতে পেরেছেন আততায়ীকে—কোটের জোব্বা গায়ে থাকলেও বোঝা গেল বয়সে তরুণ লোকটা।

'কে তুমি? কেন তোমার সম্রাটকে আক্রমণ করেছো?'

প্রথম দিকে কোনই উত্তর দিল না তরুণ, এরপর কালো দাড়িওয়ালা একজন দেহরক্ষী পাঁজরে সজোরে লাথি কষালো দু'বার। তারপরই কথা বলে উঠল আততায়ী।

'ইসমাইল খান। জানির ভ্রাতুষ্পুত্র। জানি মারা গেছেন, কারণ আপনি তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছেন।' আপনারই সৎভাই খসরু। স্বামী ছাড়া তিনি বাঁচতে চাননি। তাই আমি ওনার হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছি। আমার পিতামাতা মারা যাবার পর আমাকে তাঁর পরিবারে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি।'

হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ইসমাইল খান...সিংহাসনে আরোহণের পর পত্নী মমতাজের আগ্রহে দরবারে স্থান দিয়েছিলেন তাকে। পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে তিনি একটু বেশিই দয়া দেখিয়েছেন। এটাও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে, যে ধরনের গৃহযুদ্ধের পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছেন তা এত সহজে বা দ্রুত মুছে যাবে না। ডান হাতে ব্যথা বাড়তেই নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন সোনালি টিউনিক ভিজে গেছে রক্তে। হাত আর আঙুল বেয়ে রক্তের ধারা সাদা মার্বেলের উপর পড়ে তৈরি হয়েছে ছোট্ট একটা লাল পুকুর। তাড়াতাড়ি এ ক্ষতের শুশ্রূষা দরকার। হাত উঁচু করে চাইলেন রক্ত পড়া কমাতে, ঠিক যেমনটা করেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত হলে।

'কোন সন্দেহ নেই যে, তুমি মারা যাবে ইসমাইল খান। কিন্তু তার আগে যতক্ষণ পর্যন্ত না, আমি, তোমার সত্যিকারের সম্রাট আহত ক্ষতে ব্যান্ডেজ বেঁধে আসছি, বসে বসে মৃত্যু-ভয়ে ভীত হও আর অনুশোচনা করো কৃতকর্মের জন্য। কীভাবে মারা যাবে সেটা নির্ভর করবে আমাকে কতটা সত্যি কথা বলবে, তার উপর।'

'আমি আমার দোষ স্বীকার করছি, জাহাপনা।' এক ঘন্টা পরে আবারো শাহজাহানের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ইসমাইল। তবে এবার আগ্রা দুর্গের বাইরের প্যারেড গ্রাউন্ডে।

'আর কিই বা করার আছে তোমার? ঘটনাস্থলেই ধরা পড়েছো।' কড়া স্বরে উত্তর দিলেন শাহজাহান। শুধুমাত্র ইচ্ছেশক্তির জোরে এখনো বসে আছেন তিনি। নয়তো একটু আগেই প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিয়ে হাকিম ছোরার ফলা ঢুকে যাবার ক্ষতে সুঁই দিয়ে দশটা সেলাই করেছে, এরপর নিমের মলম লাগিয়ে বেঁধে দিয়েছে শক্ত করে। এখনো যন্ত্রণা হচ্ছে ক্ষতে কিন্তু—সাদা তুলোর ব্যান্ডেজ দেখে বোঝা গেল রক্ত পড়া থেমেছে। দ্রুত সেরেও যাবে। যদি না...ইসমাইল খান তার অস্ত্রে বিষ না মাখায়। 'তুমি কী তোমার ছুরির ফলায় বিষ মাখিয়েছিলে?'

'না, জাহাপনা।' তাড়াতাড়ি উত্তর দিল ইসমাইল খান। তরুণ মুখে ভয়ের ছাপ। 'না, আমি এটা করতামও না। তাহলে আপনি যেমন করেছেন সে রকমই অসম্মানের কাজ হত। খসরুকে মারার জন্য যাকে পাঠিয়েছেন, ইতিমধ্যে বাবার হাতে অন্ধ হয়ে গেছে...আমি নিজের হাতে পরিষ্কার আঘাত করতে চেয়েছি।'

এমনকি পুরুষ হিসেবে দাবি করার স্বপক্ষে বয়স কম হলেও শাহজাহান তরুণের সাহস দেখে প্রশংসা না করে পারলেন না। একই সাথে মনে মনে স্বস্তিও পেলেন যে, যাক মাত্র পাঁচ মাস আগে পঞ্চম মোগল সম্রাট হিসেবে মুকুট পরিধানের সময় যে উচ্চাকাঙ্খাগুলো ছিল সেগুলো পূরণ করার জন্য আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন তিনি। তারপরেও, কোন ক্ষমা নেই। কোন অনুতাপ নেই তার জন্যে যে কিনা সম্রাটকে আক্রমণের সাহস করেছে। ইসমাইল খানকে মারা যেতেই হবে। কিন্তু তার আগে এই ষড়যন্ত্রে আর কারো হাত ছিল কিনা তাও জেনে নিতে হবে।

'আর কে সাহায্য করেছে তোমাকে? কোন সাহায্য ছাড়া আমার দেহরক্ষীদের হাত থেকে নিশ্চয়ই ছাড়া পাওনি?'

'আমাকে কেউ সাহায্য করেনি। পারিবারিক সম্মানের জন্য এমনটা করেছি আমি।' ইসমাইল খানের তরুণ চোখ জোড়াতে ফুটে উঠল

আত্মপ্রত্যয়। চিবুক সামনে বাড়িয়ে বলে উঠল, 'আমিই সব দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি জানতাম যে যদি সফল হইও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব না। আপনার মৃত্যু কোন অপরাধ হত না। বরঞ্চ আপনার পাপের শাস্তি হত। আপনাকে হত্যা করে আমি আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাই পূর্ণ করতাম।

ইসমাইল খানের চেহারার দিকে তাকিয়ে শাহজাহান দেখতে পেলেন শহীদের সত্যিকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাব। এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হতে গেলেন যে এ আক্রমণের পুরো পরিকল্পনা তার একার। কিন্তু তারপরেও নিশ্চয়ই কেউ ছিল সাথে। হতে পারে নির্যাতনের মাঝেও তাদের নাম বলবে না। তাহলে দেরি কিসের? 'জল্লাদ, তোমার কাজ সেরে ফেলো।'

শাহজাহানের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল জল্লাদ। এগিয়ে এলো সামনে। স্থূলকায় লোকটার পরনে লাল পোশাক। সাথে লাল চামড়ার অ্যাপ্রন। হাতে খোলা তলোয়ার দুই ফুট লম্বা, মাথার দিকে খানিকটা বাঁকানো। তাড়াতাড়ি করে মাটিতে পাটের একটা ম্যাট পেতে দিল তার এক সহকারী। দু'জন প্রহরী ধাক্কা দিয়ে এর উপর নিয়ে আসলো ইসমাইলকে। 'গলা বাড়িয়ে দাও।' আদেশ দিল জল্লাদ। এক মুহূর্ত পরেই তার তলোয়ার সূর্যের আলো ঝিক করে উঠল ইসমাইলের উপর, ঠিক যেমন করে তরুণের ছোরা ঝিক করে উঠেছিল শাহজাহানের উপর। কিন্তু ইসমাইল খানের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে। হাত দুটো পিছনে বাঁধা; তাই নিজেকে বাঁচানোর কোন সামর্থ্য নেই তার। মসৃণ চামড়ায় দ্রুত বসে গেলো তলোয়ার। নরম মাংস ভেদ করে ঢুকে গেল ঘাড়ে। এরপর হাড় আর মাংসপেশী হয়ে কবন্ধ থেকে পৃথক হয়ে গেল ধড়। এক মুহূর্তের জন্য খোলা চোখ তাকিয়ে রইল শাহজাহানের দিকে। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই দ্বিখণ্ডিত শরীর থেকে রক্তের ফোয়ারা ছোটার আগেই জল্লাদের দুই সহকারী পাটের ম্যাটের উপর মাথা আর শরীর পেঁচিয়ে তুলে নিয়ে গেল।

প্যারেড গ্রাউন্ডের ধারে জড়ো হওয়া মানুষের ভিড় উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। খানিকটা আরাম বোধ করলেন শাহাজাহান। যদিও জীবন তাঁকে ভালোই শিক্ষা দিয়েছে যে মানুষের স্নেহ ভ্রম ছাড়া কিছু নয়। যদি ভাগ্য তাঁর সাথে না থাকে তাহলে তারা তাঁর মৃত্যুতেও হাততালি দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। তাঁকে নিশ্চিত করতে হবে যে এরকম যেন না হয়।

এছাড়া যদিও তিনি ইসমাইল খানকে সম্মানজনক মৃত্যুবরণ করার সুযোগ দিয়েছেন, তার আত্মাহীন মৃতদেহের সাথে তো এমনটা করা যাবে না। দুই হাত তুলে জনতাকে শান্ত করে বলে উঠলেন শাহাজাহান, 'তো, সকল বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি আমার পুরস্কার হবে একই, তাদের পদমর্যাদা যাই হোক না কেন অথবা আমার সাথে যত আত্মীয়তাই থাকুক না কেন। তাই আমার প্রজাদেরকে ভাগ্য সম্পর্কে জানিয়ে দেয়ার জন্য ইসমাইল খানের শরীরকে টুকরো টুকরো করে পচন না ধরা পর্যন্ত বাজারের প্রতিটি কোণায় ঝুলিয়ে রাখা হোক। খণ্ডিত মস্তক গেঁথে দেয়া হোক দুর্গের প্রধান দরজার মাথায়।'

যেমনটা তিনি ভেবেছিলেন, গর্জন করে উঠল ভিড়ের জনতা। এছাড়াও শোনা গেল নানা প্রশস্তিসূচক বাক্য। 'জিন্দাবাদ সম্রাট শাহজাহান। সম্রাট শাহজাহান চিরজীবী হোন।' যদিও তিনি ভালোভাবেই জানেন যে ষড়যন্ত্রে জড়িত আছে তাঁর রাজ কর্মকর্তারাও।

এখনো শেষ করেননি শাহজাহান। হাতে সেলাই করার সময় কামরান ইকবালের সাথে কথা বলেছিলেন তিনি—বহু দিনের সঙ্গী, পিতা আর সৎভ্রাতৃদ্বয় খসরু আর শাহরিয়ারের সাথে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধের সময়ও শাহজাহানের সাথী ছিল কামরানই—ইসমাইল খান যে প্রহরীদের সহায়তা নিয়েছিল তাদেরকে চিহ্নিত করে আটক করার ব্যাপারে। শাহজাহান নিশ্চিত যে অন্তত একজন হলেও পাওয়া যাবে।

'বন্দিদেরকে নিয়ে এসো।' নির্দেশ দিলেন তিনি। কয়েক মিনিট পরে মোগল দেহরক্ষীদের সবুজ পোশাক পরিহিত দুজন রক্ষী সামনে এলো কিন্তু তাদের লোহার দেহবর্ম আর হেলমেট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। দুই হাত একত্রে কব্জির কাছে বেঁধে রাখা। দুর্গের দেয়ালের ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে তাদেরই সশস্ত্রসঙ্গীরা নিয়ে এলো দু'জনকে। এরপর শাহজাহানের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল। কয়েক গজ সামনে দাঁড়ালেও দু'জনকেই চিনতে পারলেন শাহজাহান। প্রথম জন হরি সিং, লাহোর থেকে আগত এক সামরিক পরিবারের সদস্য। শাহরিয়ারের সময়েও নিয়োজিত থাকা এ লোকের দাদাজানের অনুরোধে এ দায়িত্ব দিয়েছে তাকে শাহাজাহান। সেই দাদাজান আবার তাঁর নিজের দাদাজান সম্রাট আকবরের সমসাময়িক সঙ্গী ছিলেন। দ্বিতীয় জন একজন উজবেক,

মজিদ বেগ, বহু বছর ধরেই আছে শাহজাহানের সশস্ত্রবাহিনীতে। উভয়কেই বেশ শান্ত দেখাচ্ছে।

'কামরান ইকবাল আমাকে জানিয়েছে যে, ইসমাইল খান তোমাদের দু'জনকে হটিয়ে আমার উপর আক্রমণ করেছে। কেন তোমরা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে? কেন তাকে থামালে না? সে তো খুব বেশি একটা শক্তিশালীও নয়।' উত্তর দিল না কেউই। 'কথা বল নয়তো লোহা গরম করতে বলব।'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মজিদ বেগ, 'আমার মনে হয় হরি সিং একটু দূরে সরে গেছে যখন ইসমাইল খান আমাদের দু'জনের মাঝে দিয়ে পার হয়ে গেছে। যদিও আমি তাকে থামানোর অনেক চেষ্টা করেছি।

তো ঘটনা তাহলে এই, ভাবলেন শাহজাহান। চোখ ঘুরিয়ে তাকালেন হরি সিংয়ের দিকে। লোকটা এখনো শাহরিয়ারের অনুগত, যেমনটা ছিল ইসমাইল খান জানি আর খসরুর প্রতি। 'নিজেকে বাঁচাতে কী বলার আছে তোমার?'

সরাসরি শাহজাহানের দিকে তাকাল হরি সিং। 'জাহাপনা! আমি পিছনে হটিনি, শপথ করে বলছি। আমি চেষ্টা করেছি আপনাকে রক্ষা করতে...ইসমাইল খানকে থামাতে। পা জোড়া ধরে মাটিতে ফেলে দিতে প্রায় সমর্থ হয়েই যাচ্ছিলাম। অন্যরা পরিষ্কার দেখেছে।'

'আর মজিদ বেগ? যেমনটা সে বলেছে ঠিক সেভাবে চেষ্টা করেছিল?'

'আমি জানি না। এছাড়া সেও আমার সহযোদ্ধা।'

'ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে না। হরি সিং, তোমাকে বলতেই হবে।'

হরি সিং আবার কিছু বলার আগেই শাহজাহান দেখতে পেলেন দেহরক্ষীদের নেতা এগিয়ে এল শুকনো প্যারেড গ্রাউন্ডে। বাতাসের তোড়ে লাল ধুলো উড়তে শুরু করেছে। 'কী হয়েছে?'

'আপনি যেমনটা নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমরা ওদের মিলিটারি ব্যারাকে খোঁজ করে এই ব্যাগটা পেয়েছি।' কথা বলতে বলতে দেহরক্ষীদের নেতা এক হাতে সবুজ রঙের একটা ভেলভেটের ব্যাগ তুলে ধরল। নিচে ধুলার উপর গড়িয়ে পড়ল বেশ কয়েকটা সোনার মোহর।

'কার থলে এটা?' জানতে চাইলেন শাহজাহান।

‘মজিদ বেগের।’

এটা হরি সিংয়ের নয়, জানতে পেরে বিস্মিত শাহজাহান। কিছুই না বলে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর জানতে চাইলেন, ‘এগুলো কী মজিদ বেগ? ষড়যন্ত্রের পুরস্কার?’

‘না, আমার সঞ্চয়।’ নিজের কথায় অটল রইল মজিদ বেগ।

‘এটা সত্যি নয়, জাহাপনা, কথা বলে উঠল দেহরক্ষী প্রধান। ‘অন্য প্রহরীদের একজন আমাকে জানিয়েছে যে জুয়ারী হিসেবে খ্যাতি আছে মজিদ বেগের আর এখন সে মেয়ের বিয়ের যৌতুক মেটাতে অর্থ জোগাড় করছে। সেই-ই অপরাধী।’

‘হরি সিং, এবার তুমি বলো।’ তাগাদা দিলেন শাহজাহান।

‘আমি পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কোন সহকর্মীকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল।’ আস্তে করে বলে উঠল হরি সিং। তবে এবার তার চোখ মাটির দিকে নামিয়ে রাখল। এ সময় মজিদ বেগ চাইল মরিয়া হয়ে প্রহরীদের হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিতে, কিন্তু চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল প্রহরীরা।

‘মজিদ বেগ, এটা তোমারই কাজ।’

‘হ্যাঁ, জাহাপনা।’

‘কে বলেছে করতে?’

মজিদ বেগ একেবারে ভেঙে পড়ল। ‘ইসমাইল খান। আমাকে এও বলেছে যে এক প্রহরীর কাছ থেকে আমার অর্থের প্রয়োজনের কথা শুনেছে।’

‘আর কেউ জড়িত ছিল?’

‘না...আমার জানা মতে না, জাহাপনা।’

‘ইসমাইল খানের মত তুমিও মারা যাবে মজিদ বেগ। কিন্তু তার মত করে না, কেননা তুমি আরেকজন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর দোষ দিতে চেয়েছো। তোমার মৃত্যু হবে হাতির পায়ের নিচে। জল্লাদ হাতিকে সামনে নিয়ে এসো।

ধীরে ধীরে বিশাল বড় এক হাতি, কানের কিনারা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল বয়সের ভার, দুর্গের দেয়াল থেকে বের হয়ে সামনে এলো। পিঠের উপর বসে আছে হাতির মতই বয়সের ভারে ন্যূজ মাহুত। একই সাথে

প্রহরীর দল টানতে টানতে মজিদ বেগকে গ্রানাইটের পাথরের তৈরি মঞ্চের উপর নিয়ে গেল। চার কোণায় থাকা লোহার আংটার সাথে বেঁধে ফেলা হল মজিদ বেগের হাত আর পায়ের গোড়ালি। প্রথমে মনে হল কোন বাধা দেবার চেষ্টা করল না সে, বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিল ভাগ্য। জল্লাদ হাতি এগিয়ে এল পাথরের দিকে। মজিদ বেগের উপর পড়ল ছায়া। আস্তে করে ডান পা উঁচু করল মজিদ বেগের পেট লক্ষ্য করে, এবার নড়ে উঠল মজিদ বেগ। ছাড়া পাবার জন্য যুদ্ধ শুরু করে দিল, চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমার অতীতের কাজ স্মরণ করুণ, জাহাপনা! আমাকে ক্ষমা করুন!'

'আমি তা করব না।' উত্তর দিলেন শাহজাহান। 'হত্যা করো।'

নিজের হাতে থাকা লোহার রড দিয়ে হাতির মাথায় আঘাত করল মাহুত। মজিদ বেগের পেটের উপর পা নামিয়ে আনল হাতি। [illegible] চিৎকার করে উঠল মজিদ বেগ। পেলভিক হাড় ভাঙ্গার শব্দ শোনা গেল। শক্ত গ্রানাইটের সাথে চূরমার হয়ে গেল হাড়। পাকস্থলীর দেয়াল ছিঁড়ে যেতেই বাতাস বের হয়ে এলো। গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই থেমে গেল সব চিৎকার।

মাহুতের কাছ থেকে আরেকটা নির্দেশ পেয়ে আবারো পা তুলল হাতি। আস্তে আস্তে ঘুরে গিয়ে হাঁটা ধরল দুর্গের দিকে। ডান পায়ের প্রতি পদক্ষেপের সাথে রক্ত মাখা কমলা রঙের ধুলা উড়তে লাগল বাতাসে।

'তো, শেষ হল আরেকজন বিশ্বাসঘাতক।' ভিড়ের জনতার চিৎকার শুনে আবারো বলে উঠলেন শাহজাহান। এরপর ফিরে তাকালেন হরি সিংয়ের দিকে। 'তুমি মুক্ত আর তোমার প্রত্যাখানের জন্য—এমনকি তোমার নিজের জীবন ঝুঁকিতে পড়ে গিয়েছিল—মজিদ বেগের অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েও কিছু বলনি, ধুলার মাঝে পড়ে থাকা মোহরগুলো নিয়ে যাও। মজিদ বেগের বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য তোমার বিশ্বস্ততার পুরস্কার।'

প্রহরি হরি সিংয়ের হাতের বাঁধন কেটে দিতেই নিচু হয়ে মোহর কুড়াতে লাগল সে। দুর্গের দিকে ফিরে গেলেন শাহজাহান। হাত নেড়ে সরিয়ে দিলেন সভাসদদের শুভেচ্ছা। শাহানশাহের বেঁচে যাওয়া আর নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে চেয়েছিল তারা। শাহজাহান যেতে চান

হারেমে, মমতাজের কাছে। ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগানোর সময়ে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন এই হত্যাকাণ্ডের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কিছু না জানানো হয় মমতাজকে। শাহজাহানের কাছ থেকে শুনলে আর নিজ চোখে দেখলে যে তিনি সুস্থ আছেন হয়তো মমতাজের আশংকা কেটে যাবে। কিন্তু একই সাথে মমতাজ হয়ত এও চেষ্টা করত যেন ইসমাইল খানকে ক্ষমা করে দেন শাহজাহান। জানির ভয়ংকর সমাপ্তি—স্বামীর হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে গরম কয়লা গিলে ফেলেছিল—এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় মমতাজকে। কিন্তু যেহেতু শাহজাহান মমতাজকে খুশি করতে চান, একবারের জন্য তিনি তাঁর অনুরোধ মেনে নিতে পারলেন না।

'না...না...রোশনারা...'

'সম্রাজ্ঞী, কী হয়েছে?'

জেগে গেলেন মমতাজ। সারা শরীর কাঁপছে। কপাল ঘেমে একসা। সাথে সাথে বিশালদেহী পারস্যবাসী ভৃত্য সাত্তি আল নিসা হলুদ সিল্কের রুমাল দিয়ে মুছে দিল ঘাম। 'আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি আর সম্রাট উন্মত্ত "মহনদী" নদীতে ষাঁড়ের গাড়ি দিয়ে পার হবার সময় একটা জন্তু পা হড়কে পড়ে যায়, গাড়ি উল্টে যায়...ঢেউ এসে রোশনারাকে নিয়ে যায় আমার কোল থেকে...আমি সাঁতার কেটে ওর কাছে যাবার চেষ্টা করলেও পারি নি...আমি বুঝতে পারছিলাম যে মেয়েটা ডুবে যাচ্ছে কিন্তু পানিতে ডুবে যাচ্ছিলাম আমি নিজেও...মাথার উপরে পানি গলার মাঝে ঢুকে যাচ্ছে পানি...আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।'

'শশশ। কিছুই হয়নি সম্রাজ্ঞী। আপনি আবারো দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। রোশনারা জাহানারার কাছে আছে। আমি মাত্র আধা ঘণ্টা আগেও আপনার মেয়েদেরকে একসাথে দেখেছি।' এত নরম স্বরে সাত্তি-আল-নিসা কথা বলতে লাগল যেন চল্লিশ বছর বয়স্ক কোন সম্রাজ্ঞী নয়, সে কথা বলছে কোন শিশুর সাথে। স্বস্তির সাথে আবারো শুয়ে পড়লেন মমতাজ। কিন্তু আরো কয়েক মিনিট কাটার পর অবশেষে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি থেমে গেল। মধ্যাহ্নের খাবারের পরপরই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু ঘরময় ছায়া এখন। এতক্ষণ নিশ্চয়ই ঘুমাননি তিনি।

চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন যে ঘুমানোর পরে জানালাগুলোতে তত্তি—সুগন্ধময়—কাশফুলের শিকড়ের ঘাস দিয়ে তৈরি পর্দা—দিয়ে গেছে ভৃত্যেরা, যেন গ্রীষ্মের কড়া রৌদ্র কামরাতে ঢুকতে না পারে। ফোঁটা পড়ার শব্দে তিনি এও বুঝতে পারলেন যে পর্দার উপর গোলাপ জল ছিটিয়ে দিয়ে গেছে তারা, যেন বাতাসও সুগন্ধময় হয়ে ওঠে।

মমতাজ পাশ ফিরে শুলেন, চিকন রশ্মির মত করে সূর্যের আলো আসছে পর্দা ভেদ করে, কাউচের চারপাশে দামি পারস্যের কার্পেটের উপর নাচছে আলোর পুকুর। মনে পড়ে গেল সেই মুহূর্তের কথা যখন তাঁর ছোট কন্যা প্রায় ডুবেই যাচ্ছিল পানিতে। শাহজাহান বাঁচিয়েছিলেন মেয়েকে। সম্রাটের সেই দুঃখ ভরা দৃষ্টি মমতাজ কখনো ভুলতে পারবেন না—পানিতে ভিজে চুপচুপে মেয়েকে কোলে দিয়েছিলেন শাহজাহান, কিন্তু তখনো নিঃশ্বাস ফেলছিল রোশনারা—শাহজাহানের পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে সারা ভারত চষে বেড়াচ্ছিলেন তারা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকাটাই তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল। অবাক লাগে ভাবতে যে, এখন তিনি সম্রাজ্ঞী, নিরাপত্তা আর আয়েশে মোড়ানো জীবন, তারপরও ও সেই দিনগুলি কখনো মনে পড়ে যায়। কখনো কখনো অবাক হয়ে ভাবেন রোশনারার কী কিছু মনে আছে, যদিও সে অনেক ছোট ছিল তখন। মমতাজের অন্য ছেলেমেয়ের চেয়ে রোশনারাই বেশি চাইতো মায়ের কাছে থাকতে। মায়ের অনুপস্থিতি অনেক দিন ধরে ভয়ে ফেলে দিত মেয়েটাকে।

'সাত্তি আল-নিসা, আমার আদেশ জানিয়ে দাও, আমি চাই আমার ছেলে-মেয়েরা আজ সন্ধ্যায় আমাদের সাথে খাবার গ্রহণ করবে।' তাদের সাহচর্যে উদ্দীপনা ফিরে পাবেন, ভাবলেন মমতাজ। এখন যখন খুশির দিন এসেছে, অন্ধকারের কথা ভাবাতে নিজের উপরই বিরক্তি এলো মনে। ছয়টি সন্তানই কি প্রমাণ নয় যে অতীতের পরীক্ষা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর সাথে আছেন? আর এখন শুধু এটুকুই যথেষ্ট যে একে অপরের সাথে যতটা পারা যায় সময় কাটানো উচিত। দুই সপ্তাহের মাঝে দারা শুকোহ আগ্রা ছেড়ে যাবে পারস্যের শাহের দরবারে মোগল দূতাবাস স্থাপন করতে। শাহজাহানের মতে, চৌদ্দ বছরের কাছাকাছি বয়স্ক দারা শুকোহ্ কয়েকদিনের মাঝেই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষে পরিণত হবে। তাই রাজকীয়

কাজের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। একমত হয়েছেন মমতাজ।

মনে প্রশান্তি ভাব আসতেই আড়মোড়া ভাঙ্গলেন তিনি। শীঘ্রই তৈরি হতে হবে আসন্ন সন্ধ্যার জন্য। সেবা দাসীরা সুগন্ধি তেল লাগিয়ে দেবে মসৃণ দেহত্বকে, চোখে কাজল আর এমন পোশাকে অঙ্গ সাজিয়ে দেবে যেভাবে সম্রাজ্ঞীকে দেখতে পছন্দ করেন সম্রাট। মসলিনের পায়জামা যেটিকে দরবারের কারিগররা নাম দিয়েছে 'বহতা পানি' আর অ্যামব্রয়ডারি করা চোলি। হঠাৎ করেই মমতাজ শুনতে পেলেন ড্রামের শব্দ, যার অর্থ সম্রাট হেরেমে প্রবেশ করেছেন। অবাক হয়ে উঠে বসলেন তিনি—এমনটা তো হবার কথা না...সাধারণত সূর্য ডোবার পরেই আগমন ঘটে সম্রাটের। খানিক পরেই জোড়া দরজা মেলে ধরল ভৃত্যেরা, প্রবেশ করলেন শাহজাহান।

একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই মমতাজ বুঝতে পারলেন যে কিছু একটা ঘটেছে। জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে? কী ঘটেছে?'

কিছুই না বলে নিজের কাছে পত্নীকে টেনে নিলেন শাহজাহান। মমতাজের শরীরের উষ্ণতা, চুলের পরিচিত জেসমিনের সুগন্ধ পেয়ে মনে মনে আবারো ধন্যবাদ জানালেন যে, ইসমাইল খান সফল হতে পারেনি। তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না। কিন্তু যাদেরকে ভালোবাসেন তাদেরকে ছেড়ে যাওয়া...অবশেষে ছেড়ে দিলেন মমতাজকে। কোট ঠিক করে ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসলেন। ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত দেখতে পেলেন মমতাজ। 'আপনার সাথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে?'

'না, দুর্ঘটনা নয়। আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে...চিন্তা করো না, চিন্তার কিছু নেই। মাংস কেটে গেছে। হাকিম এর পরিচর্যা করে দিয়েছে।'

'কে?' ভয়ার্ত কণ্ঠে ফিসফিস করে উঠলেন মমতাজ।

'ইসমাইল খান। আমার রক্ষীদেরকে সরিয়ে ছুরি মেরেছে।

'জানির ভ্রাতুষ্পুত্র? কিন্তু ও তো একটা ছোট ছেলে...কেন? কী হয়েছে ওর? আর আপনিই বা কী করেছেন তার সাথে?'

'সে জানির হয়ে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। ইতিমধ্যে শাস্তিও পেয়েছে। আমি বরঞ্চ দয়াই দেখিয়েছি—আমি তাকে দ্রুত মৃত্যু

অনুমোদন করেছি। আমি তাকে বাঁচতে দিতে পারি না...আমাকে হত্যা করার চেষ্টার পর তো নয়ই।'

'সম্ভবত না, কিন্তু...' থেমে গেলেন মমতাজ।

শাহজাহান আলতো করে নিজের হাতের মাঝে ধরলেন পত্নীর মুখ। বললেন, 'বিবাহের পর থেকে আমি যা কিছু করেছি তা আমাদের জন্য, আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য...আমাদের নিরাপত্তা আর ভবিষ্যতের জন্য।'

'আমি কখনো এমনটা সন্দেহ করিনি, কখনো না...এত বছরে না। কিন্তু এর মাধ্যমে কিছুতেই নিজেকে অপরাধী হিসেবে ভাবা বন্ধ করতে পারছি না। খানিকটা ভয়ও পাচ্ছি। আমরা যা চেয়েছি পেয়েছি, কিন্তু এর মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে রক্ত দিয়ে।'

হাত নামিয়ে নিলেন শাহজাহান। 'যদি আমি তাদেরকে হত্যা না করতাম তাহলে আমার সৎভাইয়েরা আমাকে হত্যা করত...আমাদের পুত্রদেরও। তাদের মৃত্যুতে আমি গর্বিত নই, কিন্তু এগুলোর প্রয়োজন ছিল। এটা বললে মিথ্যে বলা হবে যে আমি এ কাজ অসমাপ্ত রাখতে চেয়েছি। যদিও অতীত এসে প্রায়ই জ্বালাতন করে আমাকে—আমি জানি তোমাকেও—কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কিছুই করার নেই।'

'আপনি তা-ই করেছেন, যা করার দরকার ছিল...আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কেমন হবে যদি ইসমাইল খানই হয় প্রথম? আর কত জন আছে যারা আপনার কাজের প্রতিশোধ নিতে চাইবে?'

'আমি মোগল সম্রাট আর শত লক্ষ্য আত্মার পরিচালক। তাই আমার জীবনে ঝুঁকি থাকবেই। কিন্তু আমি আমার আর আমার পরিবারকে রক্ষা করবই...এর কখনো অন্যথা হবে না। আমি সকলকে নিরাপদে রাখব, প্রতিজ্ঞা করছি।'

রৌপ্য সিংহাসনে বসে সূর্যাস্তের দৃশ্য অবলোকন করছেন শাহজাহান। সারি বেঁধে এগিয়ে আসলো বারোজন রাজকীয় ভৃত্য। সবার হাতে একটি করে সোনালি মোমদানি যার মাথায় জ্বলছে লম্বা কর্পূরের সুগন্ধযুক্ত

মোমবাতি। দরবারের সামনে এসে প্রত্যেকেই একবার করে কুর্নিশ করল সম্রাটকে, এরপর মোমবাতি নিয়ে চলে গেল দিয়া জ্বালাতে। বিশাল পাত্রের মাঝে সরষের তেলে ডুবানো সলতে—দুর্গের আঙিনার চারপাশে রাখা আছে পিতলের দিয়াগুলো। রক্ষীবাহিনীর নেতার নেতৃত্বে কাজ শেষ করল সকলে। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাটকে জানালো, 'রাতের জন্যে দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে জাহাপনা। এরপর শাহজাহানের পছন্দের দরবার শিল্পী—গভীর সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী, তরুণ তাজিক গেয়ে উঠল সম্রাটের নামে প্রশস্তিগীতি আর তাঁর পবিত্র শাসনামল অক্ষত টিকে থাকার জন্য প্রার্থনা সঙ্গীত। সম্রাট আকবর প্রবর্তিত এই নিশি জাগরনী অত্যন্ত উপভোগ করেন শাহজাহান। দাদাজানের সফল শাসনামলের সাথে নিজের কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল এই সিংহাসনের যোগ্য উত্তরসূরী তিনিই; মাথা নত করে রাখা রক্ষীবাহিনীর সামনে দিয়ে এরপর উঠে চলে গেলেন হারেমে, মমতাজের কাছে। হাতে ধরা সবুজ ভেলভেট রিবনে বাঁধা একতোড়া কাগজ।

'আমি তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি—দরবারের একজন কবি তোমার নামে কবিতা রচনা করেছেন।' নিচু হয়ে মমতাজের অধর চুম্বন করলেন শাহজাহান।

'কী লেখা আছে এতে?'

'একটু বেশি বাক্যালংকারপূর্ণ হলেও আমার ভাবনাই ফুটে উঠেছে।'

'হতে পারে, কারণ আপনি তাঁকে আগেই বলে দিয়েছেন যে কী লিখতে হবে।'

'হুম, যাই হোক, হতে পারে। পড়ব?'

'অবশ্যই।' বলে উঠলেন মমতাজ। হালকা হাসি ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে। রিবন খুলে পড়া শুরু করলেন শাহজাহান :

'তাঁর আচরণের কোন ধুলাই
ছায়া ফেলে না সম্রাটের মনের আয়নায়
তিনি সব সময় রাজাকে খুশি
করার চেষ্টায় রত;
ভালোভাবেই জানেন রাজাদেরও

রাজার অনুভূতি।
তার চোখে খেলা করে আলো—'

কিন্তু শেষ করার পূর্বেই দরজার সোনালি তারকা আর চন্দ্রখচিত অ্যামব্রয়ডারি করা পাতলা মসলিনের পর্দা সরিয়ে এগিয়ে এল সাত্তি আল-নিসা।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইলেন শাহজাহান, 'আমি আদেশ দিয়েছি যেন বিরক্ত না করা হয়।'

'আমি দুঃখিত জাহাপনা। কিন্তু দক্ষিণ থেকে আবদুল আজিজ এসে পৌঁছেছে। আমি তাকে জানিয়েছি যে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী রাতের জন্য বিশ্রাম করছেন, কিন্তু আপনার সাথে দেখা করার জন্য তাড়া করছে সে।'

'আমি আসছি।' জানিয়ে দিলেন শাহজাহান। কী এমন ঘটেছে যে দাক্ষিণাত্যে তাঁর সেনাপতির পুত্র এত রাতে দেখা করার জন্য জেদ করছে? একটা ব্যাপার তো নিশ্চিত যে, কোন দুঃসংবাদই হবে। তাড়াহুড়োয় কক্ষ ছেড়ে হারেমের আঙিনা দিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন শাহজাহান। চাঁদের আলোয় চকচক করছে দুই সারি ঝরনা। গেট হাউছে পৌঁছে মশালের আলোয় এ মাথা থেকে ও-মাথা পায়চারি করতে থাকা কৃশকায় আবদুল আজিজকে দেখতে পেলেন। সম্রাটকে প্রধান আঙিনায় নেমে আসতে দেখে নিজের জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল তরুণ। তারপর হাঁটু গেড়ে সম্রাটকে সম্মান জানাল।

'উঠে দাঁড়াও।' নির্দেশ দিলেন শাহজাহান। আবদুল আজিজ উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল তার সারা গায়ে ঘাম আর ধুলা। সম্রাটের সামনে আসার আগে এমন কি গোসল করে পোশাক পরিবর্তনের কথাও খেয়াল নেই। 'কী কারণে তোমাকে এত তাড়াহুড়োয় আমার কাছে নিয়ে এলো?'

'আমার পিতা অবিলম্বে আপনাকে এ সংবাদ জানাতে বলেছেন যে, দাক্ষিণাত্যের সম্রাটের সৈন্যরা কতটা দুর্ভোগের মুখে পড়েছে। গোলকুন্ডা আর বিজাপুরের শাসকেরা আপনার প্রতি আনুগত্য ভুলে গিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করেছে। আমাদের সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে দিয়ে সরাসরি ভূ-খণ্ডের গভীরে চলে এসেছে। আমার পিতা যুদ্ধ হাতি আর আধুনিক কামান দিয়ে সুসজ্জিত বিশাল সেনাবাহিনী একত্রিত

করে তাপ্তি নদীর থেকে নব্বই মাইল দক্ষিণে তাদেরকে মোকাবেলা করেছেন। প্রথম দিকে আক্রমণকারীরা যুদ্ধ করতে পারছিল না, কিন্তু আমার পিতা তাদেরকে বাধ্য করেছেন।'

'তিনি একজন দক্ষ সেনাপতি।'

'হ্যাঁ জাহাপনা তিনি ছিলেন...দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল আবদুল আজিতের মুখমণ্ডল। 'পুরো একদিন যুদ্ধ হয়েছে; কিন্তু কোন পক্ষই সুবিধা করতে পারেনি। শুধুমাত্র গরম আর পানির অভাবেই আততায়ীর হাতেই নিষ্ক্রিয় হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে সেনারা। সূর্যাস্তের দিকে খানিকটা পরাজিত হতে শুরু করে আক্রমণকারীরা। আমার পিতা শেষবারের মত তাদেরকে পিছু হটিতে দিতে অগ্রসর হয় নিজের ধূসর তেজী ঘোড়া নিয়ে...আমি অনুনয় করেছি আমাকে সাথে নিতে, কিন্তু আমার কাতরতা শোনেননি তিনি।'

আবদুল আজিজের ধুলি ধূসরিত মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুবিন্দু। 'আমাদের ঘোড়সওয়ারদের দক্ষতায় আক্রমণকারীদের অনেকেই ধরাশায়ী হয়। আমার পিতা কামানের দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলে একজন গোলন্দাজ গোলা ছুঁড়ে বসে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, গোলা এসে আঘাত করে পিতার ডান বাহুতে, আমাদের লোকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছিলেন তিনি তখন। কনুই থেকে পুরো পেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু শত্রুবাহিনী পিছু না হটা পর্যন্ত কোন চিকিৎসা নিতে রাজি হননি তিনি। এরপর হাকিম ক্ষত পরিষ্কার করে রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা নেন। ব্যথা প্রচুর রক্তক্ষরণের পরেও এই রাতে ভালোভাবেই নিদ্রা গিয়েছেন পিতা আর আমিও আশা করে ছিলাম যে তিনি দ্রুতই সেরে উঠবেন...' থেমে গেল আবদুল আজিজ।

'পরের দিন সকাল বেলা পিতা আবারো শত্রুর পিছু নেবার হুকুম দেন। আমাদের চরের মাধ্যমে জানা যায় যে শত্রুবাহিনী দক্ষিণে ছুটছে। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনের দুপুর বেলা দু'পাশে পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকা বেয়ে নামার সময় হঠাৎ করেই গোলকুণ্ডার বিশাল বড় এক অশ্বরোহী বাহিনী এসে আমাদের পথরোধ করে। কোন আদেশের আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আমাদের সৈন্যরা। প্রথম আঘাতেই আমাদের সারি ভেঙে দু'টুকরা হয়ে যায়। পেছনদিকে চক্রাকারে এগিয়ে আসে আক্রমণকারীরা। সেখানেই

ছিল কামান আর রসদবাহী গাড়ি। কাটতে কাটতে এগিয়ে আসে শক্ররা। বিশৃঙ্খলার মাঝে পড়ে যায় আমাদের লোকেরা। কয়েকজন পালিয়ে যায় কিন্তু কিছু কাপুরুষ বৃথাই এই চেষ্টা করে, কেননা পেছন থেকে তাদেরকে মেরে ফেলে গোলকুন্ডার ঘোড়সওয়ারা।

'পেছনের বাকি সৈন্যরা চেষ্টা করে একত্রিত হয়ে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে। অন্যদিকে সামনের অংশে বাকি সৈন্যদের নিয়ে পিতা চেষ্টা করেন বন্দুকবাজদের প্রস্তুত করতে। তাদের প্রচেষ্টা সফল হয় শক্রদের পিছু হটাতে। অশ্বারোহীদের বেশিরভাগ এসে পিতার পাশে জড়ো হয়, কিন্তু পদাতিকেরা হয়ে পড়ে সংখ্যায় নগণ্য। আমি দেখেছি কমলা পোশাক পরিহিত একদল পদাতিক রাজপুত শক্রবাহিনীর অশ্বরোহীদের বর্শার আঘাত ঠেকাতে এক হয়ে লড়েছে। বেশ কয়েকবার রাজপুতদের তলোয়ারের আঘাতে গর্জে ওঠা ঘোড়া ফেলে দিয়েছে আরোহীকে। কিন্তু এটা ছিল অসম প্রতিযোগিতা। খুব কম সুযোগই পেয়েছে রাজপুত সৈন্যরা তাদের অস্ত্র ব্যবহার করার। তাই ফলাফল ছিল একটাই। শুধুমাত্র দু'জন রাজপুত ফিরে আসতে পেরেছে আমাদের সারিতে। দু'জনেই প্রচুর রক্ত হারিয়েছিল। এরপর আক্রমণকারীরা জ্বলন্ত ন্যাকড়া বাঁধা তীর ছুড়ে মারে। ফলে ভয় পেয়ে যায় আমাদের যুদ্ধ হাতিরা। কয়েকটা তো এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে একে অন্যের সাথে গুঁতোগুঁতি শুরু করে দেয়, অস্ত্রের মুখ ঘুরে যায়।'

'পিতা আদেশ দেন বাকি সৈন্যরা যেন উপত্যকার শেষপ্রান্তের কাছাকাছি নিচু পাহাড়ে চলে যায়, সেখানে গিয়ে আমরা আবার একত্রিত হবার সুযোগ পাবো। শক্রপক্ষের উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও আমরা সেই রকমই করলাম। কাছাকাছি পৌঁছতেই পর্বতে লুকিয়ে থাকা কয়েকজন শক্র তীরন্দাজ তীর ছোড়ে। তিনটা তীর এসে পিতাকে বহনকারী পালকিতে আঘাত করে। দুইটা তীর সাথে সাথে আগুন ধরিয়ে দেয়, তৃতীয়টা পিতার উরুতে আঘাত করে। কাপড়ে আগুন ধরে যায়। সাথে সাথে পিতার ভৃত্যেরা আগুন নিবিয়ে তাঁকে বাইরে বের করে আনে। চেতনা থাকলেও পিতা বেশ বুঝতে পারেন যে এই ক্ষত সারিয়ে তোলার ক্ষমতা নেই হাকিমের।'

'ব্যথার সাথে যুদ্ধ করে তিনি নেতৃত্ব তুলে দেন সেকেন্ড ইন-কমান্ড জাকির আবাসের হাতে। নির্দেশ দেন যতটা সম্ভব সুশৃঙ্খলভাবে পিছিয়ে যেতে। এরপর আমাকে ডেকে পাঠান। আমার হাত ধরে নির্দেশ দেন যেন এই পরাজয়ের খবর পৌঁছে দিই আপনার কাছে...আপনাকে জানাতে বলেছেন যে সৈন্যদেরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আন্তরিকতভাবে দুঃখিত আর এই মুহূর্তে সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী না পাঠানো হলে দক্ষিণে আমাদের ভূ-খণ্ড হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

সারা শরীর কাঁপিয়ে ফোঁপাতে লাগল আবদুল আজিজ। 'জাহাপনা! ভৃত্যেরা আমার পিতার দাড়িতে লেগে যাওয়া আগুন নিভাতে পারেনি। চেহারা থেকে খসে পড়েছে পোড়া চামড়া...পুড়ে যাওয়া ঠোঁট...কথা বলতে পারেননি তিনি। কয়েক মিনিট পরেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি।'

'তোমার পিতা একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমি। তুমিও তোমার দায়িত্ব পালন করেছো। এখন তুমি ঘুমাতে যাও। বাকি কথা সকালে হবে।'

আবদুল আজিজ প্রস্থান করতেই, তার পিতার মৃত্যুর খবরে কাঁপতে লাগল সৈন্যরা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে হারেমের দিকে চলে গেলেন শাহাজাহান। দক্ষিণে সৈন্যদল পরিষ্কারভাবেই পরাজিত হয়েছে। এক নতুন সেনাপতির অধীনে নতুন সৈন্যবাহিনী পাঠাতে হবে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। কিন্তু কে হবেন এই সেনাপতি?

যদি মহবৎ খান, সম্রাটের খান-ই খানান এই মুহূর্তে হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের রাজা আর তার গুর্খা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত না থাকতো, তাহলে স্পষ্ট প্রথম পছন্দ ছিল সে-ই। কিন্তু তাকে ডেকে পাঠানো দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার।

ঝরনা পার হতে হতে আরো বেশ কয়েকজন সেনাপতির নাম মনে মনে ভাবলেন শাহজাহান। বিশ্বস্ত বন্ধু কামরান ইকবাল, আগ্রা দুর্গের সেনাপ্রধান, তবে তাকে এখানেই বেশি প্রয়োজন। এছাড়া লাহোরে শাহরিয়ারের সাথে যুদ্ধে আহত ক্ষত থেকে এখনো সেরে ওঠেনি সে, পুরোপুরি হয়ত কখনোই সেরে উঠবে না।

শ্বশুর সাহেব আসফ খান বৃদ্ধ হয়েছেন। অভিযানে যাবার মত সামর্থ্য নেই এখন আর। অন্যান্য হয় বেশি রাগী অথবা বেশি সাবধানী।

কয়েকজন আছে স্থানীয়দের সাথে বেশ খারাপ আচরণ করতে অভ্যস্ত, পারিশ্রমিক না দিয়েই তাদের শ্রম চায়। কিন্তু এ ধরনের আচরণ দাক্ষিণাত্যের গর্বিত আর অশান্ত স্বভাবের লোকদের সাথে খাটবে না। না। আর কোন উপায় নেই। তিনিই যাবেন, দক্ষিণে, তাঁকেই দিতে হবে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব।

কয়েক মিনিট পরে আরো একবার সোনালি অ্যামব্রয়ডারি করা মসলিনের পর্দা সরিয়ে ঢুকলেন মমতাজের রুমে। পদ্মখচিত রেশমী কাপড়ের গোল বালিশে পিছন ফিরে শুয়ে তরমুজের রস পান করছেন মমতাজ। চোখ তুলে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, 'আবদুল আজিজ কী চেয়েছে?'

'দাক্ষিনাত্যের বিরাট পরাজয় আর বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। আমাকে এখনই সেনাবাহিনী জড়ো করে রওনা দিতে হবে।'

'কখন রওনা দেবো আমরা?'

'আমি একা যাবো। তোমরা এখানে থাকবে।'

'দাক্ষিণাত্যে এই অভিযান অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা কেন? আমি সবসময় আপনার সঙ্গী হয়েছি আর আপনিও কখনো আপত্তি করেননি।'

'হ্যাঁ, তুমি আমার সাথে গেলে আমিও খুশি হতাম। যদি না জানা থাকতো যে তুমি আবার মা হতে চলেছ। শেষবার প্রথমগুলোর চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলে তুমি। এখানেই ভালো হাকিমের বন্দোবস্ত থাকবে।'

'যেমনটা আমি আপনার প্রথম অভিযানের সময়ই বলেছিলাম, আমি আপনাকে ছাড়া থাকতে চাই না। সর্বশ্রেষ্ঠ হাকিমেরাও তো আমাদের সাথেই আসতে পারে।'

'হুম পারে সম্ভবত।'

'না, কোন সম্ভবত নেই। আমি, আমাদের ছেলেমেয়েরা আর আপনি যত হাকিম চান, সকলেই আপনার সাথে যাচ্ছি। একসাথে বিজয়ের উদ্দেশে রওনা হব আমরা।'

বোঝা গেল কিছুতেই নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না মমতাজ।

অধ্যায়-০২

আগ্রা দুর্গের বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে মলিন সূর্যের আলোয় নিজের তলোয়ার তুলে নিলেন শাহজাহান আর মাথার উপর তুলে তিনবার ঘোরালেন। ভোরের একেবারে শুরু হচ্ছে মাত্র। এই ইশারা পেয়ে, সেনাবাহিনীর গোলন্দাজেরা ছোট কামান থেকে গোলা ছুড়লো। দাক্ষিণাত্য থেকে আবদুল আজিজের বয়ে আনা সংবাদের পর থেকে দুর্গের নিচে যমুনা নদীর তীরে জড়ো হওয়া শুরু করেছিল সৈন্যরা। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল সকলে। এর বিশালত্বের দিকে তাকিয়ে—এমনকি পারস্যের শাহও এতবড় সুসজ্জিত দল একত্রিত করতে পারবেন না রণক্ষেত্রে, গর্ব ভরে ভাবলেন শাহজাহান।

প্রথম বিশ হাজার হল অশ্বারোহীদের অগ্রগামী সৈন্য। বাতাসে উড়ছে তাদের সবুজ সিল্কের তৈরি স্মারকচিহ্ন। এরপর হাতির পিঠে চড়ে চলেছে সম্রাটের বয়স্ক ও প্রধান সেনাপতির দল। জমকালো ভেলভেট আর সোনার কাপড় পরিহিত হাতিদের ঘণ্টা আর শিকলগুলো সোনা ও রুপার তৈরি হওয়ায় শব্দও বাজছে। এরপর দুধ-সাদা ষাঁড়ের দল টেনে নিয়ে চলেছে কাঠের গাড়িতে থাকা বিশাল ব্রোঞ্জের কামান। ষাঁড়ের শিঙে এর মাথায় সবুজ আর সোনালি ডোরাকাটা দাগ। এদের পেছনে এগোচ্ছে পদাতিক বাহিনীর বিশটি সারি, একেবারে পাশাপাশি অবস্থায় অনুসরণ করছে বিশাল রসদের সারি। রসদবাহী হাতিগুলোর পায়ের বদৌলতে মনে হচ্ছে ধুলার সাগরে জাহাজ চলেছে। এদের পেছনেই আছে উট, গরুর গাড়ির দল।

সময় হয়ে গিয়েছে সম্রাটের হাতি অগ্রসর হবার। দুর্গের চওড়া বহির্দ্বার দিয়ে যখন তিনি বের হচ্ছেন, পেশীবহুল বাজনাবাদকেরা সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিল ঢাকের তালে তালে যে, মোগল সম্রাট যুদ্ধে চলেছেন। 'প্রদর্শনের ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করো না, বিশেষ করে শক্তি প্রদর্শনকে।' হাসি দিয়ে আকবর বলেছিলেন একদা শাহজাহানকে। তরুণ বয়সে এই ধাঁধা দ্বিধায় ফেলে দিত তাঁকে, কিন্তু ধীরে ধীরে ঠিকই বুঝতে পারেন এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। জনগণের সামনে নিজের এবং তাঁর সাম্রাজ্যের ভাবমূর্তি যেন একটুকু ক্ষুণ্ণ না হয়, শিখে ফেলেন শাহজাহান। অভিযান অথবা দরবার রাজকার্য পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। আর এই কারণেই স্থাপত্যবিদদের আদেশ দিয়েছেন যেন তাঁদের অনুপস্থিতিতে আগ্রা দুর্গের সংস্কার কাজ করা হয়, বর্তমান বালি-পাথরের প্রাসাদে লাগান হবে সাদা মার্বেলের আচ্ছাদন। রক্তলাল বালি-পাথর ধারণ করে আছে তাঁর সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির নিদর্শন, অন্যদিকে সাদা মার্বেল ঘোষণা করবে সমৃদ্ধি আর প্রাচুর্যকে।

রত্নকারেরা ও ব্যস্ত হয়ে পড়বে। জমকালো তক্ত-ই-তাউস, ময়ূর সিংহাসন নির্মাণের কাজে। ঠিক যেমন সিংহাসনে বসে এক সময় ন্যায়ের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন মহান বাদশাহ সোলেমান। এ উদ্দেশ্যে দুই হাজার পাউন্ড বিশুদ্ধ স্বর্ণ বরাদ্দের পাশাপাশি শাহজাহান নিজে আগ্রা রাজকোষ থেকে পছন্দ করে দিয়েছেন অনিন্দ্য সুন্দর সব রত্ন পাথর। এগুলোর উজ্জ্বল আভাতে প্রায় প্রচণ্ড দেহ সুখের অনুভূতি অনুভব করেছেন তিনি। নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন যে অভিযান সফল হবেই। আর তাহলে গোলকুণ্ডার খনি থেকে তাজা হীরের যোগান নিয়ে ফিরবেন তিনি। রত্নপাথরের মাঝে হীরের প্রাচুর্যই বেশি একমাত্র গোলকুণ্ডাতে। এ ছাড়াও তিনি ভেবে রেখেছেন—কয়েকটি হীরে বসিয়ে দেবেন সিংহাসনের আসনে ওঠার সিঁড়ি তিনটিতে। আর তাহলেই যতবার তিনি সিংহাসনে আরোহণ করবেন শত্রু ততবারই পদানত হবে।

প্রস্থানরত সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে অভিবাদনের উদ্দেশ্যে আরো একবার তলোয়ার উঠিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এলেন শাহজাহান। মমতাজের কাছে যেতে হবে। হারেমের আঙিনাতে পৌঁছে দেখতে পান স্বর্ণমণ্ডিত ও পর্দাঘেরা শিবিকা আর এটি বহনকারী আটজন নপুংসকও

প্রস্তুত। কিছুক্ষণ পরে মমতাজ নিজে এসে হাজির হন। সাথে আসে পনের বছর বয়সী জাহানারা আর বারো বছর বয়সী রোশনারা।

'আমি খুশি হয়েছি যে তুমি শিবিকা ব্যবহারে একমত হয়েছো—তোমার এই অবস্থায় হাতির পিঠে চড়ে ভ্রমণ নিরাপদ নয়।'

'আপনার পরামর্শ আমি খুব কমই প্রত্যাখ্যান করেছি।'

'আরেকটা কথা। এই মুহূর্তে এটাই ভালো হবে যে তুমি আর হারেমের দলবল ভিন্ন একটি পথ দিয়ে যাবে, যেন প্রধান সারির সৃষ্ট ধুলায় সমস্যা না হয়। আমি খোজাদের আদেশ দিয়েছি যেন তোমার শিবিকার পাশে হেঁটে ময়ূর পাখনা দিয়ে বাতাস করে আর অন্যরা সামনের রাস্তায় গোলাপ পানি ছিঁটিয়ে দেবে। তোমার নিরাপত্তাও অটুট থাকবে। আমার রাজপুত অশ্বারোহী বাহিনীর পাঁচশ জন শ্রেষ্ঠ সৈন্য এ দায়িত্ব পালন করবে।'

'আপনি আমাকে নিয়ে একটু বেশিই উদ্বিগ্ন থাকেন।'

'কারণ আমি জানি, আমাদের সামনে দীর্ঘ আর কঠিন একটি ভ্রমণ আসছে।'

'আমি নিজেই এটি নির্বাচন করেছি। আপনি যতটা ভাবছেন আমি তার চেয়েও শক্ত। আগেও এর প্রমাণ পেয়েছেন আপনি। অন্তত প্রতিটি দিনের ভ্রমণ শেষে আপনাকে "মুবারক মঞ্জিল" "স্বাগতম" জানাতে পারব আমি।'

'আমার মনে হয় আমাদের আরো দ্রুত এগোনো উচিত—যতদিন যাচ্ছে শত্রুকে তার অবস্থান সুসংহত করার সুযোগ দিচ্ছি আমরা।' মালিক আলীর লম্বাটে চেহারা একাগ্রতা ফুঠে উঠল। 'এরকম অঞ্চলে আমরা সহজেই অন্তত পাঁচ...এমনকি দশ মাইলও পার হতে পারি একদিনে।'

'কিন্তু কেন? চর মারফত আজ সকালে জানতে পেরেছি যে, জাকির আবাস সফলতার সাথে আমাদের বাহিনীকে বোরহানপুরে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে, ক্ষত-ক্ষতির পরিমাণ যতটা আশংকা করেছিলাম ততটা হয়নি। কোন না কোন কারণে বিজাপুর আর গলকোণ্ডার বাহিনী আমাদের সৈন্যদের তেমন একটা লুট বা ধ্বংস করেনি।' নিজের যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের

সদস্যদের উপর চোখ বোলালেন শাহজাহান। অর্ধ-চন্দ্রকারে সম্রাটকে ঘিরে চাঁদোয়ার মত তাঁবুর নিচে বসে আছে সকলে।

'কেন তারা তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করেনি? আমার মনে হয় এক্ষেত্রে কোন কৌশল বা ষড়যন্ত্র আছে।' বলে উঠল সাদিক বেগ, বেলুচিস্তানের পর্বত থেকে আগত ধূসর দাড়িওয়ালা সেনাপ্রধান। কথা বলতে বলতে সামনে রাখা পিতলের থালা থেকে তুলে নিল মুঠো ভর্তি আমন্ড বাদাম, তৃপ্তি ভরে চিবোতে লাগল।

চওড়া কাঁধ নেড়ে শ্রাগ করে উঠলেন শাহজাহান। 'বলা কঠিন যে এ জাতীয় কোন চিন্তা আছে নাকি তাদের মাথায়। হতে পারে নিজেদের সফলতা দেখে আমাদের মতই বিস্মিত হয়ে গেছে তারা। তাই পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে তর্কে মেতেছে। বিজাপুর আর গোলকুন্ডা প্রতিবেশী হিসেবে কখনোই ভালো ছিল না। আমাদের প্রতি তাদের যে হিংসা আর ঘৃণার মনোভাব, পরস্পরের বিরুদ্ধেও তাই। কিন্তু আরো কিছু সংবাদ আছে...মনে হচ্ছে এই আক্রমণ আমাদের দক্ষিণ সীমান্তের একটি বা দুটি প্রজা রাষ্ট্রকে উসকে দিয়েছে নিজেদের স্বাধীনতা আদায়ের জন্য। মান্ডুতে আমার প্রাদেশিক শাসকেরা প্রতিবেদন পাঠিয়েছে যে মীরাপুর প্রদেশে স্থানীয় রাজা তিনজন মোগল কর সংগ্রাহককে বটগাছের সাথে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছে আর শকুনদের খাদ্য হবার জন্য মৃতদেহগুলো সেভাবেই রেখে দিয়ে আমাদের শত্রুর সাথে হাত মিলিয়েছে।'

'এই ধরনের একটা সংবাদই তো যথেষ্ট আমাদের যত দ্রুত সম্ভব ছোটার জন্য।' আবারো নিজের মতের উপর জোরারোপ করল মালিক আলী।

তাঁর ঘোড়াদের রাজা ছোট্ট একটা কুকুরের মত আচরণ করছে, একটা ইঁদুরকেও ছাড়তে নারাজ, ভাবলেন শাহজাহান।

'এ জাতীয় কয়েকটা আন্দোলন প্রায় অপ্রতিরোধ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত এরা সংখ্যায় নগণ্য আর কার্যকরণেও ততটা আগ্রগামী নয়। আমাদের বর্তমান বাহিনীই যথেষ্ট তাদেরকে দমনের জন্য। আর বোকা ষড়যন্ত্রকারীদেরকেও তাদের যথোচিত শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু মীরাপুরের রাজার আচরণ একটু বিশেষ। নিজের বয়সের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে প্রায়, আর এ কথা শোনা যায় যে শাসনকাজ দেখা-শোনা করে তার

তরুণী স্ত্রী—বিজাপুর রাজ পরিবারের সদস্য। স্ত্রীর সার্বক্ষণিক জোরাজুরিতে রাজা বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে। যদি আমাদের সত্যিকারের কোন কারণ থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই চলার গতি দ্রুত করব অথবা দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশে অগ্রগামী সৈন্যদল পাঠিয়ে দেবো। এখন পর্যন্ত আমি যতটা আশা করেছিলাম তার চেয়েও দ্রুত এগোতে পেরেছি আমরা। এর চেয়ে দ্রুত ছুটলে আমাদের সৈন্যরা শুধু ক্লান্তই হবে। পশুদেরও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন, তাহলেই শত্রুর উপর আক্রমণ ফলপ্রসূ হবে। তাই শত্রুকে দ্রুত পরাজিত করতে আমিও আগ্রহী; কিন্তু গতি বাড়ালে তেমন একটা সুবিধা পাব না।'

মাথা নাড়ল সাদিক বেগ। 'হ্যাঁ অপেক্ষা করুক আমাদের শত্রুরা...ঘেমে নেয়ে উঠুক। গোলকুণ্ডা আর বিজাপুরের শাসকেরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার অনুশীলন করুক। একে অন্যের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ুক যে কে যাবে সবার সামনে, অভিযানে কার তাঁবুতে গর্ব ঝরে পড়বে।'

নিজের আসনে বসে কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকালেন শাহজাহান। দিগন্তের কাছে ঝুলে আছে ভারী ধুলার পর্দা। এর মাঝে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সৈন্যদের লম্বা-চওড়া মাথার বর্শা। পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে অসংখ্য মানুষ আর প্রাণীর পদভারে। পুরো সারি থেকে ভেসে আসছে বাদক দলের তালে তালে বাজনার শব্দ। এর মাধ্যমে সৈন্যবাহিনী নিজেদের চলার গতি সুশৃঙ্খল রাখে। তাঁর কর্মচারীরা প্রতিদিনের যাত্রাপথের হিসাব রাখে গিঁট বাঁধা দড়ির মাধ্যমে, এরপর সন্ধ্যা বেলা জানানো হয় সম্রাটকে। ষষ্ঠ সপ্তাহ পরে উজ্জয়নী শহরের দিকে অগ্রসর হল পুরোদল। বোরহানপুরের পথে দুই-তৃতীয়াংশ রাস্তা শেষ হয়েছে। আগামীকাল মমতাজের জন্মদিন। মনে মনে এ আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য সমস্ত পরিকল্পনা আবারো ভেবে দেখলেন শাহজাহান। সব কিছুই হতে হবে একেবারে নির্ভুল...।

হঠাৎ করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল। ডানদিকে দেখা গেল এগিয়ে আসছে একজন একাকী ঘোড়সওয়ার। সাথে সাথে দেহরক্ষীরা সম্রাটের হাতির চারপাশে নিজেদের জায়গা মত

দাঁড়িয়ে গেল। হাতে উদ্যত তলোয়ার। কিন্তু ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসতেই শাহজাহান চিনতে পারলেন ঈগলের মত নাক বিশিষ্ট তাঁর দূতদের মধ্যে অন্যতম প্রধান একজনকে—একজন তরুণ রাজপুত। রায় সিং। হাত নেড়ে নিজের প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন যেন তরুণকে এগিয়ে আসতে দেয়া হয়। ঘোড়া থেকে নেমে বুকে হাত দিয়ে দাঁড়াল রায় সিং।

'কী হয়েছে? কথা বলো!'

'জরুরি সংবাদ, জাহাপনা। চম্বল নদীর উপর নৌকা আর কাঠ দিয়ে আমাদের বানানো সেতু ভেঙে পড়েছে প্রথম কামান আর রসদবাহী গাড়ি পার করার সময়। আমাদের কয়েকজন লোক ডুবে গেছে। এছাড়া দুটো কামান আর এগুলোর ষাঁড়ের দলও হারিয়ে গেছে।'

'নিশ্চয়ই সেতু নির্মাণে ক্রটি ছিল। কে ছিল এর দায়িত্বে?'

'সুলাইমান খান। কিন্তু জাহাপনা, তিনি বলেছেন সেতু নির্মাণে কোন ক্রটি হয়নি। তিনি বিশ্বাস করেন যে নিশ্চয়ই কেউ ইচ্ছেকৃতভাবে সেতুর দড়ি কেটে দিয়েছে। তাই আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনাকে জানাই।'

সরষের মাঝে ভূত? যদি তাই হয় তাহলে এটাই প্রথম নয়, ভাবলেন শাহজাহান। দুই সপ্তাহ আগে কেউ একজন প্রাণীদের খোয়াড়ে ঢুকে হত্যা করেছে কয়েকটা গাভীকে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে একেবারে মৃত্যুর আগমুহূর্ত ধরা পড়েছে অসহায় জন্তুগুলো। তাই আর কোন উপায় ছিল না, মেরে ফেলতে হয়েছে অবোধ পশুগুলোকে। এই ক্ষেত্রে যদিও তিনি কোন স্থানীয় চোরকে দায়ী করেছেন; কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে শত্রুপক্ষ উত্তরে লোক পাঠিয়েছে সেনাবাহিনীর গতিরোধ করতে। 'আমার ঘোড়া নিয়ে এসো।' আদেশ দিলেন শাহজাহান।

দশ মিনিট পরে শাহজাহান রায় সিংয়ের পাশে ঘোড়া ছুটালেন চম্বল নদীর উদ্দেশে। নদীর উত্তর তীরে বালিয়াড়ীর কাছে পৌঁছাতেই দেখতে পেলেন উড়ে গেল একজোড়া বক পাখি, তপ্ত নীলাকাশে দেখা যাচ্ছে ওগুলোর পাতলা, সরু পা। মনোযোগ দিলেন নিচে, নদীর দিকে। সৈন্যরা দ্রুত বহমান সবুজ পানিতে কাঠের দঙ্গলের সাথে যুদ্ধ করছে, চেষ্টা করছে নৌকাগুলো থেকে রসদ আর যন্ত্রপাতি উদ্ধার করতে যেন ক্ষয়-ক্ষতি আর না হয় সেতুটির। কয়েকটা নৌকা স্রোতের টানে নিচের

দিকে ভেসে চলেছে, আরেকটু হলেই গাঢ় আর থকথকে আবর্জনার ভিড়ে হারিয়ে যাবে। তাকাতেই দেখতে পেলেন দু'জন সৈন্য মিলে পিচ্ছিল নদী তীরে টেনে আনছে এক সহযোদ্ধাকে। লোকটার চেহারায় ফুঠে উঠেছে স্পষ্ট যন্ত্রণা, রক্তমাখা হাত একেবারে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। অন্য আরো দু'জন কাঠ দিয়ে তৈরি স্ট্রেচার বহন করে আনছে নদী তীরে। এর উপরে শুয়ে থাকা দেহটার হাত ঝুলছে পাশে। এর বেশ খানিকটা দূরে নদী তীরে দেখা গেল মৃতদেহের স্তূপ। কোনমতে ঢেকে রাখা তুলার কম্বলের নিচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে এলোমেলো পা।

'সুলাইমান খানকে এখনি পাঠাও আমার কাছে।' রায় সিংকে বলে উঠলেন শাহজাহান, নিজে ঘোড়ার গায়ে লাথি দিয়ে নদীর ঢালু তীরে নেমে গেল রায় সিং। অপেক্ষা করতে করতে চারপাশে তাকিয়ে ধ্বংসের পরিমাণ জরিপ করে দেখলেন সম্রাট। নৌকা-সেতুর অর্ধেকেরও বেশি অংশ নদীর মাঝ বরাবার থেকে একটু দূরে সরে গেলেও এখনো অক্ষত আছে। কিন্তু অবশিষ্ট অংশ একেবারে ভেঙে গেছে, শুধুমাত্র তিনটা অথবা চারটা কাঠের খুঁটি, যা নৌকাগুলোকে আটকে রেখেছিল, কোনমতে টিকে আছে। কামানের লম্বা ব্যারেল দেখা যাচ্ছে পানির উপরে আর পাশেই ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা একটা ষাঁড়ের মৃতদেহ, এখনো বাধা অস্ত্রের গাড়ির সাথে। পানির কিনারে মৃত আরো দুটো পশুর দেহ দেখা গেল। এই ধরনের হীন কাজ কী কেউ সত্যিই ইচ্ছেকৃতভাবে করেছে তাঁর গতি থামিয়ে সৈন্যদেরকে বিপদে ফেলতে, নাকি এটা নিছক দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই ফল? নিশ্চিত হতে পারলেন না যে কোনটি বেশি দুশ্চিন্তার।

ক্রোধ আর হতাশায় ছেয়ে গেল তাঁর মন, দেখলেন বালিয়াড়ী বেয়ে অনেক কষ্ট করে এগিয়ে আসছে সুলাইমান খান—শক্তিশালী এক পুরুষ—ঘামে ভিজে গেছে পরনের পোশাক।

'জাহাপনা', মাথা নত করে কুর্নিশ করল সুলাইমান খান।

'সত্যি কথা বল। দায়িত্বে অবহেলা করেছিলে?'

'কখনোই না, জাহাপনা। এই ঠিকঠাকভাবে আর মজবুত করে তৈরি করা হয়েছিল—আমি আমার জীবনের নামে শপথ করে বলছি। ভালো কাঠ আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দড়ি ব্যবহার করেছি আমরা। গত রাতেই কাজ

শেষ করেছিলাম। আর এর শক্তি পরীক্ষা করতে আমি নিজে একটা ভারী গাড়ি চালিয়ে নিয়ে দেখেছি। সেতুটা ভেঙে পড়েছে কারণ কেউ এখানে দুর্নীতি করেছে। দেখুন জাহাপনা...'

বুকের কাছে ঝুলতে থাকা পাটের ব্যাগ থেকে দুই মিটার দড়ি বের করে দেখালো সুলাইমান খান। 'এই ধরনের ছোট ছোট বন্ধনী দিয়ে নদী তীরে সেতু নির্মাণ করেছি আমরা। দেখুন প্রান্তটা কীভাবে কাটা হয়েছে—এগুলো কোন ধরনের ঘষা খেয়ে ক্ষয় হয়নি। এ রকম কাটা দড়ি আমরা আরো পেয়েছি। যদি বড় বড় গিঁটগুলো পরীক্ষা করি, তাহলে নিশ্চিত একটা ফলাফল পাওয়া যাবে।'

'আমাকে দেখতে দাও, দড়ির প্রান্ত পরীক্ষা করে ফিরিয়ে দিলেন শাহজাহান। 'ঠিক বলেছো তুমি। এটা ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়েছে। গত রাতে প্রহরীরা কিছু দেখতে পেয়েছিল?

'না, জাহাপনা।'

'প্রহরীর সংখ্যা বাড়াও আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেতু মেরামত করে ফেলো। আমি পার্শ্ববর্তী গ্রামে পুরস্কার ঘোষণা করে সৈন্য পাঠাচ্ছি যেন বিশ্বাসঘাতকের খোঁজ পাওয়া যায়।'

প্রধান সারির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে যাবার সময় পুরো ঘটনাটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন শাহজাহান। বিদ্রোহী আর আক্রমণকারীরা নতুন ধরনের কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করছে। সেনাবাহিনী যতই দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছে, ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। তাই তিনি নিজে কঠোর হবার পাশাপাশি তাঁর সৈন্যদের শক্তিও নিশ্চিত করতে হবে। যাত্রাপথে ঘোড়সওয়ারদের যথেষ্ট অস্ত্রে সুসজ্জিত করতে হবে। কিন্তু শিবির ঠিক কতটা ঝুঁকিতে আছে? রাজকীয় তাঁবুগুলো যথেষ্ট নিরাপদ। এরপর ভাবনা ঘুরে গেল মমতাজের দিকে। প্রতিদিনের ভ্রমণ শেষে মমতাজ আর কন্যাদেরকে চারপাশে ঘেরা কাঠের বেষ্টনীতে নিয়ে যাওয়া হয়। দেয়াল বেশ মোটা, লোহা দিয়ে বাঁধা ও কাঠ দিয়ে তৈরি, চারপাশে বেগুনি কাপড় দিয়ে ঘেরা আর চামড়ার বন্ধনি দিয়ে বাঁধা।

কিন্তু বাকি বিশাল তাঁবুর অংশ? বায়োজ্যেষ্ঠ সেনাপতি আর সভাসদদের তাঁবুগুলোও থাকে রাজকীয় তাঁবুর পাশপাশি। এরপরে সারিবদ্ধভাবে থাকে অন্যান্য সৈন্য—আর শাহজাহানের সৈন্যের তাঁবু,

এছাড়াও আছে সীমাহীন দড়ির ঘেরাও, যার মাঝে রাখা হয় পশুর পাল। কিন্তু এর পরের পৃথিবী তো একেবারে বিশৃঙ্খল। আরো হাজারো তাঁবুবাসী যেগুলো সবসময় থাকে একটা সৈন্যবাহিনীর পিছনে। ব্যববসায়ী আর ঘোড়ার বণিক, নাচুনে দল আর শিল্পীরা, দড়িবাজ, জাদুকর, দেহপসারিনী—সকলেই আসে জীবিকার খোঁজে। এই দঙ্গলে শত্রুর আগমন ঠেকানো দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু চেষ্টা তো করতেই হবে। তাঁবুর প্রহরায় থাকা সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি চৌকি বসিয়ে সন্দেহজনক ব্যক্তির তল্লাশির ব্যবস্থাও করতে হবে।

প্রথম হাউইটা আকাশে উড়ে যেতেই সোনালি তারার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রাতের আকাশ। চকচকে একটা পর্দা মতন তৈরি হয়ে ঝরে পড়তে লাগল রুপালি বৃষ্টির মত। চাইনিজ বাজি নির্মাতারা হতাশ করেনি, ভাবলেন শাহজাহান। এই ধরনের একটি প্রদর্শনী কেবল একজন সম্রাজ্ঞীর জন্মদিনেই মানায়। হারেমের তাঁবুতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মমতাজ বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন বহু উপরে বিশাল ময়ূরের স্যাপায়ার আর এমেরাল্ডের লেজ দেখে। পত্নীর খুশি দেখে সেতু নিয়ে ঘটে যাওয়া দুর্ভাবনা অনেকটাই হালকা হয়ে গেল। এছাড়াও সংবাদ পেয়েছেন যে আগামীকালই সেতু মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে আর নিজের যাত্রা আবারো শুরু করতে পারবেন তিনি পুরো ছত্রিশ ঘণ্টা বিলম্ব শেষে।

তাঁবুর আগুন থেকে ভেসে এলো মুখরোচক সুভাস। অন্ধকার চিরে দিল কমলা আগুনের রশ্মি। শাহজাহান আদেশ দিয়েছেন যেন হাজারে হাজারে ভেড়া ক্রয় করে সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হয়; যেন তারা ভোজ উদ্‌যাপন করতে পারে। অন্যদিকে ভোরের কুয়াশা কাটার আগে থেকেই কাজে নেমে পড়েছে রাজকীয় রাঁধুনী। পাখির মাংস জোগাড় করা, মসলা পেষা, বাছাই করা, অ্যাপ্রিকট, চেরী আর কিশমিশ, সাথে আছে আমন্ড আর ওয়ালনাট মিশিয়ে সুগন্ধযুক্ত মাখন, ঘি আর পেশ্‌তার সস্ তৈরি করা। বয়স্ক আর খোঁড়া রাজকীয় গৃহভৃত্য আসলাম বেগ লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে ঘুরে তদারক করছে সমস্ত প্রস্তুতির। ভর্ৎসনা করছে

রাঁধুনীদের। এছাড়া নির্ভেজাল সোনা আর রুপার থালা বের করে রাজকীয় টেবিলে পরিবেশনের পূর্বে প্রতিটি পদ পরীক্ষা করে ঢেকে দেয়ার দায়িত্বও তার।

শাহজাহান আশা করছেন খাদ্যের প্রতি সুবিচার করবেন মমতাজ। যদিও মমতাজ মানতে চাননা, কিন্তু তিনি টের পেয়েছেন যে মমতাজের খাদ্যস্পৃহা—যদিও কখনোই খুব বেশি ছিল না—একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। চেহারা প্রায়ই যন্ত্রণাকাতর দেখায়, চোখের নিচেও ক্লান্তির ছায়া। কিন্তু কিছুদিনের মাঝেই পাহাড়ে চড়বেন তারা, ঠাণ্ডা নির্মল বাতাসে হয়ত অবস্থার উন্নতি হবে।

সর্বশেষ আতশবাজিটা স্বর্গের উদ্দেশে রওনা দেবার পর শাহজাহান শুনতে পেলেন মমতাজের মৃদু ভর্ৎসনা, 'কী ভাবছেন আপনি? বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে?'

'তাই নাকি? কিছু না তো!'

'সত্যি? আমি শুনেছি একটু আগে সন্ধ্যায় নাকি আপনার কাছে সংবাদবাহক এসেছিল? কে সেতুর ক্ষতি করেছে সে ব্যাপারে কিছু জানা গেছে?'

'এতটুকুই জানা গেছে যে, কয়েকদিন আগে তিনজন ঘোড়সওয়ারকে চম্বল নদীর আশেপাশে দেখা গেছে—কথার টানে মনে হয়েছে দক্ষিণী। আমাদের গতিবিধি, কোথায় সেতু নির্মাণ করতে চাই সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর করছিল। তাদের খোঁজে লোক পাঠিয়েছি আমি। যদিও জানি যে অনেক আগেই সরে গেছে তারা।'

'আপনার কী মনে হয় লোকগুলো গোলকুণ্ডা আর বিজাপুর থেকে এসেছিল?'

'হুম, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'বেশি উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি জানি যে বিলম্ব হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছেন কিন্তু শীঘ্রিই তো আমরা বোরহানপুরে পৌঁছে যাব। অপেক্ষার পালা শেষ হবে আর রণক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবেন আপনি। আমি জানি এ ব্যাপারে কতটা উৎসুক হয়ে আছেন।'

'ঠিক বলেছো। আমি এই অভিযান দ্রুত শেষ করতে চাই। বর্তমান সীমান্ত প্রতিরক্ষার চেয়ে বরঞ্চ ভূ-খণ্ড আরো বাড়াতে চাই আমি। মাঝে

মাঝে মনে হয় পূর্বপুরুষ বাবরের ভূ-খণ্ড পূর্ণ দখল করে নেবো...এমনকি সোনালি সমরকন্দও দখল করার ভাবনা আসে মনে... ।'

'এ উচ্চাশা পূরণের সময়ও আসবে। কিন্তু প্রতিবারে একটি পদক্ষেপে। আমাদের শত্রুরা যথেষ্ট শক্তিশালী। কোন কিছুকেই চিরস্থায়ী হিসেবে ভাববেন না।'

সামনের খুঁড়ের নিচে শুকনো ঘাসের খোঁচা খাওয়ায় পথ থেকে সরে একপাশে নাড়া খেলো শাহজাহানের ঘোড়া। অপ্রস্তুত অবস্থায় গভীর চিন্তামগ্নে আচ্ছন্ন সম্রাট ঝাঁকুনি খেলেন। গতকাল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে আসিরগাঁ দুর্গে। লাল বালি-পাথর দিয়ে তৈরি এই দুর্গে তিনি এবং মমতাজ পার করেছেন পরবাসের বহু বিনিদ্র আর উদ্বিগ্ন মাস। এখানে থাকতেই খবর পেয়েছিলেন যে, পিতা তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করেছেন। মাথার মূল্য ধার্য করে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছেন খুঁজে বের করতে। আসলাম বেগ যদিও বলছিল যে, রাজকীয় পরিবারবর্গ নিয়ে আসিরগাঁ দুর্গে রাত কাটাতে, শাহজাহান দাদা বাবরের মত শিবিরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর আজ রাতে অন্তত বোরহানপুরে পৌছাতেই হবে। অভিযানের বাকি পরিকল্পনা করা সহ মমতাজের বিশ্রামেরও সুবন্দোবস্ত হবে।

পত্নীর চিন্তা মাথায় আসতেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পিছনে ছুটলেন হারেম দলের দিকে। নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে প্রধান সারির সাথেই ছুটছে এখন তারা, কেননা শত্রুভূমি ক্রমশ কাছে চলে আসছে। আট নপুংসকের কাঁধে চড়ে একাকী একটি পালকিতে ভ্রমণ করছেন মমতাজ। পর্দার মাঝে সোনালি কারুকাজ করা ফোকর দিয়ে শাহজাহানকে দেখতে পেয়ে অভিবাদন জানালেন মমতাজ।

'আজ আমাদের চলার গতি বেশ ভালো হয়েছে—সূর্য ডোবার মাঝেই বোরহানপুরে পৌঁছ যাব।' শিবিকা বাহকদের সাথে একইতালে চলতে লাগলেন শাহজাহান।

'ভালোই হল। আমিও খেয়াল করেছি সবকিছু বেশ উত্তপ্ত আর শুষ্ক দেখাচ্ছে।'

'গত বছর অনাবৃষ্টি হয়েছে...সবাই বলছে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। বোরহানপুরে গেলে সব জানা যাবে।'

'শাহজাহান...'

'কী?'

'এখানে ফিরে আসাটা কী অদ্ভুত মনে হচ্ছে? গত কয়েকদিনে কেন যেন আমার বারেবারে মনে পড়ছিল। সবকিছু—ধুলার গন্ধ, ডুবে যাওয়ার আগে লাল সূর্যটাকে দেখে যেন মনে হয় বিস্ফোরণের জন্য তৈরি। এই পাহাড়ের সারির চুম্বক সৌন্দর্য—স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। প্রথমবার যখন এখানে এসেছি, একেবারে তরুণ ছিলাম আমরা আর জীবনটাও ছিল সাদাসিধে। ভেবে মন খারাপ হয় যে সময় কত দ্রুত চলে যায়।

'আমরা এখনো তরুণ।'

'আপনি নিশ্চিত?'

চলতে চলতে মমতাজের কথা গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন শাহজাহান। অতীত—ভালো-মন্দ মিলিয়েই—ভয়ংকর জায়গা, রোমন্থন না করাটাই অধিক শ্রেয়। গতরাতে, মমতাজ পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন অবস্থায় মোমবাতির আলোয় শাহজাহান আবারো পড়লেন আকবরের জীবনীকার রচয়িতার লেখা।

তারা জানলো যে বোরহানপুরের একটা কুখ্যাতি আছে। অভিশপ্ত আর অন্ধকারচ্ছিন্ন এই জায়গায় কোন মানুষ উন্নতি করতে পারে না। কিন্তু এই কুসংস্কার শুনে হাসলেন তিনি আর মোগলদের জন্য দখল করে নিলেন। জানালেন এ স্থান তিনি বিজয় আর সমৃদ্ধির নিশান উড়াবেন...আর করলেনও তাই।

শাহজাহান সবসময় এই কথাগুলো ভেবে সন্তুষ্টি লাভ করেন যে আকবরের সময় হতেই বোরহানপুর বস্তুত মোগল বিজয়ের চিহ্ন হিসেবে কাজ করেছে। তরুণ শাহজাদা হিসেবে যে তিনি নিজেও এই জায়গা থেকেই সামরিক বিজয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। আর পরবর্তীতেও তাই করতে চান। তবে এবার যুদ্ধের পরিবর্তে দেখলেন ভিন্ন কিছু—অন্ধপ্রায় খসরু অসহায়ের মত শুয়ে আছে বোরহানপুরের পাতাল ঘরে; আস্তে করে খুলে গেল দরজা। জীবনের সেই মুহূর্তগুলোতে কী ভাবনা বইছিল তার মনে? ভাবতে কেমন লাগে যে তুমি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছো

আর জানো যে এমনটা ঘটতে যাচ্ছে তোমার আপন ভাইর নির্দেশে? জোর করে এহেন চিন্তা একপাশে সরিয়ে দিলেন শাহজাহান। নিজেকে বোঝালেন এসব দুর্বলতাকে প্রশয় না দিতে। বিশেষত যখন সবকিছু তাঁরই যা তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই কেমন যেন অস্বস্তি হল। বোরহানপুরে আসাটা কী ভুল হয়েছে? চাইলে অন্য যে কোন জায়গায় নিজের দরবার বসাতে পারতেন—হতে পারে মাভুতে...

আবারো মমতাজের শিবিকার কাছে এলেন শাহজাহান, চারপাশে বেগুনি সূর্যাস্তের আলো। প্রবেশ করলেন বোরহানপুরের প্রাচীন প্রবেশ দ্বার দিয়ে ভেতরে, দু'পাশে দু'টি পাথরে নির্মিত যুদ্ধহাতি যুদ্ধ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে, যদিও ধুলিঝড় আর বর্ষার বৃষ্টিতে আকৃতি অনেকটাই—বিকৃত হয়ে গেছে। হারামের ভেতরের আঙিনাতে পৌঁছে অসংখ্য ঝরনার কাছে গিয়ে থামলেন শাহজাহান। পর্দা সরিয়ে তুলে নিলেন ঘুমন্ত মমতাজকে আর ধীরে ধীরে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

অধ্যায়-০৩

শাহজাহানের মাথার পাশ দিয়ে শিস কেটে চলে গেল বন্দুকের গুলি। নিজের যুদ্ধহাতির পিঠে বসে ঘুরে তাকালেন তিনি। উত্তপ্ত সূর্যের আলো থেকে চোখ বাঁচাতে হাত তুলে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন হঠাৎ শুরু হওয়া যুদ্ধদৃশ্য। একটু পরেই আরেকটা গুলি এসে লাগল হাতির কানের পিছনে বসে থাকা মাহুতের গলায়। আস্তে করে পাশ ফিরে পড়ে গেল লোকটা। রক্ত ছুটছে ফিনকি দিয়ে ক্ষত থেকে, পাথুরে ভূমিতে গিয়ে শায়িত হল মাহুত। শুড় তুলতেই গতি কমে গেল হাতির, ভয় পেয়ে মাথা নাড়তে শুরু করল এপাশ-ওপাশ।

নিজের হাওদার পার্শ্বদেশ ধরে স্থির হতে চেষ্টা করলেন শাহজাহান। দ্বিতীয় মাহুত দ্রুত উঠে এসে কথা বলতে লাগল হাতির ডান কানে। 'শান্ত হও, শান্ত হও' এরপর কাঁধের উপর বাড়ি মারল লোহার রড দিয়ে। নিশ্চিন্ত হয়ে লাল বর্ণের শুড় নিচে নামিয়ে আনল হাতি।

চারপাশে পুরো যুদ্ধসারি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। গুলি বহনকারীরা নিজেদের ঘোড়া থেকে নেমে ব্যারেলে বারুদ ঢুকিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল। একটু দূরে শাহজাহানের হাতির সামনে একজন নিম্নপদস্থ সৈন্য সবুজ টিউনিক পরনে—চিৎকার করে নিজের ছোট্ট পদাতিক বাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছে শৃঙ্খলিত হবার জন্য। আরো একবার গোলার গর্জন শুনতে পেলেন শাহজাহান। আর ভেঙেচুরে পড়ে গেল দু'জন পদাতিক সৈন্য। একজন মুহূর্তের মাঝে স্থির হয়ে গেল। অন্যজন এলোমেলোভাবে শুয়ে পা নাড়তে লাগল। তার একজন সঙ্গী, বয়স্ক দাড়িওয়ালা সৈন্য সাহায্য করতে

এগিয়ে আসার পর নিজেও গুলি খেলো। পড়ে গেল সঙ্গীর দেহের উপরেই।

চারপাশ জুড়েই শব্দ আর বিশৃঙ্খলা। এখনি তাঁকে কিছু একটা করতে হবে। নতুবা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে, ভাবলেন শাহজাহান। আর এরকম কিছু করতে হলে হাতি থেকে নেমে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে এগোতে হবে। তাই মাহুত কতক্ষণে হাতিকে হাঁটু গেড়ে বসাবে সেই জন্য অপেক্ষা না করে, রত্নখচিত হাওদার একপাশে গিয়ে মাটিতে নেমে গেলেন। আঘাত ঠেকাতে ভাঁজ করে নিলেন নিজের হাঁটু। হালকা পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কর্চিকে চিৎকার করে আদেশ দিলেন, 'আমার ঘোড়া নিয়ে এসো।' কিন্তু তার আগেই ধুলা আর গুলির ধোঁয়ার মাঝে উদয় হল একদল ঘোড়সওয়ার, শাহজাহানের সামনের পদাতিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে গেল। সবুজ পোশাক পরিহিত সেনাপতির উৎসাহে পদাতিক সৈন্যরা নিজেদের ভূমি ছাড়ল না। সেনাপ্রধানের আদেশে সকলে ভি আকৃতি করে এগোতে লাগল। ঘোড়সওয়ারের দল কাছে এগিয়ে আসতেই—সম্ভবত বিশ জনের একটা দল—বাকিদেরকে ফেলে সামনে এগিয়ে এলো ঘামে ভেজা ধূসর শুভ্র ঘোড়ার উপর বসে থাকা কৃশকায় দেহের তরুণ। শিরস্ত্রাণবিহীন মাথায় লম্বা চুল উড়ছে পেছন দিকে।

ভি আকৃতির মাথায় থাকা সৈন্য যদিও শক্তভাবেই নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে, তারপরেও কাঁপা কাঁপা হাতে বর্শা ছুড়ে মারায় লাগাতে পারল না বিজাপুরের সৈন্যের গায়ে। আক্রমণকারীর ধূসর ঘোড়া সাথে সাথে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। ঘোড়ার খুড়ের নিচে পড়ে ফেটে গেল মাথার খুলি। এ সময় তার পিছনে আর বাম দিকে থাকা সৈন্যরা এগিয়ে এলো। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। এরপর সাবধানে হাঁটু গেড়ে থাকা অবস্থায় বর্শা ছুড়ে মারল। যেমনটা চেয়েছিল এবার ঠিক সেভাবেই বিঁধে গেল ঘোড়ার গলায়। সাথে সাথে পড়ে গেল জন্তুটা, আরোহী বহু দূরে উড়ে গিয়ে মাথা গেড়ে পড়ল মাটিতে। নিজের রক্ত আর মগজের মাখামাখি চুল নিয়ে পড়ে রইল বিজাপুরের আগন্তুক সৈন্য।

তাঁর নিজের ঘোড়া কোথায় গেল? চারপাশে তাকিয়ে শাহজাহান দেখতে পেলেন বাদামি রঙা তৈজী ঘোড়া নিয়ে দৌড়ে আসছে কর্চি। দ্রুত

ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে উঠেই দেহরক্ষীকে আদেশ দিলেন, 'আমাকে অনুসরণ করো।' তলোয়ার বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেলেন পদাতিক সৈন্যদেরকে ঘিরে ফেলা শত্রু ঘোড়সওয়ারদের দিকে। আক্রমণকারীদের একজন সর্বশক্তি দিয়ে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ভয় পাইয়ে দিল শাহজাহানের ঘোড়াকে। ফলে খানিকটা পিছনে হেলে গেলেন তিনি। আরেকজন ঘোড়সওয়ার লম্বা বল্লম নিয়ে নিজের কালো ঘোড়াকে ঘুরিয়ে এগিয়ে এল শাহজাহানের দিকে। কাছাকাছি আসতেই বন্যপশুর মত আক্রমণ করল সম্রাটকে। কিন্তু বেঁচে গেলেন শাহজাহান তবে তিনি ভুল করলেন না। নিজের তলোয়ার দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন শত্রুর বাহুতে। নিজের বল্লম ফেলে দিয়ে ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল আক্রমণকারী সৈন্য, একই পথে এগিয়ে আসছিল তার সঙ্গী। উদ্যত ঘোড়াকে থামাতে পারল না সে ও; ফলে পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল দু'টি ঘোড়াই, সাথে তাদের আরোহীরা।

তৃতীয় আরেকজন ঘোড়সওয়ার মাথার উপর বন্যভাবে বাঁকানো ভোজালি ঘুরাতে ঘুরাতে এগিয়ে এলো শাহজাহানের দিকে। একেবারে সময় মত সাবধান হয়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন শাহজাহান। প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে দ্রুত প্রতিক্রিয়া করলেন তিনি। তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে গেলেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজের ভোজালি দিয়ে আঘাত প্রতিহত করে দিল তৃতীয় সৈন্য। আবারো চেষ্টা করলেন শাহজাহান। এবার তলোয়ার গিয়ে আঘাত করল সৈন্যটার পেটে। পড়ে গেল লোকটা। এরপর চারপাশে তাকিয়ে সম্রাট দেখতে পেলেন বাকি আক্রমণকারী ঘোড়সওয়াররা ঘুরে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে চলে যাচ্ছে—যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই।

যুদ্ধে উন্মাদনায় ধুকপুক করতে থাকা হৃদয়ে, শাহজাহান প্রথমেই ভাবলেন পিছু ধাওয়া করে এই ছোট্ট দলটাকে নিঃশেষ করে দেবেন, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন যে এমন করাটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই হবে না। সেনাপ্রধান হিসেবে এ দায়িত্ব অন্যদের উপর দিলেন। বরঞ্চ প্রধান সারির মাঝখানে গিয়ে দেখা দরকার যে কী অবস্থা, সেখান থেকেই মূলত এর উৎপত্তি।

ধোঁয়া আর ধুলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেলেন নিজের অসংখ্য সৈন্য মাটিতে স্থির হয়ে পড়ে আছে। সাথে আছে বেশ কয়েকটি ঘোড়া আর একটা যুদ্ধহাতির মৃতদেহ। আরেকটা ঘোড়ার বাম পা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেও কোনমতে দাঁড়িয়ে কাতর আর্তনাদ করছে। যাই হোক, মাঝ বরাবার যেতেই যুদ্ধের তেমন কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না; এখানে রসদ আর বারুদের গাড়ি রয়েছে।

চারপাশে কালো ধোঁয়ায় ঘন মেঘের মত সৃষ্টি হয়েছে, এর মধ্য দিয়েই কোনমতে শাহজাহান দেখতে পেলেন কয়েকটা ছয় চাকার গরুর গাড়ি ইতস্তত ঘুরছে। প্রথম গাড়িটা টানছিল এমন দুটি গরু আহত হয়ে গিয়েছে। চালকেরা চেষ্টা করছে রশি কেটে মুক্ত করে দিতে, পেছনে চিৎকার করছে অন্য রসদবাহী গরু আর চালকেরা। ঠিক সেই মুহূর্তেই সম্রাট—দেখতে পেলেন আগাগোড়া কালো পোশাকে ঘোড়া ছয়জন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে গরুগাড়িগুলির দিকে। প্রত্যেকের হাতে দুইটি করে ধনুক, সাথে আরো একজনের হাতে ধরা তীরের মাথায় জ্বলন্ত ভেজা ন্যাকড়া। ঠিক এই কৌশলেই হত্যা করা হয়েছে আবদুল আজিজের পিতা আহমেদ আজিজকে।

ধনুকে জ্বলন্ত তীর লাগানোর আগেই কিছু একটা ভাবতে হবে, বুঝতে পারলেন শাহজাহান। ঘোড়ার পাদানিতে দাঁড়িয়ে ধনুকে তীর লাগিয়ে তৈরি হয়ে নিল লোকগুলো রসদবাহী গাড়িতে আগুন লাগানোর জন্য। চালকেরা এতক্ষণে প্রথম গরুগাড়ি থেকে আহত গরুকে রশি কেটে মুক্ত করতে পেরেছে। একটা বন্দুকের গুলি গিয়ে আঘাত করল কালো পোশাকধারী ধনুচিদের দিকে, নিজের তীর ছোড়ার আগেই পড়ে গেল লোকটা। আর এই কারণে জ্বলন্ত তীর থেকে নিজের কাপড়েই আগুন ধরে গেল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠে, মাটিতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল লোকটা।

এরপর গরম বাতাসের হলকা ধেয়ে এলো শাহজাহানের দিকে। বধির করে দিয়ে প্রায় জিনের উপর থেকেও ফেলে দিচ্ছিল আরেকটু হলে। নিজের ঘোড়াকে থামানোর চেষ্টা করতে করতে ভাবতে লাগলেন কী ঘটেছে। বুঝতে পারলেন যে, নিশ্চয়ই গাড়ি ভর্তি বারুদ ছিল। অন্তত একজন ঘোড়সওয়ারের তেল লাগান ন্যাকড়া গিয়ে ভেতরে থাকা

বারুদের বস্তায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নিজের ঘোড়াকে শান্ত করতে পারলেও বাম গালে তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন। দস্তানা খুলে আঙুল দিয়ে ব্যথার জায়গায় পরীক্ষা করে আবিষ্কার কললেন ছোট্ট কাঠের টুকরো। বালুকণা আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চোখে নিচে তাকিয়ে দেখলেন ঘোড়ার পার্শ্বদেশে আর জিনের গায়েও অসংখ্য স্প্লিন্টার ঢুকেছে। তাঁর মতই সবকিছুর গায়ে লাল রঙের আঠালো কী যেন লেগে রয়েছে—গাভী আর চালাকের মৃতদেহের মাংস। ধুলা একটু কমতেই দেখতে পেলেন বিষ্ফোরিত হয়েছে দুটি গাড়ি। চারপাশে ছড়িয়ে আছে মনুষ্য দেহের থেতলানো মাংসপিণ্ড, কোন কোন টুকরার গায়ে এখনো লেগে আছে কাপড়ের অবশিষ্টাংশ, একসাথে দলা পাকিয়ে গেছে গরু আর গাড়ির দেহাবশেষের সাথে পোড়া মাংসের গন্ধের সাথে। মিশে গেছে ঝাঁঝালো বারুদের গন্ধ।

একজন সেনাপতিকে উঠে দাঁড়াতে দেখলেন শাহজাহান। দেখতে পেলেন তার ঠোঁট নড়ছে, বুঝতে পারলেন যে লোকটা কিছু একটা বলছে, কিন্তু শুনতে পেলেন না কিছুই। তবে খুব শীঘ্রই শ্রবণশক্তি ফিরে পেয়ে বুঝতে পারলেন সেনাপতির কথা, 'তারা পালিয়ে যাচ্ছে জাহাপনা' বিস্ফোরণের ফলে আচ্ছন্ন চেতনাতেও শাহজাহান জানেন যে 'পালিয়ে যাওয়া' শব্দটি সঠিক হল না। তিনি তো তাঁর শত্রুদের পরাজিত করতে পারেননি। সফলভাবে তাঁর সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করে কৌশলগতভাবে পিছু হটছে তারা। মোগলরা নয়—তারাই আজকের বিজয়ী।

কিন্তু এভাবে হবার কথা নয়...কেননা সম্ভবনাকে সত্যি প্রমাণিত করে উদ্ধত স্বভাবের গোলকুন্ডা সৈন্যরা বিজাপুরের সৈন্যদেরকে রেখে নিজেদের ভূ-খণ্ডে ফিরে গেছে, যুদ্ধ এখন বিজাপুরকে একাই লড়তে হবে। এতটা তো শাহজাহান কখনো ভাবেননি যখন এক মাস আগে বোরহানপুর থেকে প্রধান সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাপ্তি নদীর তীরে আক্রমণকারীদের দলকে প্রতিহত করার জন্য, যারা দুর্গ সমূহে অতর্কিত বিচ্ছিন্ন হানা দিয়ে হত্যা করেছে তাঁর কসিড, বার্তাবাহক আর কর সংগ্রাহকদেরকে। বস্তুত বেশ কয়েকটি ব্যাপারেই বেশ অবাক হয়েছেন তিনি। যেমন, তাঁর সৈন্যরা বন্দি করতে পেরেছে এমন

আক্রমণকারীদের মাঝে আছে স্থানীয় জনগণরাও। জীবনের ভয়ে ভীত হয়ে ষড়যন্ত্রে নিজেদের অংশগ্রহণের কারণ হিসেবে নানা অজুহাত তৈরি করছে লোকগুলো; কেউ দাবি করছে এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে খাদ্যের সংস্থানের জন্য শত্রুপক্ষ যোগ দিয়েছে তারা। অন্যরা অনুনয় করে বলছে যে সম্রাটের বিশাল সেনাবাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্যে আরোপিত কর দিতে গিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে পরিবারগুলো।

কিন্তু সম্রাটের হাতে তেমন কোন উপায় ছিল না। যদি তিনি কর না বাড়াতেন তাহলে আক্রমণকারী ঠেকাতে এত বড় একটা সেনাবাহিনী কীভাবে তৈরি করতেন রাজকোষ অক্ষত রেখে? এই অ্যামবুশ বা চোরা আক্রমণ হবার আগপর্যন্ত এই অভিযানের সফলতা নিশ্চিত ছিল। প্রায় প্রতিবারেই তাঁর সেনাবাহিনী শত্রু যোদ্ধাদের সাথে লড়াই করেছে, শত্রুরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এই মাত্র যতটা ক্ষতি হয়ে গেল, এমনটা আর কখনো হয়নি আগে।

এক ঘণ্টা পরে, বিষণ্ন ভঙ্গিতে নিজের চারপাশে চক্রাকারে বসে থাকা সেনাপতিদের মুখোমুখি হলেন শাহজাহান। 'কেমন করে শত্রু আমাদেরকে একেবারে অন্ধকারে রেখে আক্রমণ করতে সফল হল?' মধ্যম প্রহরী দলের নেতা আশোক সিংয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। আম্বারের রাজাদের পুত্রদের একজন এই তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল সেনাপতি।

'তারা আমাদেরকে এগিয়ে আসতে দেখেছে, জাহাপনা। একজন বন্দি জানিয়েছে কেমন করে আমাদের সারির একটু সামনেই জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল কয়েকজন শত্রুপক্ষের দল। পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে এসেছিল তারা—সাথে এমনকি বাড়তি ঘোড়াও নিয়ে এসেছিল লুটের মাল আর নিজেদের আহতদের নিয়ে যাবার জন্য। আর এভাবেই আমাদের মধ্যম ভাগ ঘিরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এরপর সরাসরি পিছন থেকে আক্রমণ করেছে। আমাদের চলার পথে সৃষ্টি হওয়া ধুলার মেঘের সুবিধাটুকু নিয়েছে। ফলে একেবারে আমাদের উপর আঘাত হানার আগ পর্যন্ত কিছু বুঝতেই পারি নি আমরা।'

'মধ্যম ভাগে রক্ষী নিযুক্ত করে নি তুমি?'

'না জাহাপনা, আমি দুঃখিত।'

'তোমার উচিত ছিল। কিন্তু শুধু তোমাকে দোষারোপ করে লাভ নেই। এই ঘটনা থেকে আমাদের সকলেরই উচিত শিক্ষা নেয়া। শুধুমাত্র আরো বেশি রক্ষী নিযুক্ত করার প্রশ্নই নয়। আমাদের শত্রুদের চিন্তাধারা ও কৌশলও বুঝতে হবে।' শুধুমাত্র মাথা নাড়ানো ছাড়া আর কোন প্রত্যুত্তর এলো না সেনাপতিদের কাছ থেকে। শাহজাহান আবারো বলে চললেন, 'একত্রে আমরা সফল হবই। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমার। কিন্তু এখন ঠিক করতে হবে যে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। কতজন সৈন্য হারিয়েছি আমরা?'

'বেশি নয়—শত মানুষ থেকে কয়েকজন কম, আমার মনে হয়। কিন্তু রসদবাহী গাড়িতে আঘাত হওয়ায় প্রচুর মালামাল হারিয়েছি। বারুদ বোঝাই গাড়িতে, রসদবাহী গাড়িতে বিস্ফারণের ফলে বেশ কয়েকটি কামান বাঁধন ছেড়ে আলগা হয়ে গেছে আর খাদ্যের গাড়িতেও আগুন লেগে গেছে।'

'তো ঠিক আছে, বোরহানপুর ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন কিছু করার নেই। সেখানে আমরা বিশ্রামের পাশাপাশি পুনরায় রসদ জোগাড় করতে পারব।' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন শাহজাহান। 'সভা শেষ করা হল।'

সেনাপতিরা ফিরে যেতেই শাহজাহান ভাবলেন এরা প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত আর ঘটনার ভয়াবহতাও ঠিক তাঁর মতো করেই অনুভব করতে পেরেছে। কিন্তু এটা বিবেচ্য বিষয় নয়। তাদেরকে অবশ্যই—এর মাঝে তিনি নিজেও আছেন—আহমেদ আজিজের পরাজয় থেকে শিক্ষা নিতে হবে। শত্রুর ধূর্ততা আর শক্তিকে অবজ্ঞা করলে নিজেদের ধ্বংসই শুধু ডেকে আনবে তারা।

বোরহানপুরের পর্দা ঘেরা জানালায় একে অন্যের বাহুতে হাত রেখে দিগন্তে কমলা রঙের সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে আছেন শাহজাহান আর মমতাজ। 'দেখুন ওখানে কয়েকটা চিল উড়ছে।' বলে উঠলেন সম্রাট পত্নী। 'ওখানকার সমভূমিতে নিশ্চয়ই কয়েকটা অবলা জন্তু মরে পড়ে আছে।' মাথা নাড়লেন শাহজাহান। এই দৃশ্য বেশ স্বাভাবিক এখন।

বর্ষকাল এখনো আসেনি। সূর্যাস্তের আলোয় দেখা গেল গাছগুলোতে কোন উজ্জ্বলতা বা পাতার সমারোহ নেই। ঘাস প্রায় দেখাই যায় না, ফসলও তোলা শেষ। সবসময়কার চওড়া তাপ্তি নদী হয়ে গেছে থকথকে ঘোলাটে। মানুষ আর পশু যুদ্ধ করে নালা থেকে মূল্যবান পানি খুঁজে নিতে আর চারপাশের কয়েকটি সবুজ কর্দমাক্ত ডোবা ও এ কাজে ব্যবহৃত হয়। গৃহপালিত-বন্য সব ধরনের পশুই মারা যাচ্ছে। শুকনো ভূমিতে পড়ে থাকছে মৃতদেহের শুকনো চামড়া আর হাড়।

চারপাশের গ্রামগুলো থেকে আসা সংবাদের মাধ্যমে জানা গেল যে সেখানেও অকাতরে মানুষ মারা যাচ্ছে। বেশির ভাগই অনাহারে, অন্যরা গিয়েছে ক্ষুধার্ত বাঘের পেটে। খালি পেট ভরাবার জন্য জঙ্গল আর পবর্ত থেকে নেমে আসছে বাঘের দল। গ্রামের কিছু কিছু মানুষ কোটরে বসা চোখ আর হাড় জিরজিরে শরীর নিয়ে এসে পৌঁছাচ্ছে বোরহানপুরে। বাচ্চাগুলো মায়েদের দুধহীন, শুষ্ক স্তনে মুখ পুরে রেখেছে।

শাহাজাহান নির্দেশ দিলেন যেন সেনাবাহিনীর উদ্বৃত্ত যোগান থেকে খাবার বিলি করা হয় এদের মাঝে; কিন্তু যেহেতু বিদ্রোহ এখনো শান্ত হয়নি, তাই সৈন্যরাই সবকিছুর প্রধান ভাগ পাবে। সম্ভবত পরিকল্পনামত আগামীকাল তিনি যে লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হবেন, তাতে সফল হলে শত্রুরা বাধ্য হবে তাঁর দাবি মেনে নিতে। কৌশল পরিবর্তন করে ভারী অস্ত্র আর পদাতিক বাহিনী রেখে ঘোড়সওয়ারদের ডিভিশন নিয়ে এগোবেন তিনি। ফলে দ্রুত এগিয়ে যাবে তাঁর প্রধান সারি আর শত্রুরা যতটা তৎপরতা দেখিয়েছে তেমনিভাবে আক্রমণে তিনিও সফলতা লাভ করবেন। তার চেয়েও বড় কথা, এই নতুন বাহিনীর গতির দ্রুততা কাজে লাগিয়ে ধরা পড়ার আগেই শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন তিনি।

মনে হল যেন তাঁর মনের কথা পড়তে পারছেন মমতাজ, এমনভাবে জানতে চাইলেন শাহজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে, 'আগামীকাল আপনাকেই কেন সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব নিতে হবে? বেশির ভাগ সৈন্য তো এখানেই থাকবে আর আপনার যোগ্য সেনাপতিরও অভাব নেই। এ কাজে তাদের উপর কেন নির্ভর করছেন না?'

হেসে ফেললেন সম্রাট। এই প্রশ্নটা তিনি নিজেও বেশ ভেবে দেখেছেন। তাই উত্তরটাও তৈরি ছিল। 'আমাকে যেতে হবে, কারণ

তাহলে উদ্যম ফিরে পাবে আমার সৈন্যরা। এছাড়া গ্রামের লোকদের সামনে উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করতে চাই আমি। তাদের অনেকেই বিদ্রোহীদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়েছে। কেননা তাদেরকে প্রচুর লাভের লোভ দেখিয়েছে তারা। আমি আমার দাদাজান আকবরের সোনার কাজ করা দেহবর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরে যাবো। তিনি আমাকে সবসময় বলতেন যে একজন সম্রাটকে সবসময় সাধারণ মানুষের চেয়ে শক্তি প্রদর্শনের ব্যাপারে যত্নশীল হতে হয়। এক্ষেত্রে ভাবমূর্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে সাধারণ জনগণ তাদের সম্রাটকে বেশি ভালোবাসবে। সময়ের সাথে সাথে বারংবার নিজের উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেছেন তিনি।'

'কিন্তু এভাবে জনসমক্ষে যাওয়াটা আপনার জন্য ঝুঁকি হয়ে যাবে, তাই না? ভুলে যাবেন না যে অস্ত্র আর আহত হবার ভয় অন্যদের মত আপনারও আছে।'

'আমি জানি, আমি অন্য যে কোন মানুষের মতই মরণশীল। নিজেকে প্রকাশ করা হয়তো পাগলামীরই সামিল; কিন্তু এই ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে আমাদের রাজবংশ আর সাম্রাজ্যের জন্য।'

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় মমতাজের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারলেন যে পত্নীর সন্দেহ এখনো দূর হয়নি, তাই শাহজাহান তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'এছাড়া আমি নিজের খেয়াল রাখবো আর দেহরক্ষীরা তো থাকবেই।' এই ফাঁকে সূর্যের শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে গেল পশ্চিম দিগন্তে। নিচু হয়ে চুম্বন করলেন মমতাজকে। কতটা হারাতে হবে তাঁকে।

ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত শাহজাহানের দিকে এগিয়ে এলো রায় সিং। 'জাহাপনা...আমরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেছি একদল বিজাপুর সৈন্যের উপরে। মধ্যাহ্নের খাবারের পর বিশ্রাম নিচ্ছিল লোকগুলো। কোন এক পশুপালকের পরিত্যক্ত কুড়ে ঘরে বসে সূর্যতাপ থেকে বাঁচতে ছায়ার কক্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। তবে দু'জন পালিয়ে গেছে—একজন যে ঘোড়াগুলো পাহারা দিচ্ছিল, আর দ্বিতীয়জন কোন একভাবে পালিয়ে নিজের ঘোড়ায় উঠে চলে যেতে সমর্থ হয়। কিন্তু বাকিদেরকে বন্দি করেছি আমরা—দেখুন, তারা আসছে।'

বিকেলবেলার সূর্যের আলোয় তামার ঝকঝকানি থেকে চোখের উপর হাত রেখে শাহজাহান দেখতে পেলেন রায় সিংয়ের সাথে পাঠানো সৈন্যের দলকে-শিবিরের দিকে চলেছে সবাই। পাঁচজন ধরে রেখেছে ঘোড়াগুলোর লাগাম, এর সাথে চলেছে হাত পিছমোড়া করে বাঁধা বন্দি সৈন্যের দল। চারজন বন্দির বয়স হবে তাঁর নিজের বয়সের কাছাকাছি কিন্তু পঞ্চম জন বেশ তরুণ। লম্বা তরুণের কৃশকায় দেহে ঝুলছে ময়লা লাল সোনালি টিউনিক। বাকিদের কাছ থেকে তাকে আলাদা করে রেখেছে প্রহরীরা। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে তরুণ।

'তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলে রায় সিং?' জানতে চাইলেন শাহজাহান।

'হ্যাঁ, জাহাপনা। আমরা দু'জন তাদেরকে একজন একজন করে কুঁড়েঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম। চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল প্রত্যেককে। আর আমার সঙ্গী নির্যাতনের পাশাপাশি পুরস্কারের আশ্বাসও দিয়েছে। চারজন বেশ সাহসী, কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে; কিন্তু তরুণ সৈন্যরা ভয়ে পাজামা নষ্ট করে দিয়েছে যখন আমি ভয় দেখিয়েছি যে লোহার সাঁড়াশি গরম হচ্ছে তার পেট ফুঁড়ে দেবার জন্য। একমাত্র সে-ই আমার সঙ্গীর নরম কথায় রাজি হয়েছে মুক্ত হবার বিনিময়ে যা জানে তা বলে দিবার জন্য। অন্য বিজাপুর সৈন্যরা সন্দেহ করেছে যে তরুণটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা এমনকি বিভিন্ন হুকমিও দিয়েছে যে কি করবে তরুণের সাথে। এই কারণে তরুণকে আমরা পৃথক করে রেখেছি।'

'বেশ ভালো কাজ করেছো রায় সিং। কী বলেছে সে তোমাকে?'

'এগিয়ে চলো!' গর্জন করে আদেশ দিলেন শাহজাহান। তিনি এবং তাঁর সৈন্যরা এগিয়ে যেতে লাগলেন দেড় মাইল দূরে অবস্থিত বিজাপুরের শিবিরের দিকে। তাঁবু বলতে এখানে আছে বেশ কয়েকটি হাতে বানানো আশ্রয়স্থান, যেগুলো নির্মিত হয়েছে আঠালো মাটির সাথে মড়া গাছের ডাল দিয়ে। কোন এক উপহ্রদের অবশিষ্টাংশ এ জায়গা। এর থেকে বেশ খানিকটা দূরে কোন মতে এই খরার সময়েও টিকে আছে কয়েকটা কুঁড়েঘর, বোঝা গেল কোন এক সময় একটা গ্রাম ছিল সেখানে। বন্দি

তরুণের কাছ থেকে শত্রু শিবিরের অবস্থান আর শক্তি সম্পর্কে জানতে পারার পর নিজের সেনাপতিদের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে শাহজাহান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সূর্যোদয়ের ঠিক পরপরই আক্রমণ করার। এ সময় প্রাতঃকৃত্য আর প্রাতঃরাশ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে শত্রু সৈন্যরা।

চাঁদের আলোয় দীর্ঘপথ ঘোড়ায় চেপে আসতে আসতে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে, যেহেতু দু'জন পালিয়ে গেছে, শত্রুপক্ষ কতটা সচেতন তাঁদের ব্যাপারে। যাই হোক, নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিলেন যে, যদি শত্রুরা পালিয়ে আসা দু'জনের কথা মেনেও নেয় তারপরেও পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারবে না যে শাহজাহান এত দ্রুত কোন পদক্ষেপ নেবেন। এছাড়া আক্রমণ আর তাঁবুর মাঝে ত্রিশ মাইল দূরত্ব— এতটা দ্রুত অতিক্রম করবে সম্রাটের সৈন্যরা, এটাও তারা ভাবতে পারবে না।

কিন্তু অনর্থক বলে প্রমাণিত হবে এই ভয়, কেননা কয়েকটা ছোট পাহাড়ের উপর থেকে নিচে শত্রু শিবিরের দিকে তাকিয়ে শাহজাহান ও তাঁর সৈন্যরা দেখতে পেলেন রান্নার আগুনের ধোঁয়া, সারি বেঁধে থাকা ঘোড়া আর প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত শত্রু সৈন্যরা। পাহাড়ের চারপাশে পাহারারত কয়েকজন সৈন্যকে দ্রুত নাস্তানাবুদ করে ফেললো মোগল সৈন্যরা। টগবগ করে সামনে এগিয়ে গেলেন তিনি আর সৈন্যরা, বাতাসে উড়ছে সবুজ ব্যানার, কঠিন পোড়ামাটিতে ঝড় তুলছে ঘোড়ার খুর।

অন্যদিকে বিজাপুরের তাঁবুতে ঘোড়ার সারির দিকে ছুট লাগালো সৈন্যের দল, খাপমুক্ত করল তলোয়ার, পিরামিডের মত করে সাজিয়ে রাখা বর্শার সারি থেকে তুলে নিল যার যার অস্ত্র, প্রস্তুত হয়ে গেল মোগলদেরকে ঠেকাতে। কিন্তু যথেষ্ট সময় নেই তাদের হাতে। ভাবলেন শাহজাহান। আরো দ্রুত বেগে এগিয়ে চললেন নিজের ঘোড়া নিয়ে।

এরপর হঠাৎ করে সৈন্যের রণহুঙ্কার আর ঘোড়ার খুঁরের শব্দ ছাপিয়েও শুনতে পেলেন ভারী পতনের শব্দ, একের পর এক। আওয়াজগুলো আসছে তাঁর সামনের দিক আর বাম পাশ থেকে।

সেদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেলেন বিজাপুর আশ্রয়স্থলের গাছের ডালগুলো একের পর ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। বের হয়ে পড়ল ইতিমধ্যে গোলা

ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত কামানের নল। গোলন্দাজও হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছে গেছে কামানের পেছনে। লম্বা ব্যারেলের অস্ত্র প্রস্তুত হয়ে গেল নিমিষেই। কামান আর গোলার বল লক্ষ্য খুঁজে পেল।

নিজের ঘোড়সওয়ারাদের সৃষ্টধুলার ফাঁক দিয়ে শাহজাহান দেখতে পেলেন পা ভেঙে পড়ে গেল সামনের সারির একটা মোগল ঘোড়া। পড়ে যেতেই জায়গাচ্যুত হল পতাকাবাহক—মাথা ফেটে গেল মাটির সাথে। একটু পরেই পিছন থেকে এগিয়ে আসা ঘোড়সওয়ারদের পায়ের চাপে আরোহী আর ব্যানার দুটোই নাই হয়ে গেল। কিন্তু এখন পড়ে যাচ্ছে অন্যরাও। একটা আহত ঘোড়া পা ভেঙে পড়ে রইলো রাজপুত অশ্বরোহীদের পথের উপর। দু'জন সৈন্য সময়মতো নিজ নিজ ঘোড়ার লাগাম না টেনে ধরতে পারায় তিনজনেই একসাথে রক্ত-মাংসের দলা পাকিয়ে গেল। যাই হোক বিপর্যয় সত্ত্বেও শাহাজাহান ও তাঁর সৈন্যেরা যত শক্তি নিয়ে সম্ভব এগিয়ে গেল সামনে দিকে। খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেল শত্রুদের কাছাকাছি, ফলে সবাই মিলে একটা জায়গায় যুদ্ধে লেগে যাওয়ায় গোলন্দাজরাও কিছু করতে পারল না কারণ শত্রু-বন্ধু আলাদা করা দায় হয়ে পড়ল।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সামনে দেখা গেল একটা কাঁটার বেড়া—সম্ভবত গৃহপালিত পশুর জন্যেই তৈরি করা হয়েছিল কখনো। শাহজাহান নিজের ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিয়ে লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। নিরাপদে বেড়ার মাঝে পৌঁছেই তাকিয়ে দেখতে পেলেন একদল শত্রু অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে। এত দ্রুত কীভাবে অস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে গেল তারা? অথবা নাকি বিজাপুরের সৈন্যরা জানতো যে তিনি আসবেন, তাই কামানের মত সশস্ত্র যোদ্ধাদেরও লুকিয়ে রেখেছিল একেবারে তৈরি অবস্থায়? এখন আর এসব ভাবার সময় নেই। যুদ্ধে মনোযোগ দিতে হবে। একেবারে সামনের শত্রু যোদ্ধা ডান হাতে লম্বা বল্লম নিয়ে সরাসরি তাঁর দিকেই ছুটে আসছে।

শাহজাহান জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চেষ্টা করলেন এগিয়ে আসা সৈন্যেরা বামপাশে সরে যেতে, যেন বর্শা দিয়ে ঠিকমতো লাগাতে না পারে সম্রাটের গায়ে। লোকটা পার হয়ে যেতেই শাহজাহান তলোয়ার উন্মুক্ত করলেন। শত্রুঘোড়াকে আঘাত করতেই আরোহীকে ফেলে দিল

মাটিতে। আরেকজন বিজাপুর সৈন্য চেষ্টা করল তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে, নিজের অস্ত্র দিয়ে ঠেকিয়ে দিলেন সম্রাট।

নিজেদের ঘোড়া ছুটিয়ে আবারো একে অপরের দিকে ছুটে এলো দু'জনে। ক্রমাগত বাড়ি দিয়ে ঘোড়াকে ছুটিয়ে নিয়ে আসছে।

এবার প্রথম আঘাত করলেন শাহজাহান, কিন্তু ঘাড় নিচু করে আঘাত এড়িয়ে তাঁর দেহবর্মে পাল্টা আঘাত করল শত্রুসৈন্য। নিজের সক্ষমতার প্রমাণ দিল দেহবর্ম, কোন ক্ষতিই হল না। আবারো পরস্পরের দিকে ধেয়ে এলো দু'জন। আবারো দ্রুত আঘাত করলেন শাহজাহান আর এবার মোক্ষম জায়গায় উদ্ধত তলোয়ার গিয়ে আঘাত করল শত্রুর অরক্ষিত চিবুকে, কণ্ঠনালি চিড়ে গেল। কোন চিৎকার না করেই ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গেল মাটিতে।

তুলার কাপড় দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পেলেন ধোঁয়া আর ধুলার মাঝেই সমানে লড়ছে তাঁর দল। আরো শত্রুসৈন্য এসে যোগ দিচ্ছে দলে দলে, শাহজাহান স্বচক্ষে দেখলেন হ্রদের পেছনের গ্রাম থেকে এলো অনেকে। পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে বিজাপুরের সৈন্যরা তাঁর আগমন সম্পর্কে ধারণা করে সৈন্যদের লুকিয়ে রেখেছিল কুঁড়েঘরসহ যেখানে সেখানে সম্ভব সর্বত্র। আরো একবার শত্রুর ক্ষমতাকে খাটো করে দেখেছেন তিনি; আর এখন তারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দেরি হবার পূর্বেই কিছু একটা করতে হবে।

এগিয়ে আসতে থাকা অশ্বরোহীদের মাঝে খুব বেশি হলে ডজনখানেক হবে এমন একদলের উপর চোখ পড়ল সম্রাটের। সবার প্রথমে দু'জনে সৈন্য বহন করে আনছে সোনারঙা, বিজাপুরের পতাকা—সর্পের জিহ্বার ন্যায় আকৃতি। এদের মাঝখানে প্রায় নিজের মতই চকচকে দেহবর্ম পরিহিত এক অশ্বারোহী। মাথায় পাখনাওয়ালা শিরস্ত্রাণ। এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিজাপুরের সেনাপ্রধান আর যদি খবর সত্যি হয় তাহলে সুলতানের একাধিক পুত্রের একজন। যদি শাহজাহান একে হত্যা করতে পারেন তাহলে শত্রুদের অগ্রগতি ব্যাহত হবার পাশাপাশি মোগলরা শৃঙ্খলিত হবার সুযোগ পাবে।

'তোমরা যে যে পারো আমার সাথে এসো।' কাছাকাছি থাকা কয়েকজনকে ডেকে চিৎকার করে জানালেন সম্রাট। মোগল সৈন্যরা তাই

করল, সকলে মিলে এগোতে লাগল বিজাপুরের সেনাপ্রধানের দিকে। বড়জোর ছয়শ গজ দূরত্ব দুই পক্ষের মাঝে। দ্রুত এগোতে লাগল শাহজাহানের ঘোড়া, ঘাড়ের কাছে সাদা ঘামের রেখা, কিন্তু তারপরও অন্যদের রেখে সামনে এগিয়ে গেল দ্রুত।

এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি পৌঁছে গেলেন বিজাপুরের সৈন্যদলের কাছে। প্রথম আঘাত করলেন পতাকাবাহক এক সৈন্যের অরক্ষিত বাম পায়ে। হাঁটুর ঠিক উপরে আঘাত করে হাঁড় পর্যন্ত কেটে ফেললেন মাংস। আরেকটু হলে শাহজাহানের অস্ত্রটাই পড়ে যাচ্ছিল। যাই হোক, কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে দেখতে পেলেন পতাকাবাহক পড়ে গিয়ে ধুলায় লুটিয়ে পড়ল সোনালি পতাকা। এ সময় আরেকজন অশ্বারোহী এসে আঘাত করল সম্রাটকে, কিন্তু বুকের বর্মে লেগে পিছলে গেল তলোয়ার। তবে ধাক্কা খেয়ে পিছনে হেলে গেলেন তিনি। আবারো নিজের ভারসাম্য ফিরে পেয়ে দেখতে পেলেন সেনাপ্রধানকে আঘাত করার মত যথেষ্ট নৈকট্য পেয়ে গেছেন। তাই সর্বশক্তি দিয়ে তলোয়ার চালালেন বিজাপুর সেনাপ্রধানের চকচকে বুকে বর্মের ঠিক নিচের অংশে। যদিও ঘোড়ার পিঠেই বসে রইল, তারপরেও তলোয়ার ফেলে দিয়ে দু'হাতে পেট চেপে ধরল লোকটা। তাড়াতাড়ি শাহজাহান আবারো তলোয়ার হাতে নিলেন শত্রু সৈনপ্রধানকে একেবারে শেষ করে দেয়ার জন্য। কিন্তু এই করতে গিয়ে নিজের মাথায় আঘাত অনুভবের সাথে সাথে শিরস্ত্রাণ পড়ে যেতে দেখলেন। দস্তানা পরা হাত উঠালেন। শিরস্ত্রান ঠিক করতে, কিন্তু কানে মনে হল তালা লেগে যাবার জোগাড়। চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে চোখের সামনে নাচতে দেখলেন সাদা তারার ঝলকানি। দৃষ্টিশক্তিও ঝাপসা হয়ে এল। এখনি রণক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে নিজের চেতনা ফিরে পাবার জন্য অপেক্ষা করা উচিত।

অবচেতনেই সামনে বাড়ার জন্য তাগাদা দিলেন নিজের ঘোড়াকে, হাত আর পা দিয়ে তাড়া করলেন। নিজের সর্বোচ্চ গতি নিয়ে ছুটতে শুরু করল প্রাণীটা, কিন্তু কানের মাঝে ঘণ্টাধ্বনি আর চোখের সামনে আলোর নৃত্য বেড়ে গেল যেন। নিজের ঘোড়ার গলা জাপটে পড়ে গেলেন শাহজাহান...

কী তাঁকে এমন করে ধাক্কা দিচ্ছে? তিনি এবং মমতাজ যেন তারার রাজ্যে ভেসে চলেছেন। কিন্তু কিছু একটা যা কেউ একজন টেনে পত্নীর কাছের থেকে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে। মমতাজের বিবর্ণ মুখে ভেসে উঠল ভয় আর আকুতি। এরপরই যেন বেগুনি অন্ধকারে হারিয়ে গেল মমতাজ। কিছুই বুঝতে পারলেন না শাহজাহান। তিনি মমতাজের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছেন নাকি তাঁকেই শাহজাহানের কাছ থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল? এটা হতে পারে না...তিনি কখনোই এটা হতে দেবেন না। চেষ্টা করলেন হাত বাড়িয়ে দিতে। কিন্তু মনে হল কাপড়ে বেঁধে আটকে গেল হাত। কেউ একজন বস্তুত সত্যিই তাঁর কাপড় ধরে টানছে, নিয়ে যাচ্ছে মমতাজের কাছ থেকে 'না, না।' বিড়বিড় করে উঠলেন তিনি। মাথা নাড়াতে লাগলেন 'মমতাজ, আমি তোমার সাথেই থাকবো।' এরপরেই মনে হল যেন তীক্ষ্ণ নখের হাত চেপে ধরল গলা।

চোখ খুললেও তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন ইঞ্চিখানে দূরেই উজ্জ্বল চোখের একটা মুখ। বিস্ময়ের ভঙ্গিতে অর্ধ খোলা ঠোঁট, তারপরেও দেখা যাচ্ছে কালো দাঁত। সাদা লম্বা চুল পিছনে টেনে বাঁধা বুড়ো আঙুল ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর গলায়, খুঁজে ফিরছে অ্যাডাম'স অ্যাপেল। এই উন্মাদ নিশ্চয়ই তাঁকে হত্যা করতে চাইছে। অভ্যাসবশেই শাহজাহান হাত তুলে সরিয়ে দিলেন এই হাড়সর্বস্ব আঙুলগুলো নিজের গলা থেকে। এরপর হাত দিয়ে ধাক্কা দিলেন শয়তানটার মুখে। বিস্মিত হয়ে খেয়াল করলেন যে বিশ্রি দেহটা বেশ গরম, নাকে এসে ধাক্কা মারল বোঁটকা গন্ধ। মাথা পিছনে নিয়ে ঝাঁকি দিলেন শাহজাহান। শুনতে পেলেন কিছু একটা ভাঙ্গার মত শব্দ হল, আর এই অপচ্ছায়টা যুদ্ধ করতে করতে শাহজাহানের উপর লাফ দিতে চাইলো, চেহারার উপর গড়িয়ে পড়তে লাগল গরম লালা। হালকা দেখালেও ওজনও আছে ভূতটার।

ভারী বোঝার চাপ আর গাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে থাকা তরলের প্রবাহে পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠলেন শাহজাহান। ধাক্কা দিয়ে গায়ের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন দেহটাকে, মাথা পরিষ্কার হয়ে চোখের দৃষ্টিও ফিরে এলো। উঠে বসে চারপাশে তাকাতে লাগলেন। অসম্ভব তাপ

ছড়িয়ে গনগন করছে মধ্যাহ্নের সূর্য, পাতাবিহীন গাছের নিচে তিনি সম্পূর্ণ একা। আস্তে করে তাকিয়ে দেখে ভয়ে জমে গেলেন সম্রাট। বুঝতে পারলেন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বেঁকে যাওয়া মাথা ঝুলে যাওয়া জিহ্বা আর চোখ খুলে তাকিয়ে থাকা দেহটা একজন নারীর, বয়স্ক নারীর! বাতাসে উড়ছে লাল শাড়ির প্রান্ত। পাঁজরের হাড় আর শুকিয়ে যাওয়া চামড়ায় কোন এক সময় হয়তো পাকস্থলী ছিল, সব দেখা যাচ্ছে। বহুদিনের অনাহারী বোঝা গেল। শাহজাহান খুন করেছেন তাকে। কেন? আর তিনি একাই বা কেন?

ধীরে ধীরে খাপছাড়া স্মৃতি—অস্ত্রের ঝনঝনানি, উৎসাহ আর বেদনার রণহুঙ্কার—ফিরে আসতে লাগল মনের মাঝে। মনে পড়ে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে বিজাপুরের শিবিরের দিকে যাওয়া ঘোড়ার খুড়ের শব্দ, একটু পরেই সেনাপ্রধানের উপর হামলা, কিন্তু তারপর কী হল? অবশেষে মনে পড়ল নিজের মাথায় আঘাত পাবার কথা। সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছেন তিনি...তাঁর ঘোড়া নিশ্চয় তাঁকে এখানে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু মাইল দূরে নিয়ে এসেছে। চারপাশে তাকিয়ে না যুদ্ধ না নিজের ঘোড়া কিছুই দেখতে পেলেন না, কোন শব্দও পাচ্ছেন না। চারপাশের বালি পরীক্ষা করে কয়েকটা চিহ্ন দেখতে পেলেন খুরের নিচে। পড়ে যাবার পর নিশ্চয়ই তাঁকে ফেলে চলে গেছে ঘোড়া। কিন্তু এই নারী এলো কোথা থেকে? মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে শাহজাহান দেখতে পেলেন মাটিতে পড়ে আছে তাঁর আংটি—বড় একটা বাঁকানো এমেরাল্ড—আর হ্যাঁ, তাঁর হালকা, পোশাক রুপার বন্ধনী দ্বারা আটকানো ছিল, এখন পড়ে আছে বৃদ্ধার পাশে। হুম, তাহলে ঘটনাটা এই-ই—সম্রাটের দেহ তল্লাশী করে লুটপাটের চেষ্টা করেছিল। ধূসর পক্ককেশ নারী, নড়ে উঠতেই তারপর খুন করার চেষ্টা করে।

পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে টিকে থাকার চেষ্টায় ভুলে গেছে নারী দুর্লভ মমতা আর প্রতিরক্ষার বোধ। নিশ্চয়ই একা বেঁচে থাকতে গিয়েই এমন হয়েছে এই বৃদ্ধা। পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর পর কী গ্রাম ছেড়ে খাবারের সন্ধানে বের হয়েছে? নাকি তারা আশেপাশেই কোথায় পড়ে আছে কিন্তু এতটাই দূর্বল যে নড়াচড়া করতে পারছে না? নাকি তারা এই বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করেছে? যাই হোক, কোনমতে টিকে থাকাই মানুষের

সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন এখন। একই কারণে শাহজাহানকেও খুন করতে চেয়েছে সে...কিন্তু তিনি কেন হত্যা করলেন...কেননা বস্তুত তিনিও তাঁর সৎভাইদের হত্যা করিয়েছেন। এখন আরো একবার বাঁচার জন্য যুদ্ধ করলেন।

মৃতদেহের পাশ থেকে নিজের পোশাক তুলে নিয়ে কোনমতে মাথায় জড়িয়ে নিলেন, সূর্যের কড়া তাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য। বুকের বর্মের উজ্জ্বলতা হয়তো শত্রুতাই করে বসবে শত্রু খুঁজতে, এছাড়া বহন করার পক্ষে বেশ ভারীও এটি। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে বালিতে হালকা গর্ত করে লুকিয়ে রাখলেন। এরপর তাকালেন দাগগুলোর দিকে, সেগুলোকে তিনি তাঁর ঘোড়ার খুরের দাগ বলে ভাবছেন। পড়ে যাওয়ার আগে মনে হল উত্তর-পশ্চিম দিকে থেকেই ছুটে এসেছেন, এরপর দাগগুলো চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। তিনি এখন কী করবেন? ঘোড়ার খুরের দাগ অনুসরণ করে এটির পিছু নেবেন, নাকি পিছনে গিয়ে রণক্ষেত্রের দিকে যাবেন? ভেবে দেখলেন ঘোড়ার খোঁজেই যাওয়া উচিত। নিশ্চয়ই একটু এগিয়েই থেমে গেছে কোথাও। অন্যদিকে যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কেও কিছুই জানেন না তিনি। হতে পারে গিয়ে দেখবেন নিজের সৈন্যরা পরাজিত হয়েছে, মৃত্যু অথবা বন্দিত্বই তখন ললাট লিখন হবে।

পাতাবিহীন গাছদের নিচ দিয়ে ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে এগোতে শুরু করলেন। ঘোড়ার খুরের দাগ অনুসরণ করলেও আস্তে আস্তে তাও হারিয়ে যেতে বসেছে, কেননা ঝোপের কিনারে মাটি বেশ শক্ত। গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন যে দূতদের সাথে বসে লুকিয়ে চলাফেরার কৌশল রপ্ত করা কতটা জরুরি ছিল। ঝাপসা হয়ে যাওয়া দাগের উপর থেকে চোখ সরিয়ে সামনের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে চেষ্টা করলেন ঘোড়ার কোন চিহ্ন দেখা যায় না কিনা তা খুঁজতে। এর বদলে দেখতে পেলেন খুব বেশি হলে এক মাইল দূরত্বে উত্তর দিক থেকে ধূলি উড়িয়ে এগিয়ে আসছে একদল অশ্বরোহী। শাহজাহান জানেন না এরা বন্ধু নাকি শত্রু। তাই দ্রুত গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন বড় একটা গাছের গুড়ির পেছনে। সাবধানে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন পরিচিত চিহ্ন চোখে পড়ে কিনা। কিছুই বুঝতে পারলেন না, দলটা একেবারে কাছে চলে এলো। এরপরই

বিভক্ত হয়ে গেল। অর্ধেক এগিয়ে গেল ঝোঁপের এক দিকে, বাকিরা ঝোঁপের অন্যদিকে। সবাই প্রায় অর্ধেক নিচু হয়ে খুঁজতে লাগল কী যেন। আরো কাছে চলে আসতেই শাহজাহান গুড়ির গায়ে হেলনা দিয়ে যতোটা সম্ভব গুটিসুটি মেরে বসে রইলেন। হঠাৎ করেই স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলে চিনতে পারলেন সেনাপতিকে—লম্বা এক রাজপুত সৈন্য কালো ঘোড়ার উপর বসে আছে। লোহার বুক বর্মের নিচে কেশর রঙা আলখাল্লা। অশোক সিং। সৈন্য তাঁর নিজ বাহিনীর। গাছের গুড়ি থেকে বের হয়ে ঝোপের কিনারে দৌড়ে গেলেন শাহজাহান।

'জাহাপনা, আপনি? আপনি কী আহত হয়েছেন?' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে চিৎকার করে জানতে চাইল অশোক সিং।

'হ্যাঁ—আর না, তেমন গুরুতর কিছু না, আল্লাহর অশেষ দয়া যে তোমরা আমাকে খুঁজে পেয়েছো। আমি আঘাত পেয়েছিলাম আর আমার ঘোড়া আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে মনে হয়।'

'আমরা ঘোড়াটাকে খুঁজে পেয়েছি, বেশি দূরে যেতে পারে নি।'

'যুদ্ধে কি আমাদের জয় হয়েছে?'

'হ্যাঁ জাহাপনা। যুদ্ধে আমরাই এগিয়ে থেকেছি আর তখনি আপনাকে হারিয়ে ফেলি দৃষ্টিসীমার বাইরে। অন্যদিকে বিজাপুরে সৈন্যরা তাঁবু ছেড়ে বিস্তর ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পিছু হটেছে।'

'এখনো পিছু ধাওয়া করছ?'

'না। আমাদের ক্ষতিও কম হয়নি। আপনার অনুপস্থিতিতে সেনাপতিরা ভেবে দেখলেন যে পিছু ধাওয়া করার চেয়ে আহত সেবা আর পুনরায় শৃঙ্খলিত হওয়া বেশি জরুরি। সবাই ভয় পাচ্ছিলেন আহমেদ আজিজের মত কোন চোরা হামলা যদি হয় আর আপনাকে খুঁজে বের করাও জরুরি।'

তো, বিজয় তাহলে সম্পূর্ণ হল না, ভাবলেন শাহজাহান। কিন্তু এর আগে যে সমস্যাগুলোর মুখে পড়েছিলেন তার চেয়ে এই আংশিক সাফল্যও ভালো।

দুই ঘণ্টা পরে আবারো নিজের ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন শাহজাহান। লুকানো জায়গা থেকে এক সৈন্য আবার দেহবর্মটাও উদ্ধার করে এনেছে। পরে নিলেন তিনি। কাছাকাছিই আবার ঝোপের মড়া ডাল

জ্বালিয়ে তাড়াতাড়ি একটা চিতা তৈরি করল রাজপুত সৈন্যরা। পোশাক দেখে এটুকু নিশ্চিত যে বৃদ্ধ নারী হিন্দু, তাই আচার মাফিক শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। কিন্তু তুলোয় মোড়া দেহ থেকে আগুনে শিখা বের হতেই অপেক্ষা করার প্রয়োজন রইল না।

এই বৃদ্ধা একাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এই মরুভূমিতে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিজের বাহিনীর সাথে একত্রিত হতে হবে, নতুবা গুজব ছড়িয়ে যাবে যে সম্রাট আহত হয়েছেন অথবা মৃত্যুবরণ করেছেন। চিতার কালো ধোঁয়ার দিকে আরেক নজর তাকিয়ে ক্লান্ত ঘোড়াকে ছুটে চলতে তাগাদা দিলেন তিনি।

প্রথম কয়েক মাইল জুড়ে চারপাশে দেখা গেল শুধু শুষ্ক ভূমি। একটিও কোন জীবিত প্রাণীর দেখা মিলল না। কিন্তু এর পরই শাহজাহান দেখতে পেলেন যেন ছোট একটা গ্রাম—ছয় থেকে সাতটা গোলাঘরের বেশি না। ডানদিকে পড়ল সেই গ্রাম। হতে পারে এখানে হয়তো এমন কোন কুয়া পাওয়া যাবে যেটা এখনো শুকিয়ে যায়নি, নিজেদের ঘোড়াকে পানি খাওয়াতে পারবেন তারা। নিজের লোকদের ইশারা করে ঘোড়া ছুটিয়ে মাটির ইট দিয়ে তৈরি নিচু ঘরগুলোর দিকে চললেন তিনি। কাছাকাছি এগোতেই দেখা গেল কয়েকটা পাতা ঝুলছে এমন একটা বট গাছের নিচে সরু পা ছড়িয়ে বসে আছে এক বৃদ্ধ পুরুষ। এত লিকলিকে পা যে মনে হল নিজের ভার বইতেও অক্ষম লোকটা।

'খাবার দাও, বাপু, আমি ভিক্ষা চাইছি...ফেটে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কথা বলে উঠল লোকটা। নিজের ঘোড়ার পিঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন শাহজাহান, 'তোমাদের খাদ্যের গুদাম কি শেষ হয়ে গেছে? শেষ কবে খেয়েছিলে তোমরা?

উঁচু গালের হাড়ের উপরে কোটরে বসা বৃদ্ধের চোখ সূর্যের আলোয় চকচকে ভাব নিয়ে তাকিয়ে রইল সম্রাটের দিকে।

'ছয় সপ্তাহ আগেই ফুরিয়ে গেছে আমাদের শস্য। এর কয়েক দিন পর থেকে মারা যেতে শুরু করে গবাদিপশু। এগুলোর মৃতদেহও খেয়ে ফেলি আমরা, চামড়া আর নাড়ি-ভুড়িসহ। এছাড়া হাড়গুলোকেও মাটিতে পুঁতে রাখি এক ধরনের ময়দা তৈরির জন্য। ভাগ্যক্রমে কুয়োতে এখনো

পানি আছে। কিন্তু এছাড়া খাওয়ার মত শুকনো পাতা ছাড়া আর কিছুই নেই। কয়েকদিন আগে দুইটি বনবিড়াল ধরেছিলাম, এই-ই।'

'অন্য গ্রামবাসীরা কোথায়—?'

'তিন দিন আগে চলে গেছে অন্য কোথাও খাবার পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে; কিন্তু আমার স্ত্রী অনেক দুর্বল হওয়ায় আমি রয়ে গেছি।'

'আমাদের যা খাবার আর বাড়তি পানির বোতল আছে তাকে দিয়ে দাও', অশোক সিংকে নির্দেশ দিলেন শাহজাহান। 'দুর্ভিক্ষের এতটা প্রকোপ আমি তো বুঝতেই পারি নি।'

'অবস্থা বেশ খারাপ, জাহাপনা। বোরহানপুরের দেয়ালের চারপাশে আমি দেখেছি পশুর মলের ভেতরে হজম না হওয়া অক্ষত শস্যদানা নিয়ে মারামারি করছে পুরুষের দল। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলের এসব গ্রামের অবস্থা আরো খারাপ। এমনও শোনা যাচ্ছে যে, কয়েকটা মুদ্রার লোভে পিতা-মাতারা, নিজ সন্তানদেরও বিক্রি করে দিচ্ছে ক্রীতদাস হিসেবে, এই আশায় যে, এতে করে উভয় পক্ষই ভালো থাকবে। এছাড়া পাহাড়ের লোকদের মাঝে তো স্বজাতির মাংস খাওয়ার গুজবও শোনা গেছে; যাদের ভেড়া আর ছাগলের মাংস শেষ।'

রাজপুত সৈন্যরা লোকটাকে খাবার আর পানি দিয়ে দিলেও শাহজাহান কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারলেন না হাড় দিয়ে ময়দা তৈরি বা স্বজাতের মাংস খাবার মত ব্যাপারগুলো। কিন্তু এতে তো অবাক হবার তেমন কিছু নেই। একটু আগে তিনি নিজেও তো খুন করে এসেছেন এক বৃদ্ধাকে। যাই হোক, অন্য আরেকটা চিন্তা এলো মাথায়। মানুষটা নিশ্চয়ই তার স্ত্রীকে অসম্ভব ভালোবাসে, তাই অন্য গ্রামে গিয়ে খাবারও খুঁজতে যায় নি পত্নীকে একা রেখে। যেমন তিনিও করতেন মমতাজের সাথে। যদি জন্তুর মতো টিকে থাকাই হয় একমাত্র স্বার্থপর চেতনা, তাহলে মানুষের মাঝে এর চেয়েও মহৎ গুণ আছে...যেমন ভালোবাসা।

অধ্যায়-০৪

সাত্তি আল-নিসার সহযোগী তার গায়ে স্যাফায়ার সিল্ক জড়িয়ে মমতাজ সাবধানে নেমে গেলেন সাদা মার্বেলের তৈরি সিঁড়ির তিন ধাপ নিচে গোলাপ তেলের সুগন্ধিওয়ালা পানির পুকুরে। ভারী শরীর সত্ত্বেও কয়েক সপ্তাহের মাঝেই সন্তান জন্মদান করবেন মমতাজ। তাঁর প্রতিটি চলনে ফুটে উঠেছে এক ধরনের মাধুর্য, হাম্মামের দরজার কাছ থেকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবলেন শাহ্জাহান।

মোমবাতির উজ্জ্বলতায় ফুটে রয়েছে মমতাজের শরীরের প্রতিটি ভাঁজ। এক মুহূর্তের জন্য পত্নীর দিকে তাকিয়ে থাকার বিলাসিতায় পেয়ে বসলো সম্রাটকে। পাশের দেয়ালে মাথা রেখে বসে আছেন মমতাজ, সেবাদাসীরা পানি ঢালছে মাথার উপর। নিচে মাছের আশের আকৃতিতে তৈরি বাকানো মার্বেলে পানি পড়ে বৃষ্টির মত নৃত্য করছে। বোরহানপুরের এই চার দেয়ালের মাঝে মমতাজের জন্য স্বর্গ রচনা করেছেন শাহজাহান। আঙিনায় ফুটে আছে লাল পদ্ম আর মিষ্টি সুগন্ধওয়ালা চম্পা ফুল, অন্যদিকে প্রাচীন ঝরনা গেয়ে চলেছে জীবনের জয়গান।

দেয়ালের বাইরের কঠোর বাস্তবতায় রুক্ষ সূর্যতাপের নিচে যুদ্ধ করছে মানুষ আর পশু, জীবনীশক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে মাটি আর মানুষের। হিন্দু মন্দিরের ভক্তরা প্রার্থনা শুরু করেছে দেব-দেবীর উদ্দেশে, যেন তাদের দুঃখ লাঘব করেন দেবতারা। এমনকি কালীর উদ্দেশে রক্ত উৎসর্গও করা হচ্ছে। অন্য কয়েকজন আবার নিজেদের দুর্ভাগ্যের সময় সহায়তা না করার অভিযোগে দোষারোপ করছে মোগল সম্রাটকে। গত সপ্তাহে দু'জন সাধু সারা গায়ে ছাই মাখানো হাড়সর্বস্ব ভূতের মত চেহারা

নিয়ে হাজির হয় বোরহানপুরের প্রধান ফটকে। নিজেদের লাঠি নেড়ে শাপ-শাপান্ত করতে থাকে সম্রাটকে। শাহজাহান নির্দেশ দেন যেন তাদেরকে কিছু করা হয় আর তাই কড়া রোদে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায় সাধুগণ। কিন্তু যাবার আগে মাটিতে রেখে যায় ছোট্ট বাচ্চার দেহের মত কিছু একটা। সৈন্যরা গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পায় যে ময়লা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে ফেলে রেখে গেছে একদঙ্গল কাঠি আর মাথার কাছে শুকনো লাউ; কিন্তু যা বলতে চেয়েছে সেই বার্তা পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছেন সম্রাট। মারা যাচ্ছে ছোট বাচ্চারা আর এর সব দোষ সম্রাটের। মমতাজকে কিছুই জানাননি তিনি।

পুকুরের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন শাহজাহান। পদশব্দে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে হাসলেন মমতাজ। 'কেন যেন খুব ক্লান্ত লাগছে আজ রাতে—তাই ভাবলাম গোসল করলে ভালো লাগবে।'

লম্বাদেহী সাত্তি আল-নিসা আর অন্য দাসীরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন শাহজাহান। এরপর বসলেন পুকুরের মার্বেল বাঁধানো ঘাটে। 'দুর্ভিক্ষের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। প্রতিদিনই আমি খবর পাচ্ছি যে গ্রামবাসী পুরো গ্রাম খালি করে গবাদিপশু নিয়ে চলে যাচ্ছে পশ্চিমে পানির খোঁজে। আক্রান্ত অঞ্চলগুলোর রাজকীয় শস্যাগার খুলে দেয়ার আদেশ দিয়েছি আমি; কিন্তু প্রয়োজনীয় শস্যেরও মজুদ কম। শুধুমাত্র সপ্তাহখানেক দেয়া যাবে মানুষকে, পশুকে নয়। কিন্তু গবাদি প্রাণী ছাড়া তাদের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। কয়েকটা জায়গায় আবার বিজাপুরের বিদ্রোহীরা শস্যভাণ্ডারে হামলা চালিয়েছে।'

'আপনি তো যা পারছেন, করছেন।'

'কিন্তু নিজেকে খুবই অসহায় মনে হচ্ছে। আমার সম্পদ আর শক্তি সত্ত্বেও যেটার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে পানি, সোনা নয়। যদি এরই মাঝে বর্ষা না হয়। তো আরো বহু প্রাণ মৃত্যুবরণ করবে।'

'আপনি তো আর প্রকৃতিকে পরাজিত করতে পারবেন না।'

'আমার জনগণের জন্য আরো ভালো কিছু করতে হবে আমাকে, কিন্তু এই যুদ্ধের কারণে তাও পারছি না...দ্রুত এর সমাপ্তি টানতে হবে।'

'আপনি আবারো অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। আমি এখানে এক বছর এমনকি দুই বছরও থাকতে রাজি আছি। তবুও একটা সংক্ষিপ্ত অভিযানের জন্য আপনাকে এমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখতে চাই না।'

মোমবাতির আলোয় মমতাজের চোখে ফুটে ওঠা আকুতি দেখতে পেলেন শাহজাহান। সামনে ঝুঁকে টোকা দিলেন পত্নীর গালে। 'ঠিকই বলেছো তুমি। আমি অধৈর্য। আমি সবসময় তাই ছিলাম। শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে তাড়াতাড়ি শত্রুর সাথে বোঝাপড়া করে অন্য কোথাও উচ্চাকাংখা মেটাতে চাই—আমি তোমাকেও ফিরিয়ে নিতে চাই আগ্রার সুরক্ষিত আর আরামদায়ক দেয়ালের মাঝে। অনেক আগে যখন আমাদের প্রথম প্রথম বিয়ে হয়েছে, আমি শপথ নিয়েছিলাম যে সব ধরনের বিপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করব আর দেব শান্তি ও সমৃদ্ধশালী জীবন, যেটা তোমার প্রাপ্য। কিন্তু পিতা আমার বিরুদ্ধে যাওয়ায় আমি সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি। যখন থেকে বোরহানপুরে এসেছি আমার ভয় হচ্ছে যে, আবারো তোমাকে টেনে নিয়ে এসেছি অপ্রয়োজনীয় বিপদের মুখে। এই জায়গা তোমার জন্য নয়।'

'এই সিদ্ধান্ত ছিল আমার। আমি তো জেদ করে করেছিলাম যে আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারব না যেমনটা আমি সবসময় করে এসেছি...' উঠে বসলেন মমতাজ। মার্বেলে হাত রেখে উঠে দাঁড়াতে চাইলেন। 'সাহায্য করুণ আমাকে।' উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাতে শাহজাহানের মুখমণ্ডল ধরে, চুম্বন করলেন কপালে। 'বর্তমান যা, ঠিক তাই ভালো। আবারো আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিচ্ছি। আবারো বলছি আপনার সাথেই থাকতে চাই। যেমনটা অতীতেও আমরা সব ঝঞ্ঝা দূর করেছি। আগেও আপনাকে কতবার বলেছি যে, সেই সময় পার করে এসেছি আমরা। কেন শুধু শুধু অনুতাপ করে নিজেকে কষ্ট দেন?'

'হুম, ঠিক বলেছো তুমি। আমাকে সামনের দিকে তাকাতে হবে। কিন্তু কিছু বিষয় ভুলে যাওয়া খুব কঠিন। দ্রুত শত্রুকে মোকাবেলা করে আমি যাদেরকে ভালোবাসি তাদের জন্য শ্রেষ্ঠ কাজটাই করতে হবে আমাকে। আর এছাড়া প্রজাদের শ্রদ্ধাও আদায় করে নিতে পারব নতুন সম্রাট হিসেবে।'

'আপনি ইতিমধ্যেই তা করেছেন। আপনার পিতা নিজে আপনাকে শাহজাহান "পৃথিবীর প্রভু" উপাধি দিয়েছেন আর সময়ের সাথে সাথে আপনি এর যথার্থতা প্রমাণ করবেন নিশ্চয়।'

'এটা অনেক আগের কথা। এরপর ঘটে আছে বহুকিছু। আমার লোকেরা আমাকে এখন পর্যন্ত জানেও না।'

'আপনি আপনার পুত্র আওরঙ্গজেবের মতই জেদী। যদি যেতে হয় তবে যান। কিন্তু অন্তত একটা প্রতিজ্ঞা করুন আমার কাছে— যুদ্ধে যাবার আগে ভেবে দেখবেন যে শত্রুর মাথায় কোন্ ভাবনা চলছে...অন্যেরাও ততটাই বুদ্ধিমান যতটা আপনি। প্রতিবার আপনাকে বিদায় জানাবার সময় আমাকে বিশ্বাস করতে হয় যে আপনি ফিরে আসবেন আমার কাছে।'

'কথা দিচ্ছি নিজের খেয়াল রাখবো।' শাহজাহান তাকিয়ে দেখলেন যে উষ্ণ বাতাসেও কাঁপছেন মমতাজ। 'তোমার ভেজা কাপড় পাল্টে শুকনো কাপড় পরা উচিত। আমি ডেকে দিচ্ছি তোমার সেবাদাসীদের।'

সবুজ সিল্কের দড়ির সাথে ঝোলানো রুপার ঘণ্টি বাজাতে যাবেন শাহজাহান, এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলো জাহানারা। হাঁপাতে হাঁপাতে জানালো, 'দারা...এক অশ্বারোহী এই মাত্র খবর নিয়ে এসেছে... আগামীকাল পৌঁছে যাবে এখানে।'

'তুমি নিশ্চিত? আরো দুই সপ্তাহ পর্যন্ত তো বোরহানপুরে আসার কথা ছিল না তাঁর।' জানালেন সম্রাট।

'বার্তাবাহক জানিয়েছে যে দারা সারাদিন আর রাতেরও বেশির ভাগ সময় ঘোড়া চালাতে জেদ করেছে।'

মমতাজের দিকে তাকালেন মোগল সম্রাট। এত মাস পরে পুত্রের মুখ দেখার আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চেহারা, 'আমি এখনি সৈন্য পাঠাচ্ছি তাদেরকে এগিয়ে আনার জন্য।'

'আওরঙ্গজেবকেও তাদের সাথে যেতে দিন, যাতে সেও তার ভাইয়ের গৌরবে অংশগ্রহণ করতে পারে।' বলে উঠলেন মমতাজ। 'বয়সে ছোট হওয়ায়, নয়তো আমি জানি পারস্যের দরবারে ভাইয়ের সাথে যাবার ব্যাপারে সে কতটা উৎসুক ছিল।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন শাহজাহান। 'যদি এখন শান্তির সময় হত আমি অমত করতাম না। কিন্তু বিজাপুরের বিদ্রোহীরা যে কোন সময় যে কোন কিছু করতে পারে। আমি দেখানোর জন্য কোন স্বাগতম পার্টি পাঠাচ্ছি

না। শুধুমাত্র দারা ও তাঁর দল যাতে নিরাপদে বোরহানপুরে পৌঁছতে পারে সে ব্যবস্থা করছি। আমার মনে হয় আওরঙ্গজেব এখানে থাকলেই ভালো হবে।'

বোরহানপুর দুর্গের দরবারে বালি পাথরের মঞ্চের উপর তৈরি মাঝখানে থাকা সিংহাসনে বসে নিজের অধৈর্যভাব চেপে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন শাহজাহান। খুব কম সময়ই এসেছে যখন তিনি ভেবেছেন যে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে পরিবারের সাথে সময় কাটানো বা যখন যা খুশি করতে পারার ক্ষমতা থাকলেই ভালো হতো, এখন এই মুহূর্তেও ঠিক সে রকমই মনে হচ্ছে। খিলানওয়ালা ফটকদ্বারের পেছন থেকে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি আর খুরের আওয়াজে বুঝতে পারলেন যে তুহিন রায়, তাঁর দূত ও বাহিনী এসে পৌঁছেছে। ছুটে গিয়ে নিজ পুত্রকে অভিবাদন জানানো থেকে নিজেকে বিরত রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে, কিন্তু রীতির খাতিরে আনুষ্ঠানিকতা পালন করাও জরুরি। এই কারণে সারি বেঁধে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সভাসদ ও সেনাপতিরা। অন্যদিকে ডান পাশে অপেক্ষাকৃত নিচু একটা মঞ্চে অপেক্ষা করছে ছোট তিন পুত্র, যাদের সবার পরনে ব্রোকেডের সবুজ মোগল কোর্ট ও গলায় মুক্তার মালা।

তের বছর বয়স্ক শাহ সুজা হাসি মুখে তাকিয়ে দেখছে চারপাশ কিন্তু রাশভারী।' চৌকানা মুখের অধিকারী দুই বছরের ছোট আওরঙ্গজেব শ্রদ্ধাবনত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। শীঘ্রই এদের দু'জনের জন্য তাঁকে যথাযথ দায়িত্বপূর্ণ কাজ খুঁজে বের করতে হবে। যেমনটা তিনি করেছেন দারার জন্য, ভাবলেন শাহজাহান। একজন রাজকীয় শাহজাদার শিক্ষা এত তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় না। শাহ সুজাকে শিখতে হবে যে জীবন শুধুমাত্র শিকার আর আমোদ-প্রমোদের জন্য নয়। অন্যদিকে আওরঙ্গজেবকেও বুঝতে হবে যে ক্ষমতার ব্যবহার করা এত সহজ নয় যতটা সে পূর্ব-পুরুষের কাহিনী পড়ে, মনে মনে ভাবে। যাই হোক, ছয় বছর বয়সী মুরাদের কথা এখনই চিন্তা না করলেও চলবে। সে এখন ব্যস্ত শাহ-সুজার ওড়নার প্রান্ত টেনে তার মনোযোগ আকর্ষণের কাজে।

বাদ্য বেজে উঠল আর ঠিক নিয়মানুযায়ী প্রথমে আগমন ঘটল দূতাবাস প্রধান তুহিন রায়ের। বয়স হলেও এখনো ঋজু দেহী তুহিন রায় দাড়ি রাঙিয়ে রাখে কালো রঙে। ধীরে ধীর এগিয়ে এসে অবনত হল সিংহাসনের সামনে।

'স্বাগতম তুহিন রায়। শাহের কাছে গিয়ে সফল হয়েছে তোমার দূতাবাস?' এর উত্তর খুব ভালো করেই জানেন শাহজাহান—দূত মারফত নিয়মিত সংবাদ পেয়েছেন তিনি—তারপরেও সফলতা সম্পর্কে জনসমক্ষে প্রচার করাটা জরুরি।

'শাহ আপনাকে ভাই নামে ডেকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। আমি একটি চিঠিও বহন করে এনেছি তাঁর পক্ষ থেকে। আমি কি এটি উচ্চ স্বরে পাঠ করব জাহাপনা?'

'অনুমতি দেয়া হল, তুহিন রায়।'

আইভরি কেস খুলে বের করা হল একটি কাগজ। পড়া শুরু করল তুহিন রায়। শুরু হয়েছে ফুলের মত বর্ণনা দিয়ে একটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে যাতে লেখা হয়েছে মোগল সাম্রাজ্যের মহত্ত্ব আর যেখানে হাসি ফুটিয়েছেন শাহজাহান—পারস্যের শাহ ও মোগল সম্রাট বহুদিন যাবৎ মিত্র নয় বরঞ্চ শত্রু ছিলেন। এরপরই আসল কথায় এলো তুহিন রায়: 'আমি, শাহ আব্বাস, বিনয় সহকারে আপনার প্রস্তাবিত হেরাটে বাণিজ্যিক অধিকারসমূহ স্বীকার করে নিচ্ছি। এর পরিবর্তে আমি ঘোষণা করছি যে আমার শহর ইসফাহানে আগত মোগল সাম্রাজ্যের বণিকদের উপর কর ধার্য করা হবে না।'

'তুমি বেশ ভালো মধ্যস্থতা করেছ তুহিন রায় আর এ কারণে তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে। কিন্তু তার আগে এই ক্লান্তিকর ভ্রমণের জন্য বিশ্রাম কর। এ কারণে আমি জানি দোষারোপ করতে হবে আমার পুত্রকে। কেননা সে পরিবারের সাথে মিলিত হতে উৎসুক ছিল। ক্ষমা কর, কিন্তু আমি নিজেও সমানভাবে আগ্রহী তাঁর সাথে মিলিত হবার জন্য।'

এত তাড়াতাড়ি তাকে যেতে বলায় খানিকটা আশাহত হল তুহিন রায়। কুর্নিশ করে চলে গেল। শাহজাহান ইশারা করতেই বাদ্যের বাজানার সাথে প্রবেশ পথে দেখা গেল দারা শুকোহ্‌কে। উপস্থিত সভা-

সদবৃন্দ বাতাসে গমের শীসের ন্যায় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল, সবার মাঝ দিয়ে এগিয়ে আসল সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র। হাসি মুখে দারা এগিয়ে এলো মঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ানো পিতার বাড়ানো হাতের দিকে। ডান হাতে দারাকে ধরে সভাসদদের দিকে তাকালেন সম্রাট।

'আমার প্রিয় পুত্রের নিরাপদ আগমনের আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য আমি তাকে একটি ব্যানার উপহার প্রদান করছি—উপহার হিসেবে একজন সম্রাট এর মাধ্যমেই সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতে পারেন, যে নিয়ম চলে আসছে আমার পূর্বপুরুষ বাবরের সময় থেকে।'

এই রাতে অন্ধকার নেমে এলে আকাশে ছড়িয়ে পড়ল নতুন চাঁদের পাণ্ডুর আলো আর সেই সাথে বদলে গেল বোরহানপুর দুর্গ হারামের পরিবেশ। প্রধান আঙিনায় গাছের সাথে শিকল বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হল লাল, নীল, সবুজ আলোর কাঁচের বল। মোলায়েম আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চারপাশ। শাহের উপহার দেয়া দামি পারস্যের কার্পেট বিছানো মঞ্চের মাঝখানে পা ভাঁজ করে বসে আছেন শাহজাহান। জ্যেষ্ঠ তিন পুত্র এখনো আহারে রত। ব্রোকেডের কাজ করা হলুদ পাশবালিশে শুয়ে আছেন মমতাজ। পাশে জাহানারা আর রোশনারা একই সাথে মাথা রেখে হাস্যরসে ব্যস্ত। ছোট্ট মুরাদ গভীর ঘুমে মগ্ন ছোটদেরই মত।

দারার ফিরে আসার কথা শুনেই শাহজাহানের প্রথম চিন্তা হয়েছিল আনন্দ ভোজনের নির্দেশ দেবেন কিনা, কিন্তু একপাশে টেনে এনে তাঁকে বুঝালেন মমতাজ। 'দুর্ভিক্ষের সময় এমন করাটা কী উচিত হবে আমাদের?' জিজ্ঞেস করলেন মমতাজ। 'এত জাঁকজমক ভোজন করলে ব্যাপারটা ঠিক অমানবিক হবে না? আমাদের রান্নার গন্ধ বোরহানপুরের দেয়ালের বাইরে তাদের কাছে পৌঁছে যাবে যারা জানে না পুনরায় আবার কবে খেতে পারবে।'

তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারলেন সম্রাট। অন্যরা কী ভাববে—ঠিকই বলেছেন মমতাজ। সাধারণত এরকমটাই হয়। তাই মমতাজের পরামর্শানুযায়ী বড়সড় ভোজের পরির্বতে তিনি নির্দেশ দিলেন দারার সম্মানার্থে আশেপাশের গ্রামে শষ্য বিতরণ করতে আর নিজ রাঁধুনীকে আদেশ দিলেন হেরেমে একাকী উপভোগ করার জন্য তাঁর পরিবারের নিমিত্তে সাধারণ খাবার তৈরি করতে।

পারস্যের দরবার নিয়ে দারা শুকোহ্‌কে প্রশ্ন করে চলল শাহ সুজা। একে অন্যের সাথে তাদেরকে এত সহজভাবে মিশতে দেখে ভালোই লাগছে, ভাবলেন শাহজাহান। কতটা পৃথক তাঁর নিজের বাল্যকালের চেয়ে—এমনকি কম বয়সেও তিনি ও তাঁর সৎভাইদের মাঝে সদ্ভাব ছিলনা। আর পরবর্তীতে সিংহাসনের উচ্চাকাঙ্খা কিছু হবার আশা থাকলেও আর হতে দেয়নি কোন হৃদ্যতা। যদি তাঁর নিজের কোন ভাই থাকত—যেমনটা তাঁর পুত্রেরা একে অন্যের—হয়ত পরিস্থিতি ভিন্ন হত...

দারা কিছু একটা বলছে—নিজের ভাবনায় ডুবে ছিলেন শাহজাহান—অবিশ্বাসে মাথা নাড়ছে শাহ সুজা।

'কী হয়েছে শাহ সুজা?'

'দারা আমাদেরকে বলছে যে শাহ তাকে কী জানিয়েছে—অনেক বছর আগে পারস্যরা নাকি আমাদের পূর্বপুরুষ বাবরকে সাহায্য করেছে উজবেক নেতা শাহেবানী খানের সাথে যুদ্ধে...পারসীয়রা উজবেকদের হাত থেকে বাবরের বোনকে উদ্ধার করেছিল আর শাইবানী খানের খুলি দিয়ে চায়ের কাপ বানিয়ে উপহার পাঠিয়েছিল বাবরকে। এটা সত্যি হতে পারে না...পারসীয়দের সাথে মোগলদের কখন এত সখ্যতা ছিল, পিতা?'

কিন্তু উত্তর দিল অন্য দুজনের চেয়ে একটু পিছনে বসে থাকা আওরঙ্গজেব। 'যদি তুমি কখনো ঘটনাপঞ্জিগুলো পড়ে দেখার কষ্ট করতে, তাহলে তুমিও জানতে পারতে যে এটি সত্যি ঘটনা। বিশেষ করে বাবর নিজের মুখে বলে গেছেন। তুমি আরো জানতে পারতে যে অবশেষে হুমায়ুন যে হিন্দুস্তানে ফিরে এসেছেন তার অন্যতম একটা কারণ হল যে পারস্যরা সেনাবাহিনী দিয়েছিল।'

'আমি মুগ্ধ আওরঙ্গজেব । তোমার গৃহশিক্ষক জানিয়েছেন যে তুমি কতটা বিদ্যানুরাগী, কিন্তু আমি বুঝতে পারেনি যে কতটা। হয়ত কোন দিন তুমি অনেক বড় বিদ্বান হয়ে উঠবে।' জানালেন শাহজাহান।

'একজন বিদ্বান? না—আমি আপনার মতন যোদ্ধা হব।'

'হয়ত।'

'আমি সত্যিই তাই চাই, পিতা।' জ্বলে উঠল আওরঙ্গজেবের তরুণ চেহারা। 'আমি যা পড়ি সেখানে লেখা আছে যে, মোগলরা হিন্দুস্তান জয়

করেছে কলমের জোরে নয়, তলোয়ারের জোরে। এভাবেই আমরা এগিয়ে যাবো।'

হাসি চাপলেন শাহজাহান। আওরঙ্গজেবের কৌতুকবোধ তেমন তীক্ষ্ণ নয়, তার অনুভূতিতে সহজেই আঘাত লাগে—এই ব্যাপারটা আর ভাইয়েরাও ভালোই জানে যারা তাকে প্রায়শই খ্যাপায়।'আমি নিশ্চিত তুমি তাই হবে যা তুমি হতে চাও।'

নিজের পরিবারের দিকে তাকালেন শাহজাহান, সবাই একসাথে বসে আছে। চোখ পড়ে গেল মমতাজের চোখে। ছোট্ট করে প্রায় না বোঝার মতই মাথা নাড়লেন মমতাজ—ইশারা করে বুঝালেন যে মধ্যরাতে নিজেদের মাঝে হওয়া বিষয়ে অবতারণা করতে।

'দারা শুকোহ্, তুহিন রায় পারস্যে তোমার কৌশলের প্রশংসা করেছে। নিজেকে একজন পুর্ণবয়স্ক মানুষ হিসেবে প্রমাণ করেছ তুমি, বালক হিসেবে নয়। এ ব্যাপারে তোমার মা একটি পরামর্শ দিয়েছেন যে কীভাবে এ সংবাদ পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করা যায়।'

'আপনি কী বলতে চান, জাহাপনা?' দারা শুকোহ্‌র পরিষ্কার পিঙ্গল বর্ণের চোখ ঘুরে তাকাল শাহজাহান থেকে মমতাজের দিকে।

'এখন তোমার সময় হয়েছে বিবাহ করার। তোমার মা এক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়েছে বধূ হিসেবে তোমার চাচাতো বোন নাদিরা হবে উপযুক্ত। তিনি খেয়াল করেছেন যে তুমি তাকে কতটা পছন্দ কর...

দারা শুকোহ্ লজ্জামাখা আনন্দের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেল যে মমতাজ সঠিক বলেছেন। একই ভাবে সবজান্তার হাসি ফুটে উঠল শাহ সুজা আর আওরঙ্গজেবের মুখেও। এখন পর্যন্ত যদিও তিনি এই সখ্যতার কথা জানাতেন না, খুশিই হলেন শাহজাহান। যদি কোন এক সময় রাজবংশের প্রয়োজনে দারাকে একাধিক পত্নীর পাণি গ্রহণ করতে হয়, সে ক্ষেত্রেও এটাই ভালো হবে যে প্রথম স্ত্রী এমন কেউ হোক যাকে সে ভালোবাসে। তিনি নিজেও দারার চেয়ে খুব বেশি বয়সী ছিলেন না, যখন তিনি মমতাজের সাথে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আর রাজবংশের জন্যও এ সম্বন্ধ উপযুক্ত। নাদিরা তাঁর সৎভাই মৃত পারভেজের কন্যা, কিন্তু অতিরিক্ত মদপান ও আফিম আসক্তির কারণে অল্প বয়সেই—মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে পারভেজ। সে সময়টাতে দ্বন্দ্বে

বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এ রাজবংশ। নাদিরা আর দারা শুকোহ্‌র এই মিলনে অতীতের কিছু ক্ষতে প্রলেপ তো অন্তত লাগবে আর বিশাল রাজকীয় পরিবারও বাঁধা পড়বে একসূত্রে। মেয়েটা সুন্দরীও—খাটো কিন্তু সুদর্শনা আর ইতিমধ্যে বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে দারার চঞ্চলতার বিপরীতে বিভিন্ন উপস্থিত বুদ্ধিরও পরিচয় দিয়েছে—যেখানে মমতাজ ঠিকই লক্ষ্য করেছেন তাদের পারস্পরিক আগ্রহ।

'তো দারা, তোমার কী মত?'

'নাদিরাকে বিবাহ করতে পারলে আমি খুশিই হবো।' কণ্ঠস্বরে আনন্দ আর অস্বস্তি নিয়ে উত্তর দিল দারা। শেষোক্ত অনুভূতি নির্ঘাত ভাইদের উসকানিমূলক কথাবার্তা শুনে।

'আমিও খুশি হয়েছি যে তুমি মত দিয়েছ। আমি এখন থেকেই পরিকল্পনা শুরু করে দিচ্ছি তোমার বিয়ে নিয়ে। এই শেষ কয়েক সপ্তাহে আমরা অপেক্ষা করছি তোমার ভাই অথবা ভগ্নির আগমনের জন্য।' নিজের স্ফীত মধ্যভাগের দিক তাকিয়ে উত্তর দিলেন মমতাজ।

কুশনে হেলান দিয়ে বসলেন শাহজাহান। এরই মাঝে কল্পনা করে ফেলেছেন কেমন হবে বিবাহ শোভাযাত্রা। বিজয়ীর বেশে আগ্রায় ফিরে যাবার সাথে সাথে শুরু হবে অনুষ্ঠান। এটি শুধুমাত্র প্রিয় পুত্র বা একজন রাজকীয় শাহজাদার বিবাহের চিহ্ন নয় বরঞ্চ তাঁর নিজের রাজত্বকালেরও সত্যিকারের সূচনা হবে। দক্ষিণের বিদ্রোহ প্রশমিত হলেই কেবলমাত্র তিনি নতুন অভিযানের মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারবেন।

'জাহাপনা! রায় সিং ত্রিশ মাইল দূরে পশ্চিম দিকে বিজাপুর সৈন্যদলের এক বিশাল অবস্থান জানতে পেরেছে। 'বার্তাবাহকের ঘামে ভেজা শরীর দেখেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে উঠল যে সে কতটা দ্রুতগতিতে বোরহানপুরে ছুটে এসেছে।

উত্তেজনা অনুভব করলেন শাহজাহান। অবশেষে এটাই হতে পারে সেই সুযোগ যার মাধ্যমে তাঁর শত্রুর উপর আঘাত হানা সম্ভব হবে। ঝড়ের গতিতে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিলেন সম্রাট।

'তরতাজা একটি ঘোড়া নিয়ে ফিরে যাও রায় সিংহের কাছে। জানাও যে আমি অশ্বারোহী দল আর কামান ও যন্ত্রপাতিসহ হাতির দল নিয়ে আসছি তার সাথে যোগ দিতে। কী বলেছ বিজাপুরের সৈন্যরা ত্রিশমাইল দূরে? যদি আমি ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে যাই তাহলে তিন ঘণ্টার মাঝে দেখা হবে রায় সিংয়ের সাথে।'

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে হেরেমের দিকে স্তেপায়ে ছুটতে ছুটতে আসলেন শাহজাহান। একজন শৃঙ্খল শত্রু যে কিনা কখনো এখানে আর কখনো সেখানে দেখা দিয়ে, আক্রমণ করে পালিয়ে যায়, তার সাথে খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

একটি টুলের উপর বসে আছেন মমতাজ আর লম্বা কেশরাজি আঁচড়ে দিচ্ছে সাত্তি আল-নিসা। কাছেই বসে মমতাজের প্রিয় পারস্যের কবি ফেরদৌসের কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে জাহানারা। দারা আর আওরঙ্গজেবের মতই বিদ্বান জাহানারা, ভাবলেন শাহজাহান।

'কী হয়েছে? আপনি এত উত্তেজিত?' হাত বাড়িয়ে জানতে চাইলেন মমতাজ।

'শুভ সংবাদ অবশেষে—অন্তত আমার তাই মনে হয়। আমার সৈন্যরা বিজাপুরের বড় একদল সৈন্যের দেখা পেয়েছে। যদি আমি দ্রুত এগোতে পারি তাহলে আমি যা আশা করছি সেই যুদ্ধের দেখা পাবো।'

হাসি মুছে গেল মমতাজের চেহারা থেকে। 'আপনি আবারো নিজের যাবার কথা বলছেন, তাই না?'

'আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। এটা এমন একটা সুযোগ যে অভিযানের ফলাফল আমাদের পক্ষেই আসবে, একে অবহেলা করা যাবে না।'

'আমিও আশা করছি তাই হবে...আমি নিশ্চিত। ভালো থাকবেন।'

'আমি কথা দিচ্ছি।' নিচু হয়ে পত্নীর উষ্ণ ঠোঁটে চুম্বন করলেন শাহজাহান আর মমতাজের অনুরোধে পেটের উপর হাত রেখে অনুভব করলেন নতুন প্রাণের স্পন্দন। আর এক মাসও বাকি নেই শিশুটির আগমনের। এর অনেক আগেই তিনি ফিরে আসবেন আর হয়ত অভিযানও শেষ হয়ে যাবে। মমতাজের কক্ষ থেকে প্রায় দৌড়ে যেতে যেতে ইতিমধ্যেই ভাবা শুরু করে দিলেন যুদ্ধের কথা।

তিন ঘণ্টা পরে শাহজাহান সৈন্য দলের প্রধান অংশের সাথে ছুটে এসে রায় সিংয়ের জায়গায় পৌঁছে তাকালেন নির্দেশিত দিকে। 'বিদ্রোহীরা ওই অংশে পাথুরে পাহাড়ের উপর পুরাতন দুর্গ দখল করে রেখেছে জাহাপনা।'

প্রায় আধা মাইল দূরে ছোট পাহাড়ের মাথায় ভেঙেপড়া মাটি ইটের তৈরি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখতে পেলেন সম্রাট। দেয়ালের কিছু কিছু অংশ একেবারেই ভেঙে গেছে। ছোট্ট দুর্গটা শত্রুর অশ্বারোহী আর পদাতিক সৈন্যদলের জন্য খুব বেশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে না, তিনি তাদের হটিয়ে ঢালুর দিকে নিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু পাহাড়ের মাথার জায়গাটা পরিষ্কারভাবে কিছু বাড়তি সুবিধা এনে দেবে। কয়েকজন বিদ্রোহী দেয়ালের অক্ষত অংশের পেছনে জায়গা নিয়েছে। অন্যরা প্রাণপণে চেষ্টা করছে পড়ে যাওয়া ইট আর সুড়কি তুলে ব্যারিকেডের ব্যবস্থা করতে।

'কতক্ষণ যাবত তারা আছে এখানে?' জানতে চাইলেন শাহজাহান।

'প্রথম আলো ফোটার সময়ে তাদের কয়েকজন চরের সাথে সংঘর্ষ হয়েছিল আমাদের। এরপর আমাদের উপস্থিতি পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে পাহাড়ের মাথার দিকে সরে যায় শত্রুরা।'

'আমি এটা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে তারা শুধুমাত্র পিছিয়ে আসেনি, গ্রামে লুকিয়ে আছে যেমনটা আগেও করেছিল।'

'আগে আমি যতটা জেনেছি তার চেয়েও পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা বেশি তাদের, এই মানুষেরা হেঁটে বেশিদূর যেতে পারেনি।'

'প্রায় কত হবে এখানে তাদের সংখ্যা?'

'দুই হাজার বা তা চেয়ে বেশি হবে না।'

'আমরা তাহলে তাদের চেয়ে সংখ্যায় কম। কিন্তু এটা খারাপ না...। ঢালুর উপরে আক্রমণ করলে তাদের চেয়ে আমাদেরকেই বেশি দেখা যাবে, তারা তো দেয়ালের পিছনে।' অশোক সিংয়ের দিকে ফিরে তাকালেন শাহজাহান।

'আমাদের অশ্বারোহী দিয়ে পাহাড় ঘিরে ফেলো। এরপর ছোট কামান নিয়ে যুদ্ধহাতি পৌঁছালেই আমরা অগ্রসর হব। দেরি করার কোন মানে হয় না।'

যতটা শাহজাহান ভেবেছিলেন তার চেয়েও দেরিতে পৌঁছালো হাতির দল। এই সময়ের মাঝে বিদ্রোহীরা ক্লান্তিহীন হাত দিয়ে কাজ করার পাশাপাশি ঝুড়ি আর শাবল ব্যবহার করে দুর্গ নির্মাণ কাজ করে চলল। স্বস্তি পাচ্ছেন না সম্রাট। আদেশ দিলেন বন্দুকধারীদের ছোট দলটাকে পাহাড়ের পাশে জড়ো হতে। পিঠে বন্দুকের পাশাপাশি পানির বোতল আর বাড়তি গুলি বহন করে শত্রু রেঞ্জের ঠিক বাইরে পাথুরে কিনারের পিছনে গিয়ে অবস্থান নিল মোগল সৈন্যরা, যেন যুদ্ধ শুরু হলে তারাও তাড়াতাড়ি অংশ নিতে পারে।

হাতিরা এসে পৌঁছানোর পর বারুদ আর গোলার বল দিয়ে প্রস্তুত করা হল কামান, মধ্যাহ্নের গরমে ঘামতে ঘামতে ব্যারেল গুলি ছোড়ার উপযুক্ত হতেই শাহজাহান আগে বাড়ার আদেশ দিলেন। দৃঢ় পদক্ষেপে, ধীরে ধীরে তাই করল সকলে। হাতিদের ভারী শরীরের নিরাপদ বেষ্টনীর মাঝে পিছনে দৌড়ে এগোতে লাগল বন্দুকধারী, তীরন্দাজ আর পদাতিক সৈন্যের দল। গুপ্তচর মারফত শাহজাহান সংবাদ পেয়েছেন যে বিদ্রোহীদের কাছে এমন কী ছোট কোন কামানও নেই। তার পরেও ভয়ে ভয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন যে কখন আবার পাহাড়ের দিক থেকে ধেয়ে আসে গর্জন সহ সাদা ধোঁয়া, দেখা যাবে আবারো তিনি বোকা হয়েছেন শত্রুর শক্তি আর ধূর্ততার কাছে। কিন্তু কিছুই হল না।

এখন, তাঁর অগ্রসরমান হাতির দল ঢালুর দিকে প্রায় অর্ধেক পথ এগিয়ে গেছে আর গোলন্দাজেরা তাদের ছোট্ট কামান প্রস্তুত করে ফেলেছে। কামানের গোলা গিয়ে আঘাত করায় দুর্গের দেয়ালের লম্বা একটি অংশ খসে পড়তে দেখলেন শাহজাহান। এর পেছনে আশ্রয় নেয়া শত্রুদলের কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য বেরিয়ে এলো ধুলার মধ্যে। কিন্তু সম্রাট নিশ্চিত যে বাকিরা নির্ঘাত চাপা পড়েছে ইট-সুড়কির নিচে। এখন পর্যন্ত বিজাপুরের দিক থেকে পাল্টা কামানের শব্দ পাওয়া যায়নি। তার মানে গুপ্তচর সঠিক সংবাদই দিয়েছে তাদের কাছে কামান নেই, স্বস্তির সাথে ভাবলেন শাহজাহান। ভালোই বিপর্যয় নেমে এসেছে শত্রু বাহিনীর উপর। এখন সময় হয়েছে প্রধান সৈন্য বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার।

তলোয়ার নিয়ে আক্রমণের জন্য ইশারা করেই ঘোড়া ছোটালেন সামনের দিকে। সম্রাট ও তাঁর দেহরক্ষীদের আগে বাড়তে দেখে পাহাড়ের

চারপাশে ছড়িয়ে থাকা সৈন্যরাও দুর্গের দিকে এগিয়ে এলো। সবুজ ব্যানার উড়তে লাগল।

ছড়িয়ে থাকা পাথর এগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধহাতি নিয়ে পৌঁছে গেলেন শাহজাহান। হঠাৎ করেই এগুলোর মাঝে একটি পিঠের উপর তিনজন বন্দুকধারী ও ছোট্ট কামান সহ—লাল রঙে রাঙানো শুড় তুলে ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। শত্রু দলের ভাগ্যবান গুলি এসে লোহার পাতে মোড়া দেহবর্মের বাইরে ঠিক ডান চোখে আঘাত হেনেছে। গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল বাঁকানো দাঁতের উপর, ঘুরে গিয়ে আস্তে করে মাটিতে পড়ে গেল বিশালদেহী প্রাণীটা—সাথে পড়ে গেল ব্রোঞ্জের কামান আর বন্দুকধারী সবাই। আর এ সবকিছুই পড়ে গেল শাহজাহানের ডান পাশে ছুটতে থাকা দেহরক্ষীর পথের উপর। সাথে সাথে ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আরোহী সৈন্যটার পা আটকে গেল বড় একটা পাথরের মাঝে।

যুদ্ধের অন্য সব শব্দ ছাপিয়ে আহত সৈন্যের আর্তনাদ শুনতে পেলেন সম্রাট। একই সাথে নিজের বাম গোড়ালিতেও তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন, পাশের দিকে হেলে আরেকটু হলে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর নিজের ঘোড়াও। পড়ে থাকা ঘোড়া লাথি দিয়েছে তাঁদের উপর। গোড়ালির ব্যথা তীব্র হলেও ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু কিছু সময়ের জন্য এতে করে পাহাড়ের দিকে এগোতে থাকা তাঁর অশ্বারোহী দলের পথ রুদ্ধ করে ফেলায় গতি কমে গেল তাদের। ঠিক যখন নিজের ঘোড়াকে সামলে নিলেন, শাহজাহান দেখতে পেলেন দুর্গের দিক থেকে ছুটে আসছে অন্তত ত্রিশ জনের শত্রু বাহিনী। দূরত্ব খুব বেশি হলে তিনশ গজ। এদিকে গজিয়ে ওঠা সমস্যার সুযোগ নিতেই ছুটে আসছে তারা।

যুদ্ধহাতির উপর থেকে বন্দুকধারীরা গুলি করে দু'জন শত্রু অশ্বারোহীকে ফেলে দিল ঘোড়ার পিঠ থেকে, ঢালুর সুবিধা নিয়ে বাকিরা এসে চড়াও হল সম্রাটের বাহিনীর উপর। দাড়িওয়ালা এক অশ্বারোহী বন্যভাবে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে এসে বর্শা ছুড়ে মারলো হাতির গাল লক্ষ্য করে। তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়ে পাহাড়ে হারিয়ে গেল বর্শাটা। তবে তার আগে আঘাত করে গেল পথিমধ্যে পড়া কয়েকজন

পদাতিক সৈন্যকে। আরেকজন বিদ্রোহী অশ্বারোহী শাহজাহানের এক দেহরক্ষীর ধূসর ঘোড়ার বুকে আঘাত করল লম্বা বর্শা দিয়ে, প্রায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করল অবোধ জীবটা। তৃতীয়জন নিজের ঘোড়ার পিঠে বসেই গেঁথে ফেললো শাহজাহানের এক তরুণ কর্চিকে। এটা ছিল বেচারার প্রথম যুদ্ধ—নিঃসন্দেহে এটিই শেষ।

নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে সম্রাট এগিয়ে গেলেন আক্রমণকারীর দিকে, যে কিনা ব্যস্ত আহত তরুণের বুক থেকে নিজের বর্শা টেনে বের করবার কাজে। মাটিতে শুয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে তরুণ কর্চি। সময় মত শাহজাহানের দিকে ফিরে তাকাতে পারল না শত্রুসৈন্য, সম্রাটের তলোয়ার কঠিনভাবে আঘাত করল তার হাঁটুর উপরে, পড়ে গেল লোকটা আর হাতের বর্শা পড়ে গেল মৃতপ্রায় কর্চির দেহের পাশে। বিদ্রোহীদের ভার অন্যদের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি আক্রমণ করলেন আরেকজন শত্রু সৈন্যের উপর; মনোযোগ দিয়ে রাজকীয় বন্দুকধারীর গলা কেটে ফেলতে উদ্যত লোকটা টেরও পেল না কখন এগিয়ে এলেন সম্রাট যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুভব করল যে আঘাত লেগে কেটে গেছে নিজের মাথার খুলি। ঘোড়ার পিঠে বসে মাথা ঘুরিয়ে সম্রাট দেখলেন বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করে তাঁর সৈন্যরা এগিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। গোড়ালিতে প্রচণ্ড ব্যথা সত্ত্বেও সামনের দিকে ছুটলেন নিজের ঘোড়া নিয়ে।

ঝোপঝাড় দিয়ে বানানো ব্যারিকেডের একটি পার হল তাঁর ঘোড়া, এমন সময় আরো একবার তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন শাহজাহান। এবার বাম কাঁধে। কাঁধে লাগার আগে একটা উড়ন্ত গুলি এসে ধাক্কা খেয়েছে তাঁর বুকের বর্মের কিনারে। দ্বিতীয় গুলির বলটা পার হয়ে গেল মাথার কাছে দিয়ে হিসহিস শব্দ করে। এরপরই কয়েকটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে মরিয়া হয়ে পুনরায় গুলি ভরার কাজে ব্যস্ত থাকা শত্রুসৈন্যদের উপর চড়াও হলেন শাহজাহান। একজন বন্দুকের লম্বা ব্যারেল ঘুরিয়ে চেষ্টা করল ধাক্কা দিয়ে সম্রাটকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিতে। কিন্তু শাহজাহানের তলোয়ার কেটে ফেলল লোকটার গাল, উন্মুক্ত হয়ে পড়ল দাঁতের সারি, পড়ে গেল সৈন্যটা। মিনিটখানেকের ভেতরে দুর্গের দেয়ালের ভেতরে ঢুকে পড়লেন মোগল সম্রাট ও সৈন্যের দল। সমানে

কচুকাটা করতে লাগল বিজাপুরের সৈন্যদের, এরা আবার মরিয়া হয়ে পালাতে লাগল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। একটু পরেই কয়েকজন বিদ্রোহী নিজেদের তলোয়ার ফেলে দিয়ে ভূমিবনত হল দয়া ভিক্ষার জন্য। অন্যরা বেশির ভাগই অশ্বারোহী, চেষ্টা করল পালাতে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হল সম্রাটের অশ্বারোহী বা বন্দুকধারীদের বদৌলতে। একজন শত্রু অশ্বারোহী সাদা আলখাল্লা পরিহিত বিশালদেহী একজন নিজের ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেও পা জড়িয়ে ফেললো পাদানিতে, ফলে ঘোড়াটা নিজের আরোহীকে নিয়েই ছুটে গেল পাহাড়ের নিচের দিকে। পাথর থেকে পাথরে ধাক্কা খেয়ে মাংসের দলাতে পরিণত হল চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথা। আরেকজন শত্রুসৈন্য, পোশাক দেখে বোঝা গেল একজন সেনাপতি, বেকায়দাভাবে হাত ঝুলতে থাকা অবস্থায় ভূপাতিত হল মাটিতে। শাহজাহানের পাশ থেকে এগুলি ছুড়ছে একজন বন্দুকধারী, না হলেও দুইশ গজ অতিক্রম করে গুলি আঘাত হেনেছে শত্রুসৈন্যকে। ফিরে তাকিয়ে নিজ সৈন্যকে অভিবাদন জানালেন শাহজাহান, প্রতিজ্ঞা করলেন এ দক্ষতার জন্য পুরস্কৃতও করা হবে তাকে, ঠিক সে সময় পাহাড়ের উপর থেকে দেখতে পেলেন নিচে বোরহানপুরের দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একদল অশ্বারোহী।

একটুক্ষণ দ্বিধা করলেন শাহজাহান। যুদ্ধ জেতা হয়ে গেছে আর তিনি এটাও জানতে আগ্রহী যে কারা এরা।

নিজের দেহরক্ষীদের ডেকে অনুসরণ করতে বলে নিজের ঘোড়া ছোটালেন সম্রাট। পাহাড়ের নিচে নেমে গাছের সারির কাছে অপেক্ষারত অশ্বারোহীর দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেলেন ছয়জন মানুষ—পাঁচজন সৈন্য ও সবুজ আলখাল্লা পরিহিত সাদা বেশধারী একজন। মাথা ঘুরাতেই সম্রাট চিনতে পারলেন আসলান বেগকে। কী এমন ঘটেছে যে তাঁর বয়স্ক পরিচারক বোরহানপুর থেকে যুদ্ধের মাঠে ছুটে এলো?

নিজের ক্লান্ত ঘোড়াকে আরো জোরে ছুটিয়ে নিলেন শাহজাহান, কান নেড়ে অভিযোগ জানালো জন্তুটা। নিজের রক্ষীদের ফেলে মানুষের ছোট্ট দলটার কাছে এগিয়ে গেলেন সম্রাট। জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে? কী ব্যাপার?'

'জাহাপনা!' সময়ের আগেই সম্রাজ্ঞীর প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। শাহজাদি জাহানারা আমাকে পাঠিয়েছেন সংবাদ জানাতে...আমি অনুভব করেছি যে এটা আমার দায়িত্ব, তাই নিজেই এসেছি...' বৃদ্ধ মানুষটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই কঠিন পরিশ্রমে ও ভ্রমণে নিশ্চয় তার সব শক্তি শেষ হয়ে গেছে।

হঠাৎ করেই পাকস্থলী থেকে মনে হল ঠাণ্ডা স্রোত বের হতে লাগল। জাহানারা কেন এত তাগাদা দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছে? যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে কী তারা তাঁর ফেরার জন্য জন্ম সংবাদ রেখে দিতে পারেনি? 'সম্রাজ্ঞী কেমন আছেন?' জানতে চাইলেন শাহজাহান।

'আমি জানি না। যখন আমি এসেছি, হাকিমেরা ওনার সাথেই ছিল... আমি তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য অপেক্ষা করিনি। আপনার কন্যা জোর করছিলেন যেন কোন সময় নষ্ট না করা হয়।'

দ্বিধায় পড়ে গেলেন শাহজাহান। পুরো ইচ্ছেশক্তি দিয়ে চাইছেন বোরহানপুরে ছুটে যেতে; কিন্তু এত কষ্টে অর্জিত জয়ের সম্ভাবনা কেউ হেলায় নষ্ট করতে পারেন না। দ্রুত চিন্তা করে নিয়ে দেহরক্ষীদের দলনেতার দিকে তাকালেন।

'অশোক সিং'কে জানাও যে, এখানকার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হল। তার প্রতি আমার আদেশ হল যে যতদূর সম্ভব বিজাপুরদের ধাওয়া করতে; কিন্তু কোন ঝুঁকি নিয়ে নয়। এই দুর্গের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে বাকি সৈন্যদেরকে নিয়ে যেন বোরহানপুরে ফিরে আসে। আর দ্রুত আমার জন্য নতুন একটি ঘোড়া নিয়ে এসো।'

নিজের ঘোড়াকে আরো জোরে ছোটার তাগিদ দিয়ে অস্পষ্ট দিগন্তের দিকে চোখ আটকে রাখলেন সম্রাট। ইচ্ছে হচ্ছে বোরহানপুরে কী ঘটছে তা যদি এখান থেকেই দেখা যেত, যদিও তিনি জানেন যে অনেক মাইলের ব্যবধান উভয়ের মাঝে। আহত বাম গোড়ালিও বেশ ব্যথা করছে, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন পায়ের কাছের কাপড় ভিজে গেছে রক্তে। নিজের না শত্রুর নিশ্চিত হতে পারলেন না—কিন্তু যুদ্ধের স্মৃতি এরই মাঝে মুছে যেতে শুরু করেছে মন থেকে। সমগ্র ভাবনা জুড়ে শুধুই মমতাজ ও কখন তাঁর সাথে দেখা করবেন তাতে ব্যগ্র

হয়ে আছেন শাহজাহান। অন্তত এ সংবাদটুকু মমতাজকে স্বস্তি দেবে যে তিনি যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরে এসেছেন।

অবশেষে আবছা আলোয় সামনে দেখতে পেলেন তাপ্তি নদী। আর এর উত্তর দিকে দেখা গেল চৌকোনা টাওয়ার সেখানে রয়েছে মমতাজের আবাস।

ঘোড়া ছুটিয়ে নিচে তীরের দিকে নেমে গেলেন তিনি, এরপর অগভীর কাদা পানির মধ্য দিয়ে হাতিমহলের প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে গেলেন; এই পথে প্রতি সন্ধ্যায় হাতিদেরকে তাদের খোয়াড় থেকে বের করে নদীতে আনা হয় গোসল আর পানি পান করতে। সাধারণত এই পথে তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন না, কিন্তু এটিই দ্রুততম পথ।

হাতিমহলের বাইরের আঙিনাতে সম্রাটকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল প্রহরী। ঘোড়া থেকে নেমে গোড়ালির ব্যথা সত্ত্বেও অর্ধেক দৌড়ানো আর অর্ধেক খোঁড়ানোর ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন দুর্গের প্রাণকেন্দ্রে থাকা হারেমে। যত দ্রুত সম্ভব সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। এরপর কোনমতে বুকের বর্ম খুলেই হারেমের প্রবেশমুখে অপেক্ষমান সেবাদাসীর হাতে ছুড়ে দিলেন। সাধারণ সময় হলে রক্ত ধুয়ে যুদ্ধের ঘাম মুছে পরিষ্কার হয়ে তবেই যেতেন; কিন্তু এখন যেভাবে আছেন সেভাবেই ছুটলেন মমতাজের কাছে।

এত হঠাৎ করে তিনি এসেছেন যে সাধারণত সম্রাটের আগমনবার্তা যেভাবে ধ্বনিত হয়, তর জন্যে সময় পাওয়া যায়নি। জাহানারা মাতার কক্ষের অর্ধখোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের মেঝেতে পিতার পদশব্দ শুনতে পেয়ে মাথা তুললে পর শাহজাহান দেখতে পেলেন পানি পড়ছে তার চোখ বেয়ে।

'জাহানার' কী হয়েছে? কী ঘটেছে?'

'নতুন শিশু কিছুতেই আসছে না। গত তিন ঘণ্টা ধরে মা এই যন্ত্রণা ভোগ করছেন। কিছুই সাহায্য করতে পারছে না। আমি চেষ্টা করেছিলাম শান্ত করতে কিন্তু তিনি শুধু আপনাকে দেখতে চেয়েছেন...' জাহানারা কথা শেষ করার আগেই দীর্ঘ চিৎকার শোনা গেল; মানুষ নয় মনে হল কোন পশু চিৎকার করে উঠল। এতটা ভয় পেয়ে গেলেন শাহজাহান যা

তিনি কখনো যুদ্ধক্ষেত্রেও অনুভব করেননি। সামনে পা বাড়িয়ে পুরো দরজা খুলে ভেতরে তাকালেন।

নিচু একটি বিছানায় শুয়ে আছেন মমতাজ, হাঁটু তোলা অবস্থায় পিঠ দিয়ে শুয়ে দুই হাতে শক্ত করে ধরে আছেন বিছানার পাশ। সাদা চাদর ভরে গেছে ঘামে। লম্বা চুলের রাশি লেপ্টে আছে ব্যথাতুর মুখের সাথে, চিবুক তুলে আবারো চিৎকার করে উঠলেন তিনি। সাত্তি আল-নিসা হাত ধরে রেখে চেষ্টা করছে শান্ত করতে, কিন্তু মমতাজ এত বন্যভাবে সরিয়ে দিচ্ছে যে সাত্তি আল-নিসা ধরে রাখতে পারছে না। দু'জন হাকিম, একজন বয়স্ক, আরেকজন কম বয়সী, দাঁড়িয়ে আছে কক্ষের এক কোণায়।

কয়লার উনুনের উপর তামার পাত্রে বুদবুদ তুলে কড়া গন্ধওয়ালা কিছু একটা ফুটছে।

'ওনাকে ছেড়ে দিন জনাবা। ওষুধ প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে, ব্যথা কমাতে সাহায্য করবে।' হাকিমদের একজন বলে উঠল।

চোখ তুলে দরজার কাছে শাহজাহানকে দেখতে পেল সাত্তি আল-নিসা। তার মুখে একই অসহায় অভিব্যক্তি দেখতে পেলেন সম্রাট, যা তিনি দেখেছিলেন কন্যার মুখে।

উঠে দাঁড়িয়ে একপাশে সরে গেল সাত্তি আল-নিসা। ধীরে ধীরে শাহজাহান এগিয়ে গেলেন বিছানার কাছে। কোন একভাবে মমতাজ বুঝতে পারল যে তিনি এসেছেন, মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই আরো একবার প্রসব ব্যথা এসে নাড়িয়ে দিল। তবে এবার তিনি চিৎকার করলেন না, শাহজাহানকে পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখে হাসলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'আপনি এসেছেন।'

'অবশ্যই। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

'না। বাচ্চাটা আসবে না... আমি অনেক চেষ্টা করেছি...আমি চাই না ও আমার ভেতরে মৃত্যুবরণ করুক।'

'যখন প্রস্তুত তখন এসে যাবে... শান্ত হও।'

'হাকিমেরাও এটাই বলছে, কিন্তু আমি পারছি না। ব্যথা আর চাপে মনে হচ্ছে আমার শরীর ছিঁড়ে যাবে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।'

'জাহাপনা। বয়স্ক হাকিম এসে শাহজাহানের পাশে দাঁড়ালো। হাতে একটি কাপ। 'এই ওষুধ ব্যথা কমিয়ে দেবে।'

'আমাকে দাও।' বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে শাহজাহান কাপটা ধরলেন মমতাজের মুখের কাছে।

'খেয়ে নাও...' প্রথম দিকে হলুদ রঙের তরল চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়লেও শেষপর্যন্ত খানিকটা খেয়ে নিলেন মমতাজ।

'এতে যন্ত্রণা প্রশমিত হবে জাহাপনা। ভেতরে দানা বাঁধা চিন্তা কমে যাবে। ষোল ঘণ্টা চলছে যে প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। তিনি প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়েছেন। কয়েক মিনিটের মাঝে নিস্তেজ হয়ে পড়বেন।'

জানালো হাকিম। কিন্তু মনে হল যেন তাকে ভুল প্রমাণিত করতেই আবারো চিৎকার করে উঠলেন মমতাজ। ব্যথার ভারে ঝটকা দিয়ে শাহজাহানের হাতের কাপ ফেলে দিলেন, সবটুকু তরল গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।' ও আসছে।' নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, আল্লাহ্ ও আসছে অবশেষে...' এত জোরে শাহজাহানের ডান হাত চেপে ধরলেন যে নখ ঢুকে গেল মাংসের ভেতরে।

'ওর ব্যথা আমাকে দাও। আমাকে বহন করতে দাও এ যাতনা।' আপন মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন শাহজাহান।

হঠাৎ করেই মমতাজ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে উঠে বসার মত ভঙ্গি করলেন। চাদরের নিচে হাঁটু উঠে গেল দুই ভাঁজ হয়ে। এরপর ঝট করে মাথা নামিয়ে দিলেন পেছন দিকে। কিন্তু এবারের চিৎকারে হতাশা নয় বিজয়ের সুর ভেসে এলো। পরমুহূর্তেই শিশুর কান্না শুনতে পেলেন শাহজাহান।

'জাহাপনা, দেখুন, অনিন্দ্যসুনদর কন্যাশিশু।' সাত্তি আল-নিসা এক টুকরো সবুজ লিনেন কাপড়ে মোড়ানো পুঁটুলি ধরে রেখেছে হাতে মোগল রাজবংশের নতুন আগত অতিথির উপযুক্ত এই কাপড়।

অবসন্নভাবে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্তভাবে তাকালেন শিশুর দিকে; কিন্তু তাঁর সব চিন্তা মমতাজকে ঘিরে। 'আমি জানতাম যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে...' শুরু করলেন শাহজাহান। কিন্তু আবারো পত্নীর দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন মমতাজের চেহারায় আনন্দ নয় আতঙ্কের চিহ্ন। বুঝতে পারলেন যে চাদর, বস্তুত পুরো বিছানাই লাল বর্ণ ধারণ করেছে রক্তে। হাকিমদের বিস্মিত আর ত্রাস মেশানো চিৎকার ছাড়াও তিনি বুঝতে পারলেন যে এই রক্ত সন্তান জন্মদান জনিত নয়।

একপাশে সরে গিয়ে হাকিমদেরকে কাজ করার সুযোগ দিলেন সম্রাট। এদিকে সাত্তি আল-নিসা শিশুকে আরেকজনে দাসীর হাতে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসল তুলার কাপড়, হাকিমেরা যা দিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে মমতাজ, শরীর একেবারে স্থির। পার হতে লাগল মিনিটের পর মিনিট। শাহজাহানের মনে হল হাকিমেরা কিছুই করছে না, শুধু মমতাজের ভেতর থেকে বের হওয়া রক্তের ধারা মুছে চলেছে। তামার বেসিন যেখানে তারা কাপড় ধুচ্ছে, সেখান থেকে উপচে পানি পড়ে পড়ে লাল হয়ে গেছে পুরো মেঝে।

'নিশ্চয় কিছু করার আছে।' বলে উঠলেন সম্রাট, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর পেলেন না। শুধুমাত্র মাথা নেড়ে নিজেদের মাঝে কথা বলতে লাগল দুই চিকিৎসক।

'আমাদেরকে একা থাকতে দাও!' হঠাৎ করেই পরিষ্কার কণ্ঠে তীক্ষ্ণভাবে বলে উঠলেন মমতাজ।

'আমি কিছুক্ষণ আমার স্বামীর সাথে একাকী থাকতে চাই। যাও... এখনি যাও...!' বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে এভাবে আদেশ দিতে আর কখনো মমতাজকে শোনেননি শাহজাহান।

হাকিম দুজন আর সাত্তি আল-নিসা তাকাল তাঁর দিকে। 'সম্রাজ্ঞীর আদেশ পালন কর, কিন্তু কাছাকাছি থাকো যেন তলব করলেই আসতে পারো।' নির্দেশ দিলেন সম্রাট।

'মমতাজ...' একাকী হতেই কথা বলে উঠলেন তিনি।

'না, আমাকে বলতে দিন। রক্তের সাথে সাথে আমার জীবনও আমার হাত ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি মারা যাচ্ছি...আমি জানি। কেউ কিছুই করতে পারবে না। শেষ এই মূল্যবান সময়গুলো আমি আপনার সাথে কাটাতে চাই। আমাকে শক্ত করে ধরে রাখুন...আপনার হৃদয়ের স্পন্দন আমাকে অনুভব করতে দিন।'

আবারো হাঁটু গেড়ে বসে হাত দিয়ে পাজাকোলা করে পত্নীকে ধরে রাখলেন শাহজাহান।

'তুমি খুব সুন্দর একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছো আর শীঘ্রই সুস্থ... হাকিমেরা রক্তপাত বন্ধ করে দেবে...'

'না, আমার হৃদয় বলছে যে তা হবে না। আমার কথা শোনেন... একসাথে আর বেশিক্ষণ থাকতে পারব না আমরা। চেতনা পরিষ্কার থাকতে থাকতে আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই আমি...'

'যা খুশি বলো।'

'দয়া করে আর বিবাহ করবেন না...যদি আপনি অন্য নারীর সাথে আরো ছেলেমেয়ের জনক হন তাহলে তা আমাদের পুত্রদের জন্য ঝুঁকির কারণ হবে। এটা ঘটতে দেয়া যাবে না...সৎভাইদের মাঝে বিবাদ দুঃখ ছাড়া আর কিছু ডেকে আনে না। আমরা উভয়েই এটা জানি।'

'আমি আর কাউকে বিবাহ করব না। তুমিই আমার সব...সবকিছু।'

'আমি অনেক স্বস্তি পেলাম—জানতে পারলাম যে আমি সব সহ্য করতে পারব, এমনকি আপনাকে ছেড়ে যাওয়াও। কিন্তু আরো কিছু আছে যা আপনাকে অনুনয় করতে চাই। স্বপ্নে আমি সাদা মার্বেলের সমাধি দেখেছি...বিশাল বড় একটা মুক্তোর মতই উজ্জ্বল...এরকম একটি স্থান নির্মাণ করেন যেখানে আপনি আর আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাকে স্মরণ করতে আসতে পারবে।'

'সমাধির কথা বলো না। আরো অনেক বছর আমরা একসাথে থাকব।' এত জোরে স্ত্রীকে আগলে ধরলেন সম্রাট যেন তাঁর ভেতরে বয়ে যাওয়া জীবনীশক্তি মমতাজের মাঝেও শক্তি সঞ্চার করবে।

'দয়া করে...আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেন...আপনাকে করতেই হবে। তাহলে আমি শান্তিতে যেতে পারবো—যা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'যখন সময় আসবে আমি পৃথিবীতে তোমার জন্য স্বর্গ নির্মাণ করে দেব। কোন কিছু চিন্তা করব না, অর্থ, প্রচেষ্টা কিছুই না। পৃথিবীর কাছে এটি এমন একটি মার্বেল হবে, যা এর ক্রুটিহীন সৌন্দর্যই নয় বরঞ্চ মানুষ এটিকে জানবে ক্রুটিহীন ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে।'

শুনতে পেলেন মমতাজ—গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললেন। যেন কথাগুলো তাঁকে প্রশান্তি এনে দিয়েছে। কয়েক মিনিটের জন্য চুপচাপ একে অন্যকে ধরে রইলেন দু'জনে, এরপর ফিসফিস করে মমতাজ বলে উঠলেন,

'কখনো আক্ষেপ করবেন না, আপনি, দারা, জাহানারা অথবা আমাদের কোন সন্তানও না...আমার মত করেই ভালোবেসে তাদেরকেও...তাদের

সামনে এখনো অনেক কিছু পড়ে আছে। যেমনটা আমি একদা করেছিলাম, প্রথম রাতে যখন আপনাকে দেখেছিলাম মিনা বাজারে। সেই রাতের কথা মনে আছে? গাছের গায়ে লণ্ঠন ঝুলছিল, আমার দোকানে এসেছিলেন আপনি। দরদাম জানতেন না ভালো...শাহজাহান, আসছে বছরগুলোতে স্মরণ করবেন আমি আপনাকে কতটা ভালোবাসতাম—অন্যকে যতটুকু ভালোবাসা যায় তার চেয়েও বেশি—'

'আর আমিও তোমাকে ভালোবাসি...আর এই কারণেই আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না তুমি...'

'আমার ভাগ্য লেখা হয়ে গেছে। এর বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই আমার। উঠে দাঁড়ান, শেষবারের মত আপনাকে দেখতে দিন...'

মনে হল যেন স্বপ্নের ঘোরে মমতাজকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শাহজাহান। মমতাজের ফ্যাকাশে মুখে এমন বেদনার্ত একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে যে অশ্রুমাখা চোখে শব্দ খুঁজে পেতে চেষ্টা করছেন শাহজাহান। সব শক্তি যেন শুষে নেয়া হয়েছে তাঁর শরীর থেকে, 'মমতাজ...' শুধু এটুকুই বলতে পারলেন সম্রাট। হাঁটু গেড়ে আবারো জড়িয়ে ধরলেন পত্নীকে।

কমনীয় চোখ জোড়ার উপর ইতিমধ্যেই নেমে এসেছে একটা ছায়া। রণক্ষেত্রে বহুবার এ চাহনি তিনি দেখেছেন শত্রু কিংবা বন্ধুর চোখে যখন আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় হয়। 'আমাকে ভুলে যাবেন না...' মাথা পিছনে ফেলে দেয়ার আগে ফিসফিস করে জানালেন মমতাজ। ছোট্ট রক্তমাখা আকৃতিটার দিকে তাকিয়ে শাহজাহানের মনে হল এখনো কথাগুলো বাতাসে ভাসছে, যদিও ভালোবাসার নারী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন চিরতরে।

অধ্যায়-০৫

বার্নিশ করা রুপার আয়নাতে যে চেহারা দেখা গেল তা কোন এক আগন্তুকের। কৃশকায় অবয়বের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শাহ্‌জাহান, চোখের নিচে ফোলা, টুপির নিচ থেকে এলোমেলো যে কেশরাজি দেখা যাচ্ছে সেগুলোও কালো হবার কথা ছিল—এমন রুপালি সাদা তো নয়! আয়নাতে নিশ্চয় কোন সমস্যা আছে। পাথরের থামের উপর ছুড়ে ফেলে দিলেন আয়না। তাকিয়ে দেখলেন কার্পেটময় ছড়িয়ে পড়ল ফ্রেমে লাগানো মুক্তাদানা। যাই হোক, তাঁকে কেমন দেখাচ্ছে তাতে আর কী বা যায় আসে—তিনি খেলেন না বা পান করলেন কী করলেন না...আরেকটা সূর্যোদয় দেখলেন কী দেখলেন না? মমতাজ বিনা জীবনই বা কী আছে বাকি আর।

কক্ষের জোড়া দরজা ভেদ করেও শুনতে পেলেন বাইরের ফিসফিস আওয়াজ। ক্ষেপে গেলেন সম্রাট। আদেশ দিয়েছেন যেন তাঁকে বিরক্ত করা না হয়...এমনকি পুত্র-কন্যারাও আসতে পারবে না। গত পাঁচ দিন যাবৎ কেউ যদিও কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না তাঁর এই বেদনার্ত অবস্থায়; তারপরেও যখন তখন পদশব্দ সহ কানা-ঘুষা, তর্ক-বিতর্ক শুনতে পাচ্ছেন যে সম্রাট আর কতক্ষণ এভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবেন। তিনি নিজেই নিজেকে চিনতে পারছেন না। সম্ভবত চিরতরে...দরবারের কাজ আবারো শুরু করা তো অচিন্ত্যনীয়। কীভাবে তিনি মিষ্ট ভাষণের পেছনে স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খা মেটানোর জন্য সভাসদদের আর্তি শুনবেন অথবা তুচ্ছ বিষয়ের বিবাদ মেটানোর ব্যাপারে

সিদ্ধান্ত নিবেন যখন তাঁর সমগ্র সত্তাই হয়ে পড়েছে শূন্য আর অনুভূতিহীন?

মমতাজের মৃত্যুর পর প্রথম কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থবিরের মত হয়ে পড়েছিলেন শাহজাহান। চলে গিয়েছিলেন শোক আর আতঙ্কের উর্ধ্বে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন সাত্তি আল-নিসা মোলায়েমভাবে কর্পূর মেশানো পানি দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে মমতাজের শরীর, আইভরি চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে লম্বা কেশ, এরপর পরিয়ে দিয়েছে সাদাসিধে কাপড়। আর পুরোটা সময় অশ্রু গড়িয়েছে সাত্তি আল-নিসার নিজের গাল বেয়ে। তার কাজ শেষ হবার পর, পবিত্র কোরান থেকে মৃতের উদ্দেশে প্রার্থনা আয়াত উচ্চারণ করলেন ইমামেরা; এরপর একে একে সবাই মৃতের কক্ষ ছেড়ে গেল শাহজাহান যেন অন্তিম বিদায় জানাতে পারেন প্রিয়তমা পত্নীকে। ইতিমধ্যেই শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁটে যখন চুমু খেলেন তিনি, এক মুহূর্তের জন্য হাত চেপে বসল কাপড়ের ভাঁজে থাকা ছুরির উপর, প্রচণ্ডভাবে মন চাইল নিজের জীবনও শেষ করে দিয়ে মমতাজের সাথে বেহেশতের পথে যাত্রা করার।

আর এখন মমতাজ প্রথানুযায়ী নারীদের শব আচ্ছাদনের জন্য পাঁচ টুকরা সাদা কাপড় জড়িয়ে শুয়ে আছে তাঁর অস্থায়ী সমাধিতে। তাপ্তি নদীর অপর পাড়ে পুরাতন মোগল বিনোদন ভূমির দেয়ালের মাঝে জায়নাবাদ বাগান—উত্তর দিকে মাথা দিয়ে মক্কামুখী করে শোয়ানো হয়েছে মমতাজকে। একেবারে সাধারণ পোশাকে, কোন রত্ন ধারণ ছাড়াই শব শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছেন শাহজাহান। এমনকি পেছনে অনুসরণ করে আসা হাতির পিঠে সন্তানেরা কিংবা সভাসদদের সম্পর্কেও অসচেতন ছিলেন। একটা মাত্র বাদ্যের হালকা বাজনা তাল সঙ্গত করেছে এ শ্রদ্ধাবিনীত শেষযাত্রায়।

গরাদহীন জানালার কাছে গিয়ে তাপ্তি নদীর ওপাড়ে তাকালেন। কল্পনার চোখে দেখতে পেলেন প্রথম প্রভাতের মুক্তার ন্যায় আলোর মাঝে জ্বলছে হাজারো মোমবাতির উজ্জ্বল শিখা। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন মমতাজের সমাধি সবসময় আলোকিত থাকে হাজার মোমবাতির আলোয়। হঠাৎ করেই মাথা ঘুরে উঠল। পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচতে সামলে নিলেন মার্বেল টেলিলের কিনার ধরে। এরপর কাঁপা কাঁপা হাতে

কলসের কাছে গিয়ে গলায় ঢেলে দিলেন সবটুকু পানি। পাকস্থলীতে তরল গিয়ে পৌঁছানোর সাথে সাথে মনে হল তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। থপ করে মেঝেতে বসে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বন্ধ করে ফেললেন চোখ।

'আব্বাজান...আব্বাজান... ওঠেন!

ভাঙ ভাঙা ঘুমের মাঝে শুনতে পেলেন মোলায়েম গলার স্বর আর একটা হাত তাঁর কাঁধ ধরে নাড়া দিচ্ছে। ভারী চোখ মেলে শাহজাহান দেখতে পেলেন তাঁর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে জাহানারা।

'তুমি এখানে কেন? আমি বলেছি আমি একা থাকতে চাই...' বিড়বিড় করে উঠলেন শাহজাহান। জানালা দিয়ে তেরছা মতন সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরের মাঝে; কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না যে কতক্ষণ যাবত ঘুমিয়েছেন।

'আমি আপনাকে নিয়ে অনেক উদ্বিগ্ন ছিলাম, আমরা সকলেই... বিরক্ত না করার আদেশ তাই মানতে পারি নি।'

মাথা থেকে টুপি খুলে ফেললেন শাহজাহান। চুলে হাত বুলাতেই শুনতে পেলেন জাহানারার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। 'আমার বেশভূষা দেখে অবাক হচ্ছ তুমি; কিন্তু সুন্দর পোশাক বা দামি রত্ন আর প্রয়োজন নেই আমার... এই সংক্ষিপ্ত পোশাকে তোমার মায়ের শব শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছি আমি আর ততক্ষণ পর্যন্ত খুলব না, যতক্ষণ না এগুলো খসে পড়ে আমার দেহ থেকে।'

'আপনার চুল, আব্বাজান...'

'কী বলতে চাও?' এক গোছা চুল সামনে এনে পরীক্ষা করে দেখলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যখন ঘোড়া ছুটিয়ে মমতাজের কাছে এসেছিলেন তখন এগুলো ঠিক রাতের মতই কালো ছিল। এখন বেশির ভাগটাই সাদা। আয়না মিথ্যা বলেনি।

'আল্লাহ আমাকে সত্যিই অভিশাপ দিয়েছেন। আমার পাপের জন্য শাস্তি দিয়েছেন। এটি তাঁরই ইশারা।'

'আব্বাজান... আব্বাজান, ...শোকে আর দুঃখেই এমনটা....'

'না, এটা একটা বার্তা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে আমার সম্পদ আর ক্ষমতা সত্ত্বেও আমি শুধুমাত্র একজন

মানুষ—খরার কারণে মৃত্যুবরণ করা কৃষকদের মতই কষ্ট ভোগ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি।' বেদনা মাখা হাসি হেসেই আবার থেমে গেলেন, এর চেয়েও গভীর চিন্তা এসেছে মাথায়। মমতাজের মৃত্যু কী সৎভাইদের হত্যার দেনা শোধ?

কার্পেটের দিকে তাকাতেই রক্ত লাল আর নীল রং নাচতে লাগল চোখের সামনে, মনে হল আবারো মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। সামনে ঝুঁকে মাথা চেপে ধরলেন হাত দিয়ে আস্তে আস্তে দুলতে লাগলেন।

'আব্বাজান, নিজেকে অসুস্থ করে ফেলেছেন। এখনি কিছু খাওয়া দরকার।' বলে চলল জাহানারা, ' তোমার পরিচারকদের বলছি খাবার তৈরি করে দেবে।'

'এ কথা শুনেই মোচড় দিচ্ছে পাকস্থলী।'

'আপনাকে চেষ্টা করতে হবে, আমাদের পরিবারের জন্য। আমাদের দরকার আপনাকে। আর ভুলে গেছেন আপনার নতুন আগত কন্যার কথা। সাত্তি আল-নিসা তার এতটাই খেয়াল রাখছে যতটা রাখত আমাদের নিজের মা। কিন্তু তার পরেও ওর যত্নের জন্য আপনার আদেশ আমাদের জানা দরকার...'

হাত তুললেন শাহজাহান। যে সন্তানের জন্মের কারণে জীবন দিতে হয়েছে মমতাজকে, তাকে নিয়ে চিন্তা করতে চান না তিনি।

'সাত্তি আল-নিসাকে জানাও আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ; কিন্তু এ বিষয় এখন মুলতবী থাকুক।'

'পৃথিবীকে এড়িয়ে আপনি তো শুধু এ জায়গায় থাকতে পারেন না।'

'আমার কোন ইচ্ছে নেই। আজ ঠিক এক সপ্তাহ হয়েছে যে তোমার মা মৃত্যুবণ করেছেন। আজ রাতে আমি আবারো তাঁর সমাধিতে যাবো।'

'আমাকে আপনার সাথে আসতে দিন, আব্বাজান...দারাও যাবে। আপনার জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে এতে কোন সমস্যা নেই আর আমরাও তাই চাই।'

প্রথমে মনে হল যে বলবেন তিনি একা যাবেন। কিন্তু পরক্ষণে মনে হল যে সন্তানদেরও অধিকার আছে মমতাজের জন্য শোক করার। 'ঠিক আছে।'

সেই সন্ধ্যায় প্রায় কালো'র কাছাকাছি এমন ধরনের গাঢ় বেগুনি রঙের কাপড়ে ঢেকে দেয়া পালকিতে চড়ে বসলেন শাহজাহান, জাহানারা আর দারা শুকোহ্। একই প্রবেশদ্বার দিয়ে বের হল পালকি তিনটি, কয়েকদিন আগে এ প্রবেশদ্বার থেকেই বের হয়েছে মাথা সামনে রেখে মমতাজের শব শোভাযাত্রা, বোরহানপুর থেকে। এখনো ইট তুলে দেয়া হয়নি। গ্রাম্য মানুষের বিশ্বাস যে মৃতদেহ যে পথ দিয়ে বের করা হয় সেখানে ইটের দেয়াল তুলে বাঁধা স্থাপন করে দিতে হয়, যাতে নাকি মৃত আত্মা আবার পথ খুঁজে শরীরে ফেরত আসতে না পারে আর এই আত্মা ভূত ছাড়া আর কিছু নয়।

শাহজাহন সবসময় ভাবতেন যে এটি একটি নির্বোধ কুসংস্কার; কিন্তু এখন মনেপ্রাণে কামনা করেন যে যদি এটি সত্যি হত—আত্মা বেশেও মমতাজ যদি ফিরে আসতেন, ক্ষতে খানিকটা প্রলেপ পড়ত। মমতাজের ভূত দেখে কখনোই ভয় পেতেন না তিনি।

পালকি বাহকেরা পায়ে হেঁটেই পার হয়ে গেল নদী, গভীরতা মাত্র ফুট খানেকের একটু বেশি। এরপর এগিয়ে গেল তীর ধরে জায়নাবাদ বাগানের কাছে। অন্ধকারের মাঝেও দেখা যাচ্ছে অর্ধ-ভঙ্গুর খিলানওয়ালা ফটক। 'এখানেই রাখো আমাকে।' আদেশ দিলেন শাহজাহান। পালকি থেকে নেমে অপেক্ষা করলেন জাহানারা আর দারা শুকোহ্‌র জন্য। এরপর সন্তানদের সাথে এগিয়ে গেলেন প্রবেশদ্বারের দিকে, হালকাভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে রাজপুত প্রহরীর সালাম গ্রহণ করলেন।

খিলানের মাঝে দিয়ে সাদা মার্বেলের প্যাভিলিয়ন, ভেসে যাওয়া মেঘের ফাঁক গলে চাঁদের আলো এসে পড়ায় ছড়াতে লাগল ফ্যাকাশে উজ্জ্বলতা; তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন এখানেই হবে মমতাজের সমাধি। সাধারণ মার্বেল স্ল্যাবের উপরে মমতাজের নাম জ্বলজ্বল করছে হাজারো ছোট মোমবাতির আলোয়।

শাহজাহানের চোখ ভরে গেল অশ্রুতে, তাই সমাধি পর্যন্ত হেঁটে যেতে গিয়ে মনে হল চারপাশের সবকিছু বেড়ে চর্তুগুণ হয়ে গেছে। সমাধির কাছে পৌঁছে অসহায়ের মত কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন, মার্বেল ধুয়ে যাচ্ছে অশ্রুকণায়। নিচু হয়ে চুম্বন করলেন ঠাণ্ডা পাথর। জীবনের সমস্ত জটিলতায় মমতাজ ছিলেন তাঁর বন্ধু, প্রেমিকা,

পথপ্রদর্শক। তাঁকে ছাড়া প্রতিটি নতুন দিন মনে হল দুঃসহ পীড়াদায়ক। কিন্তু এ বোঝা বহন করতেই হবে। জাহানারা, দারা শুকোহ্ যাদের হাত তিনি অনুভব করছেন কাঁধের উপর, আর অন্য সন্তানদের খাতিরে সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করে তোলা ও রাজবংশের ভবিষ্যত নিরাপদ করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবেন তিনি। যদিও মমতাজ এখন অন্য জগতের বাসিন্দা, তিনি এ সাম্রাজ্যকে আরও সমৃদ্ধ করবেন পত্নীর স্মৃতি গৌরবময় করার উদ্দেশ্যে...কিন্তু তারপরেও মনে হল এই অনুনয় ফাঁপা আওয়াজ তুলল তাঁর শূন্য চেতনায়, তেমন কোন প্রবোধ পেলেন না তিনি। স্ত্রী পাশে না থাকলে এসবের কীই বা মানে আছে? একটাই শুধু সান্ত্বনা যে জীবনের শেষ সময়ে মমতাজের কাছে একটি প্রতিজ্ঞা করেছেন। মাথা তুলে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'আমি পৃথিবীর বুকে স্বর্গের মতন একটি সমাধি নির্মাণ করে দেব তোমাকে—আগ্রাতে। এই দুর্ভিক্ষপীড়িত ভূমিতে তোমাকে বেশি দিন শুয়ে থাকতে হবে না। সমাধির কাছে হাঁটু গেড়ে সময়ের সব হিসাব বুঝে গেলেন শাহজাহান।

'আব্বাজান...আপনি ঠিক আছেন?' দ্বিধাভরা কণ্ঠে জানতে চাইল দারা শুকোহ্।

এইবারই প্রথম তাঁর পুত্র এ জাতীয় কোন কিছু জিজ্ঞেস করল পিতাকে। এর আগপর্যন্ত পিতা হিসেবে তাঁরই দায়িত্ব ছিল সন্তানের লালন-পালন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কত বার তিনি এই একই কথা বলেছেন তাঁর কোন না কোন পুত্রকে যখন সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে অথবা মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় টলমল হয়েছে? কী অদ্ভুত এই জীবন। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই কৃষ্ণ কালো চুল নিয়ে, যুদ্ধে ছুটে গেছেন তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে, কখনোই বুঝতে পারেননি যে কতটা কাছে—অথবা এই পথে—বেদনা এসে আঘাত করবে। এখন তিনি সহানুভূতির প্রার্থী, সন্তানও অনুকম্পা দেখাচ্ছে যে কিনা এখনো কৈশোর অতিক্রম করেনি।

'আমি একজন সম্রাট আর তাই যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা আর জীবনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র যেভাবে সহ্য করেছি, তেমনি এটাও সহ্য করতে হবে। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে, না, আমি মোটেও ভালো নেই। এই ক্ষত কখনো আরোগ্য হবে না। ব্যথা হয়ত কমে যাবে কিন্তু কখনোই

আমাকে ছেড়ে যাবে না। আর আমিও তা চাই না, কেননা এই যাতনা না থাকলে আমি তোমার মাকে ভুলে যাবো।'

'কোন কিছুই আর আগের মত হবে না, আমাদের কারোর জন্যই।' জানালো দারা। ভাইয়ের কথা শুনে জাহানারা হাত বাড়িয়ে খানিকক্ষণ ধরে রাখলো ভাইকে। ঠিক ছোট্টবেলার মত যখন দারার সান্ত্বনার প্রয়োজন হত তখন মাত্র এক বছরের বড় হলেও জাহানারা এমনটাই করত।

আস্তে আস্তে বাগান থেকে বের হয়ে আসার সময় শাহজাহান ভাবলেন যে তার সন্তানেরা এখনো বেশ তরুণ আর সহজেই ভেঙে পড়ে। বেদনার ভার আঘাত করেছে পুরো পরিবারের উপর; পিতা হিসেবে তাঁকেই এগিয়ে আসতে হবে এর ভার লাঘবের জন্য।

মমতাজের মৃত্যুর পর এই প্রথম মনে পড়ল যুদ্ধের কথা। আর শত্রুর মাধ্যমেই এ ক্ষত উপশম করার চিন্তা করলেন সম্রাট। শত্রু বাহিনী নিশ্চয়ই এতক্ষণে ফন্দি আঁটা শুরু করে দিয়েছে যে কীভাবে এই অবস্থার সুবিধা নেয়া যায়। তারা নিশ্চয়ই আশা করছে যে তিনি দক্ষিণাত্য ছেড়ে শোক করার জন্য আগ্রাতে ফিরে যাচ্ছেন। ভ্রুকুটি করে উঠলেন শাহজাহান।

বিজাপুর সৈন্যদের ষড়যন্ত্রেই তিনি বাধ্য হয়ে দক্ষিণে এসেছেন। যদি তারা বিদ্রোহী না হয়ে উঠত তাহলে তিনি এখনো আগ্রাতে থাকতেন। মমতাজ হারেমের নিরাপত্তা আর আরামের মধ্যে থেকেই সন্তান জন্মদান করতে পারত, তা না করে তাঁকে সাম্রাজ্যের এই অনুর্বর অংশে কষ্টকর ভ্রমণ করে আসতে হয়েছে। মমতাজ হয়ত বেঁচে থাকত...এই নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুতাপ করে মৃত্যুবরণ করতে হবে শত্রুদের।

বিতৃষ্ণা ভরে সামনে ছড়িয়ে থাকা ড্রয়িং থেকে চোখ তুলে তাকালেন শাহজাহান। প্রধান স্থপতি তাঁর নির্দেশ মতই সব করেছে; তারপরেও কী যেন একটা নেই। বিশাল চৌকোনা বাগানের মাঝখানে হওয়ায় সমাধিটাকে কেমন বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। এখন পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছে বাগানের মাঝখানেই থাকবে সেই ত্রুটিহীন রত্ন, মমতাজের সমাধিসৌধ। 'আমি

জানি যে আমি কী চাচ্ছি কিন্তু কীভাবে এটি সৃষ্টি হবে তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না... এটি বড় বেশি সাধারণ দেখাচ্ছে। তোমার কী মনে হয় জাহানারা?'

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই...বলাটা ঠিক সহজ নয়।'

বাঁকা চোখে আরো একবার ড্রয়িংগুলোর দিকে তাকালেন শাহজাহান।

'আমি বলেছিলাম যেন বিরক্ত না করা হয়। তুমি এখানে কেন জাহানারা?'

'কারণ, আমাকে আপনার সাথে কথা বলতে হবে। ছয় সপ্তাহ হয়ে গেছে, আম্মিজান মারা গেছেন। তারপরেও এখনো আমরা ভাই-বোনেরা আপনাকে তেমন দেখতে পাই না। একই অবস্থা আপনার উপদেষ্টা আর সভাসদদের। আমি কোন রকম কোন অশ্রদ্ধা করতে চাই না, কিন্তু আম্মিজান বেঁচে থাকলেও একই কথা বলতেন। তাঁর জন্য দুঃখ করতে গিয়ে আপনি আপনার দায়িত্ব অবহেলা করতে পারেন না।'

'কীভাবে আমি দায়িত্ব অবহেলা করেছি? সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আমরা তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিয়েছি। আর কিছু কী আশা কর আমার কাছ থেকে?' জাহানারার মুখে ছায়া দেখে গলার স্বর নরম করে তিনি আরো যোগ করলেন, 'দয়া করে বুঝতে চেষ্টা কর। সমাধিসৌধের পরিকল্পনা সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আমি কিছুতেই শান্তি খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আমি জানি এ ব্যাপারে আপনি কতটা উৎসুক, কিন্তু এখন পর্যন্ত আপনার ছোট কন্যাকে দেখেন নি। তাকে কোন নামও দেয়া হয়নি। আর এখন আমি শুনতে পাচ্ছি যে তাকে আগ্রায় রাজকীয় হারেমে পাঠিয়ে দিতে চাইছেন।'

'তুমি বুঝতে পারছ না। আমি চাই শিশুটির সঠিক দেখ ভাল করা হোক; কিন্তু তাকে নিয়ে চিন্তা করাটা আমার জন্য বেদনাদায়ক।'

'ও কোন শিশুটি নয়! আপনার কন্যা! অন্তত পাঠিয়ে দেয়ার আগে ওর দিকে একবার তাকান।' উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই হাত তালি দিল জাহানারা। ইশারা পেয়ে কক্ষে প্রবেশ করল সাত্তি আল-নিসা। হাতের মাঝে উলের কম্বলে গুটিগুটি মেরে শুয়ে আছে ছোট্ট শিশুটি। 'জাহানারা।' মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানিয়ে শাহজাহানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সাত্তি আল-নিসা।

দ্বিধার পড়ে গেলেন শাহজাহান। আরেকটু হলেই সাত্তি আল-নিসাকে সরে যাবার আদেশ দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছু একটা থামিয়ে দিল। আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে গেলেন আর হালকাভাবে সরিয়ে দিলেন কম্বল। ঘুমিয়ে আছে শিশুটি। মুখের কাছে হাত মুঠি করে রাখা। এত ছোট্ট অবুঝ একটা দেহের প্রতি কীভাবে তিনি শত্রুতা করবেন...তার পরেও পিতাসুলভ কোন অনুভূতি এলো না মনে। ব্যাপারটা এমন যেন কোন কিছু অনুভব করার শক্তিটাই হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

'জাহানারা, সম্রাজ্ঞী প্রায়ই যেসব নামের কথা বলতেন যেগুলো আপনারা দু'জনে মিলে নির্বাচন করেছিলেন যদি কন্যাশিশু হয় তাহলে রাখার জন্য। তাদের মাঝে একটি নাম তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। জানালো সাত্তি আল-নিসা।

'কী ছিল সেটা? আমার মনে আসছে না...'

'গওহরা আরা।'

'তাহলে তাই রাখা হোক।'

হঠাৎ করেই জেগে গেল গওহর আরা, সাত্তি আল-নিসার কোলে আড়মোড়া ভেঙে কাঁদতে শুরু করে দিল।

'ওকে হারেমে নিয়ে যাও।' সাত্তি আল-নিসা দ্রুত তাঁর কন্যাকে নিয়ে কক্ষ ছেড়ে চলে যেতেই ঘুরে দাঁড়ালেন শাহজাহান।

'গওহর আরাকে আমাদের কাছ থেকে পাঠিয়ে দিবেন না আব্বাজান। সাত্তি আল-নিসা ওর দেখাশোনা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।' এক মুহূর্তের জন্য পিতার মোটা করে বোনা সুতির টিউনিকের উপর হেনা দিয়ে রাঙানো আঙুল রাখল। মমতাজের মৃত্যুর পর শাহজাহান আদেশ জারি করেছেন যে পুরো দরবার শুধুমাত্র সাদাসিধে পোশাক পরিধান করবে।

'ঠিক আছে।' জাহানারার তরুণ মুখখানায় স্বস্তি দেখতে পেয়ে সম্রাটের খারাপ লাগল যে তিনি তাকে উদ্বিগ্ন করেছিলেন, কিন্তু তারপরেও কিছু করার নেই তাঁর মমতাজের মৃত্যুর পর থেকে যেন তাঁর ও বাকি পৃথিবীর মাঝে কেমন একটা ব্যবধান তৈরি হয়েছে। এমনকি তাঁর পরিবারের সাথেও। অথচ তিনি জানেন যে তিনি এদেরকে ভালোবাসেন। এমনকি এখনো মনে হচ্ছে জাহানারা যেন চলে যায়। তাহলে তিনি

আবারো ডুবে যাবেন তাঁর চিন্তার জগতে। কিন্তু মনে হচ্ছে জাহানারার আরো কিছু বলার আছে।

'আব্বাজান, আরো একটা ব্যাপার আছে যা আপনার জানা উচিত। কয়েকদিন আগে আওরঙ্গজেব আমার কাছে এসেছে চরম হতাশা নিয়ে। একজন মোল্লা তাকে জানিয়েছেন যে আল্লাহ আমাদের আম্মিজানকে নিয়ে গেছেন কারণ আপনি একজন ভণ্ড মুসলমান। যে কিনা ইসলামিক আইনের অবমাননা করে দরবারে হিন্দু ও অ-মুসলিমদেরকে ঠাঁই দিয়েছে। আমি আওরঙ্গজেবকে বলেছি যে মোল্লার কথার কোন সারবত্তা নেই। আপনি ঠিক আমাদের পিতৃপুরুষ সম্রাট আকবরের নির্দেশিত পথানুযায়ী সহিষ্ণুতার উদাহরণ রেখেছেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব ঠিক আশ্বস্ত হয়নি।'

'হতে পারে সে আশ্বস্ত না হয়ে ভালোই করেছে। এমনো হতে পারে যে মোল্লা সঠিক কথাটাই বলেছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি নিজেকেই শুধু প্রশ্ন করছি যে আমাকে এভাবে শাস্তি প্রদানের পেছনে আল্লাহর যৌক্তিকতাটা কী? হতে পারে অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি আমি একটু বেশিই উদার আচরণ করেছি, ঠিক সেই পর্তুগিজের উদ্ধত জেসুইটদের মত যারা আমার সাম্রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে বেরিয়ে দাবি করে যে তারাই একমাত্র আল্লাহর কথা শুনতে পায়। তারাও তো দূষিত আর দুর্নীতিগ্রস্ত। মনে করে দেখো, যখন আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম তখন তারা কীভাবে আমাদেরকে হুগলি নদীর তীরে তাদের ঘাঁটি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, অথচ তোমার আম্মিজান সে সময় বেশ দুর্বল ছিল। নিজেদের ধর্মের প্রধান বিষয় হিসেবে যে সহানুভূতি আর যত্নের কথা গর্ব করে বলে, তার কোন চিহ্নই পাওয়া যায়নি সেই আচরণে। কেননা তারা আমার পিতা আর মেহেরুন্নিসার কাছে ভালো হতে চেয়েছিল। বছরের পর বছর আমি তাদের কথা ভেবেছি; কিন্তু এখন পদক্ষেপ নিয়েছি। দুই সপ্তাহ আগে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছি যেন তাদের যাজকদেরকে উচ্ছেদ করে ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তারা আর ফিরে আসতে পারবে না। এছাড়াও ভাবছি যে আমার শহরগুলোতে পুনরায় আর কোন হিন্দু মন্দির নির্মাণের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করব।'

'কি?' বিস্ময়ে থ হয়ে গেল জাহানারা। বেশ কিছুক্ষণ লেগে গেল পুনরায় ভাষা খুঁজে পেতে। 'আব্বাজান, যদি বিদেশী যাজকদেরকে উৎখাত করতে হয় তো করেন, কেননা তারাও সেরকমই কাজ করেছে। কিন্তু আপনার বিশ্বস্ত প্রজাদেরকে শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে শাস্তি দিবেন না। আপনার নিজের আম্মাজান, দাদীমা ছিলেন রাজপুত রাজকন্যা। আপনার এবং আমার শিরায় হিন্দু রক্ত বইছে। এর চেয়েও বড় কথা আপনার হিন্দু প্রজারা কোন অপরাধ করেনি আর আমাদের দুঃখের সময় সমব্যথী হয়েছে...সমবেদনা জানিয়ে কত বার্তা এসেছে আমদের কাছে ভেবে দেখেন। আম্বার, মেওয়ার আর মারওয়ার দরবার আমাদের সাথে শোক করেছে, আমরা যেভাবে চল্লিশ দিন পালন করেছি, ওরাও তেমনি কঠোরভাবেই তা পালন করেছে। এর পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করবেন না...এতে কিছুই হবে না।'

শাহজাহান এমনভাবে কন্যার দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন এই প্রথমবারের মত তাকে দেখছেন। মেয়েটার অবিশ্বাস্য অভিব্যক্তি কণ্ঠের আবেগ দেখে বুঝতে পারলেন যে সে হৃদয় থেকেই বলেছে কথাগুলো। আর অনেকটাই মমতাজ আছে যেন তার মাঝে—মেয়েটা তার আম্মাজানের সাহস আর নম্র অধ্যবসায়ের অভ্যাস পেয়েছে। এমনকি এক মুহূর্তের জন্য তার কণ্ঠস্বরটাও ঠিক মমতাজের মতই কানে বাজল, মনে হল চোখ বন্ধ করলে মনে হবে স্ত্রীর কাছেই আছেন তিনি। চিন্তাটা বেদনাদায়ক কিন্তু খানিকটা সান্ত্বনাও পেলেন।

'সম্ভবত তুমি ঠিকই বলেছ। কিছু করার আগে আমি আরো ভেবে দেখব। কিন্তু এর পরিবর্তে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। আমি আগ্রাতে অস্থায়ীভাবে সমাধিস্থ করার জন্য তোমার আম্মাজানের শরীর পাঠিয়ে দিতে চাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে গ্রহণ করার জন্য সমাধিটি নির্মাণ না করতে পারছি। দুই থেকে তিন দিনের মাঝে সোনালি শবাধার এসে পৌঁছাবে, আমি সেইরকমই নির্দেশ দিয়েছি আর তাই দেরি করার কোন মানে হয় না। সে তাঁর ভালোবাসার স্থানেই বিশ্রাম নিতে গেছে জানতে পারলে আমার চিত্ত শান্ত হবে। শত্রুকে নিজ হাতে শিক্ষা না দেয়া পর্যন্ত আমি নিজে দাক্ষিণাত্য ছেড়ে যেতে পারব না। তাই আমি চাই তুমি এবং দারা শেষকৃত্যের সঙ্গী হও। যেমনটা তুমি আমাকে

একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকন্যা হিসেবে এটি একেবারে যথাযোগ্য।'

বিজাপুরের অশ্বারোহী সৈন্যের বিশাল এক স্কোয়াড্রনের বিপক্ষে শাহজাহান নিজে তাঁর সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিলেন। পল্লী অঞ্চলে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে মোগল সম্রাট পরাজিত করেন শত্রুদের। আগ্রার উদ্দেশে মমতাজের শবদেহ যাত্রা করার পর ইচ্ছে না থাকলেও নিজের সেনাপতিদের অনুরোধে পুনরায় সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এখন তিনি খুঁজে পেলেন যে শত্রুকে খুঁজে বেড়ানো আর পিছু নেওয়ার যে ঝুঁকি ও উত্তেজনা, এটাই একমাত্র জিনিস যা মমতাজের জন্য সৃষ্টি হওয়া দুঃখ কমিয়ে দিয়েছে। অতীতের চেয়ে বর্তমান বিপদের উপর মনোসংযোগ করতে বাধ্য হলেন তিনি। এ ধরনের তৃতীয় একটি অভিযানে বের হয়ে বেশ উৎফুল্ল হলেন শাহজাহান।

'জাহাপনা, আপনি আমাদেরকে ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছেন। খানিকটা ধীরে ছুটবেন নতুবা আমরা আপনাকে সুরক্ষা দিতে পারব না।' ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাপিয়েও দেহরক্ষীদের দলনেতার চিৎকার শুনতে পেলেন সম্রাট। কোনই মনোযোগ দিলেন না তিনি। যদি তার ভাগ্যে মৃত্যু থাকে তবে তাই হোক। স্বর্গের উদ্যানে মমতাজের সাথে একত্রিত হতে পারবেন তিনি। মুহূর্তখানেকের মধ্যেই প্রথম বিজাপুরের সৈন্যের সাথে সংঘর্ষ হল। সাদা ঘোড়ার উপর উবু হয়ে বসে থাকা সৈন্যের বাঁকানো ভোজালির প্রথম আঘাত বাতাস কেটে গেল শাহজাহানের ময়ূরপুচ্ছ লাগান শিরস্ত্রাণের উপর দিয়ে, নিচু হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু তাঁর ঘোড়া এতটাই দ্রুত ছুটে গেল যে তিনি আঘাত হানার আগেই পিছনে পড়ে গেল লোকটা। আরেকটা বিজাপুরী সৈন্য নিজের লম্বা বল্লম ছুঁড়ে মারল সম্রাটের দিকে; কিন্তু নিজের তলোয়ার দিয়ে তিনি এটিকে একপাশে সরিয়ে দিলেন। এরপর নিজের অস্ত্র ব্যবহার করে বিদ্রোহীর বাদামি ঘোড়ার পিঠে আঘাত করতেই হ্রেষা ধ্বনি তুলে আরোহীকে ফেলে দিল জন্তুটা।

তৃতীয় বিজাপুরীর উপর আঘাত হানলেন শাহজাহান; কিন্তু বুকের বর্মে লেগে পিছলে গেল তলোয়ার। মুহূর্তখানেক পরেই দেখতে পান যে

বিজাপুরীদের মাঝে তিনি একেবারে একা। অসংখ্য শত্রু ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে তাঁকে আক্রমণের জন্য। উপলব্ধি করলেন যে বোকামি আর গোঁয়ার্তুমি তাঁকে এই বিপদের মাঝে ডেকে এনেছে। দ্রুত দুরুদুরু বক্ষে এগিয়ে গেলেন সবচেয়ে কাছের সৈন্যের দিকে। ঘোড়সওয়ার কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুকবর্মের নিচে পেটের ভেতর তলোয়ার ঢুকিয়ে দিলেন। শাহজাহান নিজের তলোয়ার মুক্ত করতেই ঘোড়ার পিঠে ঢলে পড়ে নিজের ছোট বর্শাটা মাটিতে ফেলে দিল সৈন্যটা।

দ্বিতীয় বিজাপূরী সৈন্যটা দ্রুত ঘুরে গিয়ে তৎক্ষণাৎ আঘাত হানল সম্রাটের উপর। তলোয়ার দিয়ে শাহজাহানের জিনের সম্মুখ ভাগে আঘাত করতেই হেলে পিছিয়ে গেলেন তিনি একই সাথে রক্তমাখা ফলা ব্যবহার করে শত্রুসৈন্যের শিরস্ত্রাণ ফেলে দিলেন মাথা থেকে। কিন্তু অক্ষত সৈন্য আবারো এগিয়ে এলো সম্রাটের দিকে তবে এবার নিজের দুই সঙ্গীকে সাথে নিয়ে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন শাহজাহান, ফলে সামনের পা উপরে তুলে ডাক ছাড়ল ঘোড়া। খুরের আঘাতে সবার সামনে থাকা বিজাপুরী সৈন্য পড়ে গেল পিছন দিকে। সাথে সাথে তিনি বাম হাতে লাগাম ধরে ঘুরে গিয়ে আঘাত হানতে উদ্যত হলেন পরবর্তী শত্রুসৈন্যের দিকে। কিন্তু লোকটা তাঁর ডান হাতের উপরের অংশ ধরে ফেলে, শাহজাহান বাধ্য করেন তাকে হাতের অস্ত্র ফেলে দিতে। এরপর বহুকষ্টে নিজের ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তৃতীয় আক্রমণকারী শিরস্ত্রাণবিহীন সৈন্যের দিকে এগিয়ে যান শাহজাহান; কিন্তু বুঝতে পারেন যে তিনি তেমন কিছু করতে পারবেন না। তাঁর আগেই হয়তো আঘাত করবে লোকটা। তাই অবচেতনেই চেষ্টা করলেন নিজেকে বাঁচানোর। কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁর চোখের সামনে মাথার খুলি ফেটে রক্ত-মাংসের দলা পাকিয়ে গেল বিজাপুরী সৈন্যটা। সারির মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে এগিয়ে এসেছে দেহরক্ষী প্রধান আর দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে শিরস্ত্রাণবিহীন অরক্ষিত মাথা। এরই মাঝে অন্য দেহরক্ষী সৈন্যরাও এসে পড়ে চড়াও হয় শত্রুসৈন্যদের উপর। বিজাপুরী সৈন্যরা যারা এখনো সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েনি—কোন দিকে না তাকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে, সঙ্গীদেরকে রেখে যায় মৃত্যুবরণ করতে কিংবা বন্দিত্ব বরণ করে নিতে।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে এই সময়ের মাঝে ঘোড়ার পিঠ থেকে প্রায় নামেনইনি বলতে গেলে শাহজাহান, ঘুম তো দূরের কথা—অশোক সিংয়ের সঙ্গে সমান্তরাল একটি পাথর খণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে নিচে শুকিয়ে যাওয়া নদীর বাঁকের মুখে গরুর পিঠের কুঁজোর মত দেয়াল ঘেরা কৃষ্ণপুর নামের ছোট্ট শহরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন সম্রাট। একটু আগের সংঘর্ষের পর আটক কয়েকজন বন্দি বিজাপুরী সৈন্যের কাছে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে এই শহরেই ঘাঁটি গেড়েছে তারা। নিজে অথবা মোগল বাকি সৈন্য কাউকেই বিশ্রাম নেবার সুযোগ না দিয়ে দুই ঘণ্টা আগে কৃষ্ণপুর পৌঁছে দেখতে পান বদ্ধ দুয়ার। মোগল সৈন্যরা এখন চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে শহরটাকে।

'না, অশোক সিং! আমি তাদের সাথে কোন ধরনের সমঝোতা করব না। বিনা শর্তে তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। পত্নীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি অনুকম্পা দেখিয়ে যে ইস্তেহার প্রকাশ করেছিলাম তারা সেটাকে অবহেলা করেছে। এখন তাদেরকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। তাহলে তারা কীভাবে আশা করে যে আমি আমার দয়া নীতি পুনরায় বিবেচনা করব?'

'আমি তাদের প্রতিনিধিকে জানাব।' এক মুহূর্ত দ্বিধা করে অশোক সিং বলে চলল, 'ক্ষমা করুন জাহাপনা। কৃপা পাবার কোন আশাই যদি না থাকে তাহলে তারা কী কঠিন দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যাবে না?'

হতে পরে অশোক সিং সত্যি কথাই বলছে, ভেবে দেখলেন শাহজাহান। 'ঠিক আছে। তাদের প্রতিনিধিকে জানিয়ে দাও যারাই শহর ছেড়ে গেছে এক ঘণ্টার মাঝে ফিরতে পারলে বেঁচে যাবে। মুক্ত অথবা বন্দি এ ব্যাপারে আমি কোন প্রতিজ্ঞা করব না, তবে তারা বেঁচে থাকবে।'

তীর আর বন্দুকের গুলির রেঞ্জ বাঁচিয়ে ঠিক কৃষ্ণপুরের ফটকের সামনে শাহজাহান। পঞ্চাশ মিনিট কেটে গেছে এরই মাঝে। ফটকগৃহটি বালিপাথর দিয়ে তৈরি মজবুত একটি দালান, জোড়া ফটকের উপরে কোনমতে একটি সাপ বেরিয়ে যাবার মত ফাঁক রাখা হয়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে পুরো জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে নামলেন শাহজাহান। বুঝতে চাইলেন তারা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে কিনা, যা না করে

সেক্ষেত্রে করণীয় নিয়েও ভাবতে লাগলেন তিনি। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে এক ঘণ্টা পার হবার সাথে সাথে নিজ সৈন্যদেরকে আদেশ দেবেন যেন কৃষ্ণপুরের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ করা হয়। আক্রমণের জন্য শ্রেষ্ঠ পথ হতে পারে শুকনো নদীবক্ষ, কেননা শহরের দেয়াল এদিকে নিচু আর দেখাচ্ছেও দুর্বল। বলা বাহুল্য যে সাধারণত সময়ে এই অংশই হয়ে ওঠে প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহ।

'জাহাপনা...' আবারো সম্রাটের পাশে এগিয়ে এলো অশোক সিং। 'যদি বিদ্রোহীরা যুদ্ধ করতে মনস্থির করে তাহলে আমার এবং আপনার দেহরক্ষী নেতার পক্ষ থেকে আমি একটি অনুরোধ করতে চাই। দয়া করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেকে সামনে তুলে ধরবেন না, পরিণাম সম্পর্কে না ভেবে, যেমনটা গতকালকের আগের দিন করেছিলেন।' খানিকক্ষণ থেমে আবারো বলে চলল তরুণ রাজপুত শাহজাদা, 'পুরো দরবার জানে যে সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুতে আপনি কতটা দুঃখ ভারাক্রান্ত...আপনি বলেন যে আপনার জীবন কতটা শূন্য হয়ে পড়েছে। আমিও আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়েছি, সন্তান জন্মদানের সময়ে না, জ্বরের কারণে—আমাকে জানানোর আগেই সে মৃত্যুবরণ করে। পল্লী অঞ্চলের দিকে পিতার অংশ পরিদর্শন করে ছুটে আসার সময়টুকুও আমি পাইনি। আমিও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম। নিজের জীবনকে কোন মূল্যই দিতাম না, যুদ্ধক্ষেত্রে কিছু না ভেবেই ঝাঁপিয়ে পড়তাম, শিকারে মেতে উঠতাম। এরপর পিতা আমাকে ডেকে নিয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন সবকিছু। তিনি আমাকে বলেন যে, ঈশ্বরই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে মানুষ কখন মৃত্যুবরণ করবে। কোন মানুষের হাতে এই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। একজন শাহজাদা হিসেবে ভাগ্যের প্রতি, পিতার প্রতি, ও রাজবংশের প্রতি আমার দায়িত্ব আরো বেশি। যদিও আপনি একজন হিন্দু নন, আমি বিশ্বাস করি যে আপনার ধর্মও নিশ্চয় শিক্ষা দেয় যে একজন মানুষের উচিত ঈশ্বরের ইচ্ছের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করা। এর চেয়েও বড় কথা আপনার দায়িত্ব আমার চেয়েও বেশি। আপনি কোন কনিষ্ঠ পুত্র নন বরঞ্চ একটি রাজবংশের প্রধান যিনি কিনা আম্বার প্রদেশের চেয়ে কয়েক গুণ বড় একটি সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। অপ্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করলে পর এ সাম্রাজ্যের ও আপনার পরিবারের কী হবে?'

উত্তর দেবার আগে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন শাহজাহান। 'আমি জানি, তুমি সঠিক বলেছো। আমার পুত্রদের এখনো এত বয়স বা অভিজ্ঞতা হয়নি যে তারা আমার উত্তরসূরি হতে পারে। আমি জানি মমতাজ থাকলেও একই কথা বলতেন এবং আমার কন্যা জাহানারা ইতিমধ্যে তা বলেছেও। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তুমি নিশ্চয় জানো যে গ্রহণ করে নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেয়ে এ ধরনের সদুপদেশ দেয়া কতটা সহজ।'

'কিন্তু আমার কথায় কর্ণপাত করুন জাহাপনা।' নম্রভাবে জোর করলেন অশোক সিং।

'হ্যাঁ। বিজাপুরী সৈন্যরা যদি কৃষ্ণপুর থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়ার বদলে আমি এমন একটা অবস্থানে চলে যাবো সেখান থেকে পুরো কাজের নির্দেশ দিতে পারব।'

মুহূর্তখানেক পরে যেন তাঁর কথার উত্তর দিতেই কৃষ্ণপুরের প্রধান ফটক খুলে গেল হাট হয়ে। আক্রমণ না আত্মসমর্পণ? নিজেকে শুধোলে শাহজাহান।

ফটকের মাঝে থেকে নারীদের সারি বেরিয়ে আসতেই মনে হল দাসত্ব গ্রহণ নিশ্চয়ই। বেশির ভাগই ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে রেখেছে, অন্যরা হাতের তালু একত্র করে প্রার্থনার মত ভঙ্গি করে বের হয়ে আসছে। বুঝাই যাচ্ছে যে প্রায় সবাই দাসত্ব বরণের জন্য মোটামুটি তৈরি। অন্যান্য জায়গার মত কৃষ্ণপুরকেও ছাড়েনি খরা। শাহজাহান মাত্রই অশোক সিংয়ের দিকে ঘুরে তাকিয়ে নির্দেশ দিতে চাচ্ছিলেন যেন সৈন্য পাঠিয়ে বন্দিদের গ্রহণ করা হয়, এমন সময় হঠাৎ করে ফটক দ্বার থেকে বের হয়ে এলো স্বশস্ত্র অশ্বারোহী দল। নিজেদের ঘোড়া ছুটিয়ে কৃষ্ণপুরের দেয়ালের কাছে চললো পালানোর উদ্দেশে। এদেরকে অনুসরণ করে এলো বাকি বিজাপুরী সৈন্যরা। কেউই প্রথম দলের ঘোড়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়া মানুষগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপ করল না, বরঞ্চ সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল নারী-শিশুর উপর।

'গুলি ছোড় ওসব অশ্বরোহীদের দিকে। একজনও যেন পালাতে না পারে।' অশোক সিংয়ের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন শাহজাহান। শহরের নারীদের প্রতি বিজাপুরী সৈন্যদের আচরণে এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যে ভুলে গেলেন নিজের প্রতিজ্ঞা, ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে

এলেন সবার সামনে। বেশি দূর যাবার আগেই এহেন কোন ষড়যন্ত্রের জন্য পদক্ষেপ হিসেবে দেয়ালের কাছে তাঁর নির্দেশে ঘাঁটি গেড়ে থাকা সুশৃঙ্খল বন্দুক বাজদের বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলেন। ফলে খালি হয়ে গেল বেশ কিছু ঘোড়ার পিঠ। শত্রু স্কোয়াড্রন সংখ্যায় কমে গিয়ে যতজন বেঁচে আছে কাছাকাছি চলে এলো প্রত্যেকে। তারপর নারী-শিশুর দলের মতই আহত নিহত সঙ্গীদের রেখে মাড়িয়ে মাথা নিচু করে ছুটে চলল কোনমতে নিরাপদে পার হবার আশায়।

বন্দুকের গুলির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য খুব দ্রুত ছুটে এলেন শাহজাহান। এরপর আবারো ঘোড়া ছুটাতে গেলে অশোক সিং আর দেহরক্ষীরাও চলে এলো তাঁর পাশে। একত্রে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে ধরে ফেললেন বিজাপুরী সৈন্যদের। এসময় ডজনখানেক শত্রুসৈন্য ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পিছু ধাওয়াকারীদের উপর আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো—পরিষ্কারভাবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে চাইছে সেই সৈন্যদেরকে বাঁচাতে। নিজেদেরকে তারা ঠিকই উৎসর্গ করবে, কিন্তু অন্য কাউকেও পালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হবে না। নিজের তলোয়ার বের করতে করতে ভাবলেন শাহজাহান। এগিয়ে গেলেন মাত্র গজখানেক দূরত্বে থাকা বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করতে।

প্রথম জন—একেবারে তরুণ, শাহজাহানের দেহরক্ষীদের প্রথম সারির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। নিজের তলোয়ার দিয়ে এক কোপে ফেলল দাড়িঅলা এক রাজপুত সৈন্যের পেশীবহুল হাত; কিন্তু পরমুহূর্তেই মোগল সৈন্যদের আঘাতে ঘোড়া থেকে পড়ে উন্মুক্ত ঘোড়ার খুরের নিচে পড়ে মৃত্যুবরণ করল। তার সঙ্গীরা অবশ্য একটু ভালো মূল্য পেল। মাত্র একজনেই সমর্থ হল রাজপুত দেহরক্ষীদের একজনকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিতে; কিন্তু নিজেও মৃত্যুবরণ করল রাজপুতের ছোড়া বর্শার আঘাতে পড়ে গিয়ে। শীঘ্রই শাহজাহানের অশ্বারোহী সৈন্যরা হাতাহাতি লড়াই শেষ করে দ্রুতগতিতে ছুটে চলল, পিছনে পড়ে রইল ছিন্ন-ভিন্ন দেহ আর আরোহীবিহীন ঘোড়া। পাঁচ মিনিটের মাঝে বাকি বিজাপুরী সৈন্যদের দেখা গেল শুকনো নদীবক্ষের দিকে ছুটে চলতে। হঠাৎ যেন একজন কেউ চিৎকার করে আদেশ দিল আর এর উত্তরে পুরো বিজাপুরী সারি থেমে গিয়ে ফেলে দিল নিজেদের অস্ত্র। সব মিলিয়ে পঞ্চাশজন শক্ত সমর্থ অশ্বারোহী।

'সাবধানে। তাদের খুব কাছে যেও না। যদি এটা অন্য কোন কৌশল হয়।' চিৎকার করে বলে উঠলেন শাহজাহান।

সোনালি কাপড় পরিহিত লম্বা এক বিজাপুরী অশ্বারোহী সৈন্য সবার মাঝে দিয়ে এগিয়ে এসে ঘোড়া থেকে নেমে ভূমিশয়ান হল। 'আমরা আত্মসমর্পণ করছি, জাহাপনা। আমরা বেঁচে থাকার জন্য আপনার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি।'

'কী?' চিৎকার করে উঠলেন সম্রাট। নারী আর শিশুদের পদদলিত করা, আমার নিজের লোকের মৃত্যুর কারণ হবার পরও তোমরা আশা কর যে আমি তোমাকে বাঁচার প্রস্তাব দিব? বেঁচে থাকার সুযোগ তোমরা পেয়েছিলে কিন্তু নিজেদের পাশবিক আচরণের জন্যে তা হেলায় হারিয়েছ। তুমি, তোমার সেনাপতিরা মৃত্যুবরণ করবে। তোমার লোকেদেরকে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয়া হবে।'

'জাহাপনা, আমি কাতর অনুনয় করছি...'

'অনুনয়ের আর কোন অর্থ হয় না। শ্রদ্ধার সাথে নিজের ভাগ্য স্বীকার করে নাও। মৃত্যু আমাদের সকলের কাছেই আসবে, আগে অথবা পরে। তোমার মৃত্যু বৃথা যাবে না বরঞ্চ বিদ্রোহ আর আক্রমণের জন্য যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে প্রতিরোধ করবে।'

এক ঘণ্টা পরে শাহজাহান তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যে মোঘল সৈন্যরা তাঁর নির্দেশানুযায়ী কর্তন করা মস্তক সাজিয়ে রাখার জন্য টাওয়ারের প্রথম পাথর স্থাপন করল। এরই মাঝে পাশেই একটা জায়গায় রক্তাক্ত স্তূপের উপর নীল ডুমো মাছি উড়াউড়ি শুরু করেছে। তাঁর যোদ্ধা পূর্বপুরুষেরা এশিয়ার অনুর্বর ভূমির মাতৃভূমিতে এ ধরনের টাওয়ার নির্মাণ করতেন। নিজের শাসনামলের প্রথম দিকে অবাধ্য শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য একই নিয়ম অনুসরণ করতেন সম্রাট আকবর। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, ইতিমধ্যে চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে শকুন, আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে কখন চোখ, গাল আর ঠোঁটের নরম মাংসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। এই রক্তমাখা সুউচ্চ স্তম্ভ বিজাপুরী সৈন্যদেরকে মনে করিয়ে দেবে যে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে তারা কোনভাবেই জয়ী হতে পারবে না আর যদি তারা তাদের এ আক্রমণ অব্যাহত রাখে তাহলে শাস্তিও এমনতর হবে।

কয়েকদিন পরে বোরহানপুরের প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকে আলোকিত দরবার অঙ্গনে আসলান বেগকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পান শাহজাহান, হাতে একটি চিঠি। 'জাহাপনা, গতকাল একজন অশ্বারোহী এটি নিয়ে এসেছে। মাননীয় জাহানারা এ চিঠির প্রেরক। আমি ভাবলাম আপনি নিশ্চয়ই আসার সাথে সাথে দেখতে চাইবেন এটি।'

তৎক্ষণাৎ সীলমোহর খুলে ফেললেন সম্রাট।

আব্বাজান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, আমরা দশ সপ্তাহের ভ্রমণ শেষে নিরাপদে আগ্রা পৌঁছেছি আর ঠিক যেভাবে আপনি চেয়েছেন, যমুনার তীরে অস্থায়ী একটি সমাধিতে মায়ের মৃতদেহ রাখা হয়েছে। যতই আমরা শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম রাস্তার দুই পাশে মাথায় ধুলা মেখে ক্রন্দন করছিল সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা। পুরো ভ্রমণ জুড়েই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল এরকম যেন দুঃখের নীল ছায়া গ্রাস করেছে আমাদের পুরো ভূমি। পরবর্তীতে সবিস্তারে সব জানিয়ে পত্র লিখব।

পত্রখানা পড়তে গিয়ে, আবারো নিদারুণ দুঃখের গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেল শাহজাহানের মন। সামরিক সফলতারও ম্লান হয়ে গেল মুহূর্তের মাঝে। যখন তিনি এবং মমতাজ আগ্রা থেকে যাত্রা করেছিলেন তখন ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেননি যে একত্রে থাকার দিন ফুরিয়ে এসেছে। পত্নীকে পাশে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করার তার উচ্চাকাঙ্খাও পূর্ণ হবে। আর এখন সম্রাট হিসেবে যত বড় বিজয় আসুক না কেন কী মূল্য আছে এসবের যখন একজন মানুষ হিসেবে তিনি হারিয়েছেন সব উষ্ণতা আর আনন্দ? একটা শীতল সমাধি নির্মাণের মাঝে দিয়ে কতটাই বা সান্ত্বনা খুঁজে পাবেন তিনি? তিনি মমতাজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কখনোই হতাশায় ডুবে যাবেন না; কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা কি রাখতে পারবেন?

অধ্যায়-০৬

'বোরহানপুরে স্বাগতম উস্তাদ আহমাদ।'

'আপনার ডাক পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি, জাহাপনা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটে এসেছি।'

শাহজাহান তাঁর সামনে মাথা নত করে রাখা লম্বা কৃশকায় শরীরের মানুষটিকে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন। আশা করলেন যে অবশেষে এমন এক স্থপতিকে পেয়েছেন যে কিনা মমতাজের সমাধি নিয়ে তাঁর চিন্তাকে বাস্তবে মূর্ত করে তুলতে পারবেন। যে সমাধির কল্পনা তিনি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখলেও কেন যেন অসম্পূর্ণই থেকে যাচ্ছে। 'আমার শ্বশুর আসফ খান আমাকে পত্র মারফত জানিয়েছেন যে তুমি শাহ আব্বাসের জন্য অনিন্দ্যসুন্দর দালান নির্মাণ করেছ। যে কাজের ভার আমি দিতে চাই তা কোন পারস্যের শাহ আজ পর্যন্ত করেননি—আমার স্ত্রীর জন্যে এমন একটি সমাধি স্মৃতিসৌধ যেটির অতুলনীয় সৌন্দর্যের জন্য পরবর্তী প্রজন্মও সমানভাবে বন্দনা গাইবে এ যুগের বিস্ময় হিসেবে। এই চিন্তা কি তোমাকে ভগ্নোদ্যম করে দিয়েছে?

'না। এই ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ কোন সত্যিকার কলাকারই দূরে ঠেলে দিতে পারে না।'

পরিষ্কার হয়ে গেল যে উস্তাদ আহমাদ কোন নম্র মানুষ নন; কিন্তু এই ভালো, ভাবলেন শাহজাহান। অন্য যাদের সাথেই তিনি কথা বলেছিলেন—যেমন তাঁর প্রধান স্থপতি—সবসময় ব্যস্ত থাকত তিনি যা বলতেন তাতেই প্রশস্তি আর সম্মতি জানাতে, নিজেদের থেকে খুব কম পরিকল্পনার কথাই জানাত তারা। হাত নেড়ে স্থপতিকে লম্বা নিচু

টেবিলে বসার ইশারা করলেন সম্রাট। 'আমার জন্য কী ভাবনা আছে?'

'আমার মনে হয় পারস্যরা কীভাবে তাদের বাগান নির্মাণ করে, তা জানা আছে আপনার?'

'আমি চিত্রকলা আর ড্রয়িং দেখেছি। আমি জানি তারা এগুলোকে বলে পারিদায়েজা।'

'ঠিক তাই জাহাপনা, 'স্বর্গের উদ্যান'। সমান্তভালভাবে দুটি পানির প্রবাহ ছুটে চলে উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে, স্বর্গের পবিত্র নদীসমূহের অনুকরণে। পরলোকগত সম্রাজ্ঞীর সমাধিও এভাবেই স্থাপিত হবে।'

'কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি পত্র মারফত জানিয়েছি যে আমি চাই সমাধি নির্মিত হবে বাগানের ঠিক মধ্যিখানে। তোমার কাছে নতুন কোন পরিকল্পনা নেই?' নিজের কণ্ঠের বিরক্তি লুকিয়ে রাখতে পারেননি শাহজাহান। কিন্তু উস্তাদ আহমাদ কোন ভ্রূক্ষেপ করল না।

'আছে, জাহাপনা। আমি বিশ্বাস করি যে সমাধি বাগানের মধ্যিখানে হবে না—এর পরিবর্তে অর্থাৎ বাগানকে ছাড়িয়েও সমাধি হয়ে উঠবে প্রধান দর্শনীয়। আমার পরিকল্পনুযায়ী যমুনার তীরে আপনি যে জমি ক্রয় করেছেন তা এ কাজের জন্য পুরোপুরি আদর্শ।'

উস্তাদ আহমাদের দিকে তাকিয়ে ছবিটা ভাবতে চেষ্টা করলেন শাহজাহান। অশোক সিং পরামর্শ দিয়েছেন তিনি যেন তার পিতা আম্বারের রাজার কাছ থেকে এ জায়গাটা নিয়ে নেন। যমুনা নদীর তীরে ডান হাতি কোন নিয়েছে, আর এ স্থান দুর্গ থেকে একেবারে কাছে—খুব বেশি হলে দেড় মাইল দূরত্ব। সমাধি অট্টালিকার প্রাচীর থেকে দেখা যাবে তাই নয় শুধুমাত্র, চাইলে নৌকাযোগেও আসা-যাওয়া করা যাবে। বলে চলল স্থপতি, 'নদীতীরে নিচে বাগান রেখে একটি মঞ্চে সমাধি নির্মাণের প্রস্তাব করছি আমি।'

'কিন্তু নদীতীর কি এর ওজন বইতে পারবে? আমার নির্মাতারা বলেছে যে মাটি বালিময় আর হালকা, এছাড়া নদীর গতিপ্রবাহও ভাঙনের কারণ হতে পারে।'

'এই ক্ষেত্রে যমুনা নদীর বাঁক স্রোতের শক্তি কমিয়ে দেয়। এছাড়া ইমারত সমূহকে ধরে রাখার জন্য তীরে আরো কিছু কাজ করতে হবে।'

'ইমারত সমূহ? তুমি কি বলতে চাও একের বেশি?'

'হ্যাঁ! আমাকে দেখাতে দিন জাহাপনা!' নিজের বহুল ব্যবহৃত সবুজ চামড়ার থলে থেকে ভাঁজ করা এক বিশাল কাগজ বের করল উস্তাদ আহমাদ। খুলে টেবিলের উপর বিছিয়ে দিল কাগজটি।

'আমি সবকিছুই এঁকে এনেছি, যাতে করে আমার প্রস্তাব আপনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন। সমাধিস্তম্ভটি দু'টি মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে—বড়'টি থাকবে সমাধির জন্য, এর চারপাশে ছোট আরেকটি ভিত্তিমূল থাকবে।

'সমাধির দুই পাশে এই যে কাঠামোগুলোকে চিহ্নিত করেছ এগুলো কিসের?'

'পশ্চিম দিকে তিন গম্বুজওয়ালা একটি মসজিদ আর পূর্ব দিকে একই ধরনের একটি কাঠামো তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামস্থান আর জবাব—প্রতিধ্বনি—মসজিদের প্রতিধ্বনি হিসেবে পুরো সমাধিস্থানকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে। আমার নকশাতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর দেখুন জাহাপনা, পুরো আবহকে সম্পূর্ণ করার জন্য দক্ষিণ-উত্তর দিকের প্রবাহের শেষ মাথায়, সমাধির ঠিক বিপরীতে একটি দক্ষিণাংশের ফটক দ্বার নির্মাণের প্রস্তাব করছি আমি। প্রবেশ করার সাথে সাথে দশণার্থীরা সমাধিস্থানকে এমনভাবে দেখতে পাবে যে, অনন্তহীন আকাশের বুকে ভাসছে এটি।'

শাহজাহান তাকিয়ে রইলেন উস্তাদ আহমাদের ড্রয়িংয়ের দিকে। মনশ্চক্ষে আদর্শ একটি ভারসাম্যের চিত্র দেখতে পেলেন। এরপরেও সবকিছু নির্ভর করবে সমাধির নকশার উপরে, যেটি শুধুমাত্র একটি চক্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। 'সমাধি স্তম্ভের কী হবে?'

নিজের ব্যাগ থেকে সিল্কে মোড়ানো একটি বান্ডেল বের করল স্থপতি। 'এটি দেখানোর আগে আমার চিন্তাগুলো আপনাকে বলার সুযোগ দিন। কয়েকদিন আগেই দিল্লিতে সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি দর্শন করেছি আমি। অবাক হয়ে ভেবেছি কেমন হয় যদি পরলোকগত সম্রাজ্ঞীর স্মৃতিস্তম্ভটিও হুমায়ুনের মত অষ্ট স্তম্ভ পরিকল্পনা মত হয়? কিন্তু থাকবে আলোয় পরিপূর্ণ যেন একজন নারীর স্মৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। জায়গাটা নিয়ে আমি একের পর এক পরীক্ষা করে দেখেছি; শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ভিত্তি হবে ত্রিকোণাকার আর এর লম্বমান কোণাগুলো

অষ্ট স্তম্ভের সৃষ্টি করবে। মধ্যিখানে অবস্থিত একটি অষ্টভুজ, চেম্বারের মাঝে শুয়ে থাকবে শবাধারটি আর চারপাশে আটটি পরস্পর সম্পূর্কযুক্ত চেম্বার থাকবে দুই লেভেলে। বাইরের সম্মুখ ভাগে থাকবে দুই তলা খিলানওয়ালা কুলঙ্গি। কিন্তু যথেষ্ট কথা হয়েছে জাহাপনা, আমাকে এবার দেখাবার অনুমতি দিন।'

নিজের ব্যাগ খুলে কয়েকটি কাঠের ব্লক বের করে আনল উস্তাদ আহমাদ। এগুলো দিয়ে সাবধানে তৈরি করল একটি অষ্টভুজ কাঠামো। 'দেখুন জাহাপনা—চারপাশের প্রতি পাশে থাকবে প্রবেশপথ, যাদের উঁচু মাথা বাকি খোলা জায়গা ফুঁড়ে ঊর্ধ্বে উঠে যাবে। মাটি থেকে গম্বুজের মাথার উচ্চতা হবে ২৪০ ফুট।'

'আর গম্বুজটি?'

'আমি বলব জোড়া গম্বুজের কথা। আবারো অনুমতি দিন বর্ণনা করার।' এবার পকেট থেকে দুই টুকরো পালিশ করা অ্যালবাস্টার বের করল উস্তাদ আহমাদ। 'সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির ভেতর এবং বাইরের গম্বুজ দুটোতে নিচু ড্রাম আছে। এখানকার ক্ষেত্রে আমি প্রস্তাব করছি এমন একটি অভ্যন্তরীণ গম্বুজ উঠে যাবে যেটি মাটি থেকে আশি ফুট উঁচু হবে আর বাইরের গম্বুজের আকৃতি হবে পেয়ারার মত, উপরে থাকবে সোনালি আভা।' কথা বলতে বলতে উস্তাদ আহমাদ অভ্যন্তরীণ গম্বুজটিকে মডেলের অষ্টভুজ দেয়ালের মাঝে সাবধানে বসিয়ে চারপাশে বাইরের গম্বুজ বসিয়ে দিল। 'অবশেষে আমি পরামর্শ দেব চারটি ছত্রি, উন্মুক্ত মঞ্চ বসাতে, আপনার হিন্দু অনেক প্রতিবেশীর প্রাসাদে ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক যেন আংটির মাঝে প্রধান রত্নটির চারপাশে মুক্তোদানা।'

সামনে রাখা মডেলটির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন শাহজাহান। একেবারে নিখুঁত। এই লোকটা কেমন করে তাঁর চিন্তাগুলোকে এত সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে যখন কিনা তিনি নিজেও নিজেকে বোঝাতে পারছিলেন না? সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে রইল উস্তাদ আহমাদ, বুঝতে পারছে না সম্রাটের নীরবতার অর্থ কী।

'আমি সম্রাজ্ঞীর সমাধি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্যে তোমাকে আমার স্থপতি নিয়োগ করলাম। এখনি আগ্রাতে ফিরে যাও। যা দরকার—অর্থ উপকরণ, শ্রমিক সব দেয়া হবে তোমাকে।'

'জাহাপনা! আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে। কোন উপকরণ ব্যবহার করব আমরা? বালিপাথর?'

'আশেপাশের ইমারতগুলোর জন্য সম্ভবত তাই, কিন্তু সমাধি সৌধের জন্য ব্যবহার করতে হবে বিশুদ্ধ সাদা মার্বেল—আমি ইতিমধ্যে আম্বারের রাজাকে জানিয়েছি যে তার অধীনস্থ মাকরানা খনির সবটুকু ক্রয় করব আমি; এছাড়া তাকে এও জানিয়েছি যেন নিরাপদে মার্বেলগুলো দুইশ মাইল দূরে আগ্রাতে পৌঁছে দেয়া হয়।'

প্রথমবারের মত বিস্মিত দেখালো উস্তাদ আহমাদকে। 'এর আগে কেউই মার্বেল দিয়ে এত বিশাল কিছু নির্মাণ করেনি...ব্যয় তো...'

'খরচের কথা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। পৃথিবীতে স্বর্গ তৈরি করে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছ, এটাই তোমার একমাত্র ভাবনা হবে।'

কয়েক মাসের মাঝে এই রাতেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলেন শাহজাহান। কেমন করে মৃত্যুপথযাত্রী মমতাজের শেষ ইচ্ছে পূরণ করবেন সেই উদ্বেগ দূর করে দিয়েছে উস্তাদ আহমাদের নিপুণ নকশা।

স্বপ্নের মাঝে দেখতে পেলেন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দক্ষিণের বিশাল ফটকদ্বারে, বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছেন উজ্জ্বল সমাধিসৌধের দিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও তিনি যেন নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, কেবল দেখতে পেলেন প্রভাতের আলোয় গোলাপি আলো ছড়াতে লাগল সাদা মার্বেল, তপ্ত দ্বিপ্রহরের সূর্যের নিচে হীরার মত উজ্জ্বল আর আঁধার ঘনিয়ে আসতেই হয়ে গেল বেগুনির মত মোলায়েম, মুক্তোরমতন গম্বুজের ছায়া চেপে ধরল চারপাশ থেকে। এরপর ভেলভেটের ন্যায় অন্ধকার চিরে লণ্ঠনের আলোয় জ্যোৎস্নালোকিত ফটকদ্বারে উদয় হল এক নারী। চেহারা না দেখতে পেলেও তিনি জানেন এ নারী মমতাজ...

ধীরে ধীরে বাগানের মাঝে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন, নিঃশ্বাসের সাথে পাচ্ছেন চম্পা ফুলের ভারী সুবাস। অনুসরণ করে চললেন সমাধির দিকে প্রবাহিত হওয়া রুপালি জলের ধারার মার্বেল চ্যানেল। যতই তিনি এগোতে লাগলেন, জীবন ফিরে পেল মার্বেলের ঝরনার সারি। বাতাসে ছুড়ে দিতে লাগল উজ্জ্বল রত্নের ন্যায় জলবিন্দু। শাহজাহানের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে প্রবেশপথে অপেক্ষারত মমতাজের দিকে। মনেপ্রাণে চাইছেন আরো দ্রুত ছুটে যেতে কিন্তু কথা শুনছে না পা জোড়া, এমনকি নিঃশব্দে

হাত উঁচিয়ে যখন মমতাজ ডেকে উঠলো তখনো তিনি ছুটতে পারেননি। মমতাজের মুখ এখনো ছায়া ঘেরা কিন্তু গলার চারপাশে থাকা রত্ন ছড়াতে লাগল আলো, কোমর আর কব্জিতেও রত্নের সমাহার। আর কয়েক কদম এগিয়ে গেলেই পত্নীর কাছে পৌঁছে যাবেন তিনি, কিন্তু হঠাৎ করেই কাঁপতে কাঁপতে হারিয়ে গেল নারী শরীরের অবয়ব।

হতাশ হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ধূসর সমাধিতে উঠে গেলেন তিনি, স্পর্শ করলেন দুগ্ধ মসৃণ মার্বেল, ভাবলেন শীতলতার ছোঁয়া পাবেন। এর পরিবর্তে স্বচ্ছ পাথর হয়ে গেল সিল্ক আর মানব মাংসের ন্যায় উষ্ণ-মমতাজের দেহ। মনে হল বহু বছরের প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে, পাথরে চেপে ধরলেন নিজের ঠোঁট। সমাধিসৌধ হয়ে গেল স্বয়ং মমতাজ। চারপাশে শুধু মমতাজের রত্নের সমাহার, যেগুলি তিনি পছন্দ করতেন জীবিত থাকাকালে। এমেরাল্ড, রুবি, অ্যামেথিস্ট, কোরাল ঠিক তেমনিভাবে আলোকিত হয়ে আছে সাদা মার্বেলের উপর ঠিক যেমনি এগুলো উজ্জ্বলতা ছড়াতো তাঁর দেহে। শাহজাহান হাত বাড়িয়ে সমাধি আলিঙ্গন করতে চাইলেন, কিন্তু নিজের শয়নকক্ষের গাঢ় অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে।

উঠে বসে নিজের চারপাশে তাকাতে লাগলেন। হতবিহ্বল হয়ে পড়েছেন। বিছানা থেকে নেমে হেঁটে গেলেন গরাদবিহীন জানালার কাছে, চোখ রাখলেন অন্ধকারে, ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে তাপ্তি নদীর বহমান রেখা, মনে পড়ে গেল তিনি আগ্রা আর অস্থায়ী সমাধিতে শুয়ে থাকা মমতাজের কাছ থেকে বহু দূরে। চারপাশ থেকে চেপে ধরা এই বিরান ভূমিতে কেমন অদ্ভুত লাগল নিজেকে। মমতাজের মৃত্যুর আগে একত্রে প্রায়ই তাঁরা গল্প করতেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে কাশ্মির যাবেন। আর কখনোই যেতে পারবেন না একসাথে সেখানে—কখনোই ঘুরে বেড়ানো হবে না বেগুনি ক্রোকাসের মাঠে অথবা তুষার ছাওয়া পর্বত থেকে আসা হিম বাতাস অনুভব করতে পারবেন না আর না পারবেন পদ্মেভরা হ্রদে নৌবিহারে যেতে। কিন্তু রাতের আধারের দিকে তাকিয়ে মমতাজ আর নিজের কাছে শপথ করলেন; খুব দ্রুত সমাপ্তি টানবেন এই যুদ্ধের আর স্বচক্ষে সমাধি নির্মাণের দেখভালের জন্য আগ্রা ফিরে যাবেন।

একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর তৈরি করা রক্তলাল বর্ণের তাঁবুর নিরাপদ শামিয়ানায় নিচে দাঁড়িয়ে চারপাশে নিচু অঞ্চল জরিপ করে দেখলেন শাহজাহান। এই তাঁবুই বর্তমানে তাঁর কমান্ড সেন্টার হিসেবে কাজ করছে। বর্ষার আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত ঝরে পড়ছে বৃষ্টিকণা। ভারী বৃষ্টির ফলে এরই মাঝে তাঁবুর চারপাশে কাদা জমে গেছে। তিন সপ্তাহ আগে শেষ হয়েছে খরার কাল। তারপর থেকেই ক্রমাগত বৃষ্টি। সব জায়গাতে মাটি এতটাই শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছিল যে দ্রুত এত পানি শুষে নিতে পারেনি। কয়েক জায়গায় বন্যার তোড়ে ভেসে গেছে মানুষ আর পশু—যারা কিনা কিছুদিন আগেই হাহাকার করেছে পানির জন্য। গাছে গাছে আর ঝোপঝাড়ে কুড়ি মেলতে শুরু করেছে সবুজ পাতা। ছোট ছোট কমলা গোলাপি রঙের জংলি ফুলও দেখা যাচ্ছে, গান গাইছে হাজারো পাখি। সর্বত্র শুরু হয়ে গেছে প্রাকৃতিক জীবনের জয়গান। এতসব কিছুর মাঝে বিষণ্ন কেবল মোগল সম্রাট, প্রতিনিয়ত উদ্বেগে ভুগছেন শেষ এই পরাজয়ের আশংকায়।

প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও বোরহানপুর থেকে দ্রুত প্রস্থানের উদ্দেশ্যে নিচের সেনাবাহিনী নিয়ে এই পানিতে ডোবা মনুষ্যবর্জিত অঞ্চলে এসেছেন। কেননা বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে যে বিজাপুরি সৈন্যদের শেষতম বড়সড় একটি দল মাত্র দুই দিনের দূরত্বে একটি বন্য এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। এখন বহু চিন্তা-ভাবনার পর মমতাজের মৃত্যুর পর থেকে অসংখ্য নির্ঘুম রাতের মত আরো একটি রাত পার করে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছেন শাহজাহান।

'সেনাপতিদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' চিৎকার করে পরিচারককে জানালেন। শীঘ্রই সকলে পৌছে গেলে পর ভৃত্যদের দেয়া নিচু টুলে বসে পড়ল সবাই শামিয়ানার নিচে। বৃষ্টি সত্ত্বেও অশোক সিং বরাবরের মতই স্বর্ণের কারুকাজওয়ালা মেরুন টিউনিক আর উপরের কোট গায়ে দিয়ে রঙিন আর অভিজাত বেশ নিয়ে হাজির হয়েছে। গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের গোঁফ পরিষ্কারভাবে আঁচড়ানো আর সুগন্ধিও মেখেছে তাতে। কিন্তু অন্য সেনাপতিদের অবস্থা কাদাতে একেবারে নাজেহাল। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে আওরঙ্গজেব। পিতার কাছে আর্জি জানিয়ে শাহ সুজার পরিবর্তে এই অভিযানে এসেছে সে। কিন্তু শাহ সুজাকেই

নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল শাহজাহানের। যদি না ছেলেটা তার সহিসের নির্দেশে অসমর্থ ঘোটুকী নিয়ে পোলো খেলতে গিয়ে কাঁধের হাঁড় নাড়িয়ে নিত।

সবাই এসে পৌঁছালে শুরু করলেন শাহজাহান। 'কিভাবে এ অনুপ্রবেশকারীদের চিরতরে শেষ করে দেয়া যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। বলপূর্বক শিকারি প্রাণীর মত আমাদের জমিতে উদয় হয়েছে, এখন তাদের মোকাবেলাও একইভাবে করব আমরা। ঠিক যেভাবে আমার পূর্বপুরুষেরা অনুর্বর ভূমিতে শিকার করতেন, আবদ্ধ জায়গায় আটকে ফেলে, তেমনিভাবে আমরাও শত্রুকে চারপাশ থেকে ফাঁদে আটকে ফেলব যেন পালাবার পথ না থাকে। গুপ্তচর মারফত প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে শত্রুরা প্রায় পাঁচ মাইল দূরে দক্ষিণ দিকে ঘন জঙ্গল মত এলাকায় আছে। অশোক সিং, আমি চাই তুমি আমাদের অশ্বারোহীদের মাঝ থেকে শ্রেষ্ঠ পাঁচ হাজার জনকে নির্বাচন করে সবার পেছনে একজন করে বন্দুকবাজকে নেয়ার আদেশ দাও। এরা জঙ্গল ঘিরে ফেলবে—গুপ্তচর খবর দিয়েছে এটি প্রায় ছয় মাইল বিস্তৃত। একে অন্যের মাঝে চার গজ দূরত্ব রেখে অগ্রসর হবে তারা।'

'আপনি বিজাপুরি সৈন্যদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করতে চান?'

'প্রথম দিকে হ্যাঁ, তাই, কিন্তু আমাদের ফাঁদ পাতা শক্তিশালী হয়ে গেলে আমি চাই শত্রুরা জানুক যে আমরা আসছি। আমাদের সৈন্যরা গাছপালার ভেতরে প্রবেশ করার পর, যখন চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলব আমরা, আমি ইশারা করলেই চিৎকার চেঁচামেচি এমনকি বাদ্য বাজানো শুরু করবে মোগল সৈন্যরা। চারপাশ থেকে শব্দ পেয়ে শত্রুরা বুঝতে পারবে যে পালানোর পথ নেই, আমরা একসাথে তাড়া করব তাদের ঠিক যেমন শিকারে গিয়ে করে থাকি; এরপর শুরু হবে আক্রমণ। এর মাঝেও যদি কেউ আমাদের ব্যুহ ভেঙে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হয় তাহলে জঙ্গলের কিনারে থাকা বন্দুকবাজ সহ অশ্বারোহী তার ভবলীলা সাঙ্গ করবে। পরিষ্কার হয়েছে পুরো ব্যাপারটা?'

'আমরা কি বন্দি নিব, জাহাপনা?' জানতে চাইল অশোক সিং।

'না, কোন বন্দি নয়।' অশোক সিংকে বিস্মিত হতে দেখে শাহজাহান ব্যাখ্যা করে বললেন, 'তোমরা রাজপুতেরা যুদ্ধে কোন দয়া চাও না, মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই কর। কিন্তু রাজপুতরা সম্মানীয় যোদ্ধা। যদি তারা কখনো

আমার মিত্র না হয়ে শত্রু হয়—আশা করি কখনো এমনটা হবে না—যে দয়া চাইবে আমি তাকে ছেড়ে দেব। কিন্তু এই বিজাপুরিরা আমার ভূমিতে রক্ত আর বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই আনেনি, আমার স্ত্রীর জীবনও কেড়ে নিয়েছে। আত্মসমর্পণের প্রতিটি সুযোগ নষ্ট করেছে আর তাই দয়া ভিক্ষা পাবার অধিকারও হারিয়ে ফেলেছে—যদি তারা তা চায়ও।'

অশোক সিং কিছুই বলল না, কিন্তু কথা বলে উঠল আওরঙ্গজেব।' 'আব্বা হুজুর, আক্রমণের সময় আমি সঙ্গী হতে পারি?'

দ্বিধায় পড়ে গেলেন শাহজাহান। তিনি নিজেও যখন প্রথম যুদ্ধে গিয়েছেন তখন আরো খানিকটা ছোট বয়সী ছিলেন। 'ঠিক আছে। কিন্তু সত্যিকারের যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে না।'

'আব্বা হুজুর...'

'না! আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করব না। হয় তুমি নিরাপদ দূরত্বে থাকবে নতুবা আসবেই না সাথে।'

'এই ব্যাপারে না। আমি আপনাকে জানাতে চেয়েছি যে বিজাপুরিদেরকে ছাড় না দেয়ার আপনার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সঠিক হয়েছে। তারা এর যোগ্য নয়। আর বিশ্বাসঘাতকতার পুরো মূল্য পরিশোধ করতে হবে এখন।'

'ভালো।' মাথা নাড়লেন শাহজাহান। বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও নিজের দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করতে কখনো পিছপা হয় না আওরঙ্গজেব। নিজের বিশ্বাসের প্রতি অটুট ভক্তি আছে তার, হোক সেটা ন্যায় অথবা অন্যায়। ভাইদের সাথে তর্কযুদ্ধের সময়ও নিজের সঠিক অবস্থান ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর সে, এক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয় নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতও ব্যবহার করে।

এক ঘণ্টা পরে, তিন মাইল অতিক্রম করে চলে এসেছে—প্রধান সারি। যদি সবকিছু ভালয় ভালয় হয়—চারপাশে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি থামারও কোন লক্ষণ নেই—মধ্যাহ্নের মাঝেই ঘন জঙ্গলে পৌঁছে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

কাঁধের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকালেন সম্রাট, দেখতে পেলেন খুব বেশি দূরে নেই আওরঙ্গজেব। টিউনিক আর রুপালি বুকবর্ম পরিহিত আওরঙ্গজেবের মুখমণ্ডলে গভীর মনোযোগের ছাপ। পিচ্ছিল পথে নিজের

ঘোড়া ছোটানোতে মনোযোগ দিলেন শাহজাহান, চারপাশে কাদার ছিটে উঠতে লাগল, স্টিলের তৈরি ঘোড়ার শিরস্ত্রাণের ছিটে লাগল আর রত্নখচিত শিরস্ত্রাণের নিচে সম্রাটের মুখমণ্ডলেও পড়ল ছোট ছোট দাগ।

শীঘ্রই অবশ্য থেমে গেল বৃষ্টি, সামনে দক্ষিণ দিকে ঘন জঙ্গলের দেখা পেলেন শাহজাহান। এক ঘণ্টার চারভাগের এক ভাগ সময়ের মাঝেই রায় সিংয়ের নেতৃত্বে একদল সৈন্যও উদয় হল একই পথে।

'সবকিছু ঠিক আছে, জাহাপনা।' ভেজা শরীরে লম্বা চুল উড়িয়ে সংবাদ দিল গুপ্তচর। 'বিজাপুরিরা এখনো জঙ্গলের ভেতরে আর যতদূর আমি বলতে পারি যে আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তাদের। এখন বৃষ্টি থেমেছে তাই রান্না করার আগুন জ্বেলেছে—দেখুন।'

পরিষ্কারভাবে দেখা গেল যে জঙ্গলের মাঝে বেশ কয়েক জায়গা থেকে হালকা ধোঁয়ার সর্পিল রেখা দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে বিজাপুরিরা একটা জায়গায় জড় হয়ে না থেকে পুরো জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে। 'যদি তারা খেতে চায় তাহলে জলদি করাই ভালো—এটাই তাদের শেষ খাওয়া হতে চলেছে। নজর রাখো। সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলেই সাথে সাথে খবর পাঠাবে। নচেৎ ঘিরে ফেলার সাথে সাথেই জঙ্গল ঢুকে পড়ব আমরা।'

দ্রুত নিজের সেনাপতিদেরকে সর্বশেষ নির্দেশ জানিয়ে দিলেন শাহজাহান। 'বনের চারপাশে তোমাদের সৈন্যদের পাঠিয়ে দাও। উত্তরের কিনার থেকে যারা ঢুকবে আমি তাদের সাথে যোগ দেব আর সেখান থেকেই নির্দেশ পাঠাবো। আওরঙ্গজেব, তুমি এখানেই থাকো। বিক্রম দাস—পুত্রের নিরাপত্তার রক্ষার দায়িত্ব ভার তোমাকে দিলাম আমি।'

মাথা নাড়ল সেনাপতি। নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকাল আওরঙ্গজেবের দিকে। যেন তরুণ শাহজাদাকে নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দিহান সে। বুঝতে পারলেন শাহজাহান। 'আওরঙ্গজেব আমি কি তোমার প্রতিশ্রুতি পেতে পারি যে তুমি এখানেই থাকবে, যুদ্ধে অংশ নেবে না?' মুহূর্তখানেক দোলাচলে দুলে উঠে মাথা নাড়ল তাঁর পুত্র।

দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে ঘোড়া নিয়ে আগে বাড়লেন শাহজাহান, বনের চারপাশে জড় হওয়া অশ্বারোহীদের সাথে যোগ দিলেন। অশ্বারোহী

সৈন্যদের পেছনে বসে থাকা বন্দুকবাজদের পিঠে রাখা তাদের লম্বা ব্যারেলঅলা অস্ত্র আর বারুদ ঢুকানোর শিক, কাঁধে ঝুলছে বারুদের ব্যাগ। গাছ থেকে এত বেশি পানি ঝরে পড়ছে যে মনে হচ্ছে এখনো বৃষ্টি হচ্ছে, এর নিচ দিয়ে এগিয়ে গেলেন শাহজাহান ও তাঁর সৈন্যরা। গলা বেয়ে বুকবর্মের নিচে ঢুকে পড়ছে পানির ধারা, জঙ্গলের মাটি ভেজা, পিচ্ছিল। জায়গায় জায়গায় ঘোড়ার পা দেবে যাচ্ছে কাঁদার মাঝে। আরো ঘন হচ্ছে ঝোপঝাঁড়।

গভীর মনোযোগ দিয়ে চারপাশে কান পাতলেন সম্রাট। কিন্তু ঘোড়ার খুরের শব্দ আর মাঝে মাঝে তাদের ডাক ও নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। বিজাপুরিরা এখনো দূরে আছে তাই এগিয়ে আসা আক্রমণকারীদের শব্দ শুনতে পায়নি, কিন্তু খুব বেশি দূরেও নেই।

তলোয়ার উঁচু করে মাথা ঘুরিয়ে রাজাপুতদের উদ্দেশে প্রাচীন রণহুঙ্কার ছাড়ল অশোক সিং, 'অগ্রসর হও, সূর্য চন্দ্র আর আগুনের সন্তানেরা, সম্মান অথবা মৃত্যু।' চারপাশে সৈন্যরা শুরু করে দিল চিৎকার, অস্ত্রের ঝনঝনানি, বাদ্য বাজানো। পুরো জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল শব্দের মূর্ছনা, সাম্বা হরিণ সতর্ক হয়ে চিৎকার শুরু করল, গাছের আশ্রয়ে থেকে আতঙ্কে কিচিরমিচির করে উঠল কবুতব আর ঘুঘুর দল। সময় হয়ে গেছে, বন্দুকবাজরা ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে বসে অস্ত্র প্রস্তুত করে রাখল যেন অশ্বারোহী সৈন্যদের ধাওয়া খেয়ে কোন বিজাপুরি সৈন্য বের হবার চেষ্টা করলেই গুলি করা যায়। উত্তেজিত বক্ষ নিয়ে চারপাশে পড়ে থাকা পাতার দিকে তাকালেন শাহজাহান, ডান হাতের আঙুলগুলো সজোরে চেপে বসল তলোয়ারের বাঁটের উপর।

মুহূর্তের মাঝে চিৎকারে কান পাতা দায় হয়ে পড়ল। হঠাৎ করেই খানিকটা বাম পাশে নিচু ঝোপঝাড় পেরিয়ে পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলেন বেশ কয়েকটি তাঁবু আর ঘোড়া। 'বন্দুকধারীরা, নিচে নেমে যার যার অবস্থানে চলে যাও। সবাইকে জানিয়ে দাও, এ আদেশ।' বলে উঠলেন সম্রাট। 'অশ্বরোহীর দল নির্দিষ্ট সারি বজায় রেখে অগ্রসর হবে কেউ যাতে ঢুকতে না পারে।' তাঁর বাম এবং ডান পাশে অশোক সিংয়ের ঘোড়সওয়ারা, হাতে প্রস্তুত বর্শা থকথকে কাদার মাঝে যত দ্রুত সম্ভব ঘোড়া ছোটালো সকলে।

খোলা জায়গায় বের হয়ে আসার সাথে সাথে শাহজাহান অনুভব করলেন যে কিছু একটা ছুঁয়ে চলে গেছে তাঁর গাল; কালো রঙের উড়ন্ত তীর এসে পড়েছে তাঁর খুব কাছে কাদার মধ্যে। চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পেলেন ধনুধারীকে—লম্বা চুলঅলা এক তরুণ—দূরত্ব ত্রিশ মাইল ও হবে না, দাঁড়িয়ে আছে একটা তাঁবুর সামনে আর নার্ভাস ভঙ্গিতে ধনুকে দ্বিতীয় তীর ঠিক করে নিচ্ছে। মাত্র একটা পদক্ষেপে শাহজাহান বের করে আনলেন নিজের জোড়া স্টিলের ফলার ছুরি, বাতাসে ভাসিয়ে দক্ষ হাতে ছুড়ে মারলেন। ছুরির মাথা গিয়ে ঢুকে গেল ছেলেটার গলার মাঝে; হাঁটু ভেঙে বসে খামচে ধরে আঙুলের ফাঁক গলে বের হওয়া রক্ত আটকাতে চাইল হতভাগ্য তরুণ।

শাহজাহানের চারপাশে অশ্বারোহীরা চটপট এগিয়ে গেল বিজাপুরিদের দিকে। কিন্তু বড়জোর জনা ত্রিশেক বিজাপুরি সৈন্য দেখা গেল। সম্রাট তাকাতেই দেখতে পেলেন অশোক সিং নিজের ঘোড়ার উপর খানিকটা উপুড় হয়ে আরেকজন ধনুকবিদের মাথা কাঁধ থেকে আলাদা করে ফেলল অস্ত্রের একটা মাত্র কোপ দিয়ে; কাদা মাটিতে মাখামাখি হয়ে গড়াতে গড়াতে কাটা মাথা গিয়ে থামল একটা গাছের শিকড়ের মাঝে। ধড়বিহীন শরীরটা খানিকক্ষণ সোজা হয়ে থেকে আস্তে করে কাত হয়ে পড়ে গেল কাদার মাঝে। অন্য বিজাপুরি সৈন্যরা জঙ্গলের আরো গভীরে পালিয়ে যেতে চেষ্টা শুরু করে দিল। এদিকে আবার বারুদের গন্ধ আর বন্দুকের কড়কড় আওয়াজ শুনে শাহজাহান বুঝতে পারেন যে, নিশ্চয়ই কয়েকজন নির্বোধ বিজাপুরি চেষ্টা করেছিল বন্দুকধারীদের সৃষ্ট দেয়াল ভেঙে পার হতে। 'ঘোড়াগুলোকে মুক্ত করে তাঁবুগুলোতে আগুন ধরিয়ে দাও।' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। কিন্তু প্রায় সাথে সাথে শুনতে পেলেন আরেকটা চিৎকার 'বিজাপুরি সৈন্য এখানে আমার কাছে।'

ঘোড়া ঘুরিয়েই পরিষ্কার জায়গার দূরতম কোণে ত্রিশ-চল্লিশ জনের সশস্ত্র অশ্বারোহী দল দেখতে পেলেন শাহজাহান। নেতৃত্ব দিচ্ছে লম্বা এক সৈন্য। আবদ্ধ জায়গায় আটকে পড়া সৈন্যদের চেয়ে তারা নিশ্চয়ই আরো ভালোভাবে প্রস্তুত হবার সময় পেয়েছে, কিন্তু এখানে কাদা মাটিতে মাখামাখি হয়ে আছে রক্ত।

'আবারো দলবদ্ধ হও' চিৎকার করে নিজের লোকদের আদেশ দিলেন শাহজাহান, 'সারি ঠিক করে একত্রিত হও।' গাছের আড়ালে

হয়তো আরো বিজাপুরি সৈন্য লুকিয়ে থাকতে পারে, তিনি চান না তাঁর সৈন্যরা তাড়াহুড়োয় কোন ফাঁদে পা দিক।

ডান এবং বাম পাশ থেকে, দৃষ্টিসীমার বাইরে শুনতে পেলেন মোগল সৈন্যদের সাথে বিজাপুরি সৈন্যদের যুদ্ধের শব্দ। যদিও ঠিকভাবে বলতে পারবেন না যে কীভাবে কী হচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করেন যে তাঁর সৈন্যরা নিশ্চয়ই তাদের জন্য দেয়া নির্দেশ স্মরণে রেখে নিয়ম বজায় রাখবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চারপাশের ব্যূহ ঠিক রেখে সামনে এগিয়ে চলা, শত্রুকে ধাওয়া করে একটা জায়গায় আবদ্ধ করে ফেলা যেখান থেকে তাদেরকে ধ্বংস করা সহজতর হবে।

বিজাপুরি অশ্বারোহীরা বুঝতে পারলো যে তারা সংখ্যায় নগণ্য, তাই খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করাটা উচিত হবে না। তার পরিবর্তে পেছনে ঘটে যাওয়া সংঘর্ষ থেকে বেঁচে যাওয়া দুই/তিনজনকে নিয়ে এরই মাঝে ঘোড়া ঘুরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে গহীন জঙ্গলে।

তাদের পেছনে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে শাহজাহান উপলব্ধি করলেন যে সামনে তেমন গভীর নয়, গাছের চেয়ে ঝোপঝাড় বেশি, মাটিতেও সূর্যের আলো এসে পড়েছে যেখানে সেখানে, তবে মাটি বেশ ভেজা। প্রথম প্রথম বিজাপুরিদের পদচিহ্ন দেখে অনুসরণ করা কঠিন হল না। ভাগ্য সহায় থাকলে এভাবেই তাঁরা মূল শিবিরে পৌঁছে যেতে পারবেন। প্রখর হল সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতা, কাদার মাঝে আয়নার মত প্রতিফলিত হচ্ছে, গরম হয়ে উঠেছে বাতাস, শাহজাহানের দুই কাঁধের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম বিন্দু। কানের কাছে পিনপিন করছে মশার দল, চারপাশে তাকালেন সম্রাট, কে জানে কোন ঝোপ কিংবা পড়ে থাকা গাছের আড়ালে কোন বিজাপুরি লুকিয়ে আছে কিনা হঠাৎ আক্রমণের উদ্দেশ্যে, দেখা গেল না কাউকে।

হঠাৎ করেই সামনের দিকে ঝুঁকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল শাহজাহানের ঘোড়া। আরেকটু হলেই ফেলে দিচ্ছিল তাঁকে। রীতিমত যুদ্ধ করে ঘোড়াকে শান্ত করলেন সম্রাট। কিন্তু আবারো চলার চেষ্টা করতেই টলমল করে উঠল অবোধ প্রাণীটা। হাত তুলে নিজের দু'পাশের সৈন্য সারিকে থামার নির্দেশ করে ঘোড়া থেকে নামলেন শাহজাহান। এরপর হাত ঢুকিয়ে দিলেন ঘোড়ার সামনের ক্ষুরের লোমের মাঝে। বাম ক্ষুর স্পর্শ করতেই ব্যথায় ককিয়ে উঠল ঘোড়া। 'আমার ঘোড়া চলার শক্তি

হারিয়েছে।' অশোক সিংকে ডেকে বলে উঠলেন সম্রাট। অপেক্ষা করছেন আরেকটা বাড়তি ঘোড়া আসার, এমন সময় পঞ্চাশ গজ দূরে নিচু পাহাড়ের উপর দেখতে পেলেন উদয় হল এক একাকী ঘোড়সওয়ার। সূর্যের আলো পড়ে চকচক করে উঠল শিরস্ত্রাণ। বিজাপুরিদের সাহায্যে এগিয়ে আসা সেই সেনাপতির হাতে উড়ছে সোনালি হলুদ সিল্কের ব্যানার—বিজাপুরের রং—নির্ঘাৎ শান্তিচুক্তির পতাকা। ফুসফুসের সমস্ত জোর খাটিয়ে চিৎকার করে উঠল সেনাপতি, 'আমি আমাদের সেনাপ্রধানের কাছ থেকে একটা বার্তা এনেছি। জাহাপনা, আমরা জানি যে আপনার বাহিনী আমাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। উভয় পক্ষেই আর রক্তপাত না ঘটিয়ে আমরা আত্মসমর্পণ করতে চাই।'

'তোমার স্মৃতিভ্রম হয়েছে বিজাপুরি।' উত্তর দিলেন শাহজাহান। 'আগে একবার আত্মসমর্পণের প্রস্তাব ভঙ্গ করেছ তোমরা, মৃত্যুবরণ করেছে নিরপরাধ লোক। আজ আর কোন দর কষাকষি হবে না। শান্তিচুক্তি পতাকার নিরাপত্তা পাবার কোন অধিকার নেই বিশ্বাসঘাতকদের, তাই আমি ধরার আগেই চলে যাও।' মানুষটা তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতেই আকাশের দিকে তাকালেন শাহজাহান। সূর্যের অবস্থান দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এখনো তেমন বিকাল হয়নি। যদি আল্লাহ চান তো সূর্যাস্তের মাঝেই বিজয়ী হবেন তিনি।

চল্লিশ মিনিট পরে শত্রুর বন্দুক থেকে ন্যাকড়া পেঁচানো বল এসে আঘাত করতেই শাহজাহান বুঝতে পারলেন যে শত্রুসৈন্যদের মূল ঘাঁটির অবস্থানের কাছে চলে এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে কয়েজ গজ বাম পাশে এক তরুণ রাজপুত্র সৈন্যের উরুতে লাগল প্রথম বল। রক্ত ঝরতে লাগল ক্ষত থেকে। কাত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল তরুণ। আরেকজন অশ্বারোহী চিৎকার করেই উপুড় হয়ে পড়ে গেল নিজের ঘোড়ার উপর, হাত থেকে পড়ে গেল বর্শা। তৃতীয় আঘাত লাগল একটা ঘোড়ার গলাতে, পরপর দু'বার ধীরে ধীরে পড়ে গেল ঘোড়াটা, তার আগে সময় দিল নিজের আরোহীকে নিরাপদে লাফ দিয়ে সরে যাবার জন্য। মুহূর্তের জন্য সারা শরীর কেঁপে উঠল অবলা জীবটার, তারপর ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল কাদা মাটিতে, অবশেষে স্থির হয়ে গেল।

'নিচু হয়ে থাকো।' গর্জন করে আদেশ দিলেন সম্রাট, আগে বাড়লেন ঘোড়া নিয়ে। খোলা ঝোপের মাঝ দিয়ে বড়সড় একটা তাঁবু দেখতে

পেলেন, বুঝতে পারলেন এর পেছনেই আছে বেশির ভাগ বিজাপুরিরা। ব্যারিকেড হিসেবে উল্টো করে ফেলে রেখেছে রসদবাহী গাড়ি। কিন্তু চারপাশ থেকে ঘিরে থাকায় বুঝতে পারছে না এর চেয়ে অবস্থান ভাল করা যায় কীভাবে অথবা কোথায় আশ্রয় নেয়া যায়। চারপাশ থেকে কেবল শোনা যাচ্ছে এগিয়ে আসা মোগল সৈন্যদের রণহুঙ্কার। প্রতিরক্ষা ব্যূহ এখনো ঠিক আছে আর তিনি যেভাবে পরিকল্পনা করেছেন সেভাবেই চারপাশ থেকে এগোচ্ছে সৈন্যরা একসাথে ভাবতেই অভিযান শেষ করার তাড়নাতে নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন শাহজাহান।

ঝটকা মেরে বাম পাশে সরে গিয়ে তাঁবু ঘুরে এগিয়ে গেলেন বন্দুকের গুলি ভরার কাজে ব্যস্ত থাকা বিজাপুরি বন্দুকধারীর দিকে। মানুষটার ডান বাহু ছুঁয়ে ফেলল তাঁর ফলা; ফলে হাত থেকে বন্দুক আর বারুদ ঢোকাবার শিক ফেলে দিয়ে চিৎকার করে দৌড় লাগালো বিজাপুরি। আবারো আঘাত হানলেন শাহজাহান। বন্দুকধারীর পিছন দিক উন্মুক্ত হয়ে দেখা যেতে লাগল হাড়। ঘুরতেই দেখতে পেলেন হলুদ পাগড়ি পরিহিত এক বিশালদেহী লোক ডান হাতে সড়কি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা উল্টো করে রাখা গাড়ির গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে। ঠিক সেই সময়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক মোগল সৈন্য, মানুষটা সর্বশক্তি দিয়ে হাতের সড়কি ঢুকিয়ে দিল ঘোড়ার পাকস্থলিতে। পড়ে গেল ঘোড়া, নিজের উরুর ফাঁকে আটকে ফেলল মোগল সৈন্যকে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছে মোগল সৈন্য এমন সময় হলুদ পাগড়ি মাথায় বিজাপুরি সৈন্য লাফ দিয়ে চড়ে বসল তার উপর। দুই হাতে মাথার উপর তুলে ফেলল ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত গড়াতে থাকা সড়কিটাকে। এতটাই মগ্ন নিজের কাজে যে লোকটা শাহজাহানকে দেখতে পেল না এগিয়ে আসতে, যতক্ষণে দেখতে পেল অনেক দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। নিজের ঘোড়ার পিঠে নিচু হয়ে লোকটার ঘাড়ে তলোয়ার চালালেন সম্রাট, অর্ধেক কাটা মাথা নিয়ে নিজের রক্তের পুকুরেই খপ করে পড়ে গেল বিজাপুরি সৈন্য।

কিন্তু হঠাৎ করেই যেন দুলতে লাগল শাহজাহানের পৃথিবী। নিজেকে অনুভব করলেন যেন শূন্য। ভাসছেন, তারপর ধপ করে পড়ে গেলেন ভেজা মাটিতে। আহত অবস্থায় ঘোড়ার খোঁজে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পেলেন জন্তুটা হাঁটু গেড়ে বসে আছে মাটিতে। উল্টে রাখা গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়েই এ কাণ্ড ঘটেছে নির্ঘাৎ। কয়েক ফুট দূরত্বে পড়ে আছে তাঁর

তলোয়ার। হ্যাচোড় পাচোড় করে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে অস্ত্র পর্যন্ত গেলেন; কিন্তু সেই মুহূর্তের পেছনে হালকা করে ধাক্কা মারল এক জোড়া জুতা সুদ্ধ পা, তাঁকে ফেলে দিল গভীর কাদা মাটিতে। নাক মুখ ভরে গেল কাদা পানিতে। নিঃশ্বাসের জন্য হাঁসফাঁস করতে লাগলেন তিনি। চেষ্টা করলেন উঠে দাঁড়াতে কিন্তু অনুভব করলেন একটা হাত টেনে ধরল শিরস্ত্রাণ, চুলের মুঠি ধরে বাধ্য করল আবারো পানির মাঝে মুখ ডুবিয়ে রাখতে। দমবন্ধ হয়ে প্রায় মারা যাবার জোগাড়, ফুসফুসে মনে হল আগুন ধরে গেছে। নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে চেষ্টা করলেন আক্রমণকারীর হাত ছাড়াতে কিন্তু লোকটা বেশ শক্তিশালী, প্রতিবার নিশ্বাস নেবার চেষ্টাতে বরঞ্চ নাকে মুখে ঢুকতে লাগল আরো বেশি কাদা পানি। মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলেন সম্রাট। কাপড়ের ভেতর হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগলেন দ্বিতীয় ছুরি। পেয়ে যাবার পর শক্ত হাতে ধরলেন হাতল। অন্ধের মত চালালেন উপর দিকে শত্রুর উদ্দেশে। শূন্য বাতাস কেটে গেল ছুরির ফলা। কানের পর্দা ফেটে মনে হল রক্ত পড়তে থাকবে আরেকটু পরে, আবার চেষ্টা করলেন তিনি। এবার ফলা গিয়ে বিদ্ধ হল কোন একটা পেশীর মাঝে। বিস্মিত উচ্চস্বরের চিৎকার শোনা গেল, সাথে সাথে চুলের মুঠি ধরে রাখা হাতটাও আলগা হয়ে গেল।

গায়ের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে ফেলে দিয়ে একপাশে গড়িয়ে গেলেন শাহজাহান। হাঁ করে মুখ খুলে নিঃশ্বাস নিলেন প্রাণ ভরে। শত্রু লম্বা আর ভারী শরীর—মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে হাত দিয়ে চেপে ধরেছে বুকের বাম পাশের ক্ষত। আরো কয়েকবার গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সম্রাট, এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিলেন। লোকটার পাকস্থলী বরাবর, তারপর জোর করে মাথা চেপে ধরলেন ঠিক সেই কাদা পানির মাঝে যেখানে একটু আগে যুদ্ধ করেছেন তিনি। মানুষটার দুই পায়ের ফাঁকে বসে কাদা মাটির ভেতরে যত শক্ত করে সম্ভব ধরে রাখলেন মাথা। ইচ্ছে মতন হাত-পা ছুড়ে নিজেকে বাঁচাতে চাইল বিজাপুরি সৈন্য। কিন্তু ধরে রাখলেন শাহজাহান। কয়েক মুহূর্ত ভয়ংকরভাবে লাথি চালাল মানুষটার পা জোড়া, তারপরই নিস্তেজ হয়ে পড়ল শরীর। উঠে দাঁড়িয়ে তলোয়ার নিলেন সম্রাট। এরপর খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেলেন উল্টে থাকা গাড়ির কাছে। বুঝতে চাইছেন যুদ্ধের কী অবস্থা।

'জাহাপনা, আপনি ঠিক আছে তো? যুদ্ধের মাঝে আমি আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি।' নিজের ঘোড়া থেকে ঝুঁকে এলো অশোক সিং।

'আমার নতুন ঘোড়াটাও আহত হয়ে পড়ে গেছে।'

'আপনার হাত দিন, জাহাপনা, আমার পেছনে উঠে আসুন।'

যদিও যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তারপরেও মাটিতে থাকার চেয়ে ঘোড়ার পিঠে থাকাটাই নিরাপদ, ঠিকই বলছে অশোক সিং, ভাবলেন শাহজাহান, যদিও চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহগুলো বিজাপুরি সৈন্যদের, প্রতিরোধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দেখতে পেলেন, একটা তাঁবু থেকে বের হয়ে এসেছে চারজন হলুদ পোশাক পরা সৈন্য। হাতের অস্ত্রও ফেলে দিয়েছে। এর একটু দূরেই এক বিজাপুরি সৈন্যকে হত্যা করেছে মোগল অশ্বারোহী, যার তলোয়ার এখনো তার বর্শার মাথার সাথে ঝুলছে রসদবাহী গাড়িতে।

'জাহাপনা, বেশ কয়েকজন বন্দি আটক করেছি আমরা। আপনার নির্দেশ কি এখনো পূর্বের মতনই আছে?'

'হ্যা। হত্যা করো। কিন্তু তাড়াতাড়ি আর নিখুঁতভাবে।'

চারপাশের ধ্বংসলীলার দিকে তাকিয়ে সম্রাট ভাবলেন, মমতাজের মৃত্যু আর তাঁর অসম্ভব যাতনার চেয়ে এ সৈন্যদের মৃত্যুযন্ত্রণা তো কিছুই না। শত্রুর মৃত্যুতেও কোন আনন্দ খুঁজে পেলেন না, শুধু এটুকুই স্বস্তি যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, আর তিনি জয়ী হয়েছেন। অবশেষে তিনি এবার আগ্রাতে ফিরে যাবেন ভালোবাসার স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলার জন্য—ভালোবাসার নারী মমতাজ।

অধ্যায়-০৭

নিচু একটা পর্বতের মাথায় পৌঁছেই সৈন্য সারিকে থেমে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন শাহজাহান। চোখের উপর হাত দিয়ে ছায়া তৈরি করে উত্তরে তাকালেন আগ্রার দিকে। মধ্যাহ্নের তাপে দুর্গের পরিচিত বালিপাথরের দেয়াল ঠিকরে বের হচ্ছে লাল আভা। পর্বতের পাদদেশ থেকে শুরু হওয়া সমভূমির মাঝখানে অবস্থিত শহরের বাইরের দিকে দেখা গেল সৈন্যদের বিশাল লম্বা এক সারি—কেউ ঘোড়ার পিঠে, আবার কেউবা হাতির পিঠে এগিয়ে আসছে মোগল সম্রাট ও তাঁর বিজয়ী সেনাবাহিনীকে ঘরের উদ্দেশ শেষ মাইলটুকু সঙ্গ দেবার জন্য।

যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই দুর্গে পুনঃপ্রবেশ করবেন তিনি—ফটকের সামনে বাদ্য বাজানো হবে, দেয়ালে উড়বে সবুজ পতাকা—কিন্তু তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে কোন ফুল ছোড়া হবে না, কিংবা সোনা রুপা মুদ্রার বৃষ্টি, কোন নর্তকী বা শিল্পীর নাচ গান হবে না, এসব হত যদি মমতাজ এখনো তাঁর পাশে থাকতেন। যখন থেকে দারা আর জাহানারা মমতাজের মৃতদেহ আগ্রা নিয়ে এসেছে, তখন থেকেই তিনি অপেক্ষা করে আছেন এই মুহূর্তটির জন্য। এখন দুঃসহ বেদনাদায়ক মনে হল এই চিন্তা যে রাজকীয় গৃহে ফিরে এসেছেন তিনি, দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে অপেক্ষায় আছেন দুঃখী সম্রাজ্ঞী যিনি কিনা আর কখনো তাদেরকে দেখতেই পারবেন না।

তারপরেও এটি সম্রাটের দায়িত্ব, এটি তাঁকে করতেই হবে। জ্যোতির্বিদরা জানিয়েছে যে প্রত্যাবর্তনের জন্য আজকের দিনটির মত শুভ দিন আগামী কয়েক সপ্তাহে আর পাওয়া যাবে না। তাঁর কাছে এ

ধরনের বিষয়ের কোন গুরুত্ব না থাকলেও জনগণের কাছে আছে। যদিও তিনি সম্রাজ্ঞীকে হারিয়েছেন, এটি আচরণে প্রকাশ করতে হবে যে সৌভাগ্য দেবী এখনো তাঁর এবং রাজবংশের সাথেই আছে। আর এই বার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য পুত্রদের সাথে নিয়ে দুর্গের শহরের রাস্তায় হালকা চালে ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন। দারা শুকোহ্ শহর থেকে সৈন্য দলের সাথে এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে শাহ সুজা, আওরঙ্গজেব আর মুরাদ পিতার মত শোকের সাদা পোশাক পরিহিত হয়ে সবুজ লাগামঅলা সাদা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আছে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করার জন্য।

অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়ে যাবার সাথে সাথে যমুনা হয়ে মমতাজের সমাধিতে যাবেন তিনি। উস্তাদ আহমাদের পাঠানো সংবাদ ছিল কেমন ভাসা ভাসা টাইপের। চোখ সরু করে দুর্গের পিছনে নদীর বাঁকের দিকে তাকালেন শাহজাহান, চেষ্টা করলেন নির্মাণ স্থানটা দেখতে কিন্তু দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়ায় ঢেকে আছে সবকিছু।

'আব্বাজান, দেখেন, দারা এসেছে...' চিন্তার সূতায় বাধা দিল শাহ সুজা।'

পর্বতের নিচে তাকিয়ে দ্রুত ঘোড়া নিয়ে ছুটে আসা দেহ নজরে পড়ল। খুশি হয়ে উঠলেন সম্রাট। আল্লাহ মমতাজকে নিয়ে গেছেন; কিন্তু অনিন্দ্য কান্তি চার পুত্রের মাধ্যমে দীর্ঘজীবী হবে তাঁর রাজবংশ। কৃতজ্ঞ হবার জন্য অনেক কিছুই পেয়েছেন তিনি।

পরের দিন সকাল। শাহজাহান তাকিয়ে আছেন ধূসর, প্রায় বর্ণহীন আকাশের দিকে। দরবারে একজন ইতালীয় বণিকের নিয়ে আসা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রটি অনুযায়ী আজ হচ্ছে বছরের সবচেয়ে উত্তপ্ত দিন। যন্ত্রটি দেখলে বেশ কৌতূহল জাগে। একটা লম্বা কাঁচের টিউবের সাথে লাগানো আছে পানি ভর্তি কাঁচের বাল্ব। টিউবের উপর বেশ কয়েক সারি লাইন। ইতালিয়ান বণিকের কথানুযায়ী গ্যালিলিও নামেক একজন মানুষ এটি আবিষ্কার করেছেন। ইউরোপে নাকি এটি বেশ প্রচলিত। বণিক আসলান বেগকে দেখিয়ে দিয়েছে যে কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হয়। এই

জটিল প্রক্রিয়া দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে দারা শুকোহ্, যদিও যন্ত্রটার কার্যকারিতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান সম্রাট। হিন্দুস্তানের সমভূমিতে প্রায় প্রতিটি দিনই তো গরম, তাই না?

বালিপাথরের মঞ্চ যেখানে আকৃতি পাচ্ছে সে দিকে চলেছেন শাহজাহান। উস্তাদ আহমাদ অপেক্ষা করছেন। বাতাসে ভেসে থাকা বিশ্রী ধুলা গলার মাঝে যেতেই কাশতে লাগলেন তিনি।

'জাহানারা আপনি যদি আমার সাথে ঐ দিকের উঁচু জায়গায় আসেন তাহলে চারপাশের দৃশ্য পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবেন আর বাতাসও ভালো থাকবে।' বলে উঠল উস্তাদ আহমাদ। উত্তাপে শক্ত হয়ে যাওয়া মাটির উপর দিয়ে উস্তাদ আহমাদের সাথে ছোট পাহাড়টার দিকে চললেন সম্রাট। ঠিক কথাই বলেছে তাঁর স্থপতি—এখানে দৃশ্য ভালোই দেখা যাচ্ছে। বিশাল মঞ্চের চারপাশ পরিষ্কার দেখতে পেলেন তিনি—উস্তাদ আহমাদের হিসাব অনুযায়ী ৯৭০ ফুট লম্বা আর ৩৬৪ ফুট চাওড়া—এর উপরেই স্থাপিত হবে সমাধিসৌধ।

'আমার এখনো ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে যে নদীর এত কাছে ভূমি কীভাবে এত ভার বইবে।'

হেসে ফেলল উস্তাদ আহমাদ। 'জাহাপনা, আমি বারংবার হিসাব কষে দেখেছি। আর তাই পুরোপুরি নিশ্চিত যে আমরা ঠিকঠাকভাবেই নদীর তীর শক্তিশালী করেছি, এতেই কাজ হবে। আমি নদীর তীরের কাছাকাছি খনি খননের নির্দেশ দিয়েছি শ্রমিকদেরকে, ঢালু অনুযায়ী গভীরতা কম বেশি করা হবে। এরপর ইট আর চুনা বালি দিয়ে তৈরি মন্ড দিয়ে বাঁধানো হবে এদের পাড়, ভেতরে ভরে ফেলা হবে আরো মন্ড আর আলগা পাথরের টুকরা দিয়ে। এছাড়াও শ্রমিকদেরকে আরো আদেশ দিয়েছি খনির উপর মঞ্চকে ধরে রাখার জন্য খিলান বসানোর জন্য।

'কিন্তু শ্রমিকেরা নদী তীরেও খনন করছে না?'

'হ্যাঁ জাহাপনা। তারা বিশাল বড় বড় গর্ত খুঁড়ছে। এগুলোর মাঝে চুনা-বালি দিয়ে তৈরি মন্ড ভর্তি আবলুস কাঠের বাক্স ফেলা হবে যেন যমুনা নদীর জোয়ার ভাঁটার সময়ে কোন সমস্যা না হয়।'

মাথা নাড়লেন শাহজাহান। সবকিছুই ভেবে রেখেছে উস্তাদ আহমাদ।

'বর্তমানে আমাদের এখানে বিশ হাজার শ্রমিক কাজ করছে। এখানে তাদের থাকার জায়গা।' নির্মাণ স্থানের দক্ষিণ দিকে হাত তুলে দেখালো স্থপতি। 'কুঁড়েঘরের সাথে বণিকদের জন্য চারটি সরাইখানা আছে। প্রতিদিন তাদের উট আর ঘোড়ার গাড়ি এসে পৌঁছায় আর মাঝিরা যমুনা নদীতে বার্জে করে নিয়ে আসে মালপত্র। পরলোকগত সম্রাজ্ঞীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা তাদের শহরের নাম রেখেছে মমতাজবাদ। আমি আশা করি এতে আপনার কোন সমস্যা নেই জাহাপনা।'

'না, ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে বলো যে যা দরকার তার সবকিছু আছে এখানে? যথেষ্ট বালিপাথর এসেছে?'

'হ্যাঁ, এরই মাঝে ভালো একটা মজুদ গড়ে উঠেছে, আপনি তখনো দক্ষিণে ছিলেন; তাই আমি দশ মাইল লম্বা একটি রাস্তা তৈরি করার জন্য শাহজাদা দারার অনুমতি নিয়েছি। যেন স্থানীয় খনি থেকে ষাঁড়ের দল সহজেই পাথর বোঝাই গাড়ি টেনে আনতে পারে। আপনি কি রাজমিস্ত্রীদের কাজ দেখতে চান, জাহাপনা? এখানে তুলার চাঁদোয়ার নিচে কাজ করছে একটি দল।'

সাদা ধুতি পরনে আর কপালে হিন্দুদের লাল তিলক দেয়া একজন মধ্যবয়স্ক লোক ঝুঁকে কাজ করছে বিশাল বড় এক টুকরা চৌকোনা বেলেপাথরের উপর। আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে দুটি অল্প বয়স্ক ছেলে, চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল যে লোকটার ছেলে এরা। শাহজাহান কাছে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলেন যে লোকটা পাথরের টুকরাটার উপর পেরেকের মত কিছু জিনিস এক সারিতে বসিয়ে দিচ্ছে হাতুড়ির বাড়ি মেরে। হঠাৎ করেই সম্রাট আর উস্তাদ আহমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ঝটকা মেরে সোজা হয়ে গেল।

'আমরা বিরক্ত করার জন্য আসি নি। কাজ চালিয়ে যাও।' বলে উঠলেন শাহজাহান।

সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে অতিথিদের দিকে তাকিয়ে আবারো কাজ করা শুরু করল লোকটা। পাথরের উপর কাজ করতে করতে ঘাম ঝরছে তার পেশীবহুল হাত বেয়ে। বেশ কয়েক মিনিট পরে এক ছেলের হাতে ধরিয়ে দিল হাতুড়ি, সে-ও একইভাবে ঘা মারতে লাগল তারপর হঠাৎ করেই নিখুঁতভাবে কেটে গেল পাথর। বড় একটা কাঠের টুকরো

ব্যবহার করে কনিষ্ঠজন একপাশে নিয়ে গেল একটি টুকরো। সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে সদ্যকাটা টুকরাটার উপর আঙুল বুলালো রাজমিস্ত্রী। এরপর ভালো একটা বাটালি তুলে নিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে কিনারাগুলো মসৃণ করে তুলতে লাগল।

'রাজমিস্ত্রীরা তাদের বাটালি দিয়ে পাথরের উপর কাজ করছে আর একেবারে অ্যালবাস্টারের মত মসৃণ না হওয়া পর্যন্ত পলিশ করছে এর উপরিভাগ।'

ব্যাখ্যা করে জানালো উস্তাদ আহমাদ। 'প্রতিটি ব্লক প্রস্তুত হয়ে গেলে জায়গামত তুলে নিয়ে যাওয়া হবে; এরপর ঠিকভাবে নিরাপদে চুল-বালির লোহার পাত আর বন্ধনী দিয়ে জুড়ে দেয়া হবে। এদের মাঝে একটি ফাটলও খুঁজে পাবেন না আপনি।'

কিন্তু মনোযোগ দিয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজ দেখছেন শাহজাহান। পাথরের মাঝে ত্রিকোণা করে একটি গর্ত খুড়ছে লোকটা। 'কী করছো তুমি?'

'আমার চিহ্ন তৈরি করছি। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ আর আমি চাই কোন একটা চিহ্ন রেখে দিতে যেন বোঝা যায় যে এটা আমার কাজ।'

'অন্যান্য রাজমিস্ত্রিরাও একই কাজ করছে, জাহাপনা, আমি বাধা দেয়ার কোন কারণ খুঁজে পাইনি।'

'আর আমিও তা করব না। নিজেদের কাজের প্রতি কারিগরদের এহেন গর্বে আমি খুশি হয়েছি। এটা রাখো।' রাজমিস্ত্রীর হাতে কয়েকটা কয়েন তুলে দিলেন শাহজাহান 'তোমার দক্ষতা আর কাজের প্রতি আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ।'

এরপর ঘুরে তাকালেন, 'উস্তাদ আহমাদ, তোমার নকশা অসাধারণ একটা সৃষ্টি হয়েছে। তারপরেও কী যেন নেই?'

'জাহাপনা?' বিরক্ত হবার বদলে বিস্মিত হলেন উস্তাদ আহমাদ।

সমাধির প্রবেশদ্বারে রত্ন পরিহিত মমতাজকে স্বপ্নে দেখার পর থেকে শাহজাহান ভাবছেন যে কেমন করে একে বাস্তবে রূপ দেয়া যায়। 'আমি সমাধির জন্য আরো গহনা চাই। মার্বেলের মাঝে রত্ন খোদাই করে দেয়া হোক। আমার চেয়ে এ সম্পর্কে ভালো তেমন কেউ জানে না। আমি

নিজে শ্রেষ্ঠ রত্ন নির্বাচন করে দেব রাজকোষ থেকে। যদি কোন পাথরের পর্যাপ্ত মজুদ না থাকে—সবুজ পান্না, হতে পারে অথবা নীলকান্ত মণি—সীমানার বাইরে থেকে আমদানি করব আমি। আর এ কাজ করার সময় আমার কয়েকজন হিন্দু প্রজা আমার সাথে থাকবে, যারা আমি জানি এ কাজ করতে দক্ষ, এই কলাকে তারা বলে পাঞ্চিকূরা—পাথরে খোদাই করা। এছাড়া ইউরোপীয় কারিগরদেরকেও নিয়োগ করতে পারি আমি—কৈশোরে পিতার দরবারে আসা দু'জন ইতালীয়ের কথা মনে আছে আমার। তারা তাদের জন্মভূমির ছবি নিয়ে এসেছিল—ফ্লোরেন্স এই নামেই ডাকছিল—দেখতে মনে হচ্ছিল ছবি, কিন্তু আসলে অর্ধদামি পাথরের ছোট ছোট টুকরার সমাহার।

'মার্বেলের উপর কোন ধরনের আকৃতি আপনি ফুটিয়ে তুলতে চান, জাহাপনা? সম্ভবত জ্যামিতিক নকশা?

'না, ফুল, সবুজ পাতা আর লতানো চারা, এতটাই সত্যি হবে যেন মনে হবে যে সমাধির উপরেই জন্মেছে এগুলো, তাহলে আমার পত্নীর সমাধি জীবন্ত হয়ে উঠবে। আমি আরো কিছু কারুকাজ চাই। আমি চাই অন্য কারিগরেরা ঠাণ্ডা মার্বেলের মাঝে জীবনের স্পন্দন নিয়ে আসবে লম্বা আইরিস আর সরু ডাঁটার টিউলিপ বাতাসে দোল খাচ্ছে এমন দৃশ্য খোদাই করে; ঠিক যেমনটা হয় কাশ্মীরে। আমি জানি যে এটা করা সম্ভব।'

হে প্রশান্ত আত্মা!
প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর,
প্রভু তোমার উপর সন্তুষ্ট এবং তুমিও প্রভুর উপর সন্তুষ্ট থাক।
তুমি আমার বান্দাদের (গোলামদের) সান্নিধ্যে গমন কর।
এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

ইয়া আইয়্যাতুহান নাফসুল মুতমাইন্নাতুর জিয়ী ইলা রাব্বিকি রাদ্বিয়াতাম মারদ্বিয়াহ্ ফাদখুলী ফী ইবাদি ওয়াদ খুলী জান্নাতি। (আল-কোরআন ; সুরা : ফজর : আয়াত-৩)

'কী মনে হয় আব্বাজান? আমি এবং দারা কোরান থেকে সঠিকটিই নির্বাচন করতে পেরেছি? এটা সহজ কাজ ছিল না।' নত স্বরে জানালো জাহানারা।

মাথা নাড়ালেন শাহজাহান। আগ্রাতে ফিরে আসার সাথে সাথেই তিনি তাঁর জ্যৈষ্ঠ সন্তানদের বলেছিলেন শব্দ বাছাই করতে। ফটকের কাঠামোর চারপাশে খোদাই করার জন্য, এ পদ সম্পূর্ণভাবে উত্তম। দর্শনার্থীদেরকে মনে করিয়ে দিবে যে তারা একই সাথে একটি পবিত্র স্থান আর একটি পৃথিবীর স্বর্গে প্রবেশ করছে।

'আমি আমানত খানকে নির্দেশ দেব শব্দগুলো খোদাই করে তারপর যেন পাথরকাটা কারীদের কাছে দেয়া হয় মসৃণ করে তোলার জন্য।'

'তিনি একজন সত্যিকারের কলাকার। তাঁর ক্যালিগ্রাফি বেশ প্রাণবন্ত।'

'এই কারণেই তাকে সিরাজ থেকে ডেকে পাঠিয়েছে আমি।'

শাহজাহান টেবিলের উপর তাকালেন। পুরো ভবনটির কাঠের একটি মডেল রাখা আছে সেখানে। চারটি সাদা মিনার মার্বেল মঞ্চের চারপাশে—বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। সম্রাটকে বুঝিয়ে বলার সময় উত্তেজিত উস্তাদ আহমাদ এদের নাম রেখেছে 'স্বর্গের সিঁড়ি,' এগুলো নাকি নকশার মাহাত্ম্য বাড়িয়ে তুলবে। এ মডেলটার দিকে তাকিয়ে থেকেই সন্তুষ্ট হয়ে যান শাহজাহান। কিন্তু এরপরই হাসি মুছে গেল মুখ থেকে।

'অনেক বছর লেগে যাবে এ সমাধির প্রস্তুত হতে, তারপরই কেবল মাত্র বরণ করে নেবে তোমার আম্মাজানের শরীর। এর মাঝে কাজের তদারকি আর বিল পরিশোধ করা এটুকুই করতে পারি আমি।'

'আপনি কি চান আমি বিল দেখাশোনা করি? সাম্রাজ্যের প্রথম শাহজাদি হওয়া সাপেক্ষে আমার কিছু দায়িত্ব আছে।'

'আমি তোমাকে এ পদবী দিয়েছি কারণ এটি তোমার মায়ের ছিল; তোমার উপর কাজের বোঝা ফেলার জন্য নয়।'

'আপনি যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, তখন আপনার হয়ে যেসব যোগাযোগ আর আবেদন শোনার কাজ করেছি তার চেয়ে তো দুরূহ হবে না। এটা আমাকে কিছু করার সুযোগ করে দেবে। দারাকে তো অনেক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে—আমিও কেন বেশি করতে পারব না?'

এটা সত্যি। দারার উপর দায়িত্বের বোঝা বাড়িয়েছেন তিনি, যেমন সেনাবাহিনীর যন্ত্রপাতির পুনর্মূল্যায়ন করা। জাহানারার ভূমিকা হতে হবে আরো সঙ্গত—এমন কাজ যা একজন নারী হারেমে বসে করতে পারে, যেমন মমতাজ করত—কিন্তু এটা বোঝার মত বুদ্ধি তার আছে। 'ঠিক আছে আমি পারিশ্রমিক তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব আর যদি চাও অন্য দায়িত্বও অর্পণ করব। আমি তোমাকে তোমার আম্মাজানের আইভরি সিলও পাঠিয়ে দেব যেন আমার হয়ে রাজকীয় ফরমান জারি করতে পারো।'

সম্রাট দেখতে পেলেন খুশি হয়ে উঠেছে জাহানারা। সত্যি কথা বলতে দারার সাহায্যের মত জাহানারার সাহায্য পেলেও খুশি হবেন তিনি। খোলামেলা ভাব আর সহজাত বুদ্ধির ক্ষেত্রে তারা উভয়েই সমান। এতে অবশ্য বিস্মিত হবারও কিছু নেই। কিন্তু কী হবে তাঁর জ্যেষ্ঠ্য কন্যার ভবিষ্যত? আকবর নিয়ম করে গেছেন যে সম্রাটের কন্যারা বিবাহ করতে পারবে না। যেন সিংহাসনের দাবি নিয়ে পরিবার সমূহের মাঝে রক্তপাতের সম্ভাবনা কমে যায়। হিন্দুস্তানে মোগলদের প্রথম দিককার ইতিহাস কলূষিত হয়ে আছে এমন সব কাহিনীতে। কিন্তু তারপরেও রাজকীয় কন্যারা কেন তাদের ভাইদের মত একই আনন্দ ভোগ করতে পারবে না?

মমতাজ থাকলে ঠিক বের করে ফেলতেন যে এহেন নিয়মের শুভ দিক কোনটি...কিন্তু হতে পারে এর কোন দিক নেই। রাজবংশের স্থায়িত্বই হচ্ছে প্রধান বিষয়, যেমন আকবর—জ্ঞানী এবং মানবিক ছিলেন তিনি—বুঝে গেছেন। মুগ্ধ নয়নে মডেলের দিকে তাকিয়ে থাকা জাহানারাকে দেখলেন শাহজাহান। কন্যাদেরকে খুশি করার জন্য অন্য উপায় বের করবেন তিনি।

'জাহানারা, তোমার কথাতে আমার মনে পড়ে গেছে যে তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। যদি তুমি স্বাধীন গৃহকন্না চাও তাহলে আমি তোমাকে আলাদা প্রাসাদ দিতে পারি। বেশ সুন্দর একটি আছে—যেটি ব্যবহার করতেন তোমার নানাজানের বাবা গিয়াস বেগ। তুমি রাজি?'

এক মুহূর্ত ভাবল জাহানারা। 'হ্যাঁ ধন্যবাদ' কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম... কয়েকটা সংবাদ আছে। সাত্তি আল-নিসা আমাকে জানিয়েছে নিকোলাস ব্যালান্টাইন আগ্রাতে ফিরে এসেছে, বাজারে আছে।'

‘নিকোলাস?’ সিংহাসনে আসীনের পরপর শেষ এই তরুণ ইংরেজকে দেখেছিলেন শাহজাহান। সে না কোথায় ব্যবসায়িক কাজে গিয়েছিল... কাবুল অথবা সম্ভবত হেরাতে? পরবাসে থাকাকালীন বিপদের দিনগুলোতে তার পারিবারিক বন্ধু হিসেবে বিশ্বস্ততার উদাহরণ ছিল নিকোলাস। এমন কি পিতা জাহাঙ্গীরের দরবারে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে চেষ্টা করেছে শান্তি স্থাপনের জন্য। ‘আমি নিকোলাসের সাথে দেখা করতে চাই। সে আমাদের সে সময়কার বন্ধু যখন আমাদের বন্ধুসংখ্যা ছিল নগণ্য।’

পরের দিন নিজের সামনে কুর্নিশরত নিকোলাস ব্যালান্টাইনকে দেখে শাহজাহানের মনে হল যে সে পূর্বের চেয়ে বেশ মোটা চওড়া হয়ে গেছে। আটোমোটো চামড়ার টিউনিক ভেদ করে ফুটে বের হতে চাইছে কাঁধ, আর এই বিদেশীর পরনের বিদেশী প্যান্টালুন ভেদ করে বের হয়ে রয়েছে পায়ের পেশী। কিন্তু মাথা তুলতেই দেখা গেল যে নিকোলাসের চোখ জোড়া ঠিক আগের মতই তীক্ষ্ণ আর নীল। মাখন রঙা এলোমেলো চুল, তপ্ত ভারতীয় সূর্যের নিচে প্রায় সাদা হয়ে গেছে পুড়ে।

‘দরবারে স্বাগতম, আমি শুনেছি তুমি বাজারে উঠেছো। যদি চাও তো আমার কর্মচারীরা দুর্গের মাঝেই তোমার জন্যে থাকার বন্দোবস্ত করে দেবে।’

‘ধন্যবাদ, জাহাপনা।’

‘আগ্রায় কী মনে করে?’

‘সত্যি কথা বলতে আমি আপনার দরবারে চাকরি খুঁজতে এসেছি।’

‘তুমি না ব্যবসায়ী হবে মনস্থির করেছিলে?’

‘হ্যা, কিন্তু সুবিধা করতে পারি নি। আপনার সেবা করে যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন তা দিয়ে কাবুলে গিয়ে বড় বাজার থেকে পারস্যের কার্পেট আর চাইনিজ সিল্ক কিনে জাহাজে যাবার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যার ঠিক আগমুহূর্তে খুর্দ-কাবুল পাসের সংকীর্ণ রাস্তায় আমাদের ক্যারাভানের উপর আক্রমণ করে খিলজিরা। প্রাথমিক আঘাতেই হত্যা করে বহু বণিককে। আমরা কয়েকজন মাত্র প্রাণে বেঁচে গেছি, তাও হাচোর-পাচোড় করে পাহাড়ের দিকে উঠে গিয়ে অর্ধ আলোয় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিতে পারায়। খিলজিরা আমাদের খচ্চর সহ মলামাল লুট

করে ফেলায় আমাদের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।' খানিকটা বেদনাতুর মুখে হাসলো নিকোলাস।

কিন্তু হতাশ হলেন শাহজাহান। নিকোলাসের কথায় স্মরণ হল যে কাবুলে তাঁর সুবেদার ও পাসের কাছাকাছি গোত্র অধিবাসীদের মাঝে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনতির কথা জানিয়েছে—এদের মাঝে আছে আফ্রিদি, কাফির আর খিলজিরা।

'এরপর কী করছো?'

'এরপর আমি দক্ষিণে কান্দাহার গিয়ে হেলমন্দ নদী পার হয়ে পারস্যে পৌঁছাই। কিছুদিনের জন্য শাহের সেনাবাহিনীতে যোগদান করি।'

'কখনো তোমার নিজের দেশে ফিরে যাবার কথা মনে হয়নি?'

মাথা নাড়ল নিকোলাস। 'না, আমার জন্য খুব বেশি কিছু নেই সেখানে। পিতা-মাতা মারা গেছে—বাবার সম্পত্তি পেয়েছে বড় ভাই। এছাড়াও...আমি এ দেশকে ভালোবাসি—স্যার টমাসের সাথে যখন থেকে এসেছি, তখন থেকেই আর তাই পারস্য থেকে এখানে ফিরে এসেছি। আমি দেশে যেতে প্রস্তুত নই—অন্তত এখন তো নয়ই।'

স্যার থমাস রো...টেকো মাথার ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের কথা শাহজাহান প্রায় ভুলেই গেছেন, যার কর্চি ছিল নিকোলাস।

'নিকোলাস, তুমি সবসময় আমার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলে। তাই আমার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সেনাবাহিনী হেডকোয়ার্টারে দলনেতা হিসেবে নিয়োগ দিলাম তোমাকে। পরিচিত বেশ কিছু চেহারা খুঁজে পাবে সেখানে। শাহের সেনাবাহিনী সম্পর্কে তোমার জ্ঞান বিশেষ করে অস্ত্র সম্পর্কে — কাজে লাগবে। আমার যেটা সন্দেহ যে বস্তুত আমি জানিই আমার সাম্রাজ্যের প্রান্তের ভূমি দখলের উচ্চাকাঙ্খা আছে তাঁর। সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি দেখভালের জন্য দায়িত্ব দিয়েছি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে। তুমি তাকে সাহায্যে করতে পারবে।'

'আনন্দের সহিত তা করব আমি জাহাপনা। শাহজাদা দারার কথা বেশ মনে আছে আমার।' এরপর খানিকটা দ্বিধাভরে নিকোলাস বলে উঠল, 'পারস্য থাকাকালীন সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর কথা শুনেছি আমি। সত্যি দুঃখিত।'

মাথা নেড়ে আর কিছু বললেন না শাহজাহান। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে ইশারা করলেন যে সাক্ষাৎকার শেষ হয়েছে।

চব্বিশ ঘণ্টা পরে মার্বেল হলের চারপাশে নিজের পরিচিত মুখগুলোর দিকে তাকালেন সম্রাট। আগ্রায় ফিরে আসার পর এই প্রথম নিজের পুরো সভাসদদের উপদেষ্টাকে তলব করেছেন। হাত তুলে গুঞ্জন থামিয়ে আলোচনার আশাতে কথা শুরু করলেন শাহজাহান।

'উত্তরের গোত্ররা ভাবছে যে তারা এরকম অবিশ্বাস্য আচরণ করে কাবুল আসা যাওয়ার পথে আমাদের বণিকদেরকে লুট করে নিতে থাকবে। তাদের দ্রুত সংগঠিত হওয়া অপরাধ সম্পর্কে শুনেছি আমি। এছাড়া শহরের সুবেদারের পাঠানো প্রতিবেদনও পড়েছি। সম্ভবত এ অপরাধীরা ভেবেছে দাক্ষিণাত্য নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকাতে তারা পার পেয়ে যাবে...যদি তাই হয় তাহলে শীঘ্রিই নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে তারা। আমি তাদের অভদ্রতা বরদাশত করব না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রাস্তা ঘাট নিরাপদ না হবে, বাণিজ্যের উন্নতিও ঘটবে না।'

চারপাশে বিড়বিড় করে নিজেদের সম্মতি জানালো সভাসদবৃন্দ।

'অশোক সিং', বলে চললেন শাহজাহান, 'দাক্ষিণাত্যে নিজের সাহস আর সততার পরিচয় দিয়েছ তুমি। এই ভয় দূর করার ভারও তোমার উপর অর্পণ করছি আমি। দশ হাজার সৈন্যের সেনাপতি হিসেবে তোমাকে দায়িত্ব দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি—অশ্বরোহী আর বন্দুকধারী। পাসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর এই দুর্বৃত্তদেরকে সমুচিত শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব তোমার। প্রধানদেরকে হত্য করে দুর্গ গুঁড়িয়ে দাও, গ্রাম ভেঙে পশুর দল তাড়িয়ে দাও। তাদেরকে বুঝিয়ে দাও মোগল শাসন মেনে না নেবার একমাত্র বিকল্প হল ধ্বংস আর মৃত্যু।'

'আমার সন্দেহ যে পারস্যের শাহ গোত্র সমূহকে অর্থ দিয়েছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্যে। শক্তির প্রদর্শন তাঁকে প্ররোচিত করবে দ্বিতীয়বার ভাবতে।' আস্তে করে বলে উঠল আসফ খান।

'আমি নিশ্চিত যে এটাই সঠিক।' মমতাজের পিতা শারীরিকভাবে বৃদ্ধ হতে থাকলেও মস্তিষ্ক পূর্বের মতই তীক্ষ্ণ আর সচল।

'আগামী শীতকাল এসে অভিযানের সমাপ্তি ঘটানোর আগেই আমার বাহিনী একত্রিত করে নেব আমি। শুধুমাত্র একটা প্রশ্ন : কামান

সাথে নিবো? কামান ছাড়া এগোনোটা দ্রুততর হবে।' বলে উঠল অশোক সিং।

'তোমার কি মনে হয় কামরান ইকবাল?' জানতে চাইলেন শাহজাহান।

'আমি এতে একমত। এগুলো শুধু গতি রোধ করবে। যদি কামান প্রয়োজন হয় কাবুলের সুবেদার জোগান দেবে।'

এই পরামর্শ ভালোই হয়েছে, যদিও তাঁর পুরাতন সঙ্গীর মুখখানা ব্যথায় জর্জরিত হয়ে আছে। লাহোরে হারানো হাতের ক্ষত কখনোই পুরোপুরি সারবে না।

'তাহলে তাই হোক। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দেব আমি।'

পরবর্তীতে অভিযানের বিশদ আলোচনা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক মতৈক্যের পর উপদেষ্টারা আর সেনাপতিরা চলে গেলে পর খানিকক্ষণ একা বসে রইলেন শাহজাহান। ভাবতে ভালো লাগছে যে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন তিনি। মমতাজের সমাধি নির্মাণের ব্যস্ততা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার ব্যাপারে অবহেলা করতে দেয়নি... তারপরেও সভা চলাকালীন যদিও তিনি সক্রিয় আর কর্মতৎপর ছিলেন তারপরেও কোথায় যেন রেশ ছিল না। মনে পড়ে গেল প্রাচ্য দেশ থেকে একজন ভ্রমণার্থীর কাছে দেখা পুতুল শো'র কথা। চামড়ার টুকরা কেটে নারী-পুরুষের অবয়ব দিয়ে কাঠির মাথায় গেঁথে পুতুলগুলোকে লুকিয়ে রাখা হয় সিল্কের পর্দার পিছনে, একসারি তেলের বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। অভিনয় চলাকালীন শুধু তাদের ছায়া দেখা যায়। এরকমটাই অনুভব হচ্ছে এখন তাঁর—ছায়া সম্রাট নড়াচড়া করছেন দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য।

এখন থেকে সবসময় কি তাহলে এমনই হবে? নিজের দায়িত্ব সচেষ্টভাবে পালন করতে চাইছেন কিন্তু অভিনয় হয়ে যাচ্ছে? এরকমই মহৎ হবার আকাংখা ছিল একসময়। নিয়ম মেনে চলা আর প্রচেষ্টার মাধ্যমে একে ফিরে আসতে বাধ্য করবেন তিনি।

অধ্যায়-০৮

আগ্রা দুর্গের আঙিনাতে বিশেষভাবে তাঁর জন্য তৈরি মঞ্চের রক্তলাল চাঁদোয়ার নিচে বসে আছেন শাহজাহান। সামনে সেনাপতি আর সভাসদদের দল। শুনছেন করতালের ঝনঝন আর ঢাকের বাজনা। দুই বছর আগে মমতাজের মৃত্যুর পর এই প্রথম দুর্গের মাঝে সংগীত আয়োজনের অনুমতি দিয়েছেন তিনি। এছাড়াও এবারই প্রথম নিজের সাধারণ সাদা শোকের কাপড় ছেড়ে পরিধান করেছেন দামি পোশাক আর রত্ন। উজ্জ্বল সবুজ ব্রোকেডের আলখাল্লা, কোমরে পেঁচানো রত্নখচিত কোমরবন্ধনী, গলায় রত্নের হার আর কব্জিতেও রত্ন পাথরের সমাহারে নিজের কাছেই কেমন যেন লাগছে। কোন আনন্দই পাচ্ছেন না এত জাঁকজমকের মাঝে। কিন্তু আজ দারা শুকোহ্‌র বিবাহের দিন আর যেমনটা আসফ খান স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, মমতাজ থাকলেও এটিই চাইত যেন সম্রাট রাজাকীয় জৌলুস নিয়ে বাড়িয়ে দেন জ্যেষ্ঠ্য পুত্রের বিবাহ উৎসব।

দুর্গের বাইরে অবস্থিত ভিড়ের জনতার হর্ষধ্বনি আর সংগীতের মূর্ছনায় তিনি বুঝতে পারলেন যে এগিয়ে আসছে বর ও তার ভাইয়ের। এক ঘণ্টা আগে শাহ সুজা, আওরঙ্গজেব আর মুরাদ যমুনার তীরে প্রাসাদে গেছে, যেটি তিনি বিবাহ উপহার হিসেবে দিয়েছেন দারাকে। এখন নিশ্চয়ই ফিরে আসছে চার ভাই। জমকালো কালো ঘোড়ার উপর বসে আছে দারা, তার সামনে সোনালি ওড়না পরিহিত শতখানেক পরিচারক। সবার হাতে রত্নপাথর সোনা, রুপা আর চুড়ো করে রাখা রঙিন মশলা ভর্তি গোলাকার ট্রে—কমলা পেশ্‌তা আর হলুদ রক্ত লাল

ডালিম, বেগুনি ফিগ আর সবুজ পেয়ারা। সবকিছুই তুলে ধরছে বর-কনের সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের চিহ্ন।

নিশ্চিত যে অন্তত তিনটা বাদ্য একসাথে বেজে উঠল দারা ও তাকে অনুসরণ করে আসা ভাইদেরকে স্বাগত জানাতে। মঞ্চের কাছে এগিয়ে আসার সময় সিংহাসনের পাশে দেয়ালের উপরে পর্দা ঘেরা জায়গার দিকে একটু তাকাল দারা, জানে যে সেখান থেকে তাকিয়ে আছে দুই সহোদরা। বিবাহের প্রস্তুতি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট উৎসুক জাহানারার আবদার রক্ষা করেছেন শাহজাহান। বিবাহ ভোজের জন্য সোনালি পাতায় মোড়ানো বাদাম আর শুকনো ফল দিয়ে তৈরি পোলাও থেকে শুরু করে উজ্জ্বল পোশাকের রাজস্তানী নর্তকীরা, গভীর রাতকে আলোকিত করে তোলার জন্য মধ্যরাতে আতশবাজির প্রদর্শনী সহ সবকিছুর পরিকল্পনা করতে দেখে অবাক হয়ে ভেবেছেন সম্রাট যে আত্মবিশ্বাস আর অধিকারবোধে পূর্ণ হয়ে কত দ্রুত বেড়ে উঠছে তাঁর কন্যা।

সময় এসেছে দারার মাথায় বরের জন্য তৈরি মুক্তোর মুকুট পরিয়ে দেওয়ার। অন্য দিনের চেয়েও দ্রুত খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলো আসলান বেগ, সামনে বাড়িয়ে ধরল ভেলভেট কুশনে রাখা মুকুট, উঠে দাঁড়ালেন শাহজাহান। দুই হাতে মুকুটটিকে ধরে উঁচু করে ধরলেন, যেন সকলে স্পষ্ট দেখতে পায়, তারপর পরিয়ে দিলেন পুত্রের মাথায়। আমি এখানে উপস্থিত সবাইকে বলছি যেন তারা দেখে যে আমি আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আশীর্বাদ করছি তার চাচাত বোন আমার সৎভাই পারভেজের কন্যা নাদিরার সাথে বিবাহ উপলক্ষে। মহান আল্লাহ তাদের এই মিলনকে আশীর্বাদিত করুন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বহু সন্তান ও একসাথে বহু বছর আনন্দে কাটানোর বর প্রদান করে।' এরপর দারার কাঁধ ধরে উপস্থিত সভাসদদের দিকে মুখ করে ঘুরিয়ে দিয়ে সম্রাট বলে উঠলেন, 'আমি আরো কিছু ঘোষণা দিতে চাই। এতদ্বারা আমি আমার পুত্রকে বারো হাজার ঘোড়ার সেনাপ্রধান রূপে নিয়োগ দান করছি। এই বয়সে আমার পিতাও আমাকে এই একই পদ পুরস্কার দিয়েছিলেন।'

দারার পিঙ্গলবর্ণ চোখ জোড়াতে খুশির আভা দেখতে পেলেন শাহজাহান। শীঘ্রি শাহ সুজাও হয়তো বিবাহ করবে, তাকেও সম্মানিত করবেন তিনি; কিন্তু হয়ত একই সন্তুষ্টির সাথে নয়। দারা সবকিছু,

একজন পুত্র—একজন মোগল শাহজাদা যেমন হওয়া উচিত। দারা একজন দক্ষ তলোয়ারবিদ, প্রশংসিত মুষ্টিযোদ্ধা যে কিনা নিজের চেয়েও ভারী লোকদের সহজেই হারিয়ে দেয়। একই সাথে বিদ্যানুরাগী দারা তার দাদাজান জাহাঙ্গীরের মতই বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক জীবন নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। অন্যদিকে শাহ সুজার প্রধান আকর্ষণ হল আনন্দের পিছু নেয়া—একজন তরুণের জন্য যদিও স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর মোগল পূর্বপুরুষদের বেশির ভাগেরই মৃত্যু হয়েছে শত্রু হস্তে নয়, বরঞ্চ নিজেদের দুর্বলতার কারণে। এদের মাঝে একজন নাদিরার পিতা। তরুণ বয়সেই মদ্যপ পারভেজ মৃত্যুবরণ করেছিল।

দারা এ সমস্ত বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত। যদি এভাবেই নিজেকে প্রমাণ করতে থাকে তাহলে শীঘ্রিই হয়ত তাকে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করবেন শাহজাহান। মমতাজ থাকলেও এটাই চাইতেন। আর দারার কনিষ্ঠ ভাইরাও এটাই আশা করে। ফলে স্থিতাবস্থা আর নিশ্চয়তা ফিরে আসবে, পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোতে যেটির অভাবে ভীষণ রক্তপাতে বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল সাম্রাজ্য। যদি তিনি এটা অর্জন করতে পারেন তাহলে নিজেকে নিয়ে গর্বিত বোধ করারও কারণ খুঁজে পাবেন। ভবিষ্যত প্রজন্মও তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তার পরেও সম্রাট ভেবে দেখলেন যে তাঁর পরিবার পূর্বপুরুষ থেকে পৃথক। তাঁর পুত্রেরা সকলেই আপন ভাই, সৎ ভাই নয়। আর তাই তাদের মাঝে বন্ধনও অনেক গভীর আর শক্তিশালী। দারার বয়স মাত্র উনিশ আর তিনি নিজেও একজন শাসক হিসেবে তরুণ। তাই সম্ভবত উত্তরাধিকারী নিয়ে এখনই এত তাড়াহুড়া না করলেও চলবে।

'জাহাপনা, হাতির দল তাদের যুদ্ধ শুরু করার জন্য প্রস্তুত।'

ঘোড়ার উপর বসে কপাল থেকে ঘাম মুছলেন শাহজাহান। এই ভেবে খুশি লাগছে যে ঘোড়ার পিঠে বসে এখনো ছেলেদের সাথে খেলতে পারেন তিনি। এই প্রতিযোগিতার নিয়ম হচ্ছে তিনশ গজ দূরে যমুনার তীরে রাখা তরমুজের মাঝে কে সবার আগে বর্শা নিক্ষেপ করতে পারবে।

আগ্রা দুর্গের চারপাশে জড়ো হওয়া ভিড়ের জনতার উন্মত্ত চিৎকারের মাঝে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দারা শুকোহ্‌র বিবাহের চতুর্থ দিনের আনন্দায়োজনে। শাহ সুজা আর আওরঙ্গজেব দুজনকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হারিয়েছেন সম্রাট। কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে আওরঙ্গজেবের সাথে। ভাইয়ের চেয়ে দুই বছরের ছোট হওয়া সত্ত্বেও অনেক এগিয়ে যায় শাহ সুজাকে ছেড়ে আর কৌতুকের সঙ্গে শাহজাহান খেয়াল করে দেখেছেন যে, পিতাকে হারাতে না পেরে বিমর্ষ আওরঙ্গজেব ধুলার মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিজের দস্তানা।

নিজের ঘামে ভিজে যাওয়া ঘোড়াকে ঘোরাতেই সম্রাট শুনতে পান যে ইতিমধ্যে বাজনা বাজানো শুরু হয়ে গেছে একটু দূরে নদীতীরে তাঁদের জন্যই বিশেষভাবে তৈরি ঘেরা জায়গায় হাতির সাথে যুদ্ধস্থানে। অশোক সিংয়ের সাথে ছুটতে ছুটতেই মাহুতকে ইশারা করেন শাহজাহান যেন হাতির কানের উপর থেকে সবুজ সিল্কের স্কার্ফ খুলে ফেলে যুদ্ধ শুরু করা হয়। খানিকটা সন্ত্রস্ত হয়ে ডাক ছাড়ে সম্রাটের ঘোড়া। মাটির দেয়ালের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে শুঁড় উঁচিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে হাঁক ছাড়ে হাতি দুটো। নিজের ঘোড়াকে ফিসফিসিয়ে সান্ত্বনার বাণী শোনান শাহজাহান। হাঁটু দিয়ে গুঁতো লাগান শক্তভাবে, টেনে ধরেন লাগাম। দেখতে পান যেন ইতিমধ্যেই তাঁর একটু সামনে নিজ নিজ ঘোড়ায় চেপে বসে দেয়ালের প্রায় কাছে পৌঁছে গেছে আওরঙ্গজেব আর শাহ সুজা। এর আগের খেলাতে যে বর্শা ব্যবহার করেছিল তাই ঝুলছে তাদের লাগামের পাশে। দেয়ালের অপর পাশে আসফ খানের সাথে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে দারা।

সবার প্রথমে চোখ পড়ল দামোদারের উপর—তীক্ষ্ণ দাঁত আর ভয়ংকর শুড়অলা বিশাল প্রাণী যেটির নামকরণ হয়েছে আকবরের বিখ্যাত যুদ্ধ হাতিগুলোর একটির নামানুসারে—মনে হল আজকেও এটিই শ্রেষ্ঠ। নিজের মাহুতের তাড়া খেয়ে মাটির দেয়ালের কাছে গিয়ে খানিকটা দেয়াল ভেঙে আঘাত করল প্রতিপক্ষ জলপার উপর। শক্ত ধূসর কাঁধে আঁকাবাঁকা করে লম্বা ক্ষত সৃষ্টি হল। অশোক সিংয়ের পিতা আম্বারের রাজা দুটো হাতিই পাঠিয়েছেন দারার বিবাহ উপহার হিসেবে। আবারো আঘাত করার জন্য ছুটল দামোদার; কিন্তু এবার এগোতে গিয়ে ভাঙা

দেয়ালের সাথে খানিকটা হোঁচট খেয়ে পড়ায় কাত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, বাতাসে ভেসে বাচ্চাদের খেলনা পুতুলের মত উড়ে যায় মাহুত। কঠিন মাটিতে পড়ে প্রায় সাথে সাথেই মনে হল অচেতন হয়ে গেল মাথার চারপাশে লাল রক্তের পুকুর নিয়ে। নিজের সুযোগ এসেছে বুঝতে পারে জলপা, এছাড়া মাহুতও চড়ে বসে তাগাদা দিয়েছে কাঁধে। নিজের ক্ষত নিয়ে এগিয়ে যায় জলপা। লাল শুড় পেঁচিয়ে ভেঙে ফেলে অবশিষ্ট দেয়াল। এরপর মাথা নিচু করে দাঁত দিয়ে গুঁতো দিয়ে প্রায় ক্ষত করে ফেলে দামোদারের ডান কানে।

মাথার পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, হাচোড়পাচোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধের ডাক ছাড়ে দামোদর; কিন্তু এবার দ্রুত প্রতিক্রিয়া করে জলপা। নিজের বিশাল গম্বুজের মত মাথা নেড়ে ছুটে আসে দামোদারের দিকে, এবার প্রতিপক্ষকে আঘাত করে বাম পাশে। হঠাৎ করেই দমোদার যেন হাল ছেড়ে দেয়। যথেষ্ট হয়েছে। মাথা ঘুরিয়েই ছুটে আসতে থাকে দেয়ালের যে পাশে আওরঙ্গজেব আর শাহ সুজা দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে। হালকাভাবে নিজের ডান কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিতে চায়। দেয়ালের উচ্চতা পাঁচ ফুট আর বেশ মোটা, তাই দ্বিতীয় আঘাত করতে হল দামোদারকে, কিন্তু হল না। কিন্তু তৃতীয় আঘাতের সময়ে চাপ সহ্য করতে পারল না লাল মাটি। মাহুতহীন হাতি দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়ল, এগিয়ে যেতে লাগল নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের দিকে।

হাতির আগমনে ভীত হয়ে আবারো ডাক ছেড়ে উঠল শাহজাহানের ঘোড়া। নিজের ঘোড়ার উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনতে গিয়েই শাহজাহানের চোখে পড়ল যে ঘোড়া নিয়ে সামনে এগিয়ে আসছে আওরঙ্গজেব। চেষ্টা করছে উন্মাদ হাতি আর দর্শনার্থীদের মাঝে যেতে, বেশিরভাগেরই কাঁধে ছোট ছেলেমেয়ে আর মনে হল যেন ভয়ের চোটে নিজের জায়গায় শিকড় গজিয়ে গেছে লোকগুলোর। আওরঙ্গজেবের কোন কিছু—সম্ভবত তার পাগড়িতে থাকা হীরা অথবা ঘোড়ার রত্নখচিত লাগামের ঝনঝন শব্দ—দামোদারের নজরে কাড়ল আর নিজের রক্তমাখা মাথা ঘুরিয়ে সেদিকে ছুটে গেল বিশাল জন্তুটা। শুড় পেঁচিয়ে গভীর ডাক ছেড়ে চিৎকার করে আগে বাড়লো।

'আওরঙ্গজেব ফিরে এসো।' পুত্রের দিকে এগোতে থাকা দামোদারকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন শাহজাহান। নিশ্চিতভাবে এখনি ঘোড়ার উপর থেকে ছুড়ে ফেলা হবে ছেলেটাকে।

দূর থেকে ভীত চোখে তাকিয়ে আছে পনেরো বছর বয়সী আওরঙ্গজেব। এক হাতে চেষ্টা করছে ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করতে, অন্য হাতে চেষ্টা করছে নিজের বর্শা টেনে নিতে। কিন্তু তার আগেই পৌঁছে গেল দামোদার। কাঁধের কাছে আঘাত করল ঘোড়াকে ডান দাঁতের মাথা দিয়ে, ডাক ছেড়ে আওরঙ্গজেবকে ফেলে দিল ঘোড়া। কোনভাবে নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে পায়ের উপর দাঁড়াল আওরঙ্গজেব, হাতে টেনে নিল তলোয়ার। এই ফাঁকে পরিচারকেরা এসে আতশবাজি ফুটাতে লাগল দামোদারের সামনে যেন দিকভ্রষ্ট হয় প্রাণীটার মনোযোগ। বিস্বাদ ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল বাতাস, বিস্ফোরণের ফলে খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেল দামোদার।

'শাহ সুজা না!' চিৎকার করে উঠলেন শাহজাহান। এখনো নিজের ঘোড়াকে সামলানোর চেষ্টা করতে করতে দেখতে পেলেন যে নিজের বর্শা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার দিকে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। সাথে সাথে পিছু নিল অশোক সিং। শাহ সুজা ছুঁড়ে মারলো নিজের অস্ত্র—কিন্তু দামোদারের মোটা চামড়ায় কোন আঘাতই করতে পারলো না বর্শা—ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারপাশে মাটিতে পড়ে থাকা কিছুর সাথে হোঁচট খেয়ে টালমাটাল হয়ে ঘোড়া পিঠ থেকে ফেলে দিল আরোহীকে। ফলে মাটিতে পড়ে গেল শাহ সুজা, ও নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে অশোক সিং পৌঁছে গেল ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া দুই শাহজাদা আর উন্মাদ হাতির মাঝখানে। কিন্তু তারপরই এত জোরে গর্জন হল যে কেঁপে উঠল পুরো ধরিত্রী। নিজের মাহুতকে ফেলে দিল জলপা। বেচারা এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করছিল জলপাকে নিয়ন্ত্রণ করতে। দামোদারের তৈরি করা দেয়ালের ফোঁকর গলে এগিয়ে এলো প্রতিপক্ষের দিকে। ফিরে তাকিয়ে এ অবস্থা থেকে মুহূর্তখানেকের জন্য মাটিতে যেন জমে গেল দামোদার, মাথা নিচু, তারপর আবারো কী হল সাহস হারিয়ে মরিয়া হয়ে চিৎকার করেই নেমে গেল নদীতীরে যমুনার কাছে। পিছু নিল জলপা। সামনে থেকে সরে গেল দর্শকেরা।

ঘোড়া থেকে নেমে ছেলেদের কাছে দৌড়ে গেলেন শাহজাহান। দুজনেরই ধুলায় মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেও দেখে বোঝা গেল আঘাত লাগে নি কারোরই। নিরবে চোখের পাতা বন্ধ করে মুহূর্তখানেক কৃতজ্ঞতা জানালেন শাহজাহান। এরপরই বুকে টেনে নিলেন দুই পুত্রকে।

'তোমরা দুজনেই বেশ সাহস দেখিয়েছ। তোমরা সত্যিই বাহাদুর। তুমিও অশোক সিং।'

'এটা আমার দায়িত্ব ছিল এগিয়ে আসাটা, জাহাপনা। দামোদারকে আমার পিতা দিয়েছেন উপহার হিসেবে।'

আবারো পুত্রদের দিকে চাইলেন সম্রাট, 'আওরঙ্গজেব—তুমি একটু বেশিই হঠকারী। একটা হাতির সাথে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসা উচিত হয়নি। অপেক্ষা করা উচিত ছিল দেহরক্ষীদের জন্য।'

কাঁধ ঝাঁকালো আওরঙ্গজেব। 'সময় ছিল না ততটা। আর আমি জানি আমি হঠকারী নই। হ্যাঁ, জানতাম যে ঝুঁকি আছে; কিন্তু চেষ্টা করেছি দর্শকদের নিরাপদ রাখতে। যদি আমি মারা যেতাম কোন অসম্মান হত না। আমরা সকলেই একদিন মৃত্যুবরণ করব। দেখার বিষয় হল কেমন করে এর মুখোমুখি হই আমরা। কিছু না করাতেই বরঞ্চ লজ্জা বেশি।'

কথা বলতে বলতে দারার দিকে তাকাল। বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে দারা। কী বোঝাতে চাইলো আওরঙ্গজেব? এটাই কি যে তার বড় ভাই এগিয়ে আসার চেষ্টা না করায় একজন কাপুরুষ? যদি তাই হয় তাহলে এটা সঠিক হল না। দারা অনেক দূরে ছিল। কিন্তু নিশ্চয় এটা এরকম কিছু নয়—মুহূর্তটুকুর বাহাবা নেবার আশায় উদগ্রীব এক কিশোর ছেলের ভাবনা আর বড় ভাইয়ের দিকে কথার তীর ছোড়া থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়েছে। শাহজাহানের তাই উচিত হবে না পারিবারিক পূর্ব বিদ্বেষের স্মৃতি স্মরণ করে এ ঘটনার মাঝে কোন অন্য উদ্দেশ্যে খোঁজা।

অধ্যায়-০৯

চোখ বন্ধ করে একের পর এক ধাক্কা দিয়ে মাথা পেছনে হেলিয়ে প্রচণ্ড দেহসুখ অনুভব করলেন শাহজাহান। এরপর হাঁপাতে হাঁপাতে পড়ে গেলেন তাঁর মতই ঘামে ভিজে থাকা বালুচি রমণীর নরম মাংসল শরীরের উপর। উন্নত বক্ষ আর গোলাকার অধর সহ অসম্ভব সুন্দরী এই নারী, ভাবলেন তিনি। ব্রোকেড কুশনের উপর ছড়িয়ে আছে হেনা লাগান উজ্জ্বল চুল। আর কাজলে রাঙানো চোখ জোড়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। রমণী বুঝতে পারলো যে সন্তুষ্ট হয়েছেন সম্রাট।

খাজাসারা, রাজকীয় হারেমের তত্ত্বাবধায়ক ভালোই পছন্দ করেছে।

'আপনার পছন্দ কী, জাহাপনা?' তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল খাজাসারা। 'কৃশকায় নাকি মাংস? লম্বা বা বেঁটে? কালো নাকি ফর্সা?' তাকিয়ে ছিল শাহজাহান। মমতাজের সাথে বিবাহের পর এত বছরে হারেম থেকে কোন নারীকে কখনো ডাকেনি শাহজাহান। অন্যান্য শাসকেরা মোগল সম্রাটের সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিভিন্ন নারী পাঠিয়েছে তাঁর কাছে কিন্তু এই কিছুদিন আগে ছাড়া এ সম্পর্কে ভাবেন নাই তিনি।

'তুমি পছন্দ করে দাও।' উত্তর দিয়েছিলেন শাহজাহান। 'আমার কিছু যায় আসে না।'

মমতাজের মৃত্যুর পর বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেলেও অন্য কোন নারীর প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি। কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ শারীরিক আকাঙ্ক্ষা যেন সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

'জাহাপনা, আপনি পুরুষদের মাঝে তেজী ঘোড়া।' বলে উঠল বালুচি রমণী। আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'আমি এতটা শক্তির কথা কখনো জানতাম না...'

গড়িয়ে উঠে গেলেন শাহজাহান। তাকিয়ে রইলেন বিতৃষ্ণা নিয়ে—রমনীর উপর নয় নিজের উপর।

'কী হয়েছে? আপনাকে অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে, জাহাপনা?' বিছানা থেকে উঠে গিয়ে সম্রাটের শরীরের সাথে চেপে ধরল নিজের নিরাভরণ দেহ। যেন হেনা রঞ্জিত বক্ষ অনুভব করেন তিনি। 'আমি কি আপনাকে সুখী করতে পারিনি?'

নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুনরায় জেগে উঠলেন শাহজাহান আর রমণীর মোলায়েম হাসি জানিয়ে দিল যে সেও বুঝতে পেরেছে। 'সম্ভবত আপনাকে একেবারে অসন্তুষ্ট করিনি।' হাত ঘুরে বেড়াতে লাগল সম্রাটের শরীরে। হঠাৎ করেই ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দিয়ে রমণীর সুগন্ধি মাখা কেশগুচ্ছে মুখ ডুবিয়ে আবারও তার দেহে প্রবেশ কলরেন সম্রাট। খানিকটা বেশি সময় লাগল এবার, হাতের মাঝে মাথা রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে রইলেন শাহজাহান। কাঁপছে এখনো শরীর কিন্তু শরীরের উদ্দীপনা মরে যেতেই অশ্রু গড়াতে লাগল চোখ বেয়ে। কী করেছেন তিনি? মমতাজের প্রতি পবিত্র ভালোবাসার সাথে কীভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তিনি?

'চলে যাও।' মাথা না তুলেই বলে উঠলেন। অনুশোচনায় ডুবে গেলেন আবারো।

'জাহাপনা?'

'আমি বলেছি যাও। তোমাকে আর কোন দরকার নেই।'

'খাওয়া-দাওয়া প্রায় নেইই আর তাঁর কর্চি জানিয়েছে যে মদ বর্জনের আইন সত্ত্বেও প্রায়ই মদের জন্য তলব করেন আর নির্দেশ দিয়েছেন যেন গজনী থেকে তাজা এনে দেয়া হয়। মাঝে মাঝে এর মাঝে আফিমও মিশিয়ে নেন... চারদিন আগে পরিচারকেরা এমন অবস্থায় পায় যে জনগণের সামনে প্রাত্যহিক 'ঝরকা' বারান্দায় আসার মত অবস্থাও ছিল

না। প্রায় টেনে আনতে হয় বারান্দায় আর দুই পাশে দুইজন কর্চি সাহায্য করে যেন তিনি আশীর্বাদ দিতে পারেন। মাঝে মাঝে সপ্তাহ খানেক ধরে মদ বা আফিম কিছুই স্পর্শ করেন না, কিন্তু তখনো এমনকি আসলান বেগও পারে না তাঁকে দিয়ে দরবারের কাজ করাতে। তার বদলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে তাকিয়ে থাকে দূরের কিছু একটার দিকে আর কেউ আসতে চাইলেন ভর্ৎসনা করে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি যা পেরেছি করেছি। কথা বলেছি কিন্তু যেহেতু আমার সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করেননি তাই তেমন নজরও দেননি।'

মাথা নাড়লো জাহানারা।

'তোমার চিঠি পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি কতটা উদ্বিগ্ন, তবে অবস্থা এতটা খারাপ হবে ভাবিনি।'

'কিছু সময়ের জন্য বাইরে ছিলে তুমি। আমি প্রায় প্রতিদিনই দেখতে গেছি আব্বাজানকে। আশা করেছিলাম যে অবশেষে নিশ্চয়ই নিজের শোক কাটিয়ে উঠতে পেরেছে—অন্তত পাঁচ বছর তো হয়ে গেছে যে আমাদের আম্মাজান মারা গেছেন—কিছু সময়ের জন্য এমনটাই মনে হয়েছিল। কিন্তু হয়ত আমি ভুল করেছি, তাই দেখেছি যা দেখতে চেয়েছি। অথবা সে ভেঙে পড়েছে...দিনে দিনে আরো বেশি বিমর্ষ হয়ে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে নিজেকে।'

'অন্তত আমাদের মায়ের সমাধি নির্মাণের প্রতিও কি কোন আগ্রহ নেই?'

'হ্যাঁ, বেশির ভাগ দিনেই যান কাজের অগ্রগতি দেখতে, বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়ে আসেন বিশেষ করে মার্বেলের মাঝে রত্ন খোদাইয়ের সম্পর্কে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকেন না আর ফিরে আসার সাথে সাথেই আবারও একাকিত্বে ডুবে যান। যদি এখনই সাবধান না হন তাহলে নিজের শারীরিক বা মানসিক সুস্থতা খুইয়ে বসবেন নতুবা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা দেবে; কিন্তু নিজের বা সাম্রাজ্যের প্রতি যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে যে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তাঁর...'

'বিপদ? তোমার সত্যিই ধারণা যে অবস্থা আবারো এতটা খারাপ হয়েছে?'

'আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু সম্ভবত তাই...আমি শুধু তোমাকে বলতে পারি যা দেখেছি এই কয়েকদিনের মাঝে। আবারো কাজে মনোসংযোগ

করতে কষ্ট হচ্ছে আব্বাজানের। কামরান ইকবাল আর আমাদের নানাজী আসফ খানের পরপর মৃত্যুর ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে তাঁকে। অতীতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এর চেয়েও বড় কথা, তারা দু'জনেই খোলামেলাভাবে আব্বাজানের সাথে কথা বলতে পারতেন যখনই তারা দেখতেন যে কোন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে—আর কীভাবে এই সমস্যার মোকাবেলা করা যায় দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই তাও বলতে পারতেন। তাদের তৎপরতা না থাকায় দাপ্তরিক নিয়োগ আর কর সম্পর্কিত বিষয়ে মনোযোগ না দেয়ার জেদ করেছেন পিতা।'

'কিন্তু এগুলো কি দরকারী?'

'হ্যাঁ, এগুলোই একত্রে বেঁধে রেখেছে আমাদের সাম্রাজ্যকে। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য এগুলো জরুরি যে শুধুমাত্র সেনাপতি আর কর্মীদের বাহ্যিক বিশ্বস্ততা নয়—বরঞ্চ তাদের সত্যিকারের সমর্থন আর গভীর আগ্রহ। কিন্তু তাদের অভিযোগ আর আর্তি শোনার সময় নেই আব্বাজানের আর না তিনি প্রদেশগুলো থেকে পাঠানো প্রতিবেদন পড়ে দেখেন। যাই হোক, আমি পড়েছি আর দেখেছি যা ঘটতে যাচ্ছে...'

'কী বলতে চাও?'

'আমরা নীতিহীন শিথিল হয়ে যাচ্ছি। অভিজাতদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি তাদের উচ্চাকাঙ্খায় আমল না দিয়ে; একই সাথে তাদের কাজকর্মের উপর মনোযোগ না দিয়ে। যদিও তারা এখনো বাহ্যিকভাবে বিশ্বস্ত আছে আর এই পার্থক্যটুকু তেমন চোখেও পড়ছে না—আমরা যে স্বর্ণ দেই তার বিনিময়ে রাজকীয় কাজের জন্য সৈন্য বাহিনী টিকিয়ে রাখার মত আইন অবজ্ঞা করতেও দ্বিধা করছে না। যখন তুমি বাইরে ছিলে তখন আগ্রা দুর্গের সেনাপ্রধান আজমীরের প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল যেন তিন মাসের জন্য আমাদের লাহোর ভ্রমণের সময় রাজকীয় দরবারকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঁচ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু সেখানকার শাসনকর্তা প্রতি উত্তরে জানিয়েছে যে স্থানীয় জমিদারেরা এত দ্রুত এত পুরুষ জোগাড় করতে পারবে না।'

'কিন্তু তাদেরও তৈরি থাকার কথা যদি হঠাৎ যুদ্ধ শুরু হয় সে কারণে। আমরা কি তাদের অঞ্চলে পরিদর্শক পাঠাচ্ছি যেন তারা সঠিক

সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখছে কিনা বা কর সংগ্রহ করছে কিনা তা তদারক করে আসতে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু জমিদারেরা নিশ্চয়ই ঘুষ দিচ্ছে তাদেরকে। আমি আসলান বেগকে বলেছিলাম যেন আজমীর পরিদর্শনের রেকর্ডগুলে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এতে বের হয়ে এসেছে যে মাত্র তিন মাস আগে মোগল রাজকর্মকর্তারা সেখান থেকে ঘুরে এলেও কোন ভুলের কথা লিখেনি।'

'এদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া উচিত যেন উদাহরণ হিসেবে কাজে দেয় আর আজমীরের শাসনকর্তাকেও শাস্তি দিতে হবে। অন্তত তার অনুমতিতেই এরকম দুর্নীতি হতে পারছে। আর সবচেয়ে খারাপ দিক সে নিজেও এতে জড়িত ছিল। আব্বাজান কিছু না করলেও আমি এ ব্যাপারটা নিজে দেখব। যেমনটা তুমি বলেছ একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যেন কেউ এটা ভাবার সাহস না পায় যে সম্রাটের মনোযোগ অন্য কোথায় অথবা তাঁর শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে। নতুবা অর্চ্চার রাজার মত বিদ্রোহের কবলে পড়ব আমরা ...শাহ সুজা আর আওরঙ্গজেব কী বলে এসব কিছুর ব্যাপারে?'

'আমি জানি না। আমি তাদের কাছেও চিঠি লিখেছি। কিন্তু আওরঙ্গজেব তো বেশ ব্যস্ত। গত কয়েক বছর ধরে তো সে আগ্রাতেই নেই। অর্চ্চা বিদ্রোহ দমনের জন্য তার অভিযান বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে আর বেশি সময়ও লাগছে যা আব্বাজান বা অন্য কেউই ধারণা করতে পারেনি। এখন দাক্ষিণাত্যে তার বিজয় সত্ত্বেও পুরো অঞ্চল এখনো এতটা বিশৃঙ্খল হয়ে আছে যে, স্থানীয় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। এদিকে আবার সীমান্তবর্তী সমস্যাও আছে। শাহ সুজা পুরোদমে বাংলা সামলাচ্ছে। গঙ্গা ব-দ্বীপে আরকানীজরা আমাদের বণিকদের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে।'

'অমি শুনেছি আব্বাজান নাকি শাহ সুজাকে ওড়িশার শাসনকর্তার দায়িত্ব ও প্রদান করেছেন?'

'হ্যাঁ। শাহ সুজা চেয়েছে আর আব্বাজানও একমত হয়েছেন, আমি কিছুই জানতে পারিনি। আমি এর বিরুদ্ধেই পরামর্শ দিতাম। যদিও সে এ ধরনের নিয়োগের শক্তি আর মর্যাদা বেশ উপভোগ করছে; কিন্তু

আমার মনে হয় এতটা দায়িত্বপূর্ণ আর পরিশ্রমের কাজ সামলানোর ক্ষমতা নেই শাহ সুজার অথবা হতে পারে যে আমিই তাকে ভুল ভেবেছি।'

দারার হাত ধরে হাসল জাহানারা। 'আমি খুশি হয়েছি যে তুমি আগ্রাতে ফিরে এসেছ। আমি তোমার অভাব অনুভব করছিলাম। খুব কম লোকই আছে এখানে যাদের সাথে আমি এই কথাগুলো বলতে পারি...কখনো কখনো সাত্তি আল-নিসা আর রোশনারা কিন্তু আমি বাড়িয়ে বলছি না পিতার সাথে আমার মত এত সময় কাটায় না। এখন তো সে বেশ খুশি কেননা রাজকীয় মীনা বাজার পুনরায় চালু করতে চেয়েছে রোশনারা আর আব্বাজানও একমত হয়েছে। কিন্তু অনেক হয়েছে। এখন তোমার কথা শুনতে চাই। সুরাটে ভ্রমণ সফল হয়েছে?'

'হ্যাঁ, নিকোলাস ব্যালান্টাইনকে সাথে নেবার তোমার পরিকল্পনাও ভালো ছিল। একজন দোভাষী হিসেবে খুব কাজে লেগেছে আর আলোচনাকে ভালোভাবে পরিচালনা করতেও আমাকে সাহায্য করেছে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজি হয়েছে আমাদের বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর নিরাপত্তা রক্ষার্থে আর আরব সাগর হয়ে মক্কা পর্যন্ত আমাদের তীর্থযাত্রীদের জাহাজগুলোর জন্য তাদের জাহাজ সরবরাহ করতে। মোগলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সৈন্য নেই, কিন্তু ইংরেজদের মত সমুদ্রে কীভাবে লড়তে হয় আমরা জানি না। আমাদের হয়ে জলদস্যুদের মোকাবেলা করবে তারা।'

'সুরাট বণিকেরা নিশ্চয়ই বেশ সম্মানিত বোধ করেছে যে একজন মোগল শাহজাদা ব্যক্তিগতভাবে গিয়েছে আলোচনার জন্য।'

মুচকি হাসল দারা। 'আমার মনে হয় বিস্মিতও হয়েছে। আমি বেশ শক্তিশালী একটা প্রদর্শনী করেছি—স্বর্ণ দিয়ে সাজানো একশ হাতি আর সবুজ পাগড়ি আর টিউনিক পরিহিত হাজার অশ্বারোহী, এই বিদেশীদেরকে মুগ্ধ করা সহজ—এত প্রাচুর্য দেখে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে চোয়াল।'

'ফলাফলে আব্বাজানও সন্তুষ্ট হবেন। আমাদের জাহাজে জলদস্যুদের আক্রমণে রেগে গিয়েছিলেন... থেমে গেল জাহানারা। 'কিন্তু আরো কিছু

ব্যাপার আছে যা তোমার জানা উচিত... প্রায় প্রতিরাতেই হারেমে খবর পাঠান রমণীর জন্য। কখনো দু'জন এমনকি তিনজনও। এমনকি সোনা আর মুক্তা খোদাই করে একটা আয়নাঘরও নির্মাণ করছেন যেন ভালোবাসাবাসির দৃশ্য চাক্ষুস করতে পারেন।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল দারা। 'তুমি কীভাবে এসব জানো?'

খানিকটা দুঃখের সাথে হাসল জাহানারা। 'হারেমে এটা বেশ পরিচিত মুখরোচক গল্প। আমি সাত্তি আল-নিসাকে বলেছিলাম খাজাসারাকে জিজ্ঞেস করতে, সেও নিশ্চিত করেছে এর সত্যতা। একই নারীর জন্য দু'বার খবর পাঠান না তিনি আর যতক্ষণ একসাথে থাকেন তেমন একটা কথাও বলেন না। আরো বলেছে যে আব্বাজান নাকি বিপজ্জনকভাবে নিচ্ছে—বিশেষভাবে পছন্দ করেন 'ঘোড়া বানানো..." প্রথমে শুনে তো আমি থ হয়ে গেছি। মাথাতেই আসেনি যে আমাদের আম্মাজানকে এতটা ভালোবাসার পরেও কীভাবে এমন করছেন...কিন্তু তারপরই খারাপও লেগেছে। মায়ের মৃত্যুর শোক কখনোই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি আব্বাজান আর এখন তাই যা পারেন করছেন। মনে হচ্ছে যেন পুরুষ হিসেবে নিজের সক্ষমতার পরীক্ষা নিতে শুরু করেছেন যখন কিনা একজন সম্রাট হিসেবেই মনোযোগী হবার কথা।

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল দুই ভাই-বোন। জাহানারা বলে উঠল, 'আমি কাউকে একথা বলিনি। কিন্তু বোরহানপুরে, আম্মাজান যখন ব্যথায় শুয়ে আব্বাজানের আসার অপেক্ষা করছেন, তখন আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছে যেন তাঁর মৃত্যু হলে আমি যেন আব্বাজানের উপর নজর রাখি আর কোন অনর্থ থেকে দূরে রাখি। আমি নিশ্চিত না যে কী বুঝিয়েছেন বা আমি কী করব। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে আম্মাজান আব্বাজানের চরিত্র ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে মায়ের পরামর্শ আর সহায়তা বিশেষ করে মানুষের প্রকৃতির প্রতি অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া আব্বাজান সমস্ত শক্তি সাহস, ক্ষমতা আর সম্পদ সত্ত্বেও দিকভ্রষ্ট হয়ে যাবেন—নোঙ্গর ছেড়ে ভেসে যাবে তরী। আমাদেরকে তাঁকে রক্ষা করতে হবে আর পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হবে দারা..তাঁর নিজের জন্য আর সাম্রাজ্যের জন্য। প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে।

আগ্রা দুর্গের প্রধান আঙিনায় গাছের সাথে ঝুলছে হাজার হাজার জ্বলন্ত রঙিন লণ্ঠন। একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মেরুন ভেলভেটের বিশাল তাঁবু। সপ্তাহখানেক পরিশ্রম করে শ্রমিকেরা এটি নির্মাণ করেছে আঠারো দিনব্যাপী নওরজ উৎসবের জন্য—আকবর প্রবর্তিত নতুন বছর উদ্‌যাপন উৎসব। ভেতরে সবটুকু ভূমি ঢেকে দেয়া হয়েছে মোটা নরম সিল্কের কার্পেট আর সোনা, মুক্তা ও দামি পাথরের তৈরি অ্যামব্রয়ডারী করা ব্রোকেডের পর্দা দিয়ে। উৎসব শুরু হবার পর থেকে প্রতি রাত্রে শাহজাহান তাঁবুতে দরবার বসিয়ে অভিজাতদের কাছ থেকে উপঢৌকন আর শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন অথবা তাদের ঝিকমিকে প্যাভিলিয়নে ঘুরে বেড়ান। আজ সন্ধ্যাটা অবশ্য একটু ভিন্ন হবে। আজ রাতে রাজকীয় মীনা বাজার বসবে। অভিজাতদের স্ত্রী ও কন্যরা চমৎকার সিল্ক আর ক্ষুদ্র অলঙ্কারের পসরা সাজিয়ে নিজেরাই ব্যবসায়ী বনে যান। খুব কমই হয় এরকম যখন দরবারের নারীরা সিল্কের পর্দা ফেলে বাইরে আসে আর পুরুষেরা সরাসরি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাদের সৌন্দর্যমাখা মুখের দিকে।

এরকমই এক উষ্ণ রাতে রাজকীয় মীনা বাজারে মমতাজকে প্রথম দেখেছিলেন শাহজাহান..রাজকীয় তাঁবুর সোনালি সামিয়ানার নিচে দাঁড়িয়ে অনুতপ্ত হয়ে ভাবলেন কেন রোশনারকে আবারো মীনা বাজার করার অনুমতি দিয়েছেন। মেয়েটা তর্ক করছিল যে রাজগৃহস্থালীর নারীদের জন্য এটাই বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মীনা বাজার অম্ল মধুর নানা স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছে যা ভুলে গেলেই ভালো হত... কীভাবে নিজের দোকানের পেছনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিল চৌদ্দ বছর বয়সী মমতাজ, চুলে জ্বলজ্বল করছিল মুক্তা আর হীরা... চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মিষ্টি ডোনমিনের সুবাস...ছোট একটা ফুলদানির জন্য তাঁর হাতে শাহজাহান তুলে দিয়েছিলেন উজ্জ্বল সোনার মোহর।

কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে হবে তাঁকে। সম্রাটের পরিদর্শনের মাধ্যমেই শুরু হবে মীনা বাজারের আনুষ্ঠানিক সূচনা। উঠে বসলেন অপেক্ষারত সুসজ্জিত পালকিতে। আটজন পেশীবহুল তাতার হারেমের নারী পরিচারকের কাঁধে চেপে বাতাসে ভেসে উঠলেন সম্রাট। আগে

আগে চলল খাজাসারা, পাহারা দেয়ার জন্য পাশেপাশে থাকল মসৃণ চেহারা খোজারা; শাহজাহান শুরু করলেন মীনা বাজার পরিভ্রমণ। পারস্যবাসী দাদীর কাছ থেকে শেখা গোলাপের মুখরোচক ব্যঞ্জন বানিয়েছে জাহানারা। এর সুগন্ধের সাথে সাথে সম্রাট চোখে দেখলেন রাজবাজীর বয়স্ক পরিচারকদের তৈরি চিনি আর মাখনের মিষ্টি।

আঙিনার অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অংশে পৌঁছলেন শাহজাহান। এখানকার দোকানগুলোতে পসরা সাজিয়েছে সভাসদ আর কর্মকর্তাদের পত্নী আর কন্যরা। প্রশংসাসূচক বাক্য আর দর কষাকষির ভান করতে করতে এগোবার সময় সম্রাটের মনোযোগ চলে গেল পণ্যের দিকে নয়, নারীদের দিকে। কয়েকজনকে চিনতে পারলেন কিন্তু বাকিদেরকে কখনো দেখেননি, যেমন বেগুনি সিল্কের রোব পরিহিত লম্বা এক নারী, বেণী করা চুলে গেঁথে রেখেছে গাঁদা ফুল। একজন রমণীর তুলনায় কাঁধ দুটো চওড়া হলেও কোমর বেশ সরু। কালো চোখ জোড়া সাহসের সাথে তাকিয়ে রইল সম্রাটের দিকে। দোকানের মালিক হিসেবে অন্য নারীদের চেয়ে তার পসরার দিকেই মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইলেন শাহজাহানের।

'কে এই নারী?' খাজাসারার কাছে জানতে চাইলেন সম্রাট।

'কলিমা বেগম। লাহোরে আপনার শাসনকর্তার স্ত্রী। আপনি দাক্ষিণাত্যে থাকাকালীন দু'জনে বিবাহ হয় কিন্তু স্ত্রী হিসেবে তেমন প্রিয় নয়। পাঁচ বছর আগে বিয়ে করা স্ত্রীকে নিজের সাথে লাহোরে নিয়ে গেছে লাহোরের শাসনকর্তা কলিমাকে রেখে গেছে। আপনি কি তার দোকান ঘুরে দেখতে চান জাহাপনা?'

'না, কিন্তু আজ রাতে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

'সে একজন বিবাহিত নারী, জাহাপনা...'

'এটা তোমার দেখার বিষয় নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে আগ্রহী, আমার আদেশ মতই কাজ করবে।'

এক বা দুই ঘণ্টা পরে নিজেকেই শুধোলেন শাহজাহান যে তিনি কেন করলেন এমনটা। গত বিশ বছরে যে হারেমের দিকে তিনি আগ্রহ দেখাননি সেখান থেকে কাউকে পাঠানোর জন্য খাজাসারাকে আদেশ দেয়া এক কথা আর তাঁর কোন এক প্রাদেশিক শাসনকর্তার স্ত্রীকে ডেকে পাঠানো তো পুরো ভিন্ন কথা। কি হয়েছে তাঁর? নিজের দুঃখ ভোলার

জন্য এমন কাজ এতটাই অর্থহীন যেমন রাস্তার কোন এক কুক্কুরীর উপর চড়াও হয় কুকুর?... না....খাজাসারাকে জানাতে হবে যে তিনি মত বদলেছেন।

কলাই করা ঘণ্টির কাছে পৌঁছলেন শাহজাহান, যেন ডেকে পাঠাতে পারেন কোন পরিচারককে। তারপরই থেমে গেলেন। হৃদয়ে মমতাজের জায়গা কেউ কখনো নিতে পারবে না...যতবারই তিনি কোন নারীকে বিছানায় নিয়ে যান, ততবারই নিজেকে আরো বেশি করে বঞ্চিত মনে হয়। তারপরও নারী দেহের সান্নিধ্যে খুঁজে পান ক্ষণস্থায়ী আরাম। এছাড়াও অন্য নারীদের সাথে ভালোবাসাবাসির সময় স্পষ্টতই বুঝতে পারেন যে এরা মমতাজের তুলনায় কতটা নিকৃষ্ট মন আর শরীরের দিক দিয়ে। আবারো প্রমাণিত হয় অকৃত্রিম আর একনিষ্ঠ ভালোবাসা রয়ে গেছে তাঁদের মাঝে।

শাহজাহান বিস্ময় নিয়ে ভাবতে লাগলেন যে খাজাসারা যখন তাকে সম্রাটের বিছানায় নিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন কী চলছে কলিমার মনে। এটা তো নিশ্চিতভাবেই বোঝা গেছে যে সে-ও আগ্রহী। কলিমার চোখের দৃষ্টি স্মরণ করে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই রইল না তাঁর। কলিমা কি নার্ভাস বোধ করছে? অথবা সম্ভবত ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা করা শুরু করে দিয়েছে যে কীভাবে এই অবস্থার ফায়দা নেয়া যায়? আর তিনি নিজে? নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে অন্য পুরুষের স্ত্রীকে হস্তগত করছেন ঠিক যেভাবে ডেভিড বাথশেরাকে চুরি করেছিল। এটা কি একজন সম্মানীয় লোকের মত কাজ? হয়তো বা। যদি কলিমা রাজি হয় তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে স্বামীর ভালোবাসা পাবার যোগ্য নয় সে। তার মানে তিনি স্বামী বা স্ত্রী কারো ভালোবাসাতেই অনধিকার প্রবেশ করছেন না, যেমনটা তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে মমতাজের মৃত্যু।

মধ্যরাতের খানিক আগে দরজায় শোনা গেল মৃদু করাঘাতের শব্দ। প্রবেশ করল খাজাসারা। একেবারে পিছনেই কলিমার লম্বা দেহ ঢেকে আগে ক্রিম রঙা আলখাল্লায়, লম্বা করে টানা ঘোমটায় ঢেকে আছে মুখ। 'আমি কলিমা বেগমকে নিয়ে এসেছি জাহাপনা।' জানালো খাজাসারা। 'আপনি আবার ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত কি হারেমে ফিরে যাবো?'

'না, বাইরে অপেক্ষা করো।'

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নারীকে দেখে আবারো ফিরে এলো শাহজাহানের বিস্মিত ভাব। দ্বিধায় পড়ে ভাবতে লাগলেন তিনি কেন করছেন এমনটা? দু'জনে একাকী হতেই এগিয়ে গেলেন কলিমার দিকে। আস্তে করে ফেলে দিলেন ঘোমটা। এইবার বেণী না করা থাকাতে দুই কাঁধের উপর আলতো করে ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল কেশরাজি। যেরকম আত্মবিশ্বাসী ছিল মীনা বাজারে ঠিক সেভাবেই সম্রাটের দিকে তাকিয়ে হাসলো কলিমা। ডান হাতে গলার কাছ থেকে নিজের পোশাকের রুপালি সুতা খুলতে শুরু করে দিল।

'না, এখনি না।'

'জাহাপনা?' হাত ছেড়ে দিল কলিমা।

'আজ রাতে তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি, কী মনে হয় তোমার?'

'কারণ আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করেছি। দেখেছিলাম যে বাজারে তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে।'

'তোমার নিজের কী অনুভূতি? স্বেচ্ছায় নিজেকে তুলে দিচ্ছ আমার হাতে?'

'অবশ্যই জাহাপনা।'

'কিন্তু, তুমি তো বিবাহিত। তোমার স্বামী?'

'অনেক মাস যাবত তাকে দেখি না আমি। তার কাছে আমি যেমন কিছু না, তেমনি আমার কাছে সেও। আমাকে বিয়ে করেছিল যৌতুকের কারণে। পাঞ্জাবে তার জমির পাশেই আমার পিতার জমি—এছাড়াও তার অন্য স্ত্রী আছে যাকে আমার চেয়েও বেশি পছন্দ করে।'

'কিন্তু তার প্রতিই বিশ্বস্ত থাকা কি তোমার দায়িত্ব নয়?'

'আমার সম্রাট যখন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সে ডাকে সাড়া দেয়াও কি আমার দায়িত্ব নয়?'

একের পর এক কথা সাজাতে পটু এই নারী, ভাবলেন শাহজাহান। তাঁকে প্রেমকলা শিখিয়েছে যারা সেসব রাজকীয় হারেমের বেশ্যাদের চেয়ে কোন অংশে উন্নত নয় এ নারী, সে সময় তিনি ছিলেন নারী সম্পর্কে অজ্ঞ, শিখতে আগ্রহী তরুণ শাহজাদা।

‘তোমার পোশাক খুলে ফেল।’ হুক খুলে ক্রিমরঙা পোশাক মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল দেখতে পেলেন শাহজাহান। পুরোপুরি নিরাভরণ দেহে সুগন্ধি তেল মাখানো উজ্জ্বল ত্বক, কোমরে ঝুলছে ছোট ছোট সোনালি পাতাওয়ালা স্বর্ণের চেন।

‘ঘুরে দাঁড়াও।’ আস্তে করে নড়ে উঠতেই কেঁপে উঠল সোনালি পাতার দল। চৌকোণা কাঁধ জোড়া মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সাথেই মিল বেশি। তেমনি পেছন দিক, গোলাকার পৃষ্ঠদেশ আর লম্বা পেশীবহুল পা দেখতে কামোদ্দীপক কিন্তু সুন্দরী নয়—অন্তত তাঁর কাছে তো নয়ই।

আবারো তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়াল কলিমা, আরেকটু হলেই শাহজাহান তাকে আদেশ দিতে যাচ্ছিলেন যেন পোশাক পরে নিজেকে ঢেকে নেয়। কিন্তু তার আগেই হাত দুটো তুলে মাথার পেছনে চুল হাত বুলাতে লাগল কলিমা। অসম্ভব পরিচিত এই ভঙ্গি কতবার একই ভঙ্গিমাতে তিনি দেখেছেন মমতাজকে! হঠাৎ করেই তীব্র বাসনায় ছেয়ে গেল মন।

‘ওখানে শুয়ে পড়।’ নিচু ব্রোকেডের চাদরে ঢাকা ডিভানের দিকে হেঁটে গেল কলিমা। নিজের পোশাকের পাথরের বোতাম খুলে ফেললেন শাহজাহান। নারী দেহের উত্তাপ পেলেন শাহজাহান নিজের নিচে। মুহূর্তখানেক পরে ডান হাতে প্রস্তুত করে নিলেন ক্ষেত্র—কিন্তু কলিমার উরু জোড়া একেবারে ভিন্ন মমতাজের নরম মাংসল দেহ থেকে—আনন্দে মৃদু ডাক ছাড়তে লাগল কলিমা—ভান না সত্যি বলতে পারবেন না সম্রাট—এরপর চিৎকার করতে করতে শাহজাহানের কাঁধ ঘামচে ধরল কলিমার হাতের নখ। এবারেও তার স্বর শুনতে পেলেন না তিনি, কানে বাজতে লাগল মমতাজের মোলায়েম কণ্ঠ, শাহজাহানকে ফিসফিস করে তাড়া দিচ্ছি তাঁকে আরো বেশি করে ভালোবাসতে।

দুই ঘণ্টা পরে ঘামে সিক্ত শরীর নিয়ে উঠে বসলেন শাহজাহান। হাতের উপর মাথা রেখে অন্ধকারকে ধন্যবাদ জানালেন। এই-ই ভালো। যদিও জানালার ফাঁক গলে চুইয়ে পড়া ঝাপসা আলোতে বোঝা গেল যে ভোরের আর খুব বেশি দেরি নেই। নিজের আনন্দ মেটার সাথে সাথেই তাড়িয়ে দিয়েছেন কলিমাকে; কিন্তু এখনো তার সুবাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে শয্যা মাঝে। পাশে রাখা মার্বেলের টেবিলে রুপার পাত্র থেকে পানি ঢেলে নিলেন এক কাপ, শেষ করে ফেললেন এক চুমুকে। ভয়ঙ্কর স্বপ্নটা দেখে

জেগে ওঠার পর এখনো কাঁপছে শরীর। এর সাথে কলিমার কোন সম্পর্কই নেই। দেখতে পেয়েছেন যমুনার তীরে ভূতের মত উঠে গেছে মমতাজের সমাধি, যদিও মার্বেলের বিশুদ্ধতা যথাযথ আছে। নিজের সৃষ্টির দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে, কিন্তু তখনই তীক্ষ্ণভাবে ভেঙে পড়তে লাগল সাদা গম্বুজ—ঠাণ্ডা পাথরের কোন টুকরো নয় ঠিক যেন কোন নারীর বক্ষ। মমতাজের বক্ষ। হঠাৎ করেই আতঙ্কিত চোখে দেখতে পেলেন ফিনকি দিয়ে রক্ত উজ্জ্বল লাল রক্ত ছুটতে শুরু করল গম্বুজের মাথা থেকে, ধেয়ে আসতে লাগল বেগুনি রঙের ছোট নদী...

অন্য আরেকটা দৃশ্য এসে ঢেকে ফেলল সমাধিকে—সন্তান প্রসবের যন্ত্রাণাতে গুঙ্গিয়ে উঠছে মমতাজ, ভিজে গেছে রক্ত আর ঘামে, চিৎকার করছে বাচ্চাটা এসে যেন সমাপ্তি ঘটে ব্যথার...এরপর আবারো রক্ত, এবার গড়িয়ে পড়ছে জল্লাদের খড়্গা থেকে, মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল তাঁর সৎভাই শাহরিয়ারের কর্তিত মস্তক...দৃশ্যপট বদলে গেল আবারো; জানি স্বামী খসরুর মৃত্যুর ভার সইতে না পেরে জ্বলন্ত কয়লার দিকে এগিয়ে গেল মুখে তুলে নিতে...একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লাল-সোনালি আভার দিকে...সাবধানে বেছে নিল ছোট একটা কয়লার টুকরা...তুলে নিল...মুখের কাছে এনে অনুভব করল এর তীব্র তাপ, এরপরই চোখ বন্ধ করে মুখ খুললো...চিৎকার করে গিলে ফেলল। এরপর জানির ঝলসানো মাংসের গন্ধ এসে লাগল নাকে, কাঁপতে কাঁপতে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন হতভম্ব শাহজাহান।

বড় বেশি মৃত্যু আর ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে গেছে তাঁর পরিবারে। মোগলরা কী করেছে যে এরকমটা হল? আল্লাহতায়ালা মোগলদের অসীম ক্ষমতা আর সমৃদ্ধির বর প্রদান করলেও এতটুকু শান্তিতে থাকার ফুরসত দেননি, যা কিনা একেবারে তুচ্ছ একটি পরিবারেরও অধিকার আছে পাবার। তাঁর নামের অর্থ 'পৃথিবীর শাসক', অথচ এই অন্ধকারে বসে মনে হল তাঁকে নিয়ে উপহাস করছে শব্দ দুটো।

আরেকটু আরাম পাবার জন্য নিজের জায়গা বদল করলেন শাহজাহান। গোধূলি বেলাতে হারেমে ফিরে গেছে মোটা কালো চুল আর অদ্ভুত হলুদ

চোখের অধিকারিনী তুর্কি বেশ্যা। তাঁর শরীর নিংড়ে নিয়েছে এ রমণী অথচ মন তবুও অশান্ত। বহু রাত ধরেই ঘুমাতে পারছেন না তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন নিচু টেবিলের তালা লাগান ড্রয়ারের দিকে, চাবি ঘুরিয়ে বের করে আনলেন ছোট্ট মদের বোতল, এর ভেতরে ফেলে দিলেন ছোট্ট এক চিমটি অফিম। জানেন যে এই জিনিস দিয়ে মেহরুন্নিসা শেষ করে দিয়েছে তাঁর পিতাকে কিন্তু তাঁকে নিদ্রা যেতেই হবে। একটু পরেই চলে গেলেন সুবাস মাখা সুখের কোলে। তিনি এবং মমতাজ পাশপাশি শুয়ে আছেন আগ্রাতে তাদের প্রথম প্রাসাদের বাগানে জেসমিন ছাওয়া কুঞ্জবনে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন মমতাজের গাল, তাকিয়ে দেখলেন হাসলেন মমতাজ, আস্তে করে এগিয়ে এলো তাঁর দিকে। আস্তে আস্তে তাঁর চোলির পান্না বোতাম খুলতে শুরু করলেন শাহজাহান, আঁটো-সাঁটো পোশাকের নিচে ভেলভেটের মত নরম বক্ষ।

'দয়া করে জেগে উঠুন...সন্ধ্যা খাবারের জন্য কাপড় পাতা হয়েছে আর আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছি...ভুলে গেছেন?'

একটা গলার স্বর—কোন এক নারীর কণ্ঠ—ভেসে এলো শাহজাহানের বিবশ চেতনাতে। চোখ খুলে চেষ্টা করলেন মনোসংযোগ করতে, কিন্তু তাঁর ডিভানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গোলাপি পোশাকের দেহটা ঝাপসা হল শুধু। এমনকি কাছে এগিয়ে এসে তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেও আলাদা করে চিনতে পারলেন না, মনে হল যেন কালো চুলের আড়ালে ঢেকে আছে অর্ধেক। দ্বিধাগ্রস্তভাবে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। মমতাজ? যদি মমতাজ তাঁর পাশেই শুয়ে থাকে তাহলে এমন হবে কীভাবে? কিন্তু দেহটা তাঁর আরো কাছে ঝুঁকে আসতেই কমলার মিষ্টি সুবাস পেলেন—মমতাজের প্রিয় সুগন্ধিগুলোর একটি যা সে ব্যবহার করত। তার মানে মমতাজই। হাত বাড়িয়ে কোমল স্তনে রুক্ষ হাত রাখলেন শাহজাহান।

'থামেন। কী করছেন?...অনুগ্রহ করে এমন করবেন না...

নারীদেহ ধাক্কা দেয়ার চেষ্টা করতেই আরো জোরে চেপে ধরলেন সম্রাট, ডান হাতেও কাজে লাগিয়ে উরুসন্ধিতে যেতে চাইলেন। নরম কাপড় ভেদ করে দৃঢ় মাংসপেশীর উষ্ণতা আর আবেদন টের পেলেন তার বিপরীত...মমতাজ কখনো তাঁকে কোন কিছুতে বাঁধা দেয়নি। এটা শুধুমাত্র তাঁকে প্ররোচিত করা জন্য একটা খেলা...

যুদ্ধরত নারীদেহের গলায় হাত পেঁচিয়ে শাহজাহান চেষ্টা করলো তাকে শুইয়ে দিতে, শরীরী গন্ধে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। 'তুমি জানো তুমি আমার কাছে কতটা...' ফিসফিস করে জানালেন, নারীদেহে আবদ্ধ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট। মমতাজ সব সময় সাড়া দিয়েছে তাঁর ডাকে। একেবারে প্রথম রাত থেকেই মমতাজ জানতো যে কীভাবে আনন্দ দিতে হয় ও গ্রহণ করতে হয় আর তাদের মাঝে সবসময় তাই ছিল। কিন্তু আরেকটু কাছে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ করে গড়ান দিয়ে ডিভান থেকে ছিটকে গেল নারী, মুখের উপর লুটিয়ে পড়ল কেশরাজি।

'কোথায় যাচ্ছো তুমি? যেও না...লাফ দিয়ে নামলেন শাহজাহান কিন্তু ধরার আগেই পিতলের বোল তুলে ছুড়ে মারল তাঁর দিকে, এসে আঘাত লাগল তাঁর ডান কপালে। মুখের উপর গড়িয়ে পড়ল রক্তের ধারা। ব্যথায় কেঁপে উঠে পিলার ধরে নিজেকে সামলাতে চাইলেন তিনি। এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে ফেললেন চোখ।

'আব্বাজান!'

আবারো চোখ মেলে তাকিয়েই জাহানারাকে দেখতে পেলেন শাহজাহান। চোলির সামনের অংশ খুলে উন্মুক্ত হয়ে আছে সব। কী ঘটেছিল? মাথা নাড়তে লাগলেন যেন এইভাবে কেটে যাবে চেতনার মেঘ। মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন...কান্না ভেজা কাজল লেপ্টে থাকা চেহারাতে শোক আর প্রতিবাদের ভাষা...

থ হয়ে গেলেন যে তিনি কী করতে যাচ্ছিলেন, 'জাহানারা...আমি চাইনি...'এক কদম এগিয়ে গেলেন সামনে, কিন্তু পিছিয়ে গেল জাহানারা, পেছন থেকে আসা ছাদের বাতাসে উড়তে লাগল তার গোলাপি মসলিনের স্কার্ট।

'না...আর কাছে আসবেন না!' অদ্ভুত শোনালো মেয়েটার গলা—উচ্চ আর রুক্ষ স্বর—ঘরে থেকে বের হবার দরজার দিকে তাকিয়ে আছে; কিন্তু পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন শাহজাহান। পিলার ছেড়ে এপাশে সরে দাঁড়াবেন শাহজাহান কিন্তু আবার কি মনে করে থেমে গেলেন। এভাবে কীভাবে যেতে দেবেন জানাহারাকে? আগে কথা বলতে হবে তার সাথে...'

'আমাকে বলতে দাও কী ঘটেছিল...'

'না!' একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জাহানারা তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়ে চলে গেলেন ছাদের দিকে।

'জাহানারা...দৌড়ে পিছু নিলেন শাহজাহান। বাইরের মৃদু আলোতে প্রথমে কিছুই ঠাহর করতে পারছিলেন না, আলো জ্বলছে তেলের পাত্রে, কিন্তু তারপরেই একটা শব্দে বুঝতে পারলেন যে কোথায় আছে জাহানারা—ছাঁদের একেবারে শেষ মাথার কাছে একটা সিঁড়িতে যেটা সরাসরি নেমে গেছে হারেমে। 'দাঁড়াও...'

এক মুহূর্তের জন্য পিছু ফিরে তাঁকে দেখল জাহানারা, তারপর মসলিনের স্কার্ট তুলে ধরে দৌড়ে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে, হঠাৎ করেই পা হড়কে হোঁচট খেলো সামনের দিকে। হাত বাড়িয়ে চেষ্টা করল কিছু ধরে তাল সামলাতে। নিচে পড়ার সময় স্কার্টের প্রান্ত গিয়ে পড়ল তেলের শিখার উপর। আতঙ্কে জমে গিয়ে শাহজাহান দেখতে পেলেন কাপড়ে ছড়িয়ে পড়ল কমলা রঙা আগুনের জিহ্বা আর চিৎকার শুরু করে দিল তাঁর কন্যা।

খানিকটা দৌড়ে, খানিকটা টলতে টলতে এগোতে লাগলেন শাহজাহান, কিন্তু তিনি পৌছবার পূর্বেই হারেমের নারী পরিচারিকারা ছুটে আসলো সিঁড়ি বেয়ে, নিশ্চয়ই তারা শুনতে পেয়েছে মেয়েটার চিৎকার। কী ঘটেছে দেখতে পেয়ে দু'জন হাঁটু গেড়ে ধপ করে বসে পড়ল জাহানারায় পাশে, একজন চেষ্টা করল খালি হাত দিয়েই আগুন নিভিয়ে দিতে—আরেকজন চেষ্টা করতে লাগল জ্বলন্ত স্কার্ট খুলে নিতে। খানিকটা কাজও হচ্ছিল, কিন্তু একজন ঠিক জাহানারার উপরেই ঝুঁকে পড়াতে আগুন ধরে গেল তার লম্বা চুলে, নিজের মাথা খামচে ধরে চিৎকার জুড়ে দিল সেও। এর প্রায় সাথে সাথে দ্বিতীয় জনের কাপড়েও আগুন ধরে গেল, উঠে দাঁড়িয়ে একটা ঝরনার দিকে এগিয়ে যেতেই হালকা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল আগুন, মনে হল মানব মশালে পরিণত হয়েছে পরিচারিকাটি।

এরই মাঝে এগিয়ে এসেছে অন্য সেবাদাসীরাও। সবাই মিলে পানি ঢালতে লাগল জাহানারার উপর। পানি ঢেলে নিভিয়ে দিল আগুনের শিখা, তারপর নজর দিল বাকি দু'জনের উপর। কিন্তু শাহজাহান

তাকিয়ে আছেন কেবল নিজ কন্যার দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে পোড়া কাপড়ের টুকরা সরিয়ে ফেলতে লাগলেন, ভয় পাচ্ছেন যে কী দেখবেন তা ভেবে।

উপুড় হয়ে শুয়ে আছে জাহানারা, পিঠের কিছু অংশ আর বাম পা মারাত্মকভাবে পুড়ে গেছে আর অনিন্দ্য সুন্দর চুলের বেশির ভাগই ভস্ম হয়ে গেছে। পোড়া মাংসের গন্ধ নাকে ঢুকতেই হাঁপাতে লাগলেন সম্রাট।

'হাকিমেরা আসছে, জাহাপনা'। শুনতে পেলেন বলে উঠল কেউ একজন। ধোঁয়া আর শোকাচ্ছন্ন চেহারায় নেমে এলো অশ্রু জল, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই শক্তপোক্ত হাত এগিয়ে এলো তাঁকে সাহায্য করতে। মিনিটখানেক পরে দু'জনে হাকিম এসে ঝুঁকে পড়ল জাহানারার উপর। 'শ্বাস পড়ছে কিন্তু পোড়া ক্ষতগুলো বেশ খারাপ। অবশেষে বলে উঠল হাকিম দ্বয়ের একজন।

'কোথায় নিয়ে যাবো, জাহাপানা? নিজের প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো শাহজাদীকে? 'জানাতে চাইল অন্য হেকিম।

'না...দুর্গের ভেতরে রাজকীয় হারেমে তার জন্য মহল তৈরি কর। সেবাদাসীদের দিকেও সব রকম খেয়াল রাখবে—জাহানারাকে সাহায্য করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে তারা' আদেশ প্রদান শেষে শাহজাহান তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে হাকিমের নিদের্শানুযায়ী বাকি সেবাদাসীরা এসে পানিতে ভেজা তুলার চাদর দিয়ে ঢেকে দিল জাহানারা আর অন্য দুই নারীকে। তারপর সাবধানে তুলে নিল শিবিকাতে।

ছাদের থেকে নামার সময় আস্তে আস্তে তাদের পিছু নিলেন শাহজাহান। পলকের জন্য যমুনা নদীর দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল মমতাজের অর্ধনির্মিত সমাধি। 'মায়ের মত আবার কন্যাকেও মৃত্যুবরণ করতে দিও না। প্রার্থনা করতে লাগলেন শাহজাহান। এর বদলে আমাকে শাস্তি দাও, আমি এরই যোগ্য।'

অধ্যায়-১০

জাহানারা বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে উঠতেই কাছে ঝুঁকে এলেন শাহজাহান। খানিকটা কেঁপে উঠল চোখের পাতা। কিন্তু তারপরই আবার স্থির হয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল অসুস্থ কক্ষের আলো-আঁধারীতে। অবস্থার যদিও তেমন অবনতি হয়নি তারপরও উদ্বিগ্ন হয়ে আছে হাকিমেরা। খুব কম সময়েই পুরোপুরি চেতনা থাকে জাহানারার আর গোলাপি বর্ণের পোড়া ক্ষতগুলো ড্রেসিংয়ের পরেও ভয়ঙ্কর লাগে দেখতে। গত দশ দিন ধরেই চলছে এরকম। যতটা পারেন কন্যার বিছানার কাছেই সময় ব্যয় করছেন শাহজাহান। দর্শনার্থীদের সামনে কেবল সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দেখা দিয়ে আসেন। মাথা নামিয়ে বসে আছেন সম্রাট। বারে বারে মাথায় ভাসছে সে রাতের স্মৃতি। অফিমের ঘোরে জাহানারাকে মমতাজ ভেবে ভুল করেছিলেন। আর নিজ কন্যার প্রতি এমন অপরাধ করতে যাচ্ছিলেন যা খোদা এবং মানুষ উভয়ের চোখেই জঘন্যতম অপরাধ। তিনি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছেন না, তাহলে কীভাবে আশা করেন যে জাহানারা তাঁকে ক্ষমা করবে?

রোগীর ঘরে এসে প্রায়ই তাঁকে সঙ্গ দেয় দারা আর মুরাদ। কয়েক দিনের মাঝেই বোরহানপুর থেকে আওরঙ্গজেব আর বাংলা থেকে শাহ সুজাও এসে পৌঁছে যাবে। আবারো একত্রিত হবে তাঁর পুরো পরিবার; কিন্তু পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ। কীভাবে তিনি তাদেরকে বলবেন যে সত্যিই কী হয়েছিল? কোথায় গেল সেই সৌভাগ্যের তারকা যা তাঁকে আগ্রাতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল মমতাজের মৃত্যুর পর?...তারপরেও এমন নয় যে ভাগ্য তাঁর প্রতি বিমুখ হয়েছে। বরঞ্চ নিজের দুর্বলতা দিয়ে

তিনিই এটিকে ডেকে এনেছেন। জাহানারা যদি সুস্থও হয়ে যায় তার ক্ষত সব সময় মনে করিবে দেবে যে কীভাবে তিনি কন্যার বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছিলেন। নিজের ভাবনায় এতটাই ডুবে ছিলেন যে প্রথমটাতে শুনতেই পাননি কক্ষের মাঝে হাকিমের পায়ের শব্দ, কাছে এসে ডেকে উঠল হাকিম, 'জাহাপানা?'

'কী হয়েছে?'

'বিদেশীটা বলছে সে সে একজন ইউরোপীয় ডাক্তারকে চেনে যে হয়তো শাহজাদীকে সাহায্য করতে পারবে। যদিও আমার সন্দেহ হচ্ছে তারপরেও আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আপনার কাছে পৌঁছে দেব বার্তা।'

'কোন বিদেশী?...নিকোলাস ব্যালান্টাইনের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, ইংরেজ লোকটা।'

'এখনি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তাকে। যদি সে জানে যে কেউ একজন বা কিছু সাহায্য করতে পারবে আমি এ সম্পর্কে শুনতে চাই।'

আধ ঘণ্টা পরে তাঁর সামনে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে নিকোলাস। জাহানারার স্কার্টে যে জায়গাতে আগুন ধরে গিয়েছিল তার থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরত্ব।

'কী অবস্থা? আমি জেনেছি যে তুমি নাকি একজন চিকিৎসককে চেনো যে শাহজাদীকে সাহায্য করতে পারবে?

মাথা নাড়ল নিকোলাস।

'একজন ফরাসী চিকিৎসক এখন এখানে আগ্রাতে স্থায়ী হয়েছে। অনেক বছর আগে একবার দেখা হয়েছিল তার সাথে—আমার প্রভু স্যার টমাসকে সুস্থ করে তুলেছিল পাকস্থলী প্রদাহ থেকে আর আমি জানি যে, একাজে তার দক্ষতা অসাধারণ। মাননীয়া জাহানারার পুড়ে যাওয়া সম্পর্কে আমার কাছে শুনে একটা প্রতিষেধকের কথা জানিয়েছে। যুদ্ধের সময় কামান ফেটে বা তীরের মাধ্যমে পুড়ে যাওয়া সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য এ ওষুধ আবিষ্কার করেছে সে। এই ওষুধ আরব, তার নিজের দেশ আর হিন্দুস্তানের যৌথ জ্ঞানের মাধ্যমে তৈরি। শপথ করে জানিয়েছে যে এতে ব্যথা কমে যায়। আরো জানিয়েছে যে তাড়াতাড়ি লাগাতে পারলে পোড়া চামড়া নতুন করে গজাতে থাকে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আমার সাথে করেই নিয়ে এসেছি যদি আপনি তার সাথে কথা

বলতে চান—আমি দোভাষীয় কাজ করব। অল্প অল্প ফারসী বলতে পারে ডাক্তার।

'ভেতরে নিয়ে আসো তাকে।'

খাটো চৌকানো দেহাবয়বের ডাক্তারের কালো বেল্ট বাঁধা রোব গোলাকার পেটের কাছে এসে আঁটসাঁট হয়ে আছে।

'কী ধরনের চিকিৎসার প্রস্তাব করতে চাও তুমি?'

অনুবাদ করে শোনালো নিকোলাস আবার মনোযোগ দিয়ে ডাক্তারের উত্তর শুনে নিয়ে ঘুরে তাকালো শাহজাহানের দিকে। 'চিকিৎসা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে একবার রোগীকে অবশ্যই দেখতে চায়। জানতে চাইছে এটা কি সত্যি যে কাঁধ, পেছন দিকে আর পা মারাত্মকভাবে পুড়ে গেছে?'

মাথা নাড়লেন শাহজাহান। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে আবারো বলে উঠলেন ডাক্তার। 'এখানে আগ্রাতেও একই রোগের চিকিৎসা করেছে বলে দাবি করছে। খড়ে ছাওয়া ছাদ এতটাই শুকিয়ে ছিল যে স্ফুলিঙ্গ থেকেই আগুন ধরে যায়। গত মাসে শহরের উত্তর দিকে এভাবেই আগুন ধরে গিয়েছিল বাড়ির সারিগুলোতে। বেশ কয়েকজন নারী মারা গেছে কারণ তারা পর্দা ভেঙে বাইরে আসতে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু সে কয়েকজনকে বাঁচাতে পেরেছে...এর সাথে যে মলমের কথা আপনাকে বলেছি তা তার নিজের আবিস্কার, এ সব কিছুই রোগীর যন্ত্রণা কমাতে পারে।'

'সে ব্যথা কমানোর কথা বলছে। রোগীর সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে পারবে? আমার কন্যার দুজন সেবাদাসী পুড়ে যাবার কারণে মারা গেছে।'

'আমি এর উত্তর জানি। জাহাপনা—আমি নিজেই তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলেছে যে চেষ্টা করবে কিন্তু কোন প্রতিজ্ঞা করতে পারবে না—অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না শাহজাদীকে দেখতে পাচ্ছে।'

'আর ক্ষতের আকার? যদি আমার কন্যা সুস্থ হয়েও যায় এটা কমাতে পারবে সে?'

ডাক্তারের সাথে কথা বলে নিল নিকোলাস, 'না, জাহাপনা পুড়ে যাবার ফলে সৃষ্টি ক্ষতের দাগ পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারবে না।'

'এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তাকে জানিয়ে দাও যে যদি সে আমার কন্যার জীবন রক্ষা করতে পারে তাহলে যা চায় পাবে।'

আবারো ফিসফিস করে ডাক্তারের সাথে আলাপ করে নিকোলাস উত্তর জানালো, 'জানতে চাইছে কত দ্রুত রোগিনীকে দেখতে পারবে?'

'এখানে রাজকীয় হারেমে তাকে দেখাশোনা করা হচ্ছে। কেবলমাত্র অসম্ভব জরুরি হলেই আমার হাকিমেরা প্রবেশের অনুমতি পায়। কোন বিদেশীকে এর আগে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়নি। এ ধরনের বিপর্যয়ের মুহূর্তে যদিও এসব নিয়ম বোকামীর সামিল, তার পরেও শ্রদ্ধা দেখাতেই হবে। তোমাদের দু'জনকে হারেমে যাবার অনুমতি দিলাম আমি। কিন্তু আমার নপুংসক ভৃত্যেরা তোমাদের মাথা ঢেকে নিয়ে যাবে।

ফরাসী লোকটা কিছু বলে উঠতেই মাথা নিচু করে শুনলো নিকোলাস। 'জাহাপনা, শাহজাদী খাদ্য আর পানীয়ের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কথা বলছে ডাক্তার।

'তাকে জানাও যে আমার কন্যা প্রায় অচেতন অবস্থায় আছে। দুর্ঘটনার পর থেকে তার ঠোঁটের মাঝে কয়েক ফোঁটা পানি মিশ্রিত আফিম গিয়েছে শুধুমাত্র ব্যথা কমাবার জন্য, বিশেষ করে পট্টি বাঁধার সময়।'

'ডাক্তার জোর দিয়ে বলছে যে যত শীঘ্রি সম্ভব শাহজাদীকে খাবার খাওয়াতে হবে—নরম করে দেয়া ফল বিশেষ করে কলা—কিন্তু বিশেষ যত বেশি বার সম্ভব পানি খাওয়াতে হবে। শরীরে তরল দরকার।'

আধ ঘণ্টা পরে ফরাসী ডাক্তারের কাঁধে হাত রাখলো নিকোলাস। খাজাসারা যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে ঠিক সেভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এরপর একজন খোজা-মৃসণ চেহারা, লাবণ্যময়—দুই বিদেশীর মাথার উপর সবুজ ব্রোকেডের কাপড় পরিয়ে দেয়। ঠিকঠাক বেঁধে যতক্ষণ পর্যন্ত না সন্তুষ্টি আসে যে হ্যাঁ, একজন বিদেশীও হারেমে প্রবেশের পর কিছু দেখতে পাবে না। নিকোলাসের ঘাড়ে সুড়সুড়ি লাগালো রেশমি কাপড়ের স্পর্শে। যাই হোক, খাজাসারার নির্দেশে আস্তে আস্তে পা ফেলে সামনে বাড়লো দু'জনে। খোজা ভৃত্যের কাঁধে হাত রেখে চলেছে ডাক্তার।

'কয়েক বছর আগে একবার হারেমে এসেছিলাম আমি।' ফিসফিস করে জানালো ফরাসী ডাক্তার, 'গুজরাটের মোগল শাসনকর্তার অন্দর

মহলে। তার বহু স্ত্রীর একজনের ধারণা হয়েছিল যে তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। আসলে বেশি খেয়ে ফেলেছিল সেই নারী আর আমি শুধু পেট পরিস্কারের ওষুধ দিয়েছিলাম। কিন্তু তার হাতের পালস খুঁজে পেতে যে কী কষ্ট হয়েছিল তা কখনোই ভুলবো না আমি। হাতের মাঝে এত মুক্তার মালা জড়ানো ছিল যে প্রথমে তো আমি খুঁজেই পাইনি পালস্ ।'

ডাক্তার মুচকি হাসতেই নিকোলাস দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। একই সাথে চিৎকার করে সাবধান করে দেয়া হল যে দু'জন বিদেশী এগিয়ে আসছে। তাই হারেমের অন্তর্পুরবাসিনীরা যেন দৃষ্টিসীমার আড়ালেই থাকে।

সামনে এগোতে গিয়ে জুতার নিচে নরম কার্পেটের স্পর্শ পেল নিকোলাস। আরো পাওয়া গেল ধূপ-ধুনার চনমনে মিষ্টি গন্ধ। আরো কয়েকবার এঁকেবেঁকে মোড় নিয়ে এগোতে দিয়ে আরো কয়েকটি দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। কিন্তু বৈচিত্র্যময় এই হারেমে প্রবেশ নিয়ে কল্পনাগুলো মনমত হল না। ভারতে আসার পর থেকে যৌন আনন্দের এ ক্ষেত্র সম্পর্ক বহু রসাত্মক কাহিনী শুনে এসেছে সে। যাই-হোক আবারো মনে পড়ে গেল আহত আর সম্ভবত মৃত্যুপথযাত্রী শাহজাদীর কথা। শাহজাহানের সব ছেলেমেয়েদের মাঝে জাহানারা আর তার ভাই দারা শুকোহকেই একেবারে তাদের বাল্যকাল থেকে চেনে নিকোলাস। জাহানারা বেশি আগ্রহী ছিল নিকোলাসের নিজের দেশের প্রথা নিয়ে প্রশ্ন করার ব্যাপারে—কেমন করে বাস করে নারীরা আর কেমন করেই বা একজন নারীই হয়ে উঠেছে এর সর্বময় শাসনকর্তা।

হঠাৎ করেই মোলায়েম মোমবাতির আলোতে পিটপিট করে উঠল নিকোলাসের চোখ জোড়া। মাথা থাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে কাপড়ের টুকরো। বড়সড় একটা রুমের মাঝে দাঁড়িয়ে নানানা ধরনের শিকড় বাকড় আর কর্পূরের গন্ধ পেল নিকোলাস আর ডাক্তার। চারপাশে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল জাহানারাকে। বদলে দেখতে পেল তিন রমণী সিল্কের কাপড় ধরে রেখে আড়াল করে রেখেছে কোন একজনকে। এটাই নিশ্চয়ই আহত জাহানারার শয্যা।

'মহামান্যার ক্ষত পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তার এখন আসতে পারে।' ঘোষণা করল খাজাসারা। 'কিন্তু দোভাষীকে পর্দার ওপাশেই থাকতে

হবে।' ডাক্তারকে নিজের কাঁধ থেকে চামড়ার ব্যাগ নামাতে দেখল নিকোলাস। এরপর নিজের নাকের উপর একজোড়া মোটা কাঁচের চশমা বসিয়ে দিল ডাক্তার। এরপর একজন দাসী পর্দা একটু তুলে ধরতেই ভেতরে ঢুকে গেল ডাক্তার। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল নিকোলাস। মনে হল বহু যুগ পরে, কিন্তু হয়ত পনের বা বিশ মিনিটের বেশি হবে না উদয় হয় ডাক্তার।

'তো? সাহায্য করতে পারবে তাকে?' জানতে চাইল নিকোলাস।

'পোড়া ক্ষতগুলো মারাত্মক আর পানি বের হচ্ছে—আমি মলম লাগিয়ে দিয়েছি আর দুই জগ ভর্তি করে রেখে যাবো যেন তার সেবাকারীরা পরে লাগিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আমি যতটা ভয় পেয়েছিলাম অবস্থা ততটা খারাপ নয়। আমার ধারণা বেঁচে যাবে। পালস্ স্বাভাবিক, নিঃশ্বাসও ঠিক-ঠাকভাবে নিচ্ছে। কিন্তু সুস্থ হতে এখনো সময় লাগবে আর—যত্নও প্রয়োজন।'

'সম্রাট তুমি যা চাও দিতে চেয়েছেন। কিছু চাও?'

'জানি আমি। এ মহান মানুষগুলোর ধারণা যে তাদের বিত্ত দিয়ে যে কোন কিছু বা যে কাউকে ক্রয় করা সম্ভব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শাহজাদীর তারুণ্য আর শক্তিই তার সবচেয়ে বড় সহায়ক হতে পারে, আমি নই।'

আইভরি বাঁধাইকৃত বইটা নামিয়ে রাখার আগে আরো একবার কবিতাটা পড়ে দেখল জাহানারা। দারার নিজের লেখা কবিতাটা পড়তে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। অসম্ভব ভালো লেগেছে যেদিন চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছে শয্যাপাশে বসে আছে তার ভাই। জাহানারা হাসতেই, দারা'র চোখে চিকচিক করে উঠেছে কান্না—এই অশ্রু কী খুশিতে যে সে বেঁচে আছে নাকি সৌন্দর্যহানির দুঃখে, নিশ্চিত নয় জাহানারা। বিছানার পাশে রাখা ছোট্ট আয়নাটা তুলে নিয়ে নিজের মুখের সামনে ধরল শাহজাদী। বাম গালের চামড়ায় মসৃণ, উজ্জ্বল একটা লাল চিহ্ন গলা পর্যন্ত নেমে যেতে যেতে চওড়া হয়ে গিয়েছে। পেছন দিক বা বাম পা দেখতে কেমন লাগছে কোন ধারণাই নাই। এখনো বেশ দুর্বল তাই নিজে বাঁকা হয়ে দেখার সার্মথ্য নেই। কিন্তু অনুমান করতে পারছে।

যাই হোক, অন্তত ব্যথাটা ধীরে ধীরে কমে গিয়ে মাথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। যদিও এর সাথে অন্য সমস্যাও জুড়ে যাচ্ছে। আগুন লেগে যাবার রাতে শাহজাহানের আচরণের স্মৃতি এতটাই তাজা আর তিক্ত যে মনে হল মাত্র তিনদিন আগেই ঘটেছে এমনটা—ছয় সপ্তাহ আগে নয়...সে সময় একমাত্র চিন্তা ছিল পালিয়ে যেতে হবে। মনে পড়ে গেল পা বেঁধে পড়ে গিয়েছিল কিছুর সাথে হোঁচট খেয়ে, যখন দৌড়ে পালাচ্ছিল, কিন্তু তারপরই সব অন্ধকার ছায়া আর সীমাহীন ব্যথা। পুরোপুরি চেতনা ফিরে পাবার আগের দীর্ঘ সময়টাতে ঝাপসা ঝাপসাভাবে মনে পড়ে যে পিতা এসে বসে থাকতেন তার বিছানার পাশে, হাকিমদের সাথে আলোচনা করতেন জাহানারার সুস্থতা নিয়ে। প্রথম প্রথম এতটাই দুর্বল ছিল যে বুঝতে পারত না তার কী হয়েছিল। কিন্তু টুকরো টুকরো আলোচনা শুনে অংশগুলোকে জোড়া লাগিয়ে বুঝতে পারে মসলিনের স্কার্টে আগুন ধরে গিয়ে মারাত্মকভাবে পুড়ে গেছে সে।

যখন নিশ্চিত হয়ে গেছে যে জাহানারা সুস্থ হতে আর বেশি দেরি নেই তখন খেয়াল করে দেখেছে যে শাহজাহান একাকী রুমে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ না কেউ—সাধারণত দারা, মুরাদ, অথবা রোশনারা সাথে থাকত। যখন ঘুম আসে না, অন্ধকারে শুয়ে থেকে বারংবার মনে পড়ে যায় সেই ভয়ঙ্কর রাতের স্মৃতি। চেষ্টা করে কোন একটা ব্যাখা খুঁজে পেতে যেন সবকিছু সত্ত্বেও পিতার প্রতি সে ভালোবাসা অনুভব করে, তার সাথে যেন সমঝোতা করতে পারে। কী হয়েছিল যে নিজ কন্যার সাথে এহেন আচরণ করলেন তিনি?

কারো সাথে যদিও সে আলোচনা করেনি যে কী হয়েছিল—বৃদ্ধ আর বিশ্বস্ত সাত্তি আল-নিসা, ভাইরা কিংবা রোশনারা কারো সাথেই না...এমনকি তার বোনও বিশ্বাস করতে চাইবে না, যদি বিশ্বাস করেও বুঝতে পারবে না।

'আজ কেমন আছ জাহানারা? তোমাকে ভালো দেখাচ্ছে!'

আওরঙ্গজেব কখন এসেছে শুনেতেই পায়নি জাহানারা। হলুদ পোশাকের নিচে কিছু একটা নিয়ে এসেছে। হাসি লুকালো জাহানারা—হয়ত আরেকটা উপহার। তার ভাইরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে যেন জাহানারা একটা ছোট্ট অসুস্থ শিশু তাই তাকে খেলনা দিয়ে

ভুলিয়ে রাখতে হবে। গতকাল বাংলা থেকে আনা কোরাল আর মুক্তার তৈরি নেকলেস উপহার দিয়েছে শাহ সুজা।

'প্রতিদিনই অনুভব করছি যে সুস্থ হচ্ছি।

'ভালো। দেখো কী এনেছি তোমার জন্য।' পোশাক থেকে স্বর্ণের পাখির খাঁচা বের করল আওরঙ্গজেব। বাঁকানো আইভরি দাঁড়ের উপর বসে আছে হালকা নীলাভ রঙের ঘুঘু, গলায় পেঁচানো পদ্মরাগমনির কলার।

'অনেক সুন্দর। ধন্যবাদ ভাই।'

'এটা কী?' হাতে বই তুলে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টে দেখতে লাগল আওরঙ্গজেব।

'দারার লেখা কয়েকটা কবিতা। সুরাটে যাবার পথে একজন সূফী সাধকের সাথে দেখা হয় আর তার সান্নিধ্যেই আর শিক্ষায় উৎসাহী হয়ে এ সকল পদ্য রচনা করেছে দারা। সেই সূফী সাধককে আগ্রতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে দারা যেন তারা আরো আলোচনা করতে পারে।'

'দারা কেন এত আগ্রহী হল? আর দেখ কী লিখেছে এখানে :

আমি আনন্দিত হয়েছি যে প্রতিটি মানুষই তার নিজস্ব পথে খুঁজে ফেরে সৃষ্টিকর্তাকে।'

আওরঙ্গজেবের অবজ্ঞা ভরা কণ্ঠে বিস্মিত হয়ে গেল জাহানারা।

'দারা সঠিক লেখেনি? আত্মিক জ্ঞানের সন্ধান করা তো আমাদের সকলেরই দায়িত্ব...আত্মিক শান্তি...যে পথেই আমরা তা পারি না কেন।'

'মোল্লা আর তাঁদের লেখনি? তাঁরাই তো আমাদের পথপ্রদর্শক আল্লাহর কাছে। তাদেরকে আর তাদের বিচারকে অবহেলা করে নিজস্ব পথে চলা শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা, আর বিপথগামীতাই নয়—এটা ধর্মদ্রোহীতা।'

'তাই? দারা মনে করে আলোকিত জ্ঞান অন্বেষণের পথে বাধা হচ্ছেন কয়েকজন মোল্লা—তারা সৃষ্টিকর্তা আর মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে যায় নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য। আমিও এ ব্যাপারে একমত।'

'এটা একেবারে যাচ্ছে-তাই চিন্তা।' ঠাস করে বইয়ের মলাট বন্ধ করে জাহানারাকে ফিরিয়ে দিল আওরঙ্গজেব। 'যখন তোমার শরীর আর মন শক্তি ফিরে পাবে তুমি বুঝতে পারবে।'

'সম্ভবত। অথবা যেহেতু আমি তোমার চেয়েও একেবারে কাছ থেকে অনুভব করেছি মৃত্যুকে, তুমি স্বীকার করবে যে আমি হয়তো অস্তিত্বের সত্যিকারের আচরণ বুঝতে পারি। আমাদের বিশ্বাস তোমার মত নয়, শুধু এই কারণেই দারা আর আমার উপর রাগ করো না...'

'আমি কখনোই তোমার সাথে রাগ করি না। কিন্তু দরবারে ফিরে আসার পর থেকে দেখছি যে দারা কতটা উদ্ধত হয়ে গেছে আর কীভাবে অন্যদের মতামতকে অশ্রদ্ধা করছে। একজন শিশু হিসেবেও ভালো ছিল না, সব সময় ভাবতো যে ওই সবচেয়ে ভালো জানে আর আমাদেরকে বলে দিত যে কী করতে হবে। কখনো বুঝতে পারেনি যে নিজে কী করছে। যখন থেকে আমি দক্ষিণে গেছি, সময় পেয়েছি মুসলিম বিভিন্ন রাজ্য গোলকুন্ডা, বিজাপুর আর আহমেদনগরকে কাছ থেকে দেখার। তাদেরকে দমিয়ে রেখে আমাদের রাজত্বের অধিকারে আনার জন্য আমাদেরকে শক্তি দেখাতে হবে—কিন্তু শুধু সামরিক শক্তি বলে, সত্যিকারের বিশ্বাসের পালনকারী আর অনুসরণকারী হিসেবে ধর্মীয় শক্তি দিয়ে। আমাদের পিতার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহের অন্যতম একটি কারণ ছিল যে পিতার মাঝে তিন ভাগই হিন্দু অংশ আর বিবাহ করেছে একজন শিয়া মুসলিমকে...'

'আমাদের পিতা একজন সম্রাট। তাঁর জন্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলার তাদের কোন অধিকার নেই। ঠিক একইভাবে আমাদের মা, সুন্নি অথবা শিয়া যাই হোক না কেন, তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম আর সকলের প্রতি দয়ালু...'

রাগে কাঁপতে থাকলো জাহানারার কণ্ঠস্বর। 'যদি আমরা নিজেরাই এ ধরনের সংকীর্ণ নিচুমনা কথার প্রভাবে পড়ে যাই তাহলে শুধু যে মায়ের স্মৃতিকে অপমান করব তা না আমাদের বেশির ভাগ প্রজার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো।'

'আমি দুঃখিত। আমি তোমাকে উত্তেজিত করতে চাইনি...চলো অন্য কোন কিছু নিয়ে কথা বলা যাক।' বিছানার কাছে হাঁটু গেড়ে বসল আওরঙ্গজেব। 'যখন আমি প্রথম ফিরে এসেছি তখন তুমি বলেছিলে যে একজন বিদেশী চিকিৎসক তোমাকে সাহায্য করেছে অলৌকিক এক 'মলম' দিয়ে। কে সে?'

'নিকোলাস ব্যালান্টাইনের একজন বন্ধু—নিকোলাসই তাকে নিয়ে এসেছিল। অসম্ভব শক্তি আছে লোকটার—একজন অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও, শেষ অংশটুকু যোগ না করে পারল না জাহানারা।

আওরঙ্গজেবের কালো চোখ জোড়া দেখে মনে হল যে সেও বুঝতে পেরেছে ভালো। আওরঙ্গজেব ভালোই বলেছে; কিন্তু যদি সে ঠিক বলে থাকে যে দারা মাঝে মাঝে বিধর্মীদের প্রতি ঝুঁকে যায়, তাহলে তো সে নিজেও সংকীর্ণমনা আর অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে।

দুই ঘণ্টা পরে চলে গেল আওরঙ্গজেব। ঘরের চারপাশের কুলঙ্গিতে তেলের বাতি জ্বেলে দিতে শুরু করল সেবাদাসীর দল, সম্রাটের আগমন, ঘোষণা শুনতে পেল জাহানারা। কয়েক মুহূর্ত পরেই কক্ষে প্রবেশ করলেন শাহজাহান একা। জাহানারার দেখভালের জন্য এক কোণায় বসে থাকা হামিককে জানালেন চলে যেতে। হাকিমের পেছনে জোড়া দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই হঠাৎ করে সন্ত্রস্ত বোধ করতে লাগল জাহানারা। মনে পড়ে গেল পিতার আচরণ। ভাবতে লাগল কক্ষে তাদের সাথে কেউ থাকলে কতই না ভালো হত।

বিছানার কাছে না এসে জানালার কাছে হেঁটে গেলেন শাহজাহান। তাকিয়ে রইলেন গোধূলির দিকে। শব্দ বলতে শুধুমাত্র বাইরের আঙিনাতে নিম গাছের কাছে থাকা ময়ূরের ব্যাকুল ডাক। এরপর ধীরে ধীরে জাহানারার দিকে ঘুরে তাকালেন। কিন্তু কথা বলার আগে কেটে গেল আরো বেশ কিছু মুহূর্ত। কর্কশ শোনাল কণ্ঠস্বর। কতবার যে আমি ভেবেছি তোমার কাছে আসব ক্ষমা চাইতে অন্তত বুঝিয়ে বলতে...কিন্তু এই সাহসটুকু না করতে পারার আগপর্যন্ত বুঝি নি যে আমি একটা কাপুরুষ। এখন দেখ আমি এসেছি, যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার...শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না...'

'না..' দয়া করে...পিতার যন্ত্রণাক্লিষ্ট চেহারা দেখে ভয় উধাও হয়ে গেল জাহানারার মন থেকে। 'সেই রাত নিয়ে আর কথা বলব না...আমাদের দুজনেরই উচিত ভুলে যাওয়া।' উঠে বসল জাহানারা, মানসিকের চেয়েও শারীরিক ব্যথায় ককিয়ে উঠল বেশি। কেননা পোড়া ক্ষতগুলোর জন্য শরীর টানটান করতে এখনো ব্যথা হয়।

'তোমার হৃদয় অনেক দয়াবান। আমার জন্য প্রায় মরতে বসেছিলে তুমি...কেননা পিতা-কন্যার সম্পর্কের সব সীমা লঙ্ঘন

করেছি আমি। এ কারণেই বলতে হবে আমাকে...আমি ভাবতে পারছি না যে সে রাতে আমাকে যেভাবে দেখেছিলে তারপরে আর কখনো আমার দিকে তাকাতে পারবে কিনা। আমি কোন অজুহাত দিতে চাই না। কিন্তু ঘুমের জন্য আফিম নেয়াতে আমি দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। অন্য দুনিয়ায় চলে গিয়েছিলাম আমি...অর্ধ-চেতনার বশে ভেবেছিলাম তুমি মমতাজ এবং ফিরে এসেছ আমার কাছে...আমি ভেবেছিলাম যে আমি মমতাজকে পেতে চলেছি। আমি বুঝতেই পারিনি যে এটা তুমি, যতক্ষণে পেরেছি অনেক দেরি হয়ে গেছে আর পালিয়ে গেছ তুমি।'

'আপনি ভেবেছিলেন আমি আম্মাজান?'

'হ্যাঁ, আমি তাকেই স্বপ্নে দেখছিলাম আর বাস্তবের সাথে মিলিয়ে ফেলছিলাম। আর কখনোই এমনটা ঘটবে না, আমি শপথ করছি। তোমার দুর্ঘটনার পর থেকে এক ফোঁটা মদ বা একদানা আফিমও ঠোঁটে ছোঁয়াইনি আমি।'

'অন্তত এতে খুশি হয়েছি আমি।'

'কিন্তু ক্ষমা করতে পারবে আমাকে...যা করেছি শুধু তাই না, ভয়ংকর অবস্থাটার জন্য?' মাথা নিচু করলেন শাহজাহান। 'আমি নিজেকেই দোষারোপ করছি যে সৎভাইদেরকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলাম বলে তোমার আম্মাজান মৃত্যুবরণ করেছেন, তেমনি আমার কৃতকর্মের জন্যেই আহত হয়েছ তুমি—উপর থেকেই এ শাস্তি পেয়েছি আমি।

চুপ করে রইল জাহানারা। এখন বুঝতে পারছেন কীভাবে ঘটল ঘটনাটা। পিতার কোন অনৈতিক কর্ম নয় এটা বরঞ্চ এমন এক দুঃখ যা থেকে এখনো বের হয়ে আসতে পারেননি বা মেনেও নিতে পারেননি। যদি এখন জাহানারা না বলে যে সে ক্ষমা করেছে, নিজেকেও যদি তা বোঝাতে না পারে—সেই রাতের ঘটনা কুরে কুরে খাবে তাদের দুজনকেই। আগুন লাগার আগে তার সবচেয়ে বড় দুঃশ্চিন্তা ছিল যে চারপাশের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন পিতা। যদি এখন থেকে জাহানারা ফিরিয়ে দেয় তাহলে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন শাহজাহান।

মুখে হাসি ফোটালো জাহানারা আর সাধারণভাবেই জানালো, 'হ্যাঁ, আমি ক্ষমা করেছি।' মুহূর্তখানেক পরেই অনুভব করল যে

আগ্রহভরে তার হাত ধরলেন শাহজাহান। বহু কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে; চেষ্টা করল কেউ যাতে আবেগপ্রবণ না হয়ে ওঠে তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আগুন লেগে যাওয়া রাত নিয়ে আর কখনো কথা বলব না আমরা—এতে শুধুমাত্র ব্যথাই বাড়বে। এর চেয়ে বরঞ্চ সামনের দিকে তাকানো যাক! আগে যেভাবে দেখতাম, সেভাবে তোমার কাছে আসা আর্তি-অনুরোধ পাঠিয়ে দেবে না আমার কাছে?'

'আবারো তোমার সাহায্য পেলে কৃতজ্ঞ হব আমি।'

পিতার আচরণে স্বস্তি দেখতে পেয়ে আরো যোগ করল জাহানারা। 'যখন আমি আবার আগের মত ঠিকঠাক হাঁটতে পারব—চিকিৎসকেরা জানিয়েছে যে আর বেশি দেরি নেই—নৌকা করে আমাকে নিয়ে যাবেন মায়ের সমাধি দেখে আসতে? কতটা উন্নতি হয়েছে দেখতে চাই আমি। শুধু আপনিই তাকে ভালোবাসতে না, আব্বাজান, আমরাও বাসতাম।'

মেয়েটা তাঁকে আরো একবার সুযোগ দিচ্ছে পরিবারের সাথে মিলিত হবার, বুঝতে পেরে চোখে জল এল শাহজাহানের। সেভাবেই উত্তর দিলেন, 'আমরা সবাই যাবো, অনেক দিন হয়ে গেল—অনেক দিনের চেয়েও বেশি—আমরা পুরো পরিবার একত্রিত হইনি।'

দ্বিতীয় পর্ব
‘সর্পদন্তের চেয়েও তীক্ষ্ম...’

অধ্যায়-১১

আগ্রা, ১৬৪৭

সুবাসিত বাগানের মধ্য দিয়ে এগোতে লাগলেন শাহজাহান। গোলাপি আকাশের পটভূমিতে অশ্রুবিন্দুর ন্যায় গম্বুজের নিচে সাদা মার্বেলের জমকালো সমাধিস্তম্ভ দেখে মনে হল, ভাসছে। সুনিপুণ এই সৌন্দর্য দেখে দম বন্ধ হয়ে এল সম্রাটের। এর আগে আজকের দিনে মমতাজের ষোড়শ মৃত্যুবার্ষিকীতে পাঠ করার জন্য কবিতা রচনা করে দিয়েছেন দরবারের একজন কবি।

> পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে তোমার দৃষ্টি দোলা দেয়
> স্মৃতির ভার তোমার পদাঙ্ককে সংকোচন করে দেয়
> মেঘে চোখের দৃষ্টিভ্রম করে দেয়,
> খাঁটি পাথরের ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়
> মদ স্ফটিকের ভেতর স্বচ্ছ দেখায়
> যখন তারার থেকে আলো মার্বেলে প্রতিফলিত হয়
> বাতির আনন্দ উৎসবে পুরো প্রাসাদ সুসজ্জিত হয়।

মমতাজের সবশেষ বিশ্রাম স্থানের অসাধারণ আকার আর উজ্জ্বলতা উভয়কেই তুলে এনেছেন কবি। চার বছর আগে দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকীতে, অস্থায়ী সমাধি থেকে নিয়ে আসা হয় মমতাজের মৃতদেহ। রত্নখচিত ফুল খোদাই করা সাদা মার্বেলের শবাধারে রাখা হয় মৃতদেহ। বাঁকানো

লতাগুলো জীবনীশক্তি আর নবজন্মকে তুলে ধরেছে যেন তারা সত্যিই জন্মেছে এই মার্বেলের উপর। সাধারণ কালো মার্বেল দিয়ে সোজা-সাপ্টা করে লেখা হয়েছে এপিটাফ : এই অত্যুজ্জ্বল সমাধিটি আরজুমান বানু বেগমের, যাঁকে মমতাজ মহল উপাধিতে সম্মানীত করা হয়েছে। একাকী ঘণ্টাখানেক সমাধিগৃহে কাটান শাহজাহান। এরপর পাথরের সিঁড়ি বেয়ে মাটির নিচে সমাধিগৃহ ছেড়ে উঠে যান মৃত সম্রাজ্ঞীর উদ্দেশে শোক পালনের জন্য অপেক্ষারত তাঁর পরিবার আর সভাসদদের কাছে। এখনো ঠিক একই কাজই করবেন তিনি।

তাঁকে যারা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে যে সময়ের সাথে সাথে কমে যাবে যন্ত্রণা, তাদের কথা বিশ্বাস করলে এখন আশাহত হতেন তিনি। যদিও শাসনকার্যের ভারে কিছু সময়ের জন্য চাপে ছিলেন তিনি, কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেছে যে কী হারিয়েছেন। অনুভূতিগুলো এখনো এত তাজা যে মনে হচ্ছে প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করছেন সমাধি স্তম্ভে। তারপরেও কী হারিয়েছেন তা অনুভব না করতে পারার মানে এই নয় যে তিনি মমতাজকে ভুলে যাচ্ছেন, এই কাজটা কখনোই পারবেন না...অন্তত যা সৃষ্টি করেছেন খানিকটা আরাম মিলবে। এর চেয়ে সুন্দরভাবে আর কখনোই ফুটে উঠতো না তাঁর ভালোবাসা আর হারানোর বেদনা।

এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি সমাধির কাজ। কারিগরেরা শেষ ছোঁয়া লাগাচ্ছে সীমানা দেয়ালের উপর সুন্দর করে বসানো লাল বালিপাথরের প্যাভিলিয়ানের উপর। এখানে সুর বাজাবে বাদকের দল। এছাড়াও সম্রাট নির্দেশ দিয়েছেন যেন মসজিদ আর অতিথিশালাগুলোকেও আরো চকচকে করে তোলা হয়। মাত্র গত মাসেই খাজনা আদায়কারীদের প্রধান কর্মকর্তা জানিয়েছে যে সমাধি নির্মাণের খরচ পৌঁছে গেছে পঞ্চাশ লাখ রুপিতে। ইঙ্গিত দিতে চেয়েছে যে এহেন খরচে কোন এক সময় দেউলিয়া হতে বসবে টাকশাল, কিন্তু মাঝপথেই তাকে থামিয়ে দিয়েছেন শাহজাহান—মোগল সামাজ্য এতটাই বিত্তবান আর শক্তিশালী যে, কোন কিছুই অসম্ভব নয় যেমন রত্নখচিত তাজমহল; সমাধিস্তম্ভকে জনগণ ইতিমধ্যেই 'মমতাজ মহল' থেকে সংক্ষিপ্ত করে তাজমহল ডাকা শুরু করেছে।

ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কত বড় এক উদাহরণ রেখে যাচ্ছেন শাহজাহান...যুগের পর যুগ মহিমা গেয়ে যাবে তাঁর নির্মিত দালান সমূহ, হোক সেটা ব্যক্তিগত ক্ষতির সৌধ তাজমহল অথবা দিল্লিতে সাম্রাজ্যের শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা শহর শাহজাহানাবাদ। এতে সহজে তাঁর শাসনামল ভুলতে পারবে না ইতিহাস। পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় দক্ষিণে মোগল সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করেছেন আর কে জানে উত্তরে কতটা এগিয়ে যাবেন তিনি আর তাঁর উত্তরসূরীরা?

এ ভাবনার উদয় হতেই কাঁধের উপর দিয়ে পলক ফেলে দেখে নিলেন চার পুত্রকে—সকলেই তাঁর মতই পরিধান করেছে শোকের শুভ্র পোশাক। ফটকদ্বারে একটা মাত্র বাজনার সাথে মৃদু তালে পা ফেলে পিতাকে অনুসরণ করছে। হেঁটে আসছে উত্তর দক্ষিণে বয়ে চলা পানির প্রবাহ আর মসৃণ বুদবুদঅলা মার্বেলের ঝরনার পাশ দিয়ে।

সমাধি স্তম্ভের কাছে পৌঁছতেই শুনতে পেলেন কালো আলখাল্লা পরিহিত মোল্লাগণ স্বর্গের উদ্যানে মমতাজের আত্মাকে গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা করছে। বালিপাথরের মঞ্চের কাছে পৌঁছে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন মার্বেলের তৈরি ছোট ভিত্তিমূল আর সমাধির মাঝখানের অষ্টভুজ প্রকোষ্ঠে। সোনালি ঝাড়বাতির আলোতে উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছে। ঝুলন্ত সিল্কের দেয়াল আর ধিকিধিকি করে জ্বলা ধূনার ধোঁয়ায় বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে যেন স্ফটিকের কণা।

পালিশ করা জাফরি কাটা পর্দার সামনে তাঁর জন্য সংরক্ষিত আসনে বসলেন শাহজাহান। একটি মাত্র পাথরের ব্লক কেটে তৈরি করা রত্নখচিত এ জাল ঢেকে রেখেছে নিচের সমাধি গুহাতে শুয়ে থাকা মমতাজের কফিনের অনুরূপ মার্বেলের স্মৃতিস্তম্ভ, পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ আরবীয় মুক্তা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে এর উপর।

স্মরণ সভার আচার অনুষ্ঠান পালন করলেন মন দিয়ে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা শেষ হতেই আবারো ডুবে গেলেন স্মৃতির মাঝে। দুঃখের তীক্ষ্ণ শলাকা এসে আঘাত করল হৃদয়ে, তীব্রভাবে অনুভব করলেন যে একাকী হতে চাইছে মন। সমাধি ছেড়ে দ্রুত পিছন দিকে হেঁটে গেলেন দক্ষিণের প্রবেশদ্বারে। চাঁদের আলোয় ঝাপসা দেখাচ্ছে সাদা মার্বেলের ছাত্রি। প্রহরীরা উঠে দাঁড়ালেও থামলেন না। হনহন করে

হেঁটে নিচে নদী তীরে নোঙর করে রাখা বজরার দিকে এগিয়ে চললেন। নাবিকেরা বুঝতেই পারেনি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন সম্রাট। দৌড় দিয়ে নামিয়ে দিল বজরায় ওঠার তক্তা। ‘ উল্টো দিকের বাগানে নিয়ে চলো আমাকে।’ আদেশ দিলেন সম্রাট।

মমতাজের সমাধি নির্মাণের কাজ তখন অর্ধেকও হয়নি এমন সময় তাজমহলের ঠিক অপর পাশে যমুনার তীরে নিজের মালিদেরকে দিয়ে মাহতাব বাগ নামে উদ্যান তৈরি করেন শাহজাহান—চন্দ্র আলোর উদ্যান। রাতের বেলা প্রস্ফুটিত হয় এরকম তীব্র সুগন্ধঅলা সব ফুলের চারা রোপণ করা হয় এ উদ্যানে। অনেক অনেক বছর আগে শাহজাহানের পিতৃপুরুষ বাবর একদা ক্রীড়াভূমি গড়ে তুলেছিলেন এ স্থানে। এখন এটি ব্যবহৃত হচ্ছে সম্রাট শাহজাহানের একান্ত ব্যক্তিগত স্থান হিসেবে। একাকী হেঁটে বেড়ান আত্মমগ্ন শাহজাহান, গভীরভাবে ধ্যান করেন স্মৃতিসৌধ নিয়ে।

যমুনার ঢেউয়ের তালে তালে অল্প অল্প দুলছে বজরা, তারপরেও দাঁড়িয়ে রইলেন শাহজাহান। বজরা তীরে নাক দিতেই নেমে যাবার তক্তার জন্য অপেক্ষা না করেই তীরে নেমে গেলেন। এগিয়ে গেলেন নদীর দিকে, মুখ করে তাকিয়ে থাকা ছোট মার্বেলের আচ্ছাদনের দিকে। এর নিচে বসে স্তম্ভের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বন্ধ করে ফেললেন চোখ। ভেসে এলো শুধু তীরে পানির আছড়ে পড়ার মৃদু শব্দ।

কিছুক্ষণের জন্য মন জুড়ে রইল শুধুই মমতাজ। সেই রাতে মমতাজের চাহনি যখন বুঝতে পেরেছে আর বেশিক্ষণ বেঁচে রইবে না, কখনো ভুলতে পারবেন না। শাহজাহান—অথবা সেই সাহস, শেষ মুহূর্তে সময়গুলোতে একসাথে সহভাগিতা করেছেন দু’জনে... মাঝে মাঝে মনে হয় শুধুমাত্র তখনই, বিচ্ছেদের সেই মুহূর্তে সত্যিকারভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে কতটা গভীরভাবে ভালোবাসেন এই নারীকে। বিবাহের পর থেকে বছরের পর বছর মমতাজের শর্তহীন ভালোবাসাকে চিরস্থায়ী হিসেবে নিয়েছেন তিনি—অন্ধকার মুহূর্তগুলোতে শক্তি শুষে নিয়েছেন এ ভালোবাসা থেকে। মমতাজের সৌন্দর্য আর মিষ্টি চরিত্র, মাংস আর পানীয়ের মতই টিকিয়ে রেখেছে তাঁকে। কিন্তু কখনো কি মমতাজের নিঃস্বার্থপরতা আর কষ্টসহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছিলেন তিনি? মমতাজের

শেষ মুহূর্তের উদ্বিগ্নতাও ছিল তাঁকে আর তাঁর সন্তানদের নিয়ে। আর এখানেই সম্ভবত মমতাজের কাছে হেরে গেছেন তিনি। পরিবারের হৃদয়ের স্পন্দন ছিল মমতাজ...তাঁর কাছেই নিজ হৃদয়ের অনুভূতি আর চিন্তা তুলে ধরতেন ছেলেমেয়েরা। সমব্যথিতা অবচেতনেই মিশে ছিল মমতাজের চরিত্রে। কেন তিনিও একই হতে পারেন না? মাঝে মাঝে মনে হয় নিজ সন্তানেরাই যেন আগন্তুক তাঁর কাছে। এর কারণ কি এটাই যে, নিজের পিতার সাথেও তাঁর সম্পর্ক বিদ্বেষপূর্ণ ছিল? অথবা এই কারণে যে একজন সম্রাট হিসেবে সাম্রাজ্যের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ও জনগণের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে আর তাই নিজের সন্তানদের জন্য সময় ব্যয় করা যাবে না?

যে কোন সংকটময় কালই একত্রিত করে তোলে পরিবারকে, এতে কোন সন্দেহ নেই। জাহানারা সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত উদ্বেগময় মাসগুলোতে ছেলেমেয়ের উপস্থিতিতে স্বস্তি পেয়েছেন তিনি। কিন্তু তার পর থেকে কদাচিৎ আবার তাঁরা একত্রিত হয়েছিল...এমনকি মমতাজের মৃত্যুবার্ষিকীতেও নয়। ফলে কীভাবে তিনি তাঁদের সম্পর্কে জানবেন, বিশেষ করে পুত্রদের সম্পর্কে? বত্রিশ বছর বয়সী দারা, পিতার সব সময়কার সঙ্গী, দরবারে তেমন একটা অনুপস্থিত থাকেন না, কিন্তু মাত্র পনের মাসের ছোট শাহ সুজা মৃত্যুবার্ষিকীর জন্যে আগ্রাতে ফিরে এসেছে কিন্তু পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে বাংলাতে নিজের প্রশাসকের দায়িত্বে ফিরে যেতে পারলেই খুশি হবে। যদি আগ্রাতে গত কয়েক সপ্তাহের তার আচরণ ভেবে দেখা যায়, তাহলে বলতে হবে যে সম্ভবত দরবার থেকে দূরে থাকার স্বাধীনতা উপভোগ করছে শাহ সুজা—পিতার কাছ থেকেও দূরে—নিজের প্রদেশের উন্নতির উচ্চাকাঙ্খাও আছে হয়ত। শাহজাহানের পিতা সুলভ সমালোচকের দৃষ্টিতে এখনো শাহ সুজা রয়ে গেছে পূর্বেকার মতই অলস আর আনন্দপিয়াসী। তারপরেও কি বলা যায় না যে এগুলো বিত্তশালী পরিবারে জন্ম নেয়া তরুণের সহজাত প্রবৃত্তি যদিও এগুলো তার নয়?

ভ্রুকুটি করলেন শাহজাহান। তৃতীয় পুত্র এখনো তাঁর কাছে এক বিস্ময়। যদিও কেউ তার সম্পর্কে লঘুতা বা চাপল্যের অভিযোগ আনতে পারবে না। আওরঙ্গজেবের বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। দাক্ষিণাত্য

থেকে ফিরে এসেছে। চারিত্রিক দিক থেকে হয়ে উঠেছে আরো বেশি গম্ভীর আর আত্মমগ্ন। কদাচিৎ প্রকাশ করে নিজের ভাবনা যদিও শাহজাহানের সন্দেহ যে এর কোন কমতি নেই আওরঙ্গজেবের মাঝে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে ওলেমাদের সাথে ধর্মীয় বিষয় আলোচা করে আর নামাজ পড়ে। খাবার এবং পানের ব্যাপারে মিতাহারী আওরঙ্গজেব কখনো মাদকদ্রব্য স্পর্শ করেনি। শক্তি ব্যয় করে সামরিক দক্ষতা অর্জনে। এ ধরনের অত্যন্ত কঠোর, সাদাসিধা জীবন যদিও সমালোচনার কিছু নেই; কিন্তু একজন তরুণের ক্ষেত্রে কেমন যেন অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুতাপের বিষয় এই যে, আওরঙ্গজেব দারার মত সামাজিক নয়। দু'জনেরই ধর্মীয় আর দর্শন বিষয়ে আগ্রহী। কিন্তু দারা অপেক্ষাকৃত বেশি কৌতূহলী আর খোলা মনের অধিকারী— বিরুদ্ধবাদীদের সাথে তর্কে অথবা নিজের ধারণা বদলাতে সদা প্রস্তুত—অন্যদিকে, আওরঙ্গজেব কেবলমাত্র তাদের সঙ্গই পছন্দ করে যারা তার মতই একই মতাদর্শের ধ্বজাধারী।

পিতা পুত্রের এ দূরত্ব বলা যায় শীতল সম্পর্ক—বেশ অপ্রতিভ একটি ব্যাপার। দারা'র সাথে কথা বলতে যদিও তিনি কোন সংকোচ বোধ করেন না; কিন্তু গুরুগম্ভীর আর মৌন স্বভাবের আওরঙ্গজেবের সাথে কী কথা বলবেন সেটাই ভেবে পান না। হতে পারে এর কারণ যে তিনি তাকে কমই দেখেছেন। আওরঙ্গজেবও ঠিক শাহ সুজার মতই—সম্ভবত কারণের ভিন্নতা থাকতে পারে—যত শীঘ্র সম্ভব আগ্রা ত্যাগে উৎসাহী ছিল। শাহজাহানও এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছিলেন। তারপরেও মনে হয় আওরঙ্গজেব আরেকটু বেশি সময় রাজদরবারে কাটালেই ভালো করত। জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের কাছ থেকে শিখতে পারত কেমন করে সহজাতভাবেই সন্তুষ্ট করতে হয় অন্যদেরকে।

হঠাৎ করেই পদশব্দের আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলে তাকালেন, 'কে এখানে?'

'আমি আব্বাজান।' জাহানারার কণ্ঠ শুনলেন শাহজাহান। অন্ধকার থেকে পেছনে কয়েকজন সৈন্যসমেত বের হয়ে এলো জাহানারার পাণ্ডুর দেহাবয়ব। 'নারীদের জন্য তৈরি পর্দার ফাঁক দিয়ে আপনাকে দেখেছি সমাধি ছেড়ে আসতে। চিন্তা হচ্ছিল।'

'একা এসেছ তুমি?'

'রোশনারা আসতে চেয়েছিল আমার সাথে কিন্তু আমি জানিয়েছি যে এর প্রয়োজন নেই। আমার কয়েকজন সেবাদাসী আর আপনার কয়েকজন ভৃত্য নিয়ে নদী পার হয়ে এসেছি।'

'তাদেরকে বলো দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে। অনুগ্রহ করে বলো...যোগ করলেন শাহজাহান। সন্দেহ করলেন জাহানারা হয়ত আপত্তি করতে চাইবে।

'কিন্তু আমাকে নিশ্চয় থাকতে দেবে, তোমার সাথে?'

দ্বিধা ভরে মাথা নাড়লেন সম্রাট। দ্রুত নিচে নেমে প্রহরীদের সাথে কথা বলে ফিরে এসে বসল জাহানারা।

'মাত্রই আমি তোমাকে নিয়ে, তোমার ভাইবোনদের নিয়ে ভাবছিলাম....কেমন করে সবকিছু বদলে গেল তোমার আম্মাজান মারা যাবার পরে।'

'আমরা সবাই বেশ ছোট ছিলাম তখন, দারা আর আমি একটু বড় হয়েছিলাম, বাকিরা তো সবাই ছোট ছিল।'

'আর এখন তোমরা সকলে নারী-পুরুষ হয়ে গেছ, আমি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। যখন আমি তরুণ ছিলাম সময় যেন চিরকালের মত একই থাকত—চির গ্রীষ্মকাল। অথচ এখন মনে হয় ঋতুগুলো আসছে আর যাচ্ছে। এমনকি আমার লাগান এই গাছের ফলগুলোও মনে হচ্ছে চোখের পলকে দ্রুত বড় হয়ে, পেকে পড়েও যাচ্ছে।'

কিছুই না বলে নদী থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের হাত থেকে বাঁচতে শালটা আরেকটু ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিল জাহানারা।

'সম্ভবত, আমাকে কোথায় সমাস্থি করা হবে তা ঠিক করার সময় এসে গেছে।' বলে চললেন শাহজাহান।

'আব্বাজান...'

'কেন, এ ব্যাপারে কথা বলা যাবে না? মৃত্যু এসে আমাদের সবাইকেই নিয়ে যাবে। প্রায়ই আমার মাথায় আসে তোমার মায়ের অনুরূপ একটি সমাধি নির্মাণের চিন্তা। এই জ্যোৎস্না উদ্যানেই হবে, তবে সাদা মার্বেল দিয়ে নয়, কালো মার্বেল দিয়ে। এমনকি দু'জায়গার মাঝে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটা রুপালি সেতুর ভাবনাও আছে; যেন রাতের

বেলা আমার আত্মা নদী পার হতে পারে মমতজের সাথে মিলিত হবার জন্য...কিন্তু সম্ভবত এটা একটু বেশিই আকাশকুসুম হয়ে যাচ্ছে, একজন মোগল সম্রাটের জন্যও।'

পিতার দিকে তাকিয়ে জাহানারা ভাবতে চাইলো যে তিনি কি সত্যিই ভেবে চিন্তে এসব বলছেন কিনা। ইদানীংকালের বিভিন্ন ঘটনার কথা মাথায় রাখলে অবশ্য এটা বলা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলা থেকে যেভাবে দেখে এসেছে, পিতা ছিলেন দৈনন্দিন বিষয়ে আগ্রহী, প্রয়োগবাদী আর যে কোন ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। এরপরেই খেয়ালী এক একাকিত্বের মেঘ এসে ঢেকে ফেলে চেতনা। অনেক কাল আগেই একেবারে হৃদয়ের গভীর হতেই ক্ষমা করে দিয়েছে জাহানারা, যদিও পুরোপুরি ভুলতে পারেনি কেমন করে একটা ঘটনা ঘটায় পুড়ে গিয়েছিল সে। তারপরেও গত কয়েক বছরে আবারো কাছাকাছি এসেছে পিতাকন্যা। এখন পিতার দিকে তাকিয়ে চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। শাহজাহানের বয়স আর মানসিক বিপর্যস্ততা স্পষ্টতই চোখে পড়ছে। যদি আবারো তিনি আগের মত নিজের সত্যিকারের রূপ ফিরে পেতে পারতেন।

'আমি আপনার মতামত চাই, আব্বাজান। আমার মনে হয় আমার কারিগরেরা ভালোই কাজ দেখিয়েছে। তারপরও সময় আছে যে কোন পরিবর্তন করার।'

'আজ সন্ধ্যায় আসব আমি। তুমিও আসবে আওরঙ্গজেব। দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাবার আগে দারার প্রাসাদ দেখার এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

'আমি দুর্গেই থাকতে চাই। দালানকোঠা তেমন টানে না আমাকে। এছাড়া রোশনারাকে দেখতে যাবো বলেও কথা দিয়েছিলাম।'

'এটা তো পরেও করতে পারবে। আমি চাই তুমি দারা আর আমার সঙ্গী হও।' না চাইলেও গলার স্বর উঁচু হয়ে গেল শাহজাহানের। যেমনটা ইদানীং প্রায়শ ঘটছে, আজও তাঁকে ক্রোধান্বিত করে তুলেছে আওরঙ্গজেব। 'এখন যাও তোমরা দু'জনেই। আমার আরো কিছু কাজ আছে।'

দুই ঘণ্টা পরে যমুনার তীর ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন শাহজাহান। দুই পাশে দারা আর আওরঙ্গজেব। পেছনে প্রহরীদের ছোট্ট দল। এখনো ধূলিধূসরিত আর কাঁচা দেখালেও মার্চের উষ্ণ সূর্যের আলোয় বেশ দৃষ্টিনন্দন দেখাচ্ছে দারার নতুন প্রাসাদ। আঙিনাতে ঘোড়া থেকে নামতেই হলুদ আর সোনালি উর্দিধারী দারার ভৃত্যেরা এগিয়ে এলো লাগাম ধরতে। আগ্রহ নিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগলেন সম্রাট। হাওয়া বাতাস খেলছে এমন সব কক্ষের মাঝে দিয়ে নিচতলার ছাদে নিয়ে গেল দারা। এরপর মাঝখানের সমান্তরাল ছাদে, যেটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজের মত ছত্রি। 'নাদিরা আর নারীদের দল সান্ধ্যবাতাস উপভোগ করতে পারবে।' ব্যাখ্যা করে জানালো দারা।

মাথা নাড়লেন শাহজাহান। 'ভালোই কাজ করেছে তোমার কারিগরেরা।' নিচতলায় পৌঁছে আবারো আওরঙ্গজেবের দিকে তাকালেন, 'তোমার কী মনে হয়?'

'বেশ সুন্দর। কিন্তু মনে হচ্ছে অর্থের ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা ছিল না।'

বিস্মিত হল দারা। 'যেমনটা তোমাকে বলেছিলাম, আমার দ্বিতীয় পুত্র সিপিরের জন্ম উপলক্ষে এ নতুন প্রাসাদ নির্মাণের জন্য অর্থ এবং জমি দিয়েছেন আব্বাজান।'

'যদি আমাদের ভ্রমণ শেষ হয়, তাহলে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে দুর্গে ফিরে যেতে চাই।'

পিতার দিকে তাকালেন আওরঙ্গজেব। 'বোরহানপুরের দক্ষিণে কর আদায় সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে একটা রিপোর্ট এসেছে আজ সকালে। আমি এখনো পড়া শেষ করিনি।'

এবার উত্তর দিল দারা। 'ভ্রমণ এখনো শেষ হয়নি। তুমি তো আমায় ভূগর্ভস্থ কক্ষ দেখোইনি। আলোপ্পো থেকে আনা আয়নার সারি দিয়ে মুড়ে দিয়েছি চারপাশ আর আমার নকশাবিদ বেশ কয়েকটি হাওয়া সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে যেমনটা পারস্য আছে। ফলে গ্রীষ্মকালেও শীতল থাকবে। আব্বাজান এটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে এলে আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাবো—অন্দরসাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি এখনো। তাই চারপাশে ধুলা আর নোংরা, কিন্তু আমি চাই আগ্রা ত্যাগের আগে দেখে যাক আওরঙ্গজেব।

মাথা নাড়লেন শাহজাহান আর প্রায় ঘুরেই তাকাচ্ছিলেন এমন সময় অদ্ভুত স্বরে কথা বলে উঠল আওরঙ্গজেব—না, আমি যাবো না।'

'আওরঙ্গজেব।' পুত্রের দিকে তাকালেন শাহজাহান। 'তোমার দাক্ষিণাত্যের সমস্যা নিশ্চয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আওরঙ্গজেব উত্তরে জানালো, 'না, যেমনটা বলেছি, আমি ভূগর্ভস্থ কক্ষ দেখতে চাই না আর আবারো অনুমতি চাইছি চলে যাবার জন্য।'

হতভম্ব হয়ে গেলেন শাহজাহান, নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। দৃঢ়তার স্পষ্ট ছাপ আওরঙ্গজেবের অভিব্যক্তিতে। কী হয়েছে তার? দারাকে তিনি এত সুন্দর একটি উপহার দিয়েছেন তাই কি অসন্তোষ হয়েছে সে? যদি তাই হয়, তাহলে মোটেই ভালো হয়নি ব্যাপারটা। সব পুত্রদের প্রতিই তিনি একেবারে মুক্তহস্ত। বালখিল্যতার কোন ইচ্ছেই নেই তাঁর। আদেশ দিলেন,

'আমি চাই ভাইয়ের অনুরোধে ঘরটি দেখতে যাবে তুমি।'

'আব্বাজান, আমাকে নির্দেশ দেয়ার আগে দয়া করে ভেবে দেখ কেন নইলে আপনাকে অমান্য করতে বাধ্য হব আমি।'

ক্রমেই রাগ বাড়তে লাগল সম্রাটের। 'তোমার এমন আচরণের কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। ভাইয়ের সাথে অভদ্রতা আর আমার সাথে অবাধ্যতা করছ তুমি। পিতা হিসেবে আমি বলছি না যে দারার কথা মত কাজ কর, তোমার সম্রাট হিসেবে আদেশ দিচ্ছি।'

'তাহলে প্রজা হিসেবে প্রতিবাদ করলাম আমি!'

লম্বা লম্বা পা ফেলে গিয়ে ছেলের পেশীবহুর কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন শাহজাহান।

'কী হয়েছে তোমার? যেমনটা বলেছি কর নয়ত শাস্তি দেব।'

'হতে পারে; কিন্তু অন্তত নিজের জীবন বাঁচাতে পারব আমি। এ কক্ষের কথা শুনেছি আমি—একটা মাত্র দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে, বেরোতে হবে। এর উদ্দেশ্যটাই বুঝতে পারছি না—হয়ত কোন ফাঁদ।

থ বনে গেল দারা। কী বলতে চাইছ তুমি? আমি তোমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছি?'

'কীভাবে নিশ্চিত হব যে তুমি তা চাইছ না?'

ধাক্কা দিয়ে আওরঙ্গজেবকে সরিয়ে দিলেন শাহজাহান। 'তুমি একটা ভণ্ড প্রতারক যদি এই অভিযোগ কর যে ভাই তোমাকে হত্যা করতে চাইছে। কক্ষটিতে যেতে জোর করব না আমি; কিন্তু এখনি সরে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।

আঙিনাতে বের হয়ে যেখানে ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখা হয়েছে, চিৎকার করে প্রহরীদের সেনাপ্রধানকে নির্দেশ দিলেন, 'অর্ধেক প্রহরী নিয়ে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে এখনি দুর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। বাকিরা এখানেই অপেক্ষা করো।'

ছেলের আচরণে আঘাত পেলেও আবারো কক্ষে ফিরে আসার সময় চেষ্টা করলেন গলার স্বর নিচু করতে। কোনমতেই চান না যেন বাইরের সৈন্যরা কিছু শুনে ফেলে। 'আওরঙ্গজেব, আগ্রা দুর্গে তোমার গৃহে ফিরে যাও, এক্ষুনি।'

'আব্বাজান, আমি...'

'চুপ করো। তোমার অজুহাত শোনার কোন আগ্রহ নেই আমার। যাও!' পুত্রের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন শাহজাহান। সূর্যস্নাত আঙিনার দিকে দ্রুত হেঁটে গেল আওরঙ্গজেব। একটু পরেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। রাগে রীতিমত কাঁপছেন বুঝতে পারলেন শাহজাহান। কুচক্রীকারীরা নিশ্চয়ই আওরঙ্গজেবের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে দারা তাকে মৃত দেখতে চায়। তার একগুয়ে অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা এমন ষড়যন্ত্রের ফল। না হলে কেন এই দাবি করল যে সে জানে তার উপর বিপদ নেমে আসছে?

রাগে হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণের জন্য প্রস্তরমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শাহজাহান। দারার দিকে তাকিয়ে দেখেন, অনিন্দ্যকান্তি মুখখানা ঘুরিয়ে রেখেছে অন্য দিকে, যেন পিতার চোখে চোখ না পড়ে যায়।

'আওরঙ্গজেব একটা ব্যাখ্যা চাওয়ার অধিকার আছে আমার।' প্রথম আগ্রা দুর্গ তারপর পুত্রের গৃহে আসতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগলেও এখনো প্রশমিত হয়নি শাহজাহানের রাগ। মাথা ঠাণ্ডা হবার জন্য অপেক্ষা করলে

ভালো হত, কিন্তু তৃতীয় পুত্রের এহেন অদ্ভুত আচরণের কারণ না জানা পর্যন্ত শান্তি পাবেন না তিনি।

'সেই সময়ে যা বলেছি, তার চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই আমার।' অনড় আওরঙ্গজেবের অভিব্যক্তি।

'তুমি পরিষ্কারভাবে বলেছ যে মাটির নিচের কক্ষে তোমাকে আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে দারার কোন একটা উদ্দেশ্যে ছিল।'

মাথা নাড়লেও কিছু বলল না আওরঙ্গজেব।

'কেন?' চিৎকার করে উঠলেন শাহজাহান। 'উত্তর দাও।'

'যদি আমি বলিও আপনি বিশ্বাস করবেন না আমাকে। দারা আমার বিরুদ্ধে আপনার মনে বিষ ঢেলেছে।'

'আওরঙ্গজেব, আমার সাথে রহস্য করে কথা বলবে না।'

খানিকক্ষণ দ্বিধা করে কাঁধ ঝাঁকালো তাঁর পুত্র। 'ঠিক আছে, আপনি যেহেতু বাধ্য করছেন...আগ্রাতে ফেরার পর থেকে আমি দেখছি দারা কতটা বদলে গেছে। দারা কখনোই নম্র ছিল না আর এখন তো রাজদরবারে ঠিক একটা ময়ূরের মতই সদর্পে ঘুরে বেড়ায়। যখন সাম্রাজ্যের দূরতম কোণে বসে আমি আর শাহ সুজা আপনার কাজ করার চেষ্টা করছি, দারা এখানে আহলাদে পরিপাটি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে...'

'তো তাহলে এই ব্যাপার নিয়ে তুমি হিংসা করছ!'

প্রথমবারের মত হাসল আওরঙ্গজেব। 'হিংসা? না। আমি ঘৃণা করি দারাকে। ওর শুধু দেখনো ব্যাপারটা আছে, কোন সারবত্তা নেই। অনেক বছর ধরেই এটা সন্দেহ করেছি আমি। তার পুরো মনোযোগ কীভাবে শুধু নিজেকে জাহির করতে হয়। ও এমন ভাব করে যেন ইতিমধ্যেই তাকে আপনার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা তার ভাইয়েরা যেন কিছুই না। আমাদের বিশ্বস্ততা নিয়ে পরীক্ষার আগে ভেবে দেখা উচিত।'

'সাবধানে কথা বলো আওরঙ্গজেব...'

'আপনি আমার সত্যিকারের ভাবনা আর অনুভূতি জানতে চেয়েছিলেন। যা শুনলেন তা যদি পছন্দ না হয় তাতে তো আমার কোন দোষ নেই। যেমনটা আমি বলেছি দারা উদ্ধত আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী...'

'কিন্তু তুমি যেমনটা দাবি করছ যে সে ভাবে তার ভাইয়েরা মূল্যহীন, তাহলে তোমাকে কেন হত্যা করতে চাইবে?'

'বাইরের পৃথিবীতে নিজেকে আপনার প্রিয়পুত্র হিসেবে জাহির করতে চায় দারা। আর আপনার স্বীকৃতি নিয়ে তার অবস্থানের ব্যাপারেও কোন ভয় নেই। কিন্তু গোপনে নিজের ভেতরে এ ভয়ে ভীত হয়ে থাকে যে, কোন একদিন আমরা কোন ভাই তাকে হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে বসব। সব সময় তো এটাই আমাদেরকে পথ দেখিয়েছে, "রাজসিংহাসন নয়ত কফিন"—আগেকার দিনে এটাই তো বলত সকলে, তাই না? আপনাকেও সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছিল আর এই করতে গিয়ে নিজের দু'জন সৎ ভাইকেও সরিয়ে দিয়েছিলেন পথ থেকে।'

নিশ্চুপ রইলেন শাহজাহান। রাগ আর অপরাধবোধের মিশ্র অনুভূতি পাকিয়ে উঠছে বুকের মাঝে। বহু কষ্টে গলার স্বর সংযত রেখে বলে উঠলেন, 'এটা ভিন্ন ব্যাপার। আর কোন উপায় ছিল না আমার। আমি যা করেছি তা করেছি শুধুমাত্র এই কারণে যে নতুবা আমার সৎভাইয়েরাই আমাকে হত্যা করে ফেলত—বস্তুত তোমাকেও—সম্ভাব্য শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইত। কিন্তু এ সময় তো বহু আগেই পেরিয়ে গেছে। এ ধরনের বর্বোরচিত নীতি আমার পরিবারে সহ্য করব না আমি। আমার সকল পুত্রই আপন ভাই, বড় হয়ে উঠেছে যত্নশীল পিতা-মাতার ছত্রছাত্রায়, যারা একে অপরকে ভালোবাসে, প্রতিদ্বন্দ্বী স্ত্রী আর উপপত্নীদের কাছ থেকে আসা ভাই-বোন নয় যে একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে।'

'আপনার ধারণা আমরা আপন ভাই, এই কারণই আমাদেরকে একসাথে বেঁধে রাখবে? দারাকে জিজ্ঞেস করুন, সেও কি এটা মনে করে কিনা? হাবিল আর কাবিলের কথা ভুলে গেছেন? ভাইদের মাঝে যুদ্ধ তো নতুন কিছু নয়।'

'এখনো তুমি আমাকে কোন প্রমাণ দিতে পারনি যে দারা তোমাকে আঘাত করতে চায়—তোমার ভয় পুরোপুরি অমূলক, মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা ছাড়া কিছু নয়...'

'না। এর চেয়ে বেশি। যেমনটা আমি বলেছি, দারা সন্দেহ করে যে সময় এলে পর তার কোন ভাই হয়ত সিংহাসনের জন্য তার সাথে লড়াইয়ে নামবে। শাহ সুজা ক্ষমতা পছন্দ করলেও, এমনকি তার নিজের উচ্চাকাঙ্খা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে অলস। মুরাদ এখনো ছোট এবং

নিজেকে প্রমাণও করেনি। তাই এখন দারার একমাত্র ভয় আমাকে নিয়ে আর এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সে জানে যে আমিও তার মতই সামর্থ্য রাখি—সম্ভবত তার চেয়েও বেশি। আমি নিশ্চিত যে দাক্ষিণাত্য থেকে রাজাদরবারে আমার ফিরে আসাটা ভালোভাবে নেয়নি সে। তার উদ্দেশ্য এতেই পূর্ণ হবে যদি আমি আর শাহ সুজার ক্ষেত্রে একই কথা খাটে—এখানে কেন্দ্রের প্রভাব আর আপনার কাছ থেকে দূরে থাকি। আর সব সময়ের জন্য আমি দূরে চলে গেলে তো আর কোন সমস্যাই রইল না তার। সে জানে আমি তার ধ্যান-ধারণা সমর্থন করি না। সূফী রহস্যবাদের প্রতি তার আগ্রহ, আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের দুর্নাম করা। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই আমাকে এক মোল্লা সাবধান করে দিয়েছে যে দারা নাকি বলেছে সাম্রাজ্যে আমার মত ধর্মান্ধ গোঁড়া লোকের প্রয়োজন নেই...'

হাত তুললেন শাহজাহান। আওরঙ্গজেবের এসব ধারণা আর অভিযোগ শুনে মাথা এত গরম হয়ে উঠল যে, বুঝতেই পারছেন না কোত্থেকে থেকে শুরু করবেন।

'তুমি ভুল বলছ। এটা তো প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার যে তোমার আর দারার মাঝে ভিন্নতা আছে, এমনকি তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও। বয়সকালে তোমরা দু'জনেই প্রায় সমকক্ষ থাকতে। কিন্তু তোমার এই অদ্ভুত অভিযোগ, ভিত্তিহীন সন্দেহ বরদাশ্‌ত করব না আমি। কোন সে মোল্লা যে ভাইয়ের বিরুদ্ধে তোমার মন বিষিয়ে তুলেছে?

'আমি বলতে পারব না। বিশ্বস্ত হয়েই আমাকে জানিয়েছে আর আমিও কখনো তার নাম প্রকাশ করব না।'

'অনেক হয়েছে তোমার এই ঔদ্ধতপনা আর অবাধ্যতা...কী করবে আর কী করবে না তা নিয়ে এমনভাবে কথা বলছ যেন তুমিই—আমি নই সম্রাট। দারার ভূগর্ভস্থ কক্ষ দেখতে যাবার আমার আদেশ অমান্য করেছ তুমি আর এখন বলছ যে নামটাও আমাকে বলবে না।'

কক্ষের এ মাথা ও মাথা পায়চারি শুরু করলেন শাহজাহান। 'দারাকে বলছ যে ক্ষমতালোভী, উচ্চাকাংখী—কিন্তু নিজেই বুঁদ হয়ে আছ এতে—ভাইয়ের প্রতি হিংসার মনোভাব পোষণ করছ, এমনকি এটাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করলেও এটাই সত্যি।'

'হতে পারে আমি হিংসা করছি, যদিও আপনি যে কারণে ভাবছেন, সেই কারণে নয়। যখন দারা আর আমি মেহরুন্নিসার কাছে থেকে বড় হচ্ছিলাম, তখনো আমি বুঝতে পারতাম যে আপনি দারাকেই বেশি ভালোবাসেন। এখনো মনে আছে লাহোর প্রাসাদের খাল থেকে উদ্ধার করতে আসার সময় কি করেছিলেন আপনি...কেমন করে দারার নাম ডেকেছিলেন আগে, আমার নয়—'ওকে বাঁচিয়ে তোলাটাই আপনার প্রধান চিন্তা ছিল।'

'এটা পাগলামী। আমি তোমাদের দু'জনকেই ভালোবাসি। আগেও বাসতাম। তুমি ততটাই আমার পুত্র, যতটা দারা।' অপলক ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন শাহজাহান।

'বলছেন ঠিকই আপনি, কিন্তু এটা সত্যি নয়। যদি তাই হত, তাহলে দারাকেও কোন একটা প্রদেশে পাঠিয়ে দিতেন, যেমনটা পাঠিয়েছেন আমাকে আর শাহ সুজাকে। এর পরিবর্তে তাকে দরবারে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন, যেমন করে মা মুরগি আগলে রাখে প্রিয় ছানাকে। কী করেছে সে এ পর্যন্ত? লড়াই করেছে যেভাবে আমি করেছি? নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে সাম্রাজ্যের জন্যে? না। কেননা আপনার চোখে ওর জীবন এতটাই মূল্যবান যে ক্ষতির মুখে ফেলা যাবে না। এর বদলে যমুনার তীরে নিজের প্রাসাদে নিরুপদ্রব জীবন কাটাচ্ছে সে। তার হারেমের যে কোন নারীর মতই বখে যাওয়া, আহলাদে মাখা জীবন।'

'চুপ কর! আর শুনতে পারব না আমি। যা কিছু তুমি বলেছ আমাকে নিয়ে আর দারাকে নিয়ে, সবকিছুই তোমার ভ্রান্ত কল্পনা, কিন্তু বিপজ্জনক। কী ঘটবে যদি দরবারে এ খবর ফাঁস হয়ে যায় যে সম্রাটের দুই পুত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে—এমনকি একজন আরেকজনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে? শুধু ভেবে দেখো যে, কেমন করে এ ঘটনার ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করবে সীমান্তের ভেতরে আর বাইরে থাকা আমাদের শত্রুরা...কতটা অনিষ্ট ঘটাতে চাইবে তারা। আমি তোমাকে বলছি আওরঙ্গজেব, ভাইয়ের বিরুদ্ধে একতরফা এ অভিযোগের এখানেই ইতি ঘটাও। একই সাথে আমার বিরুদ্ধে আনা তোমার অভিযোগেরও।'

পায়চারি থামিয়ে পুত্রের দিকে তাকালেন শাহজাহান।

আওরঙ্গজেব কিছুই না বললেও মুখের দৃঢ় অভিব্যক্তির অর্থ ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন সম্রাট। ছেলের এই পাগলামো মনোভাবের প্রতি ক্রোধান্বিত হবার পাশাপাশি তিনি এটাও ভেবে চিন্তিত হলেন যে, আওরঙ্গজেব নিজেকে এতটাই অপাংক্তেয় আর ব্রাত্যভাবে যে পিতা হিসেবে তাঁকেই শক্ত হতে হবে, দুর্বলতা দেখানো যাবে না আর এই আচরণ এখানেই খতম করতে হবে। নয়ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে এর পরিণতি? 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি নিশ্চিত হচ্ছি যে তোমার যৌক্তিক চিন্তাধারা ফিরে আসেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে আমার রাজপ্রতিনিধি হিসেবে আর দায়িত্ব পালন করছ না তুমি।'

আলোচনা শুরু হবার পর থেকে এই প্রথমবার শাহজাহান লক্ষ্য করে দেখলেন যে তীর নিশানাতে লেগেছে। দৃশ্যতই মূহ্যমান হয়ে গেল আওরঙ্গজেব।

'আব্বাজান...'

'না, এখনো শেষ করিনি আমি। অনির্দিষ্ট কালের জন্য আগ্রা দুর্গেই থাকবে তুমি। তোমার মানসিক অবস্থার এমন মুহূর্তে তোমাকে চোখের আড়াল করার ঝুঁকি নিতে চাই না আমি। আশা করি সামনের দিনগুলোতে নিজের বোকামি বুঝতে পেরে অনৈতিক অভিযোগ তুলে নেবে তুমি। ভাবতেও পারবে না যে আমাকে কতটা হতাশ করেছ তুমি।'

নিজের খাস কামরায় ফিরে এসে খানিক বসে রইলেন শাহজাহান। এখনো ডুবে আছেন গভীর চিন্তায়। সময় হয়ে গেছে পরিবার আর বাইরের পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়ার যে কোন্ পুত্রকে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে দেখতে চান তিনি আর সমস্ত সন্দেহের অবসান করার—অথবা অযাচিত আশার—কনিষ্ঠ কোন পুত্রের যদি কিছু থেকে থাকে। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই নিজেদের অসন্তুষ্টি মিটিয়ে নেবে তারা। বিবাদের আশংকাও দমন করতে পারবেন তিনি।

দুই দিন পরে, দর্শনার্থীদের সামনে নিজের জমকালো ময়ূর সিংহাসনে বসে গর্ববোধ করলেন শাহজাহান। এ ধরনের জৌলুস আর কোন শাসকই বা সৃষ্টি করতে পেরেছিল? তাঁর আদেশ মত সেনাপতি আর সভাসদগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠ পোশাক আর রত্ন পরিধান করেই হাজির

হয়েছেন আজ। কমলা রঙের সিল্কের আলখাল্লা আর হীরেখচিত হাতলওয়ালা ছুরি কোমরে ঝুলিয়ে জ্বলজ্বল করছে অশোক সিং। নিজের শাসনামলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করতে এসেছেন সম্রাট, তাই এমনটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে একবার সেদিকে তাকালেন শাহজাহান। দারার দু'পাশে শাহ সুজা আর মুরাদ। হাত তুলে নীরবতা কায়েম করলেন সম্রাট। যদিও বহু খিলানঅলা কক্ষটাতে এমনিতেই নেমে এসেছে নৈঃশব্দের চাদর।

'আজ তোমাদের সকালকে ডেকে পাঠানোর কারণ হল দরবারে আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকোহ্‌কে সম্মানিত করা। এই মর্মে আমি তাকে হিসার ফিরোজা জায়গীর ও লোহিত বর্ণের শিবিকা স্থাপনের অধিকার প্রদান করলাম।' কথা শেষ করার আগেই দেখতে পেলেন চারপাশে শুরু হয়ে গেছে চকিত দৃষ্টি বিনিময়। সবাই জানে তিনি কী বুঝাতে চেয়েছেন। দারাকে মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছেন। খুব বেশি সময় লাগল না নিজ খাস কামরায় রুদ্ধ আওরঙ্গজেবের কানে এ সংবাদ পৌঁছাতে। এর তাৎপর্যও বুঝতে পারল সে। সম্ভবত অবশেষে পার্থিব পৃথিবীর সত্যিকারের রূপ বুঝতে পারবে আওরঙ্গজেব, মেনে নেবে যে সিংহাসন কখনো তার হবে না। মিথ্যে আশার চারা উপড়ে ফেলে, ভ্রাতৃ বিদ্বেষের তিক্ততা রোধ করার জন্য দ্রুত কাজ করতে হবে শাহজাহানকে। যাই হোক আল্লাহর ইচ্ছেতে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটিই করেছেন তিনি। নিজের নিবুর্দ্ধিতা বুঝতে পারবে আওরঙ্গজেব, স্বীকার করে নেবে যে দারার উপস্থিতিতে সে কখনোই পিতার আনুকূল্য পাবে না। এটাও উপলব্ধি করতে পারবে যে তার ক্ষতি করার কোন কারণই নেই দারার—কখনোই দু'জনে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না—যদিও আওরঙ্গজেবের মত অহংকারী মানুষের পক্ষে হজম করা কঠিন হবে এ সত্য।

অধ্যায়-১২

আব্বাজান, আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই ...'

'কী হয়েছে জাহানারা? কোন সমস্যা নেই তো? তোমার স্বাস্থ্য...?'

প্রায় প্রতিদিনই পালকিতে করে দুর্গে আসে জাহানারা। তারপরও পিতার কাছে পাঠানো অনুরোধ যেন তার সাথে তারই প্রাসাদে দেখা করেন শাহজাহান—পেয়ে অবাক হয়েছিলেন সম্রাট।

'আমি ভালো আছি, আমার সম্পর্কে কিছু নয়, আওরঙ্গজেবের সম্পর্কে।'

'তো সে তোমাকে বলেছে তার সম্পর্কে ওকালতি করতে, তাই না?'

'না, সে জানেও না যে আমি তা করছি। কিন্তু পরিবারের মাঝে কোন ভুল দেখতে পেলে আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না তা। আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু সম্ভবত আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি, যা আপনি পাচ্ছেন না।'

নম্রভাবে হলেও এহেন পরিহাসে আঘাত পেলেন শাহজাহান।

'আমি স্বচ্ছভাবেই দেখতে পেরেছি সব। আওরঙ্গজেবের উচিত নিজেকেই দোষ দেয়া। আমি ভেবেছিলাম যে সে একজন পুরুষ, কিন্তু তার আচরণ তো সে কথা বলে না।'

'আমিও মানছি তা.... আর আমার ধারণা আওরঙ্গজেব নিজেও এখন বুঝতে পারছে। তার সাথে অনেক সময় কাটিয়েছি আমি, শুনেছি ওর আবেগপ্রবণ সব কথা, চেষ্টা করেছি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে, সে স্বীকার করেছে যে মূর্খের মত কাজ করেছে। শুধু চেয়েছে আপনার কাছে প্রিয়

হতে। এখন মিনতি করছে আপনি যেন তাকে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে অনুমতি দিন...'

'আমি একজন যোগ্য পদমর্যাদার কর্মকর্তা খুঁজে পেয়েছি, তাই তার আর প্রয়োজন নেই।'

'আব্বাজান—যখন আমি অসুস্থ ছিলাম আর আপনি আমার বিছানার পাশে বসে থাকতেন, মাঝে মাঝেই আমি শুনেছি যে আপনি আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করতেন যে আমি জীবন ফিরে পেলে আপনি যে কোন কিছু করতে রাজি। আমাকে পুনর্জীবন দান করেছেন আল্লাহ্, আর আমি—তিনি নন—এখন এই দয়া চাইছি আপনার কাছে।

'জাহানারা...'

'হ্যাঁ! আওরঙ্গজেব মন খারাপ করে আছে। ক্ষমা করে দিন তাকে, একসময় যেমন আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন আপনি। অবরুদ্ধ দশা থেকে মুক্তি দিন তাকে।'

'তারপর?'

'নতুন কোন কাজে নিয়োগ দিন। যদি দাক্ষিণাত্যে নাও হয়, অন্য কোথায় যেখানে সে তার মেধাশক্তি কাজে লাগাতে পারবে। এসবের অপচয় হবে না আর সে নিজেও দিনে দিনে তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠবে না। মোটেই অসন্তুষ্ট করবে না আপনাকে। আর এটা শুধু আমার মন্তব্য নয়, আমি দারার সাথেও কথা বলেছি। যদিও প্রথমে সে নিজেও আওরঙ্গজেবের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিল—আওরঙ্গজেবের ভ্রান্ত ধারণার কথা নিয়ে—কিন্তু তারপর জানিয়েছে যে শত্রুতার কোন ইচ্ছে নেই তার আর যদি আওরঙ্গজেব অনুতপ্ত হয় তাহলে সব ভুলে গিয়ে আওরঙ্গজেবের নতুন জীবন দেখতে রাজি সে।'

'কেন দারাকে এত অপছন্দ করে আওরঙ্গজেব? এটা কি শুধুই হিংসা?

'হতে পারে—কিন্তু এতে যে শুধু আওরঙ্গজেবেরই দোষ তা নয়। আমার পোড়া ক্ষত থেকে সেরে ওঠার পর থেকে আমি দেখেছি যে তাদের মাঝে মনোমালিন্য বেড়ে চলেছে। আমারও মনে হয়েছে যে আপনার দাক্ষিণাত্য পেয়ে নিজের উপর বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে দারা—যদিও আমি নিশ্চিত যে অবচেতনেই হয়েছে এমনটা। আওরঙ্গজেবের

মাঝে রসবোধ নেই, যেটা সে নিজেও জানে আর তাই দ্রুত বুঝেও ফেলে যদি কেউ তাকে অবমাননা করে—ইচ্ছেকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবেও—বিশেষ করে দারা। তাই এভাবেই শুরু হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

'কিছু কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক আমি জানি। কিন্তু আওরঙ্গজেব এমনভাবে কথা বলেছে যে সে দারাকে ঘৃণা করে। বড় ভাই তার সম্পর্কে এমন কী করেছে যে এত গভীরভাবে আহত হয়েছে সে?'

খানিকটা দ্বিধার পর জাহানারা জানালো, 'তাদের মধ্যকার ধর্মীয় ভিন্নতা।'

'ধর্মীয়? আমি জানি দারা সুফীবাদে আগ্রহী আর আওরঙ্গজেব মোল্লাদের সাথে প্রচুর সময় কাটায়, কিন্তু কখনো তো কল্পনাই করিনি যে ধর্ম কখনো এত বিরোধের কারণ হতে পারে।'

'ভুল করেছেন আপনি। দারার চরিত্র সম্পর্কে জানেন আপনি—সহিষ্ণু আর সবকিছু নিয়েই কৌতূহলী... আওরঙ্গজেব আমাদের সুন্নি পণ্ডিত আর মোল্লাদের সব কিছু মেনে চলে আর বিশ্বাস করে যে এদেরকে অমান্য করাটা ধর্মদ্রোহিতা। তার মতে দারার দর্শন ধর্মদ্রোহিতার সামিল আর আমাদের শাসনকার্যের অন্তরায়। আমি প্রায়ই তাকে বলতে শুনেছি যে মোগল সাম্রাজ্যের সমস্যা হল কঠোর আর সত্যিকারের মুসলিম পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি আমরা। দুর্নীতির জন্য আপনার কর্মচারীদের মাঝে হিন্দু আর শিয়াদেরকে দোষারোপ করে সে। আর বিশ্বাস করে যে আমাদের প্রশাসনকেও দূষিত করতে তুলছে এরাই। আমাকে এও জানিয়েছে যে, দাক্ষিণাত্যে থাকাকালীন অবৈধ সুদ আর অনৈতিকতার বহু উদাহরণ খুঁজে পেয়েছে যার পেছনে হাত রয়েছে আমাদের হিন্দু প্রজাদের—জমিদারের হাতে দাসের মত নিঃশেষিত হচ্ছে পুরো গ্রাম। জমিদার তাদেরকে দারিদ্র আর ঋণের জালে জড়িয়ে রেখেছে।

'এই ধরনের ক্ষেত্রে ধর্ম কোন ব্যাপার নয়, চরিত্রই আসল। যদি সে অপরাধের কথা জানতে পারে, তাহলে আমার রাজ প্রতিনিধি হিসেবে তার দায়িত্ব হচ্ছে এগুলোকে ঠিক করা।'

'অবশ্যই। আর আওরঙ্গজেবের মতে এ কাজটিই করতে চেয়েছে সে। কিন্তু তার মতে শাসনকার্যের একেবারে গভীরে পৌঁছে গেছে পচন।

কট্টরবাদী মোল্লাদের উৎসাহে সে চায় প্রতিটি হিন্দুকে—তার ভাষায় অবিশ্বাসীদের অপসারণ করতে হবে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে।'

'তাহলে বলতে হয় যে সে একটা বোকা। আমার দাদাজান বুঝতে পেরেছিলেন যে সাম্রাজ্যকে একত্রে বেঁধে রাখতে হলে আর এর সমৃদ্ধি সাধন করতে হলে সকল প্রজার প্রতি সমান আচরণ করতে হবে—অশোক সিংয়ের মত হিন্দু আর মুসলিম, সকলের জন্য। তুমি নিজে যেমন একবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে যে আমার বিশ্বস্ত আর আস্থাবান সভাসদ ও সেনা প্রধানদের মাঝে হিন্দু রয়েছে, আমাদের ধমনীতে বয়ে চলেছে রাজকীয় রাজপুত রক্ত।'

'একই কথা বলে দারাও আর এখানেই তাদের বিরোধ। শেষবার, দারার প্রাসাদ দর্শনের এক কি দুইদিন আগে, দুজনের প্রায় মারামারি লেগে যাবার দশা যখন আওরঙ্গজেব বলে বসে যে আমাদের উচিত হিন্দু মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।'

'সম্ভবত দুইজনেই ভুলে গিয়েছিল যে আমিই এখনো সম্রাট আর আমিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব যে, আমার সাম্রাজ্যের উচ্চ পর্যায়ে কারা কাজ করবে আর কোন ধরনের ধর্মীয় দালান নির্মাণে আমরা অনুমতি প্রদান করব।'

'আমি আপনাকে ক্ষিপ্ত করে তোলার জন্য বলিনি। আমি শুধুমাত্র আমার ভাইদের মাঝে কোন সমস্যা হয়েছে তা বুঝিয়ে বলতে চেয়েছি।'

'তুমি যেটাকে ব্যাখ্যা বলছ, সেখানে তো কিছুই নেই যে আওরঙ্গজেব কেন ভাবছে দারা তাকে হত্য করতে চায়?'

'আওরঙ্গজেব এখন জানে যে সে অসঙ্গত আচরণ করেছে। কিন্তু তার মত করে দেখার চেষ্টা করুন। দারা সবসময় সতর্ক থাকে না। ছোটবেলা থেকেই আওরঙ্গজেবকে প্রলোভনে ফেলে মজা করতো দারা। এখন এই মধ্যবয়সেও সে জানে যে কোথায় টোপ ফেললে আওরঙ্গজেব দারাকে নিজের শত্রু ভাবা শুরু করবে, সন্দেহ গড়ে তুলবে আর দারার প্রতিটি কাজের বাঁকা অর্থ খুঁজবে...কিন্তু আওরঙ্গজেব জানিয়েছে যে সব কিছুই এখন অতীত আর সে একটা ভুল করেছে ভূগর্ভস্থ কক্ষ নিয়ে। আবারো আপনার আস্থা অর্জন করতে চাইছে। আমিও বিশ্বাস করি এটা সত্যি।'

চুপ করে রইলেন শাহজাহান। জাহানারা কি ঠিক বলছে? দারার প্রাসাদের সেই ঘটনার পর থেকে দুর্গের মাঝে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে আছে আওরঙ্গজেব। যদিও তার উপর খুব সূক্ষ্মভাবে নজরদারির ব্যবস্থা করেছেন সম্রাট, সন্দেহমূলক কিছুই পাওয়া যায়নি। কোন ধরনের রাজদ্রোহ বা সম্রাটের উত্তরসূরী হিসেবে দারার নাম ঘোষণার পর কোন অসন্তোষেরও আভাস পাওয়া যায়নি। আওরঙ্গজেব হয় খুব পাকা অভিনেতা অথবা সত্যিকার অর্থেই অনুতপ্ত হয়েছে।

'আব্বাজান। অনুগ্রহ করে জানান যে আপনি তাকে ক্ষমা করেছেন। আর নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ দেন। অন্তত আপনার দরবারের সভায় যোগ দেবার অনুমতি প্রদান করেন, যেমন দারা আর মুরাদ অংশ নেয়। আওরঙ্গজেবকে এভাবে দূরে সরিয়ে রেখে দরবারের চোখেও তাকে খাটো করছেন। আমরা সবাই জানি যে ও অহংকারী প্রকৃতির; তাই আপনার কাছে প্রকাশ না করলেও এতে আহত হচ্ছে আওরঙ্গজেব।'

'তাকে খাটো বা নীচ দেখানোর কোন উদ্দেশ্য নেই আমার। আমি শুধু তাকে একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছি। সে যে ধরনের আচরণ করেছে তাতে এটাই প্রাপ্য। যদি, তোমার কথানুযায়ী ও নিজের ভুল বুঝে থাকে, তাহলে ঠিক আছে দরবারের সভায় যোগ দেবার অনুমতি দেয়া হবে। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে তার উপর। যদি আচরণে পরিবর্তন এনে থাকে তাহলে তার জন্য নতুন পদেরও ব্যবস্থা করব আমি। যদি তা না হয় তাহলে আমার কাছ থেকে সহৃদয়তার আর কোন আশা নেই ...'

চার মাস পরে, ব্যক্তিগত দর্শনার্থীদের বিশাল কক্ষে সান্ধ্য বাতি জ্বেলে দিয়ে গেছে ভৃত্যেরা। সভাসদদের সামনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন শাহজাহান। এদের মাঝে দারা, আওরঙ্গজেব আর মুরাদও আছে। সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে মনোযোগ সহকারেই সব ধরনের আলোচনা শুনেছে আওরঙ্গজেব। কিন্তু নিজে থেকে তেমন কিছু না বললেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রায় খোশামোদের মত করেই একমত হয়েছে দারার বিভিন্ন যুক্তির সাথে। কর, ছোটখাট প্রজা রাষ্ট্রের বিদ্রোহ দমন কিংবা উত্তর থেকে দক্ষিণে পুরো সাম্রাজ্যকে একসাথে বেঁধে রাখা গ্রেট ট্রাংক

রোডের উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে মেতেছে সভাসদদের দল। হতে পারে যে দুই ভাইয়ের মাঝে ধূমায়িত বিষেদগার আসলে উঠে গেছে। অন্তত শাহজাহান সেরকমটাই আশা করলেন। হঠাৎ করেই একটা সুযোগ নিজে থেকেই এসে ধরা দিয়েছে তার রাজবংশের কাছে, যা হয়ত আর কখনো ঘটবে না—অন্তত তাঁর জীবদ্দশায় তো নয়ই। আর দুই পুত্রের বোকার মত তর্কের খাতিরে তিনি নিজের অথবা জ্যেষ্ঠ সেনাপতিদের মনোযোগ নষ্ট হতে দেবেন না।

মাথা তুলে, শুরু করলেন সম্রাট। 'এটা আমার কোন সাধারণ দৈনন্দিন সভা নয়। যুদ্ধ-সভায় বসেছি আমরা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কাবুল আর বাদাকশান থেকে আমার প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সংবাদ পাঠাচ্ছে যে, অক্সাস নদীর পেছনে উজবেক গোত্রেরা নিজেদের মাঝে মারামারি করে সন্ত্রাস কায়েম করে রেখেছে নিজেদের ভূমিতে। আর এই বিশৃঙ্খলাই আমাদের জন্য সুযোগ।'

'আপনি কী বলতে চান জাহাপনা?' জানতে চাইল সব সময়কার মত সোনালি রেশমী টিউনিক পরিহিত অশোক সিং।

'আমার কথার অর্থ হচ্ছে, উজবেকদের হাতে এখন নিজেদেরকে প্রতিরক্ষার মত অবস্থা নেই। যদি আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারি, তাহলে উত্তরে পৌঁছে বাল্ক দখল করে নিতে পারব। ব্যবসায়ের জন্য মূল্যবান এই শহর দখল করতে পারলে কাবুলে থাকা আমাদের ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত লাভবান হবে। কিন্তু বাল্ক হবে শুধুমাত্র সূচনা। একবার বাল্কে পৌঁছতে পারলে অক্সাস নদী পার হয়ে মাত্র ১৭০ মাইল দূরে থাকা সমরকন্দ দখল করে নিতে পারব। ভাগ্যদেবীর এনে দেয়া এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে সোনালি শহর হয়ে যাবে আমাদের...'

একটু থেমে চারপাশের মুখগুলোর দিকে তাকালেন শাহজাহান। কেউ কেউ প্রশংসা করছে, কারো মুখে সন্দেহের আভাস, কিন্তু বেশিরভাগই বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে। কাউকেই নিজের সিদ্ধান্ত জানাননি তিনি, এমনকি দারাকেও নয়। বহুদিনের সযত্নে লালিত উচ্চাকাঙ্খা এটি। প্রায় সময়েই, নিদ্রাহীন অবস্থায় অন্ধকারে শুয়ে শুনতে থাকেন ভৃত্যের মুখে নিজের পূর্বপুরুষের লেখনী। সেই বালক বয়স থেকেই ভালোবাসেন বাবরনামা—সিংহাসনের সন্ধানে আসা তরুণ ঘোড়সওয়ার

শাহজাদা। কঠিন পরিস্থিতিতেও বিশ্বাস না হারানো; যত বিশালই হোক না সেই বিপদ, রোমাঞ্চিত করে তুলত শাহজাহানকে। তবে সবার উপরে দাগ কাটত বিশেষ একটি ঘটনা—সমরকন্দ শাসন করার জন্য বাবরের দৃঢ় মনোভাব নিজের জীবদ্দশায় যা একবার নয় তিন তিনবার আক্রমণ করেছিলেন তিনি। যখন থেকে উজবেকদের সমস্যার কথা শুনছেন, তখন থেকেই এ আক্রমণের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন শাহজাহান।

'আশ্চর্য হয়ে গেছ, সবাই।' বলে চললেন শাহজাহান। 'ভুলে গেছ যে মোগলরা হিন্দুস্তানে আসার আগে আমরা অক্সাসের ওপরেই শাসন করতাম। আমার পূর্বপুরুষ তৈমুর সমরকন্দকে নিজের রাজধানী তৈরি করেছিলেন আর পর পিতামহ বাবর এটি দখলও করেছিলেন। তাই ঐসব ভূমির উপর জন্মগত অধিকার আছে মোগলদের।'

'কিন্তু বাবর, সমরকন্দ ধরে রাখতে পারেননি, যত চেষ্টাই করুন না কেন। শেষপর্যন্ত উজবেকরা তাঁকে পরাজিত করেছিল।' বলে উঠল দারা।

'কারণ, তিনি সংখ্যায় কম ছিলেন। তাঁর পেছনে বিশাল কোন সাম্রাজ্যের সম্পদ ছিল না, যেমনটা আছে আমার। এছাড়াও তাঁর শত্রুরা একত্রিত হয়েছিল শাইবানী খান নামে যুদ্ধবাজ উজবেক নেতার অধীনে। এখন এই মুহূর্তে উজবেকদের এ ধরনের কোন নেতা নেই।'

'আমি আপনার বক্তব্য বুঝতে পারছি, আব্বাজান।' আলোচনায় অংশ নিল আওরঙ্গজেব। 'অক্সাস পার হয়ে যাওয়াই আমাদের ভাগ্য। আর যদি সফল হই তাহলে সমরকন্দ থেকে শুরু করে দাক্ষিণাত্যের শেষপর্যন্ত শাসন করব আমরাই—এতটা এমনকি তৈমুরও পারেননি।'

মাথা নাড়লেন শাহজাহান, কক্ষের মাঝে একমাত্র আওরঙ্গজেবকেই মনে হল বুঝতে পেরেছে তার প্রস্তাব, আর এ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—যদিও এতে মনঃক্ষুণ্ন হলেন তিনি। সম্ভবত অন্যেরা এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি।

'তুমি নিশ্চিত যে পাঠানো প্রতিবেদনগুলো সম্পূর্ণ সত্য?' খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়ল দারা। 'আমাদেরকে যেভাবে জানানো হয়েছে উজবেকরা কি সত্যিই এতটা হানাহানিতে লিপ্ত নিজেদের সাথে? আর

যদি তা হয়ও, তারা যদি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বিদেশী আক্রমণ ঠেকাতে একজোট হয়ে ওঠে?'

'আমার কর্মচারীদের পাঠানো সংবাদ বিশ্বাস করি আমি। একজন তো এমন বর্ণনাও দিয়েছে যে উজবেকদের এক গোত্র আরেক গোত্রের লোকদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। অন্তত পাঁচ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে। এদের মাঝে পুরুষদের পাশাপাশি নারী আর শিশুরাও আছে। রক্তক্ষয়ী জাতিগত বিবাদ এখন চরম আকার ধারণ করেছে। একে অন্যের উপরে প্রতিশোধ নেবার উপরেই বেশি মনোযোগী এখন তারা। তাই যতক্ষণে আমাদের দিকে নজর দেবার ফুরসৎ পাবে, বহু দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু হ্যাঁ, ঘটনার অবশ্যই পরিবর্তন হতে পারে। আর তাই এখন আমাদেরকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।'

'আপনি সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন, জাহাপনা। উত্তরে কত সংখ্যক সৈন্য পাঠাতে চান আপনি?' জানতে চাইল অশোক সিং। 'বেশ বড়সড় আর সশস্ত্র সেনাবাহিনী প্রয়োজন হবে আমাদের। পাহাড়ের জীবনযাত্রা বেশ কঠিন আর আবহাওয়াও বৈরি।'

'সবকিছু নিয়ে সবিস্তারে পরে আলোচনা হবে। কিন্তু আমি বলব অন্তত পঞ্চাশ হাজার ঘোড়সওয়ার আর কামান নিয়ে দশ হাজার বন্দুকধারীর সাথে পদাতিক সৈন্যরাও যাবে, বাঙ্কের জন্য যাতে সমস্যা না হয়। এরপর অক্সাস পার হয়ে সমরকন্দ পৌছাতে আরো যদি প্রয়োজন হয় তো, তারাও যাবে। এটি নির্ভর করবে উজবেকরা কতটা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তার উপর।'

'কিন্তু এ ধরনের বিশাল সেনাবাহিনী একত্রিত করার জন্য সময়ও দরকার। মনে করে দেখ যে অতীতের চেয়েও কতটা সময় বেশি চেয়েছে আমাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সৈন্য সমাবেশ করার জন্য... আমাদের অভিজাত সম্প্রদায় রাজকীয় ব্যবহারের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করার রীতিতে আলগা ভাব নিয়ে এসেছে।' জোর দিয়ে বলে উঠল দারা।

দারার এতটা চিন্তিত হবার বা প্রশ্ন করার কোন দরকার নেই। ভাবলেশ শাহজাহান। 'আমি জানি, কিন্তু সৈন্য পাঠাতে দেরি করলেই শাস্তি দেয়া হবে। এছাড়া, বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগের ব্যাপারেও

সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। ইতিমধ্যেই ইংরেজ নিকোলাস ব্যালান্টাইনকে দায়িত্ব দিয়েছি তিন হাজার ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ দেয়ার জন্য।'

'সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে কে থাকবেন?' জানতে চাইল অশোক সিং। এই একই প্রশ্ন নিয়ে সম্রাট নিজেও বেশ বিচলিত হয়ে আছেন।

কক্ষের পেছন দিকে আওরঙ্গজেব উঠে দাঁড়িয়ে সোজা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, দেখতে পেলেন শাহজাহান। দাক্ষিণাত্যে একজন দক্ষ সেনাপতি হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছে আওরঙ্গজেব আর তাই এক্ষেত্রেও সেই হতে পারে নিশ্চিত পছন্দ, একথা তিনি নিজেও জানেন। প্রত্যক্ষ যুদ্ধের তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই দারার। শাহ সুজা বহু দূরে বাংলাতে আর ডেকে পাঠাতেও সময় লাগবে। অন্যদিকে মুরাদ এখনো তরুণ এবং কোন চেষ্টাও করা হয়নি তাকে নিয়ে এর আগে। রাত জেগে গভীরভাবে তিনি ভেবে দেখেছেন যে আওরঙ্গজেবকে কী এ দায়িত্ব দেয়া যায় কিনা। প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়েও ফেলেছিলেন বিভিন্ন দিক থেকে এটাই হত যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত—কিন্তু পুত্রের অযৌক্তিক আচরণের স্মৃতি এখনো মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি তিনি। যতই ভেবেছেন ততই উদ্বিগ্ন উঠেছেন। মনগড়া একটা ধারণার জন্য তাঁর আদেশ অমান্য করার পরও কি আওরঙ্গজেবের ব্যাপারে ঝুঁকি নেবেন তিনি? অথবা আওরঙ্গজেবের কাল্পনিক বা উস্কানিমূলক কথাবার্তা যদি জ্যেষ্ঠ কর্মচারীদের মাঝে মতভেদ তৈরি করে?

প্রত্যূষের আলো কক্ষের মাঝে প্রবেশ করতেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে নতুন দায়িত্ব নেবার আগে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে আওরঙ্গজেবকে।

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বভার দেয়া হবে, শাহজাদা মুরাদকে।' আশ্চর্য হয়ে গেল সকলে আর মুরাদের চেহারায় ফুটে উঠল সত্যিকারের বিস্ময়। 'আমি জানি এটা তোমার জন্য প্রথম বড় কোন অভিযান মুরাদ। কিন্তু সময় এসেছে, তোমাকে শিখতে হবে যুদ্ধবিদ্যা আর আমি জানি যে আমাকে হতাশ করবে না তুমি। তোমাকে পরামর্শ দেয়ার জন্য আর প্রতিদিনকার সমস্ত কিছু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিলাম অশোক সিং, তোমার উপর। নিজের সাহসের প্রমাণ দিয়েছ তুমি—আর নিজের সামরিক দক্ষতারও—বহু বছর আগে যখন দাক্ষিণাত্যে

একসাথে লড়াই করেছিলাম আমরা। আর ভালো কোন গুরু পাবে না আমার পুত্র।

'কিন্তু আব্বাজান...' এক পা সামনে এগিয়ে এলো আওরঙ্গজেব। 'আমাকে পাঠানো উচিত। মাত্র কি দেখাইনি যে আমিই একমাত্র বুঝতে পেরেছি তোমার উচ্চাশা? প্রমাণ দেইনি যে অর্চ্চার রাজার বিরুদ্ধে আমার প্রথম অভিযানের সময় থেকেই আমি একজন দক্ষ সেনাপ্রধান? দাক্ষিণাত্যের এককণা ভূমিও কি আমিও ছেড়েছি শত্রুহস্তে? বিজাপুর আর গোলকুন্ডার শাসকদেরকে কি বাধ্য করিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে ভয় পেতে আর মোগলদের সাথে চুক্তি করতে? আমাকে বাল্কে যেতে দাও আর দেখ আমাদের কামানের আঘাতে কত দ্রুত কেঁপে ওঠে এর দেয়াল....'

'না, আওরঙ্গজেব, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।'

'ভুল করেছ আর একদিন এর জন্য অনুশোচনাও করবে।'

সারাটা কক্ষে সবার নিঃশ্বাস আটকে গেল বুঝতে পারলেন শাহজাহান। এই ধরনের অবাধ্যতার ভয়ই করেছিলেন তিনি। আওরঙ্গজেবকে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত সঠিকই হয়েছে আর তৎক্ষণাৎ আরো একটি সিদ্ধান্ত নিলেন সম্রাট—কোন ধরনের পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এ সিদ্ধান্ত তার পুত্র নিজেই ডেকে এনেছে নিজের উপর। 'আমি আবারো বলছি, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এছাড়া তোমার জন্য নতুন নিয়োগেরও ব্যবস্থা করেছি। আজকেই এটা ঘোষণা করার কোন ইচ্ছে ছিল না আমার; তোমাকে গুজরাট পাঠাচ্ছি। সেখানকার প্রাদেশিক শাসনকর্তা বেশ অসুস্থ আর বয়স্কও হয়ে গেছেন। তুমি এখন থেকে তার দায়িত্ব পালন করবে। তোমার অনেক কাজের মাঝে অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে জলদস্যুদের হাত থেকে আমাদের বাণিজ্যতরী আর তীর্থযাত্রীদের বহর কতটা নিরাপদে রাখছে ইংরেজরা, তার দেখাশোনা করা।'

'গুজরাট" এক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল আওরঙ্গজেব। কিছুই না বলে সোজা তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। অন্যান্য অনেক সভাসদের মতই দারা নিজেও তাকিয়ে আছে মেঝের কার্পেটের দিকে; যেন চাইছে না যে কারো সাথে চোখের দৃষ্টি আটকে যায়। অন্যদিকে মুরাদ একবার তাকাচ্ছে আওরঙ্গজেবের দিকে, একবার পিতার দিকে।

'যদি আপনি তাই চান, তো ঠিক আছে আমি গুজরাট যাবো।' অবশেষে বলে উঠল আওরঙ্গজেব, যদিও চোখের মাঝে জ্বলতে থাকা আগুন উপহাস করছে শব্দগুলোকে।

'ঠিক আছে। কয়েকদিনের মাঝেই রওনা হতে হবে তোমাকে। এখন আবার মনোযোগ ফিরিয়ে আনা যাক বাল্ক অভিযানের প্রসঙ্গে—আমি চাই যথাযথ রসদ আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাত্রা করুক আমাদের সেনাবাহিনী আর তাই হাতে সময় একেবারে অল্প।'

অধ্যায়-১৩

'একমাত্র আপনার সাথেই কথা বলতে পারি এখন আমি। বিপদের সময় যেমনি, তেমনি সমৃদ্ধির সময়েও আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন আপনি।' জাহানারা এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে সে নিকোলাস ব্যালান্টাইনকে যমুনার তীরে তার প্রাসাদের আঙিনাতে দেখা করতে বলেছে। কিন্তু বেশ কয়েক ঘণ্টা গভীরভাবে চিন্তা করার পর মনে হয়েছে এটাই যুক্তিযুক্ত। 'মাফ চাইছি। আপনি নিশ্চয়ই তৃষ্ণার্ত।' সেবাদাসীর দিকে ফিরে জানালো, 'বরফ দিয়ে শরবত নিয়ে আসো।'

এরপর মধ্যাহ্নের তপ্ত সূর্যালোক থেকে বাঁচতে তৈরি শামিয়ানার নিচে, নিজের বিপরীত প্রান্তে রাখা স্তূপীকৃত তাকিয়ার উপর বসার জন্য ইশারা করল নিকোলাসকে।

'আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি, মাননীয়?'

'কয়েকদিনের মাঝেই পিতার সেনাবাহিনী উত্তরে যাত্রা করবে আর আপনিও তাদের সাথে যাবেন।'

'হ্যাঁ। বিদেশী সৈন্যদের প্রধান হিসেবে।' নিজের বিস্ময় লুকাতে ব্যর্থ হল নিকোলাসের অভিব্যক্তি।

'আমি একটু খোলামেলাভাবেই বলতে চাই যে আমি মুরাদকে নিয়ে চিন্তিত। এটা হতে যাচ্ছে আমার ভাইর প্রথম কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। কিন্তু নেতৃত্ব দেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা বা এসম্পর্কিত কোন প্রশিক্ষণ নেই তার। আমার বিশ্বাস যে আব্বাজান বেশ বড়সড় একটা ভুল করেছেন তাকে এ কাজে নিয়োগদান করে, কিন্তু একথা বলতে পারব না আমি।'

‘উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ অশোক সিং। কয়েক বছর আগে কাবুলের চারপাশের গোত্রসমূহকে ঠাণ্ডা করেছিল সে। আর শাহজাদাকেও দিক নির্দেশনা দিতে পারবে।

‘তিনি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন। কিন্তু মুরাদকে চেনেন না আপনি। আমার পিতা যখন সম্রাট হন তখন মুরাদ ছোট্ট একটা শিশু আর মা মারা যাবার সময়েও বেশ ছোট ছিল। বড় হয়ে উঠেছে হারেমে। সুদর্শন চেহারা আর চঞ্চলতার জন্য অতিরিক্ত মনোযোগ পেয়ে বখে গেছে। মুরাদ বোকা নয় কিন্তু নিজের মত করে চলতে চায় আর একটু অবাধ্য...এমনকি মাথা গরমও করে ফেলে। ওর এই দিক সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আমার পিতার। মুরাদ তাঁকে ভয় পায়—তাঁর উপস্থিতিতে সবসময়েই শ্রদ্ধাবনত আর বাধ্য থাকে—কিন্তু তার সত্যিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে আমি জানি। দরবার থেকে একবার দূরে যেতে পারলেই মুরাদের মাথায় চড়ে বসবে ক্ষমতার ভূত। একইভাবে হয়ত তাকে অতি উৎসাহী করে তুলবে। যদিও আমার পিতা একমত হবেন না, কিন্তু আমার ধারণা অশোক সিং—তিনি যদিও এখন সৎ বিশ্বস্ত সেনানায়ক—অচেনা আর অযাচিত পরিস্থিতিতে মুরাদের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারবেন; কিংবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।’

‘ক্ষমা করুন, মাননীয়’, কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে অন্য ভাইদের সাথে আলোচনা করলেই কি ভালো হত না?’

‘আমার উদ্বিগ্নতাকে মোটেই আমল দেয়নি দারা শুকোহ্। তারও ধারণা যে মুরাদের কাঁধে দায়িত্ব পড়লেই ভালো হবে।’

দারার সাথে সেই সংক্ষিপ্ত আলোচনার কথা স্মরণ করে হতাশ হল জাহানারা। আজকাল দরবারে নিজের নিমন্ত্রিত সুফী সাধকদের সাথে দর্শন আলোচনায় এতটাই মত্ত দারা যে, তার ভাষায় এইসব নারীসুলভ কুটকচালির জন্য সময় নেই এখন হাতে। ‘শাহ সুজাও অনেক দূরে বাংলাতে আর আওরঙ্গজেব গুজরোটে নিজের গন্তব্যের পথে চলে গেছে। এছাড়াও ...’ খানিকটা দ্বিধাভরে সতর্ক চোখে নিকোলাসের দিকে চকিত দৃষ্টি হানলো জাহানারা। যদি সে তাকে বিশ্বাসই না করে তাহলে এখানে ডেকেছেই বা কেন? যাই হোক নিজেকে জোর করে আবারো বলতে বাধ্য করল, ‘আমার চিন্তার প্রতি তেমন একটা সহৃদয়তা দেখাবে না আওরঙ্গজেব।

তার ধারণা যে পিতার উচিত ছিল তাকেই সেনাবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করা এবং এটাই সঠিক আওরঙ্গজেব একজন দক্ষ নেতা আর অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তাই সেই-ই হওয়া উচিত ছিল প্রথম পছন্দ।

'তাহলে সম্রাট কেন তাকে এ দায়িত্বের ভার অর্পণ করেননি?'

'যেমনটা আপনি এবং পুরো দরবার জানেন যে কিছুদিন আগে পিতা এবং আওরঙ্গজেবের মাঝে...কোন এক ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছিল। আর তাই হঠাৎ করে দাক্ষিণাত্যের দায়িত্ব থেকেও আওরঙ্গজেবকে অব্যাহতি দেয়া হয়। আমার ধারণা উজবেক অভিযানের দায়িত্ব মুরাদকে দেয়ার মাধ্যমে আওরঙ্গজেবকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন সম্রাট— আওরঙ্গজেবের স্থানে মুরাদকে বসিয়েছে। সত্যি কথা বলতে, আওরঙ্গজেবকে নিয়েও চিন্তা হচ্ছে আমার—দারা আর পিতার সাথে তার সম্পর্ক এতটাই নষ্ট হয়ে গেছে যে ঠিক করার হয়ত আর কোন উপায় নেই।'

থেমে গেল জাহানারা। অশ্রু ভরা চোখে তাকিয়ে দেখল গোলাপের সুগন্ধি মেশানো শরবতে চুমুক দিল নিকোলাস। এলোমেলো শুভ্র কেশ লুটিয়ে আছে রোদে পোড়া চেহারার উপর। অতীতের মতই কেন হয়ে যায় না দিনগুলি যখন তাদের মা জীবিত ছিলেন আর শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও একত্রিত ছিল পুরো পরিবার? হঠাৎ করেই ছেলেবেলায় পৌঁছে গেল জাহানারা। শিবিকার পর্দার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে তাকিয়ে আছে নিকোলাসের দিকে, যার উপস্থিতিতেই ফিরে আসে ভরসা, জাহাঙ্গীরের হাত থেকে বাংলাতে পালিয়ে যাবার সময় একই সাথে পথ চলেছে তারা। বহু স্মৃতির মাঝে মনে পড়ে গেল—হুগলীতে পর্তুগিজ প্রাঙ্গণে দারা আর তার সাথে খেলছে নিকোলাস, অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকা মায়ের চিন্তা থেকে সরিয়ে রেখেছে তাদেরকে। আওরঙ্গজেবকে শিখিয়ে দিচ্ছে কীভাবে তলোয়ার নিয়ে খেলতে হয় আর মুরাদের জন্য বানিয়ে দিচ্ছে খেলনা সৈন্য।

বহু কষ্টে নিজেকে বাস্তবে ফিরিয়ে এনে আবারো বলে উঠল জাহানারা, 'ছোটবেলা থেকেই আমি এবং আমার ভাই-বোনদের প্রতি যথেষ্ট দয়া দেখিয়েছেন আপনি। আর এই কারণেই এখন আমি আপনার কাছে অনুনয় করছি, অনুগ্রহ করে অন্তত আমার একটি চিন্তা কমবে যদি আপনি মুরাদের উপর নজরে রেখে পারেন তো তাকে শাসনও করবেন,

উপদেশ দিয়ে সাহায্যও করবেন, একজন বিদেশী ও রাজকীয় ভাড়াটে সৈন্যদের প্রধান হিসেবে। একই সাথে একমাত্র আপনিই আছেন যাকে মুরাদ বাল্যকাল থেকেই জানে, অন্য সেনাপ্রধানদের চেয়ে আপনিই তার সাথে বেশি মিশতে পারবেন। যেখানে কিনা তার আচরণ যতই অযৌক্তিক আর নির্বোধের মত হোক না কেন সবাই তাকে শাহ্জাদা হিসেবে ভিন্ন চোখেই দেখবে।

'আমি জ্যেষ্ঠ সেনাপ্রধানদের একজন নই আর যেমনটা আপনি ভাবছেন একজন বিদেশী হওয়াটা আমার জন্য সুবিধা বয়ে আনবে, তেমনি একই কারণে হয়তো তার কাছের মানুষের তালিকায় ঠাঁই দেয়া হবে না আমাকে।

'তারপরেও আর যত অদ্ভুতই মনে হোক না কেন আমার অনুরোধ আপনার সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে চেষ্টা করবেন। আর যখনই সুযোগ করতে পারবেন রাজকীয় পত্রবহক মারফত লিখবেন আমার কাছে।' চট করে একবার উদাসীন মুখে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের তিনজন সেবাদাসীর দিকে তাকাল জাহানারা। নিকোলাসের সাথে একটু একা হতে পারত যদি ... কিন্তু এ ধরনের কোন ব্যাপার তো পুরোপুরি অচিন্ত্যনীয়। এমন না যে নিজের পরিচারিকাদের উপর বিশ্বাস নেই তার, কিন্তু রটনা ছড়ানোর লোভ সামলানো এমনকি বিশ্বস্তদের পক্ষেও কঠিন হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে নিকোলাসের দিকে এগিয়ে গেল জোহানারা; খানিক নিঁচু হয়ে নিজের হেনা রাঙানো হাত রাখল নিকোলাসের বাহুতে।

'নিকোলাস... পরিবারের ভবিষ্যত নিয়ে যদি সত্যিই চিন্তিত না হতাম তাহলে, আমাদের প্রথা সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন আপনি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কখনোই নিমন্ত্রণ করতাম না এখানে। পুরুষদের পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান আপনি, অন্যদিকে আমি...'

'জাহাপনা, আপনার কাছে আরেকটি পত্র এসেছে।'

পরিচালকের হাত থেকে মোড়ানো পত্রখানা হাতে নিয়েই দেখলেন যে অশোক সিংয়ের সীল লাগান। খুলে ফেললেন অধৈর্য ভঙ্গিতে। প্রায়

এক মাস আগে মুরাদের অভিযান সম্পর্কে সংবাদ পেয়েছিলেন আর তাও ও আবার বাল্কে সেনাবাহিনী অগ্রসর হবার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল শুধু।

জাহাপনা,

বাল্কের দিকে এগোতেই কঠিন অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে আমাদেরকে স্থানীয় শাসকবর্গ। আমাদের রসদের উপর লুটপাট চালানোর চেষ্টা করার পাশাপাশি হত্যাও করেছে যারা বাধা দিয়েছে তাদেরকে। যাই হোক, হতাশ হইনি আমরা। দশ দিন আগে তাঁবু তৈরিতে ব্যস্ত ছিলাম এমন সময় সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসে আপনার পিতৃপুরুষ বাবরের শত্রু শাইবানী খানের এক উত্তরসুরীর নেতৃত্বে উজবেক বাহিনী। লড়াই করে হটিয়ে দিয়েছি তাদেরকে। নিজেদের শৃঙ্খলা বজায় রেখে রসদবাহী গাড়ির পেছনে থেকে গুলি ছুঁড়েছি। পরবর্তী দিন সকালবেলা, আপনার পুত্রের অনুমতি সাপেক্ষে, আমাদের অশ্বারোহী বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে ছুটে গেছি পলায়নপর শত্রুর পেছনে। প্রধান অংশকেই বাগে পেয়ে বাতাসের গতিতে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে বহু উজবেককে হত্যা করেছি, কিন্তু আমাদের তেমন ক্ষতিও হয়নি। দেহরক্ষীদের ভিড়ে হরিণের মত কাঁপছিল উজবেক শাহজাদা। কিন্তু গর্ব সহকারে জানাচ্ছি যে, রাজপুত বর্শা সমাপ্তি এনে দিয়েছে তার জীবন আর তার জনগণের প্রতিবন্ধকতা দু'টোর উপরেই। আমাদের বিজয়ের ফলে পরিষ্কার হয়ে গেছে বাল্কের রাস্তা, যেখানে তিনদিন পরেই পৌঁছে গেছি আমরা।

প্রথম দিকে শহর প্রধান আমাদের শর্ত সমূহকে কটুভাষা আর যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে খারিজ করে দেয়। যাই হোক, একদিন পর আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র কামানের গোলা গিয়ে তার দেয়াল ফুটো করে দেয়ায় মন পরিবর্তন করে একজন হীন ব্যক্তির ন্যায় নম্র স্বরে ক্ষমা প্রার্থনাও করে। একই সাথে আত্মসমর্পণের শপথও করে, যদি আমরা আমাদের প্রস্তাব পুনরায় বিবেচনা করে দেখি তবেই। সময় বাঁচানোর জন্য—অভিযানের জন্য অনুকূল ঋতুর শেষ হওয়ার সময় হয়ে এসেছে প্রায় আর এ অঞ্চলে এটি বেশ দুর্লভ—একই সাথে মানব জীবনের সুরক্ষার জন্যও, আমার পরামর্শনুযায়ী একমত হন আপনার পুত্র। বিজয়ীর বেশে বাল্কে

প্রবেশ করি আমরা সবুজ ব্যানার উর্ধ্বে তুলে ধরে আর স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বাদ্যধ্বনি।

এরপর অক্সাসের তীরে গিয়ে সুবিধামত নদী পার হবার জায়গা খুঁজে বের করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে অগ্রবর্তী সেনাবাহিনী—বিশাল বড় নদীটার ঢেউ বেশ বিশ্বাসঘাতক—এরপর নৌকা সেতু বানাবার জন্য বাহন একত্রিত করার আর পর্যাপ্ত কাঠের ব্যবস্থা করার দায়িত্বও দেয়া হয়েছে তাদের উপর। এ অঞ্চলের কাঠের বেশ অভাব — কেননা কামান আর ভারী রসদ নদীর অপর পাড়ে নিয়ে যাবার জন্য ভেলা প্রয়োজন হবে। ঈশ্বরের মর্জি হলে, কয়েকদিনের মাঝেই নদীর ওপারে পৌঁছে সোনালি সমরকন্দের দিকে যাত্রা করব আমরা। উজবেকরা জানে যে আমরা আসছি—আমাদের সফলতা আর শক্তির সংবাদ হয়ত একত্রিত করবে তাদের যোদ্ধাদেরকে। কিন্তু যদি আমরা দ্রুত অগ্রসর হতে পারি—এর উপরেই বেশি জোর পরামর্শ দিচ্ছি আমি—আমাদের সামনে দাঁড়াতেও পারিবে না তারা আর যেমনটা বাল্কে করেছি তেমনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করব সমরকন্দে।

আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পাঠিয়েছে আপনার পুত্র, এও জানাতে বলেছে যে আপনার পক্ষ থেকে এ অভিযানে অংশ নিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত সে। সাথে আরো জানিয়েছে তৈমুরের রাজধানী দখল করা নিয়ে চেষ্টার কোনো কমতি থাকবে না এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি। দীর্ঘস্থায়ী ও পরিপূর্ণ বিজয়ের সাথে আপনার ভূ-খণ্ডের সীমাও চিরকালের জন্য বৃদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর শাহজাদা মুরাদ।

চারপাশে কারা আছে ভুলে গিয়ে, পড়া শেষ হতেই আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন শাহজাহান, বিজয়ীর সালাম হিসেবে উর্ধ্বে তুলে ধরলেন বজ্রমুষ্টি। বিশাল সব প্রাসাদ আর মাদ্রাসা, ফলের বাগান, স্বর্ণ-প্রবাহিত নদী নিয়ে সমরকন্দ তাঁর হবে—বহুদিনের সযত্নে উচ্চাকাঙ্খা। এমনকি তাঁর পিতামহ মহান আকবরও এমন দুঃসাহসী পরিকল্পনা করার কথা চিন্তা করেননি। দেড়শ বছর পরে মোগলরা আবারো দাবি করছে তাদের পিতৃপুরুষের ভূমি। এ নিয়ে লিখবে তাঁর জীবনীকারেরা, তাঁরই ময়ূর সিংহাসনে বসে গর্বিত বোধ করবে বংশধরেরা। এর চেয়েও বড় কথা

নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করছে মুরাদ। আওরঙ্গজেব অথবা দারা কেউই এতটা ভালো করতে পারতো না।

তো এখন নিজের সভাসদদের সাথে বসবেন তিনি। তবে তার আগে পরিবারের সাথে ভাগাভাগি করতে চান এই সুসংবাদ। কয়েক মিনিট পরেই হারেমের বিশাল গিল্টি করা কাঠের দরজা মেলে ধরল খোঁজাদের দল। শাহজাহান প্রবেশ করতেই মাথা নিচু করে কুর্নিশ করল রাজপুত প্রহরীরা। দারা, তিনি জানেন শিকার করতে বাইরে গেছে, কিন্তু আশা করলেন জাহানারাকে খুঁজে পাবেন এখানে—প্রায়ই নিজের কনিষ্ঠ ভগিনীদের দেখতে আসে সে। কিন্তু রোশানারার ঘরে আসতেই নিরাশ হলেন সম্রাট, একাকী বসে আছে রোশানারা। পিতার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'মুরাদের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ এসেছে। বাল্ক দখল করে নিয়েছে তারা আর শীঘ্রই অক্সাস পার হয়ে কয়েক দিনের মাঝেই সমরকন্দ পৌঁছে যাবে।'

'বেশ ভালো সংবাদ। আমাদের সাম্রাজ্যের কোন শত্রুই আর রইবে না! আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য ভোজের আয়োজনের নির্দেশ দেবে?'

'না... এখনো না। সমরকন্দের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করা যাক আর এর পরেই এত বিশাল সমারোহে আনন্দ উদ্‌যাপন করা হবে যা আগে কখনোই দেখেনি হিন্দুস্তান আর মোগলেরা।'

'আমাদের সেনাবাহিনীর সফলতার সংবাদে খুশি হয়ে উঠবে আওরঙ্গজেব। গুজরাটে তার কাছে পত্র লিখব আমি—আর বাংলাতে শাহ সুজার কাছেও যেন তারা দুজনেই আমাদের আনন্দ সহভাগিতা করতে পারে?

'না, আমার জন্যই তোলা থাক এ দায়িত্ব। কিন্তু জাহানারা কোথায়? তাকেও জানাতে হবে।'

'তার নিজের প্রাসাদে। সাত্তি আল-নিসা গওহর আরাকে সেখানেই নিয়ে গেছে আজ।'

'সভাসদদেরকে সংবাদটা জানাবার পর আমি নিজেই সেখানে যাবো তাহলে।'

কক্ষ ত্যাগের জন্য ইতিমধ্যে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে শাহজাহান। এমন সময় শুনতে পেলেন রোশনারা বলে উঠলো, 'আব্বাজান আমি জানি না সময়টা সঠিক কিনা : কিন্তু একটা ব্যাপার ঘটেছে যা আপনার জানা দরকার সম্ভবত।'

এমন কিছু একটা ছিল রোশনারার কণ্ঠে যা ঠিক ভালো শোনাল না। ফিরে তাকালেন সম্রাট। 'কী হয়েছে?'

'কয়েক মাস আগে জাহানারাকে সেবাদাসী হিসেবে তরুণী এক গুজরাটী অভিজাত নারীকে পাঠিয়েছিলাম আমি, নাম নাসরীন। কর্মঠ হিসেবে জানি আমি এই নারীকে, তাই ভেবেছি আমার ভগিনীরও কাজে লাগবে। এখানে হারেমে নাসরীনের ফুপু আছে। যখনই ফুপুকে দেখতে আসে, আমার কাছেও আসে নাসরীন। এভাবে কয়েক সপ্তাহ আগে আমাকে এমন একটা কথা জানিয়েছে যা কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না—মুরাদ আর সেনাবাহিনী আগ্রা ত্যাগের খুব বেশিদিন আগের কথা না। নিকোলাস ব্যালান্টাইন, আমার ভগিনীর সাথে তার প্রাসাদে গিয়ে সাক্ষাৎ করে এসেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক একসাথে ছিল তারা আর নাসরীন যদিও শুনতে পায়নি যে কী কথা হয়েছে তাদের মাঝে, তবে এটুকু দেখেছে যে উভয়েই বেশ আন্তরিক ছিল।'

বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন শাহজাহান। নিকোলাস ব্যালান্টাইন আর জাহানারাকে কী নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে? আর কেমন করেই বা তাঁর কন্যা এতটা অন্ধ হয়ে গেল যে নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে প্রাসাদে এক পুরুষকে ডেকে পাঠাল?

'আপনি রেগে গেছেন, আব্বাজান। আমার উচিত হয়নি কথাটা বলা।'

'জাহানারা নিজে কি তোমাকে কিছু বলেছে নিকোলাসের সাথে সাক্ষাৎ করা নিয়ে?'

'না, আর তাই আরও অদ্ভুত ঠেকেছে ব্যাপারটা।'

'তুমি কেন তাকে জিজ্ঞেস করোনি?'

এত সরাসরি প্রশ্নে মনে হল আশ্চর্য হয়ে গেল রোশনারা। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল মনমরা হয়ে পড়ল; তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালো 'আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলাম—মনে হতে পারে যে আমি অনধিকার চর্চা করছি। এছাড়া, তাকে প্রশ্ন করার মত পদমর্যাদা

নেই আমার। সাম্রাজ্যের সম্মানীত শীর্ষস্থানীয় নারী জাহানারা আর আমি তার ছোট বোন মাত্র।

রোশনারার মন্তব্যে দুঃখের আভাস পেয়ে খানিক আগে অনুভব করা উল্লাস মুছে গেল শাহ্জাহানের মন থেকে। 'আমাকে বলার পেছনে কারণটা কী? আর এত দেরিই বা কেন করেছ?'

'প্রথম দিকে আমি কী করব তাই বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু এরপর থেকেই ভগিনীর খ্যাতি নিয়ে ভয় হতে লাগল—বিশেষ করে সে তো এখন আর হারেমেও থাকে না। নিজের গৃহস্থালী সাজিয়ে নিয়েছে। দরবারে রসাত্মক কাহিনী ছড়িয়ে পড়া খুবই সোজা। আমি নাসরীনকে জোর করে বলে দিয়েছি যেন আর কাউকে না জানায় আর সেই দিনে উপস্থিত অন্য পরিচারিকাদেরকেও শপথ করিয়েছি যেন গোপনই থাকে এ কথা। এরপর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাকে জানাব কারণ আপনি শুধু আমাদের পিতাই নন, জাহানারাকেও বোঝাতে পারবেন... এই ধরনের আচরণ তার অবস্থানের ক্ষতি করতে পারে...'

'ঠিক কাজটিই করেছ তুমি। যেমনটা তুমি নিজেই বলেছ। কুৎসা ছড়াতে সময় লাগে না আর পাখা গজাতেও তর সয় না। যাই হোক, এ নিয়ে আর ভাবতে হবে না তোমাকে।'

শাহ্জাহান প্রস্থান করলে পর খানিক দাঁড়িয়ে রইল রোশনারা। পিতা যখন এত বড় বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা, এখন উপলব্ধি করতে পারল রোশনারা যে এই সময়ে জহানারার বিষয় তোলা উচিত হয়নি। কিন্তু তারপরেও পিতার প্রতিক্রিয়াতেও অবাক না হয়ে পারেনি রোশনারা। শাহ্জাহানকে মনে হল রোশনারা আর জাহানারা উভয়ের সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন—কিন্তু সে নিজেই বা কেন এত বিস্মিত হচ্ছে? পিতার চোখে কোনরকম ত্রুটি নেই জাহানারার। এমনকি সে নিজেও কোন ভুল করেনি...পিতাকে যাই জানিয়েছে, পুরোটুকুই নির্জলা সত্যি আর যদি জাহানারা নিজের পদমর্যাদা সত্ত্বেও এহেন বোকামি করতে পারে, তাহলে যে কোন শাস্তিও জাহানারার প্রাপ্যই বলতে হবে। নাসরীন তো ইতিমধ্যে এও জানিয়েছে যে নিকোলাস সবসময় পত্র লিখে জাহানারার কাছে, যদিও কোন চিঠি পড়ার সুযোগ করে উঠতে পারেনি নাসরীন—নিজের রত্নভাণ্ডারে তালাবদ্ধ করে রাখে চিঠিগুলোকে। যাই হোক, সবসময় চোখ

রাখছে নাসরীন। হয়ত কোন একদিন নাসরীন যথেষ্ট প্রমাণ হাজির করতে পারবে যা দেখিয়ে পিতাকে জানানো যাবে যে জাহানারার উপর আরো মনোযোগ আর শিক্ষা দেয়া উচিত। পিতা হিসেবে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র-কন্যাদ্বয়ের কোন অপরাধে আমল দেন না শাহজাহান আর তাই জাহানারা আর দারা দুজনেই পিতার হৃদয়ে নিজেদের অবস্থান নিয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী। ফলে দু'জনেই মর্জিমতন আচরণ করে যেন কনিষ্ঠ ভাই-ভগিনীরা কোন ব্যাপারই না। কিন্তু, ঠিক আছে অপেক্ষা করুক তারা...

'এত হুট করে তোমাদের সবাইকে তলব করা হয়েছে, কেননা কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে অনেক দেরি হয়ে যেত।' নিজের সভাসদদের উপর চোখ বোলালেন শাহজাহান। নিদ্রাতুর চেহারা আর তাড়াহুড়োয় গায়ের উপর চাপানো পোশাক দেখেই বোঝা গেল যে মাত্রই বিছানা ছেড়ে এসেছে। এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না যা এই মাত্র পড়লেন। অথচ দু'টি পত্র সপ্তাহখানেকের ব্যবধানে লেখা হলেও এসে পৌঁছেছে আধা ঘণ্টা আগেপরে। বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছেন যে সংবাদ পাবেন নিরাপদে অক্সাসের অপর পাড়ে পৌঁছে সমরকন্দের দিকে এগিয়ে চলেছে সেনাবাহিনী। কিন্তু বাস্তবে তেমনটা কিছুই ঘটেনি। তার বদলে প্রতি চিঠি বয়ে এনেছে একের পর এক অজুহাত—নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই অপেক্ষা করছে সেনাবাহিনী... রসদবাহী জন্তুগুলোর খাবার কমে গিয়েছে, তাই তারা অপেক্ষা করছে যথেষ্ট মজুদের জন্য... বিদেশী ভাড়াটে সৈন্যরা অনভ্যস্ত খাবার আর পরিবেশে জ্বরের কবলে পড়েছে... অক্সাসের অপর পাড়ে উজবেকদের দেখা যাচ্ছে অপেক্ষা করছে যেন পার হতে গেলেই আক্রমণ করবে মোগলদের উপর; তাই অন্যত্র দিয়ে পার হবার ভণিতা করতে হতে পারে সেনাবাহিনীকে।

ধৈর্য বজায় রাখতে চেষ্টা করছেন সম্রাট, বিলম্বের কারণগুলো বোধগম্য বলে বোঝাতে চাইছেন নিজেকে আর সমরকন্দের দিকে অভিযান চালাবার জন্য অনুকূল আছে এখনো আবহাওয়া। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে সন্দেহ বাড়ছে যে তাঁর সাথে যেন কোন খেলা হচ্ছে।

অশোক সিং নিজে কখনো এমনটা করবে না, কিন্তু ক্রমশই রাজপুত সেনাপতির লেখায় একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে সে তাই লিখছে যা মুরাদ তাকে লিখতে বলছে ...

অশোক সিংয়ের বাক্যে একের পর এক সন্দেহসূচক শব্দ এমনকি অস্বস্তিরও আভাস পাচ্ছেন তিনি। প্রমাণ হয়ে গেছে ব্যাপারটা। নতুন ডাকে আসা প্রথম পত্রটি হাতে নিয়ে এখনো কাঁপছেন সম্রাট, জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন চিঠির বিষয়বস্তু :

'জাহাপনা,

আপনার পুত্র আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছে যেন আপনাকে জানিয়ে দিই যে মোগল সেনাবাহিনীর হাতে দক্ষিণে পিছু হটা ব্যতীত আর কোন পথ খোলা নেই। অক্সাস পার হওয়া এখনো সম্ভব হচ্ছে না; কেননা নিজেদের সাম্প্রতিক সব বিভেদ ভুলে একত্রে জড়ো হওয়া শুরু করেছে আমাদের শত্রুরা। তাদের লক্ষ্য একটাই—প্রথম সুযোগেই আমাদেরকে নির্মূল করা। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই উজবেক একদল অশ্বারোহী নদীর উর্ধ্বভাগে বেশ কয়েক মাইল পার হয়ে এসে আক্রমণ করে আমাদের শিবিরের উপরে আর নির্বিচারে হত্যা করে প্রহরীদের। পরের দিন সকাল বেলা কাঁধ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খুঁজে পাই মৃত প্রহরীদেরকে; মুখ থেকে ঠেলে বেরিয়ে ছিল জননেন্দ্রিয়। মনোবল হারিয়ে আমাদের সৈন্যরা অভিযোগ করছে যে অচেনা এই ভূমিতে যুদ্ধ করার মত অবস্থায় নেই তারা। এছাড়া আবহাওয়াও আমাদের প্রতিকূলে চলে গেছে—প্রথম তুষারপাত হয়ে গেছে; রুক্ষ শীতের সাথে টিকে থাকার মত রসদ নেই সৈন্যদের। আমরা তাই আপনার পুত্রের নির্দেশে পিছিয়ে এসে বাল্কে আপনার পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি।

অশোক সিং।'

শাহজাহান কথা বলা বন্ধ করতেই চারপাশে নেমে এলো ভারী নিস্তব্ধতা। কেউই তাঁর চোখের দিকে তাকাতে রাজি নয়। তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে তারা কী ভাবছে—যুদ্ধ করার মত কোন অবস্থাই নেই মুরাদের। আর ঠিকই ভাবছে তারা বিশেষ করে এইবার দ্বিতীয় পত্রটি লিখেছে মুরাদ নিজে।

'এটার চেয়েও খারাপ সংবাদ আছে। তার থেকে বড় কথা এবারের পত্র লিখেছে আমার পুত্র যা ছাড়িয়ে গেছে অশোক সিং'কেও।'

'আববাজান, এই পত্র যখন আপনি পড়ছেন ততক্ষণে আমি আর আপনার সেনাবাহিনী বাল্ক ছেড়ে হিন্দুস্তানের পথে রওনা হয়ে যাবো। শহর ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। অক্সাসের ওপরে উজবেকদের ঢেউয়ের মত আঁছড়ে পড়ার সংবাদ পেয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কাবুল ফিরে যাবার, কেননা পরবর্তীতে যে বিশাল ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে তার ঝুঁকি এড়ানো যাবে তাহলে। আমি চাইনি আমাদের অসংখ্য সৈন্যের রক্তপাত ঘটুক আর আমার বিশ্বাস যে আমার সিদ্ধান্ত বুঝতে পেরে একমত হবেন আপনিও।

আপনার দায়িত্ববোধ সম্পন্ন পুত্র মুরাদ।'

'দায়িত্ববোধ সম্পন্ন পুত্র! —' নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না শাহজাহান।

'আমার অবাধ্য হয়েছে সে। জানত যে তার একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে তৎক্ষণাৎ সমরকন্দের পথে রওনা হওয়া। এর পরিবর্তে আবিষ্কার করেছে নিত্যনতুন অজুহাত আর হাত ফসকে গেছে নিশ্চিত বিজয়। আর এখন যতটুকু অর্জন করেছিল সেটাও টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে বিনা যুদ্ধে। তাকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। কিন্তু জরুরি প্রশ্ন হচ্ছে উত্তরে অশোক সিংকে কোন নির্দেশ পাঠাবো যে যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন কোন সেনাপ্রধান নিয়োগ দিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর দায়িত্বে কে থাকবে? তোমাদের কী পরামর্শ?' অপেক্ষা করলেন শাহজাহান। কিন্তু এবারেও কথা বলল না কেউই। 'তো কারো কিছু বলার নেই?'

কিন্তু চারপাশে নিজের সভাসদদের দিকে তাকিয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই সম্রাট উপলব্ধি করলেন এ অপরাধ যতটা মুরাদের ঠিক ততটাই তাঁর। আওরঙ্গজেবকে শিক্ষা দিতে চেয়ে অনভিজ্ঞ এক তরুণকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বহু দিনের সাধনার লক্ষ্য সমরকন্দের দিকে। কিন্তু কখনো ভাবেন নি যে মুরাদ তাঁকে এতটা বাজেভাবে হতাশ করবে।

'জাহাপনা, অবশেষে নীরবতা ভাঙ্গলেন একজন বর্ষীয়ান উপদেষ্টা।

'এই বছর অভিযানে আর সফল হবার সম্ভাবনা নেই—অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে, শীঘ্রই উত্তরের মুখে বরফ পড়ে হিন্দুস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে আপনার সেনাবাহিনীকে। তাহলে কাবুলেই কেন তাদেরকে শীতকাল কাটানোর নির্দেশ দিচ্ছেন না? এরপর শুকনো দিন এলে আবারো উত্তরের দিকে এগিয়ে যাবে তারা—সম্ভবত হিন্দুকূশের ভেতর দিয়ে ভিন্ন কোন রাস্তা ব্যবহার করতে হবে যেন চমকে যায় আমাদের শত্রুরা।'

খানিক চুপ করে থেকে মাথা নাড়লেন শাহজাহান।

'ঠিক আছে, এটা সঠিক। একটা প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে সে কারণে হাল ছাড়ার কোন মানে হয় না। বিশেষ করে যখন এত বড় সেনাবাহিনীকে গড়ে তুলতে ও সশস্ত্র করতে প্রচুর ব্যয় হয়েছে। আমি এখনো বিশ্বাস করি যে সফল হবার পেছনে বহু যুক্তি আছে আমাদের। এছাড়া এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার মানে হল শত্রুর চোখেও হীন হয়ে যাওয়া। উজবেক বা পারস্য সকলেই ভাবতে উৎসাহী হবে যে নিজেদের দন্ত হারিয়ে ফেলেছে মোগল সেনাবাহিনী।' চারপাশে প্রকৃতই নিদ্রাভেঙ্গে জেগে উঠেছে উপদেষ্টারা। বিড়বিড় করে সকলেই একমত হল সম্রাটের সাথে।

'ভালো। আমি এখনই অশোক সিংকে সংবাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি এই বলে যে, কাবুলেই শীতকাল কাটাবে সেনাবাহিনী। এছাড়া সেখানকার প্রশাসকের কাছেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাচ্ছি তাদের জন্য যথাযথ আশ্রয় ও খাবারের সংস্থান করার।'

'আর নতুন সেনাপ্রধান, জাহাপনার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।' দ্রুতকণ্ঠে জানতে চাইল বর্ষীয়ান উপদেষ্টা।

'গুজরাট থেকে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে ডেকে পাঠানোর ব্যাপারে মনস্থির করেছি আমি। এ দায়িত্ব নিতে আগ্রহী ছিল সে। এখন তাহলে প্রমাণ করার সুযোগ দেয়া যাক যে সে এর যোগ্য আর আমার ভরসার।'

অধ্যায়-১৪

এগিয়ে আসা বর্শার আঘাত থেকে বাঁচতে একপাশে সরে গেল নিকোলাস। মাত্র এক ইঞ্চির জন্য মিস করল তাকে বর্শার ফলা। বালি মাটিতে গিয়ে পড়ল কোন ক্ষতি না করে, কিন্তু তার শত্রু হামাগুড়ি দিয়ে লুকিয়ে পড়ল কয়েক ফুট দূরে পড়ে থাকা তার মৃত ঘোড়ার পেছনে। লোকটা এখনো হাল ছাড়েনি।

নিজের ঘোড়ার উপর চড়ে বসল নিকোলাস। ইচ্ছে এগিয়ে গিয়ে পিষে মেরে ফেলবে অথবা তলোয়ার দিয়ে ধড় আলাদা করে দেবে শত্রুর। এমন সময় নিজের কোমরবন্ধনী থেকে লম্বা বাঁকানো ছুরি বের করল লোকটা। নিকোলাস প্রায় তার গায়ের উপর পৌঁছে গেছে, এমন সময় ছুড়ে মারল ছুরি। ঝাঁকি দিয়ে মাথা পিছনে ঠেলে দিল নিকোলাস কিন্তু ঠিক সময়মত হল না কাজটা। ফলে তীক্ষ্ণ ফলায় কেটে গেল গাল, রক্ত গড়াতে লাগল চেহারার অবশিষ্ট অংশ দিয়ে মুখের ভেতরে। ব্যথা ভুলে সামনে ঝুঁকে লোকটার দিকে আঘাত করল নিকোলাস। কিন্তু হিসেবে ভুল হয়ে গেল। উপজাতি লোকটা আবারো মৃত ঘোড়ার পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়তে শূন্য বাতাস কেটে গেল তলোয়ার। নিজের ঘোড়ার মাথা ঘুরিয়ে আবারো লোকটাকে আঘাত করতে উদ্যত হলেও তাল হারিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেয়ে মাটিতে পড়ে গেল নিকোলাসের ঘোড়া। নিকোলাসের মনে হল উড়ন্ত গোলার মত করে ঘোড়া থেকে মাটিতে ছিটকে গেল তার মাথা।

পতনের ফলে ঘুরে উঠল মাথা। মুখ থেকে থু করে তিক্ত স্বাদের রক্ত ফেলে বহুকষ্টে উঠে দাঁড়াল নিকোলাস কিন্তু প্রায় সাথে সাথে পৌঁছে গেল

শত্রু লোকটাও। ঘামের গন্ধ এসে ধাক্কা মারল নাকে, চৌকোণা ধাঁচের লোকটা মাটিতে ফেলে দিল নিকোলাসকে। হাসতেই মুখ থেকে বেরিয়ে এলো রসুনের টকটক গন্ধ, নিকোলাসের শাসনালীর উপর আঙুলের চাপ বাড়িয়ে মোচড়াতে লাগল যেন প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়। নড়াচড়া করে, লাথি দিয়ে নিজের উপর থেকে লোকটাকে ফেলে দিতে চাইল নিকোলাস, কিন্তু মানুষটা বেশ ভারী আর নিকোলাসের নিজের শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে শ্বাস নিতে না পারায়। ফুসফুসের ভেতরে মনে হল ঢুকে গেছে তপ্ত বালি। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ জোড়া। হঠাৎ করেই রক্তের ফিনকি ছুটে এসে মুহূর্তের জন্য মনে হল অন্ধ করে দিল নিকোলাসকে, বজ্রমুষ্টি ছেড়ে দিল লোকটা। হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছে তাকাতেই দেখা গেল কেউ একজন কেটে ফেলেছে নিকোলাসের আততায়ীর মাথা। রক্ষাকারী—যেই হোক না কেন—ইতিমধ্যে হাওয়া হয়ে গেছে তারপরেও তাকে নিঃশব্দে ধন্যবাদ জানালো নিকোলাস। মৃতদেহকে একপাশে সরিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে উঠে বসল বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করতে থাকা নিকোলাস। চারপাশে তাকাল।

কাবুল থেকে উত্তরদিকে দীর্ঘ যাত্রার শেষ অংশে এসে সংকীর্ণ গিরিপথগুলোর একটির মধ্যে পৌঁছাতেই এই অতর্কিত হামলা হল মোগলদের অগ্রগামী সৈন্য দলের উপর। হিন্দুকুশের ভেতরে এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে থাকা পর্বতের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে মোগল বাহিনী। গ্রীষ্ম হলেও এখনো ঢেকে আছে তুষারে। কয়েক জায়গায় তো গিরি সংকট এতটাই সরু যে পাশাপাশি খুব বেশি হলে তিনজন অশ্বারোহী পথ চলতে পারে। মাথার উপর ঝুলে থাকা চূড়া উঠে গেছে দুইশ ফুট পর্যন্ত। আর তাই প্রায় সবসময়েই পথ চলতে হচ্ছে ছায়ার মাঝে। সম্ভবত এ কারণেই মোগল চরেরা মাথার উপরে পাথরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা উপজাতিদের দেখতে পায়নি। তাই হঠাৎ করেই নির্ভুলভাবে মোগলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকগুলো।

আততায়ীদের না দেখতে পেয়ে আর পুরো সারি জুড়ে ধুপধাপ করে সতীর্থ সৈন্য পড়ে যেতে থাকায় আঁকাবাঁকা পথ ধরেই যত দ্রুত সম্ভব ছুটে চলল মোগল সৈন্যরা। শত্রুর নিশানা এড়াতে এই সংকীর্ণ পথে যত দ্রুত সম্ভব পড়ে গেল আরো মোগল কিন্তু একই সাথে এসে পড়ল

বাকিরা, মানুষ আর ঘোড়া উভয়েই শ্বাস ফেলছে বহুকষ্টে এই পাথুরে সমভূমিতে পৌঁছে। কিন্তু সান্ত্বনা এই যে অন্তত মোগল সৈন্যরা একটু একত্রিত হতে পারবে।

অবশেষে শত্রুদের দেখা পেল তারা—লাল-সবুজ ডোরাকাটা আলখাল্লা পরিহিত একদল অশ্বারোহী যোদ্ধা। ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক আর মাথায় কালো উলের টুপি পরা তুর্কমান অপেক্ষা করছে নিজেদের বিশালদেহী মাংসল ঘোড়ার পিঠে বসে; নিশ্চিত যে সরু গিরিপথ থেকে বের হবার সাথে সাথে মোগল সৈন্যদেরকে খতম করে দেবে তাদের বন্দুকধারীরা।

মাথার উপর অস্ত্র ঘুরিয়ে, রণহুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসা তুর্কমানদের দেখতে পেয়ে অশোক সিংয়ের প্রায় হাজার রাজপুত আর নিকোলাসের পাঁচশ ভাড়াটে বিদেশী সৈন্য উন্মাদের মত চেষ্টা শুরু করল সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে—এদের উপর ভার পড়েছে আওরঙ্গজেবের সৈন্যদের পৌঁছানোর আগে পথ প্রস্তুত করা। চারপাশের বিশৃঙ্খলার মাঝে নিকোলাসের কানে আসল রাজপুত অফিসারদের চিৎকারের শব্দ। নিজেদের সৈন্যদের একত্রিত করতে চাইছে তারা কিন্তু তার আগেই চলে এলো তুর্কমানরা। চওড় খড়্গা দিয়ে কচুকাটার মত হত্যা করতে লাগল মোগল সৈন্যদেরকে, ঘোড়ার পাদানিতে দাঁড়িয়ে লম্বা ব্যারেলের বন্দুক তুলে ছুড়তে লাগল আগুনের বল। জিজেল নামেই এগুলো পরিচিত—সাথে আছে বাঁকানো জোড়া ধনুকের তীর।

মৃত ঘোড়াটার ওপাশে গিয়ে চারপাশে তাকাল নিকোলাস, ডান হাতে এখনো ধরা আছে তলোয়ার। তার নিজের ঘোড়া তাকে ফেলে রেখেই উধাও হয়ে গেছে। যতটা বুঝতে পারছে যুদ্ধের অবস্থা এখনো ভারসাম্যপূর্ণ; কিন্তু ক্ষতিটা বেশি মোগলদের পাল্লাতেই।

বামপাশে কমলা-পোশাকে সজ্জিত, হাতে লোহার ফলা লাগান বর্শা নিয়ে তুর্কমান বন্দুকধারীদের দিকে ছুটে যাচ্ছে রাজপুত সেনারা; পিছনে বড় বড় পাথরের আড়াল থেকে তীর ছুড়ছে ধনুবিদেরা। অস্ত্রের ঝনঝনানির মাঝেও শোনা গেল রাজপুত সৈন্যের চিৎকার; গলার মাংস বের হয়ে গেছে ভেদ করে ঢোকা তীরের আঘাতে। এরপর একে একে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল দ্বিতীয় আর তৃতীয় রাজপুত; দুজনের শরীরেই

লেগেছে বন্দুকের গুলি। সোজাসুজি সামনে তাকাতেই নিজের একদল সৈন্যকে দেখতে পেল নিকোলাস—ফরাসী আর ডেনমার্কের সৈন্য সংখ্যায় কম হলেও দুঃসাহসিকতার সাথে লড়ছে; চেষ্টা করছে চারপাশ ঘিরে থাকা তুর্কমান অশ্বারোহীদের চক্রটাকে ভাঙ্গতে। হঠাৎ করেই একজন, গম্বুজের মত শিরস্ত্রাণের নিচে সোনালি চুলের রাশি দেখা গেল, ঢুকে গেল তুর্কমানের ব্যূহ ভেদ করে। কিন্তু সাথে সাথেই গুলির আঘাতে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। এক মুহূর্তের জন্য পাদানীতে আটকে রইল, কিন্তু এরপরই টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেল চামড়ার পাদানী। মাটির উপর কয়েক গড়ান দিয়ে অবশেষে স্থির হল হতভাগ্য ডেনিশ। লোকটাকে চিনতে পারল নিকোলাস। ডেনিস এই জলদস্যু বাংলার কাছে এসে জাহাজ ভেঙে যাবার পরে যোগ দিয়েছে ভাড়াটে সৈন্যদলে। একটা ঘোড়া খুঁজে বের করে নিজের লোকদের সাহায্য করতে এগিয়ে যাবার তাগাদা অনুভব করল নিকোলাস...

হঠাৎ করেই কানে এলো ঘোড়ার খুরের সম্মিলিত বাজনা। মাথা ঘোরাতেই দেখা গেল গিরিপথ দিয়ে বের হয়ে আসছে তরতাজা মোগল সেনারা, খোলা জায়গা পেরিয়ে যুদ্ধস্থানে পৌঁছে গেছে প্রায়। হলুদ সূর্য খচিত একগাদা কমলা রঙা ব্যানার বাতাসে উড়তেই বোঝা গেল যে অশোক সিং নিজে আছে এদের নেতৃত্বে। আরো নিশ্চিত হওয়া গেল দেহরক্ষীদের ভিড়ে লম্বা সাদা ঘোড়ার উপর বসে থাকা, লোহার বর্ম গায়ে ঋজু রাজপুত অবয়বটা দেখে। চমকাতে লাগল সামনে বাড়িয়ে ধরা তলোয়ার, সন্ধ্যার মৃদু আলোতে জ্বলতে লাগল আগুনের মত। কিন্তু আর দেখার সুযোগ পেল না নিকোলাস। কোঁকড়া কালো দাড়িঅলা এক বিশালদেহী তুর্কমান ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল নিকোলাসের দিকে, নির্ঘাৎ তাকে দেখতে পেয়েছে আর পিষে মেরে ফেলতে চাইছে।

কাছেই একটা বর্শা পড়ে আছে দেখতে পেল নিকোলাস। তলোয়ার ফেলে একেবারে সময় মত হাতে তুলে নিল বর্শা। এক পাশে লফিয়ে পড়ে, অশ্বারোহীর পথ থেকে সরে গিয়ে আড়াআড়িভাবে বর্শাটা রেখে দিল ঘোড়ার খুড়ের নিচে। এগিয়ে আসতে থাকলে তুর্কমানের বাম পায়ে বিঁধে গেল বর্শা। নিজেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে তুর্কমান, এমন

সময় এক লাফে লোকটার উপর চড়ে বসল নিকোলাস, ছুরি বের করে দ্রুততার সাথে একেবারে ঢুকিয়ে দিল লোকটার গলায়।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। হাতে রক্তমাখা ছুরি, চারপাশে তাকিয়ে দেখছে আর কোন বিপদ ওত পেতে আছে কিনা। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি মাংসে ঢুকে গেল বন্দুকের গুলি অথবা তলোয়ার।

মৃতলোকটার ঘোড়াটা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, লাগাম ধরতে এগিয়ে গেল নিকোলাস। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে কাঁপতে থাকলেও বোঝা গেল আঘাত পায়নি জন্তুটা। শুধুমাত্র সামনের ডানদিকে খুরের চামড়ায় বর্শার আঘাতে খানিকটা রক্ত ঝরছে। ঘোড়ায় গলায় হাত বুলিয়ে পিঠে চড়ে বসল নিকোলাস; এরপর সাবধানে এগোতে লাগল সামনের দিকে, এই আশায় যে একটুখানি উঁচু জায়গা পাওয়া গেলে কী ঘটছে তা ভালোভাবে দেখা যাবে। অশোক সিং আর তার সৈন্যরা এসে গেছে, নির্ঘাৎ লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে তুর্কমানদের দল...

ঘোড়ার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে ফিসফিস্ করে উৎসাহ দিতে দিতে সাবধানে মৃত আর মৃত্যুপথযাত্রী দেহগুলোকে পার হয়ে ছোট্ট পাহাড়টাতে নিরাপদে পৌঁছে গেল নিকোলাস। নিচে তাকাতেই দেখা গেল এক মাইলের চারভাগের এক ভাগ দূরত্বে সত্যিকারের পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করছে অশোক সিং। জোড়া মাথার যুদ্ধ কুঠারের আঘাতে মাথা কেটে গেল এক তুর্কমানের। এরপর ডান হাতে আঘাত করল দ্বিতীয় তুর্কমানের উপর, হাতের বর্শা ফেলে দিয়ে ঘুরে চলে গেল লোকটা, আহত হাত পাশে ঝুলতে লাগল মাংসপিণ্ডের মত করে। চারপাশ জুড়েই দেখা গেল হঠাৎ যেন যুদ্ধে আগ্রহ হারিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বা হামাগুড়ি দিয়ে পাথুরে ভূমি ছেড়ে চলে যেতে লাগল তুর্কমানরা। নিকোলাসের ফরাসী আর ডেনিশ ভাড়াটে সৈন্যরা নিজেদের শত্রুদেরকে নিকেশ করে এগিয়ে গিয়ে জড়ো হল অশোক সিংয়ের সৈন্যদের সাথে। এটাই যে প্রথম তা নয়, এভাবে আরো বহুবার রাজপুত শাহজাদা আর তার যোদ্ধারা যুদ্ধের গতি ঘুরিয়ে দিল মোগলদের অনুকূলে।

উল্লসিত হয়ে অশোক সিংয়ের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল নিকোলাস। হাসি দিয়ে দস্তানা পরা ডান হাত তুলে স্বাগত জানালো অশোক সিং।

"অনেক শিক্ষা পেয়েছে—পালিয়ে যাচ্ছে তাই।" বলে উঠল নিকোলাস। সত্যিই তাই। ভাগ্যগুণে বেঁচে যাওয়া নিকোলাস চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পেল কয়েক জায়গার খণ্ডযুদ্ধও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কয়েক জায়গায় তুর্কমানদের ছোট ছোট দল এখনো মাটি আঁকড়ে প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে; কেননা তাদের ফেরার পথও বন্ধ হয়ে গেছে। নিকোলাসের ডান পাশেই এমন ত্রিশজন মিলে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুললেও বাঁচতে পারছে না। রাজপুত তলোয়ার আর বল্লমের হাত থেকে। কাছাকাছিই ছোট আরেকটা দল আশ্রয় নিয়েছে উল্টেপড়া রসদবাহী গাড়ির ওপাশে। কিন্তু নিকোলাসের ভাড়াটে সৈন্যরা কয়েকজন মিলে ধাওয়া করে খোলা জায়গায় বের করে আনছে এ তুর্কমানদের।

ডানদিকে দুইশ গজ দূরত্বে, দেখা গেল একদল কালো আলখাল্লাধারী অশ্বারোহী। এখনো চওড়া ফলার খড়্গ নেড়ে ভয়ঙ্করভাবে যুদ্ধ করছে লোকগুলো। মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে মোগলদের সামনে থেকে পথ বের করে নিতে। অন্যান্য তুর্কমানদের চেয়ে ভালো ঘোড়া আর সশস্ত্র অবস্থায় আছে এরা। কালো ঘোড়ায় চেপে নেতৃত্ব দিচ্ছে ঘন দাড়িঅলা এক তুর্কমান। সম্ভবত স্থানীয় খান ও তার দেহরক্ষীরা।

'উচিত শিক্ষা দিয়েছি আমরা এ বর্বরগুলোকে', হেসে ফেলল অশোক সিং। এরপর থেকে মোগল সৈন্যদের উপর আক্রমণ করার আগে দু'বার ভেবে দেখবে হয়ত।

উত্তর দেবার আগেই পেছনে পাথুরে ভূমিতে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল নিকোলাস। ঘুরে তাকাতেই চিনতে পারল ছয়জন সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসা আওরঙ্গজেবের তরুণ কর্চিকে। ঘোড়ার উপর থেকে অশোক সিংকে জানালো, জনাব! শাহজাদা আওরঙ্গজেবের কাছে থেকে বার্তা নিয়ে এসেছি।'

'শাহজাদাকে জানাতে পারো যে গিরিপথ দিয়ে প্রধান সৈন্যসারি নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য আর কোন ভয় নেই তার—আমাদেরকে বিপদে ফেলার জন্য বসে থাকা লোকগুলোকে সমূলে উৎখাত করেছি আমরা।' জানিয়ে দিল রাজপুত।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে একবার নিকোলাস আর আরেকবার অশোক সিংয়ের দিকে তাকাল তরুণ কর্চি। যেন বুঝতে পারছে না যে কী বলবে, ধুলিমাখা চেহারাতে উদ্বিগ্নতার ছাপ।

'আমি নিশ্চিত এটা শুনতে পেলে খুশিই হবেন আমার প্রভু। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে একটা আদেশ নিয়ে এসেছি আমি। এখনি পিছু হটতে হবে সবাইকে।'

'কী? ঠিক শুনছি তো?' সামনে ঝুঁকে এলো অশোক সিং।

'শাহজাদা আওরঙ্গজেবের ইচ্ছে যেন সবাই পিছু হটে গিরিখাদে মিলিত হয় তাঁর সঙ্গে।'

'কেন? যদি এখন আমরা পিছু হটি, তাহলে এত কষ্ট করে দখল করা ভূমি আবারও কেড়ে নেবে শক্রুরা। আবারো তাহলে একইভাবে যুদ্ধ করতে হবে সেনাবাহিনীর জন্য পথ নিরাপদ করতে।'

'নিজের যুক্তি জানাননি আমার প্রভূ।'

অশোক সিংয়ের দিকে তাকাতেই কপালের উপর শিরা লাফাতে দেখল নিকোলাস।

'কয়েকদিন ধরে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না অশোক সিং আর আওরঙ্গজেবের। রাজপুতের পরামর্শ প্রায়ই হেলায় সরিয়ে দিচ্ছে শাহজাদা, যা অহংকারী আর কদাচিৎ রেগে যাওয়া অশোক সিংয়ের পক্ষে মেনে নেয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আর নিজের কথা বলতে গেলে নিকোলাসের নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছে না কর্চির কথা। পর্বতের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসায় প্রায় সফল হয়েছে, তাঁর সামনেই পড়ে আছে সহজতম রাস্তা, এমন সময় সব ছেড়েছুড়ে তিনি পিছু হঠার মানে নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

'কী ঘটেছে গিরিপথে? উপরের পাথরে লুকিয়ে থাকা বন্দুকধারীরা কি এখনো গুলি করছে প্রধান সৈন্য সারির উপর, যেমনটা তারা করেছিল অগ্রগামী দলের উপর? শাহজাদা কি আমাদেরকে সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠাচ্ছেন?' জানতে চাইল অশোক সিং। গলার স্বরে ক্রোধ আর অবিশ্বাস।

মাথা নাড়ল কর্চি। 'আমি যখন এসেছি ততক্ষণে, উঁচু জায়গার বেশির ভাগটাই আমাদের দখলে চলে এসেছিল।'

'তাহলে আমি পিছু হটব কেন? সামরিকভাবে এর কোন মানে হয় না। সঠিক কোন কারণ ছাড়া এখন পিছু হটা আমার আর এ ভূমি রক্ষার্থে আত্মদান করা আমার সৈন্যদের স্মৃতির পক্ষে সম্মানহানিকর।'

'আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে এগুলো শাহজাদার আদেশ আর তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যেন তৎক্ষণাৎ মান্য করা হয়।'

'গভীর চিন্তায় মগ্ন নিশ্চুপ অশোক সিংকে দেখে অস্বস্তির সঙ্গে একে অন্যের দিকে তাকাল নিকোলাস আর কর্চি। এবারই প্রথম না যে জ্যেষ্ঠ সেনাপ্রধান না হয়ে খুশিই হয়েছে নিকোলাস, কাঁধের উপর তাই এতবড় দায়িত্বের বোঝাও নেই। কয়েক মুহূর্ত আগেও সতীর্থের মত সমানভাবে বিজয়ের আনন্দ ভাগ করে নিয়েছে দু'জনে। কিন্তু এখন সে একজন অধঃস্তন মাত্র, অপেক্ষা করছে নির্দেশের ।

'শাহজাদা যদি আমাকে পিছু হটার নির্দেশ দিয়ে থাকে, তাহলে আমাকে অবশ্যই তা মানতে হবে।' আস্তে করে কথাটা বলেই আবার গলা চড়াল অশোক সিং। বলে উঠল, 'কিন্তু আমার উপর শাহজাদার প্রথম আদেশ ছিল গিরিপথের বাইরের দিকটা শত্রুমুক্ত করা আর এখনো শেষ হয়নি এ কাজ। যেহেতু এই আদেশ প্রথমে পেয়েছি আমি, তাই এটাই শেষ করব আগে।'

অশোক সিং কি করতে যাচ্ছে বুঝে ওঠার আগেই নিকোলাস দেখতে পেল নিজের তলোয়ার হাতে নিয়ে নিজের লোকদের উদ্দেশে রণহুঙ্কার ছাড়ল রাজপুত। এরপর সাদা ঘোড়ার গায়ে জুতা দিয়ে চাপড় দিয়ে ছুটে গেল যুদ্ধরত খানেদের দিকে। এমনকি নিজের দেহরক্ষীদের জন্যও অপেক্ষা করল না। তবে কী ঘটেছে বুঝতে পেরে সাথে সাথে নিজেদের ঘোড়া ছোটাল অশোক সিংয়ের দেহরক্ষীরা। নিকোলাস নিজেও ঝেরে ফেলল সব দ্বিধা। পাথুরে জমির উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এক হাতে লাগাম আর অন্য হাতে তলোয়ারের হাতল ধরে চেষ্টা করল সামনে কী হচ্ছে দেখতে। কিন্তু দৃষ্টি বাধা পেল আরো কয়েকজন অশ্বারোহী থাকাতে। হঠাৎ করেই খানিকটা ফাঁক পাওয়া গেল, কেননা রাস্তার মাঝে পড়ে থাকা পাথর এড়াতে দু'পাশে সরে গেল দুই রাজপুত সেনা। অশোক সিংয়ের সাদা ঘোড়া এক পলকের জন্য চোখে পড়ল। রাজপুত শাহজাদা প্রায় পৌঁছে গেছে যুদ্ধস্থলে কিন্তু দেহরক্ষী এখনো খানিকটা দূরে। এরপরই আরেকটা জিনিস নজরে পড়ল : বাতাসে শিষ কেটে শাহজাদার দিকে এগিয়ে আসছে একটা বর্শা। অবচেতনেই চিৎকার করে উঠে নিকোলাস। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে হারিয়ে গেল তার সাবধানবাণী।

বর্শাটা এসে বিঁধে গেল অশোক সিংয়ের গলায়। আঘাতের জায়গায় হাত দিয়ে আস্তে করে ঘোড়া থেকে এগিয়ে আসা দেহরক্ষীর পথে লুটিয়ে পড়ল রাজপুত শাহজাদা।

খেপা মোষের মত ছুটে গিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল নিকোলাস। মনোযোগ দিয়ে কেটে ফেলে হত্যা করতে লাগল শত্রুদেরকে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে একপাশে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেল দাড়িঅলা যোদ্ধার দিকে। নিজের খড়্গ নিকোলাসের উপর দিয়ে চালিয়ে দিল খান; কিন্তু নিজের অস্ত্র দিয়ে আঘাত প্রতিহত করল নিকোলাস। প্রতিপক্ষের কুঁচকিতে ঢুকিয়ে দিল তলোয়ারের ফলা। চিৎকার করে পড়ে গেল খান। ঘোড়া ছুটাতে ছুটাতেই নিকোলাসের চোখে পড়ল মাটিতে পড়ে থাকা বেশির ভাগ শত্রু, হয় মৃত নতুবা মৃত্যুপথযাত্রী। পুরো যুদ্ধের মতো এই খণ্ডযুদ্ধের ফলাফল নিয়েও কোন সন্দেহ রইল না। কিন্তু নিজের সম্মান রক্ষার্থে আত্মদানের পথ বেছে নিল অশোক সিং। ক্ষতির কথা ভেবে পরিতাপে দগ্ধ হল নিকোলাস। অসংখ্য যুদ্ধে অংশ নেয়া পোড়খাওয়া চারজন পেশীবহুল রাজপুত সেনা ডুকরে কেঁদে উঠল সবার সামনে। কাঁধে তুলে নিল দোমড়ানো মোচড়ানো আর রক্তাক্ত শাহজাদার মৃতদেহ। বহুদূরে পর্বতের মাঝে ডুবে যেতে লাগল রক্তলাল বলের মতো, সূর্য। একটু পরেই, এই ধূসর বিরান পাহাড়ে যতটুকু সম্ভব কাঠ জোগাড় করে চিতা বানানো হল। শেষকৃত্যের শিখায় আলোকিত হয়ে উঠল রাতের আকাশ। পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেল অশোক সিংয়ের আত্মা।

ভগ্নহৃদয়ে তলোয়ার খাপে ভরে রাখল নিকোলাস। ঘোড়ার দিকে ফিরে ডেকে উঠল তার ভাড়াটে সৈন্যদের দলনেতাকে। নাভারে থেকে আগত বর্ষীয়ান ফরাসী, 'জড়ো কর আমাদের সৈন্যদেরকে। শাহজাদার আদেশে ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে। এই কারণে আমরা পরাজিত হলেও' এই আদেশকেই মানতে হবে।

প্রাসাদের ছাদে একাকী দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন শাহজাহান। যদিও দেখতে পাচ্ছেন না যমুনার উপর দিয়ে তীরের মত আকৃতি নিয়ে উড়ে যাওয়া একদল সারসের সৌন্দর্য। তিন মাস থেকে

বিপর্যয়ের সংবাদ প্রথমবার এনেছিল কসিডস, ঠিক তখনকার মত করেই আরো একবার চোখের সামনে ভেসে উঠল হিন্দুকুশের গিরি অঞ্চলে তুষারপাত আর ক্ষুধার জ্বালায় মৃত আর অথর্ব হয়ে পড়ে থাকা হাজার হাজার মোগল সৈন্যদের ছবি। আরো একবার কাবুলের পথে পিছু হটে আসছিল তাঁর সৈন্যরা। অসংখ্য প্রাণহানি আর রাজকোষের বিশ মিলিয়ন রুপি খরচ হয়ে গেলেও দখল করা গেল না এক ইঞ্চি ভূমি। তাঁর পুরো রাজত্বকালের প্রথম আর স্থায়ী সামরিক পরাজয় হিসেবে প্রমাণ হয়েছে এ অভিযান...আরো একবার নিজের কাছে জানতে চাইলেন যে আওরঙ্গজেব কীভাবে তাঁকে এতটা হতাশ করতে পারল, এমনকি গত বছরে মুরাদকেও ছাড়িয়ে গেছে এ ব্যর্থতা। এইবার তো মোগল সেনাবাহিনী এমনকি অক্সাসও পার হতে পারেনি... উজবেকদের সাথে একবারও তলোয়ার হাতে যুদ্ধে নামেনি। বরঞ্চ পুরো শীতকাল ধরে তাদেরকে দেরি করিয়ে দেবার সুযোগ দিয়েছে ভাঁড়ের মত পোশাক পরিহিত, আঘাত করে পালিয়ে যাওয়া আফগান আর তুর্কমানদেরকে ফলে কাবুলে এসে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা আর সফল হয়নি।

আর এই সাম্প্রতিক সংবাদ। খোঁড়া সমরকন্দ অভিযানের সুযোগ নিয়ে কান্দাহারের বিপক্ষে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে পারস্যের শাহ। আর মাত্র সাতান্ন দিন অবরোধের পর মেরুদণ্ডহীন মোগল প্রহরীরা দুর্গের ফটক খুলে দিয়েছে বিজয়ী পারসীয়দের জন্য। যতই ভাবছেন ততই রেগে যাচ্ছেন আওরঙ্গজেবের উপর। এখন অপেক্ষা করছেন পিতার জরুরি আদেশে গতরাতে আগ্রাতে ফিরে আসা আওরঙ্গজেবের সাথে কথা বলার জন্য। মুরাদের ব্যর্থতার তুলনায় আওরঙ্গজেবের ব্যর্থতাকে ক্ষমা করা কঠিন হচ্ছে, কেননা সে তো আরো বেশি অভিজ্ঞ ছিল।

আসলে দারা যা বলেছে তাই-ই ঠিক... নিজের সক্ষমতা নিয়ে একটু বেশিই উচ্চ ধারণা ছিল আওরঙ্গজেবের, এখন তাই খামতিগুলো বাজেভাবে চোখে পড়ছে। শাহজাহানও তাকে একই কথাই জানাবেন।

শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' কর্চিকে ডেকে আদেশ দিলেন শাহজাহান।

পাঁচ মিনিট পরে নিজের সাদাসিধে পোশাকে পিতার সামনে এসে হাজির হল আওরঙ্গজেব। তার ভাবভঙ্গি, ঋজু কাঁধ, উন্নত মস্তকের উপর

একনজর চোখ বুলিয়েই শাহজাহান বুঝতে পারল যে নম্র বা অনুতাপ তো নয়ই বরঞ্চ যুদ্ধের অভিপ্রায় নিয়েই এসেছে আওরঙ্গজেব, এতে আরো রেগে গেলেন তিনি।

'তো, নিজের স্বপক্ষে কী বলতে চাও তুমি?' একাকী হতেই ত্বরিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন শাহজাহান।

'পর্বতের মরু খাদের জন্যই আমাদের পরাজয় ঘটেছে। কয়েকটা ভারী কামান টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও, অস্ত্রবাহী গাড়িগুলোর চাকা ভেঙে গিয়েছিল আর বেশিরভাগ তো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে পাথুরে ভূমিতে।'

'তাই তুমি গাড়ি ঠিক করার ব্যবস্থা না করে কামান ছেড়ে চলে এসেছো!'

'হ্যা, আর কোন বিকল্প দেখি নি আমি। মেরামতের জন্য সময় লাগতো আর ক্ষতিও বারবার হত। এছাড়া অস্ত্রের জন্য চলার গতিও কমে গিয়ে অর্থহীন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

'কিন্তু একবার পর্বত থেকে বের হয়ে সমতল ভূমিতে যেতে পারলেই তো আর অর্থহীন থাকত না সেগুলো। সাধারণ গোত্রের মানুষেরা কীভাবে গোলা-বারুদ বহন করে? আরো শক্তভাবে চেষ্টা করা উচিত ছিল তোমার। কামানের সহযোগিতায় এতদিন অক্সাসের ওপারে পৌঁছে যেতে তুমি!'

'আমার বিবেচনাতে অক্সাস পর্যন্ত এগুলোকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল, আব্বাজান।'

'এগুলোকে ছাড়াই এগিয়ে যাবার কথা একবারও ভেবেছিলে তুমি? না! আদেশের অবাধ্যতা করে পালিয়ে এসে কলঙ্ক লেপে দিয়েছো আমার আর মোগল সেনাবাহিনীর উপর। তাই বিস্মিত হবার কিছু নেই যে অশোক সিং—ভালো বন্ধুই শুধু নয়, আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আর বিশ্বস্ত জেনারেল—মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করেছে।'

'এই আচরণকে সম্মানযোগ্য বলছেন আপনি? বেঁচে থেকে আবার যুদ্ধের চেষ্টা না করে অপ্রয়োজনে আত্মদান করাটাকে বোকামি ছাড়া আর কিছু বলব না আমি। তিনি যাই ভেবে থাকুন না কেন আমার পদক্ষেপই সঠিক ছিল। অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েই বিলম্ব হয়ে গেছে আমাদের।

শত্রুরা জানত যে আমরা আসছি আর তাই প্রতিদিন শয়ে শয়ে এসে জড়ো হচ্ছিল পরাজিত করার উদ্দেশ্যে। আধুনিক অস্ত্রের অভাব সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করছিল তারা। আমি অস্ত্র এগিয়ে নিতে পারছিলাম না। আর তাই অস্ত্র ছাড়া নিজের লোকদের ঝুঁকির মধ্যেও ফেলতে চাইনি আমি।'

'এমনটা তো নাও হতে পারত। কতজনকে হারিয়েছ তুমি?'

'প্রায় বিশ হাজার—যুদ্ধে পাঁচ হাজার আর ঠাণ্ডা ও রোগের প্রকোপে পনের হাজার। কয়েক বছরের তুলনায় শীত আর তুষারপাত শুরু হয়েছিল তাড়াতাড়ি...আব্বাজান, একবারের জন্য হলেও বিশ্বাস করুন আমাকে। যা যা সম্ভব আমি করেছি। সবকিছুই আমার বিরুদ্ধে ছিল আর সৈন্যরাও অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল—বিশেষ করে যারা সমভূমি থেকে এসেছিল—মরুভূমিরও ছিল অনেকে। আমার প্রচেষ্টা ব্যতীত ক্ষয়ক্ষতি আরো বেশি হত।'

'কিছুই তোমার অপরাধ নয়, অন্য কারো, তাই না? সবসময় এটাই তো তোমার অজুহাত। আমার প্রতি কোন শ্রদ্ধাই নেই তোমার, না তোমার পিতা হিসেবে, না সম্রাট হিসেবে। নিজের মন্তব্য আর দক্ষতার উপর অগাধ আস্থা। এতটা বাজেভাবে আমাকে হতাশ করেছ, যা ঘটা সম্ভব বলে কখনো ভাবিইনি। তার উপরে আবার বহু প্রাণহানি হয়েছে—অশোক সিং সহ।'

'বারবার অশোক সিংয়ের নামে কেন স্তুতি? রাজপুতেরা আমাদের মত নয়—তাদের বিশ্বাসে গলদ আছে আর গরিমা তো সহ্যই করা যায় না। অহেতুক ঝামেলা না করে আমার আদেশ মান্য করে, পিছু হটায় সাহায্য করলেই সাম্রাজ্যের জন্য দায়িত্ব পালনে সার্থক হত।'

'তোমার সাহস কত বড় যে রাজপুত গরিমা নিয়ে কথা বল! রাজপুতদের সাহস আর বিশ্বস্ততা নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না আর মোগলদের বহু কীর্তিমান অভিযানের পেছনে তাদের হাত রয়েছে। জিহ্বাতে লাগাম দিয়ে আমার কথা শোন। আমি তোমাকে একান্তে ডেকে পাঠিয়েছি কেননা যা বলতে চাই তা সর্বসমক্ষে বললে আমাদের পরিবারের সম্মান কমত বৈ বাড়ত না। দুর্বল হিসেবে তোমাকে অভিযুক্ত করতে হবে কখনো ভাবিনি আমি। কিন্তু একমাত্র তুমি আর কেউ নয়,

দুর্বল হিসেবে প্রতিপন্ন করেছ আমাদের রাজবংশকে। তোমার কারণে কান্দাহারের দেয়ালের উপর থেকে হাসতে হাসতে আমাদের উপর মূত্র বিয়োগ করছে পারসীয়রা...।

'বুঝতে পারছি আপনি মনস্থির করে ফেলেছেন। এটা দুর্বলতা নয়, শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ যে কখন আপনি বুঝতে পারবেন উচ্চাকাঙ্খাকে স্থগিত রেখে পুনরায় কীভাবে আর কখন তার পিছু নিতে হবে। তো আপনার ইচ্ছের কাছে মাথা নত করছি। আমাকে নিয়ে কী করতে চান?'

'পৃথিবী যদি তাকিয়ে না থাকত, তাহলে তোমাকে সাম্রাজ্যের একেবারে দূরতম কোণে উধাও করে দিতাম নয়ত মক্কায় পাঠিয়ে দিতাম হজ করতে যেহেতু তুমি প্রার্থনা এত ভালোবাসা। কিন্তু আমার রাগের মাত্রা বুঝে ফেলার সন্তুষ্টি দিতে চাই না শত্রুদেরকে। দাক্ষিণাত্যে তোমার পূর্ব পদে ফিরে যাবে তুমি; কিন্তু তোমার আচরণের উপর নজর রাখব আমি। অন্তত এখন সেখানে শান্তি বজায় আছে সর্বত্র। তাই তোমার সামর্থ্যের বাইরে কোন সামরিক হুমকি মোকাবেলা করতে হবে না। এক সপ্তাহের মাঝেই রওনা দেবে। এখন যাও।'

'তিনি কখনো আমাকে বা আমার উচ্চাকাঙ্খাকে বুঝতে পারেননি, কেননা আসলে কখনো বুঝতেই চাননি।' মাথা নাড়ল আওরঙ্গজেব।

'কিন্তু অন্তত সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে তোমাকে দাক্ষিণাত্যে ফেরত তো পাঠাচ্ছেন।' আগ্রা দুর্গের ছাদে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের আরেকটু কাছে সরে এসে কাঁধে হাত রাখল রোশনারা।

'নিজের মুখ বাঁচাতে করেছেন—আমার জন্য নয়। কেন অভিযান ব্যর্থ হয়েছে সেদিকে কোন আগ্রহ নেই—আগ্রহ শুধুমাত্র মানুষ কী ভাববে তা নিয়ে। আমি নিশ্চিত দারা আমার বিরুদ্ধে কিছু লাগিয়েছে। আমাকে বেশি না ঘাঁটানোর ব্যাপারে তাদের দুজনেরই উচিত সাবধান হওয়া।'

'তুমি হয়ত ঠিকই বলেছ, দারা নিশ্চয়ই কিছু বলেছে তোমার বিরুদ্ধে। যখন তুমি ছিলে না, একসাথে বহু সময় কাটিয়েছে তারা। জাহানারাও প্রায় তাদের সাথে থাকত, একা লাগত নিজেকে আমার।'

জ্যেষ্ঠ ভগিনীর নাম নিতেই নরম হয়ে গেল আওরঙ্গজেবের চেহারা। রোশনারার মনে হল আওরঙ্গজেব সবসময় বড় বোনকে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু সময় এসেছে তাকে জানানোর যে বড় বোনও তার চেয়ে দারার পক্ষই বেশি নেবে। কিন্তু যদি চায় তাহলে মিত্র হতে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে রোশনারা। সম্ভবত সময় এসেছে তাকে জানানোর যে আওরঙ্গজেব যতটা ভাবছে সাম্রাজ্যের সম্মানীয়া শীর্ষস্থানীয় নারী ঠিক ততটা ক্রুটিহীন নয়।

'নিকোলাস ব্যালান্টাইনও তোমার সাথে আগ্রা ফিরে এসেছে, তাই না?'

'হ্যা। ফেরার সময়ে শেষপর্যায়ে পায়ে আঘাত পেয়েছে, সেরেও গেছে। কেন জানতে চাইছ?'

'কেননা মুরাদ অভিযানে বের হবার ঠিক আগমুহূর্তে একটা ঘটনা ঘটেছে। নিকোলাস ব্যালান্টাইন জাহানারার সাথে তার প্রাসাদে দেখা করেছে। তারপর থেকেই পরস্পরের কাছে চিঠি লিখছে তারা, এমনকি যখন তোমার হয়ে যুদ্ধ করছিল তখনো...'

'এটা হতেই পারে না... কে বলেছে তোমাকে? কীভাবে জানো তুমি?' বিস্মিত হয়ে গেল আওরঙ্গজেব।

'আমার প্রাক্তন এক সেবাদাসী এখন তার কাজ করে। সেই-ই আমাকে জানিয়েছে যে কী ঘটছে। পিতার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেছি এটা নিয়ে। কিন্তু তুমি জানো জাহানারাকে নিয়ে কী ভাবেন তিনি, বিশেষ করে আগুনের ঘটনার পর থেকে। কিন্তু কেই বা জানে তাদের পত্র বিনিময়ের আসল উদ্দেশ্য কী? আমি বলছি না যে সত্যিই কোন অনর্থ ঘটছে কিন্তু এমনটা কি হতে পারে না যে নিকোলাস আমাদের পদ্ধতি বুঝতে না পারলেও জাহানারাকে অভিযানের সময়ে তোমার আচরণ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে আর এ তথ্য কাজে লাগিয়ে দারাকে সাহায্য করেছে পিতার কাছে তোমার বিরুদ্ধে লাগাতে।'

'জাহানারা কখনো এমন কিছু করবে না।'

'তুমি নিশ্চিত? পিতার বয়স বাড়ছে। হতে পারে ইতিমধ্যেই তিনি ঠিক করে ফেলেছেন যে সময় আসছে, তাকে ভাইদের মধ্য থেকে একজন কাউকে বেছে নিতে হবে। যদি তিনি চান যে দারাই হবে পরবর্তী সম্রাট, তাহলে সাধ্যমত সব কিছু করবে দারাকে সাহায্য করতে। এটার

মানে এই না যে জাহানারা তোমার শত্রু হয়ে গেছে—আমি জানি তুমি তাকে কতটা পছন্দ কর, আমিও। কিন্তু ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির মোহ মানুষকে বদলে দেয় আর আমার বিশ্বাস তাকেও বদলে দিয়েছে। তাকে তো আমার আর গওহর আরার মত হারেমে থাকতে হচ্ছে না, নিজের গৃহস্থালি আর প্রাসাদ পেয়েছে। আনন্দ আয়োজনের ব্যবস্থাও করতে পারছে। আর তার ঔদ্ধত্বের আরেকটা প্রমাণ হল ইংরেজটার সাথে সম্পর্ক। সে ভাবছে আমাদের সবাইকে আটকে রাখা নিয়ম না মানলেও চলবে তার।'

'শুধুমাত্র প্রথা নয়, ধর্মীয় নীতিও এতটা অভদ্রতার অনুমতি দেয় ন।' আস্তে করে জানালো আওরঙ্গজেব।

'এতটা রাগ করো না। আমি নিশ্চিত যে ভাই হিসেবে তোমাকে ভালোভাসে সে। কিন্তু সিংহাসনের জন্য দারাকে পছন্দ করে।' হেসে ফেলল রোশনারা, কিন্তু উত্তর পেল না আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে। মাটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আওরঙ্গজেব। জাহানারার কাছে তার অবস্থান দারার নিচে ভাবনাটা বেদনাদায়ক। যদি সে কখনো এটা নিয়ে ভাবতোও, তাহলে ধারণা করত যে জাহানারা নিশ্চয়ই সকলকে সমানভাবে ভালোবাসে। তারপরেও যত গভীরভাবে ভাবছে ততই বুঝতে পারছে যে রোশনারার কথাই সঠিক। যতবার তাদের মাঝে কথা কাটাকাটি হয়েছে ততবার জাহানারা দারার পক্ষ নেয়নি? দারার দর্শন সম্পর্কে আগ্রহকে বাহবা দেয়নি? যদি সময় আসে তাহলে আওরঙ্গজেবের কঠোর আর কট্টর শাসনামলের চেয়ে দারার দুর্বল আর ঢিলেঢালা শাসনই বেশি পছন্দ করবে না? চিন্তার মাঝে রোশনারার নরম স্বর অনুপ্রবেশ করে আরো তিক্ত আর সন্দেহগ্রস্ত করে তুলল আওরঙ্গজেবকে। যদি আমি ইংরেজটার সাথে জাহানারার সম্পর্কের আর কোন প্রমাণ পাই তাহলে কী করব?'

'বাবার সাথে আরেকবার কথা বলবে আর এবার এমনভাবে যেন সে শুনতে বাধ্য হন। আর আমাকেও জানাবে... সবকিছু জানা প্রয়োজন যেন প্রস্তুতি নিতে পারি। এ ব্যাপারে তোমাকে কি বিশ্বাস করতে পারি? কাউকেই সহ্য করব না আমি—জাহানারাকেও না—যদি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।'

অধ্যায়-১৫

অতি ধীরে আরেকবার নিকোলাস ব্যালান্টাইনের চিঠি পড়ল জাহানারা। প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বার পড়লে একটু স্বস্তি খুঁজে পাওয়া যাবে, ভেবে থাকলে নিরাশ হল সে। কীভাবে এত ভুল হয়ে গেল ব্যাপারগুলো? যতবার চেষ্টা করল, কিছুই বুঝতে পারল ন। এত তড়িঘড়ি করে আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যে ফেরত পাঠালেন শাহজাহান যে ভাইয়ের সাথে দেখা করার কোন সুযোগই পেল না সে। একাকী কথা বলে উত্তরের অভিযান সম্পর্কে আওরঙ্গজেবের নিজস্ব মতামতও শোনা হল না। পিতার সামনে আওরঙ্গজেবের প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করলেও ঠোঁট চেপে বসে এমন এক গোঁয়ারের মত আচরণ করলেন শাহজাহান যে, জাহানারা বিস্মিত আর হতাশ হয়ে গেল।

দারার ধারণা আওরঙ্গজেবকে নিয়ে চিন্তা করে ভুল করছে জাহানারা। তার ধারণা, তাঁর মাথা গরম, কিন্তু হৃদয় শীতল। একমাত্র শক্ত কোন শাস্তি পেলেই সে বুঝতে পারবে। পিতাকে তাই বলেছি আমি।' কথাগুলো বলার সময় কেমন কঠোর দেখাচ্ছিল দারাকে। হয়ত তার প্রাসাদে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে এখনো আওঙ্গজেবকে সত্যিকারভাবে ক্ষমা করতে পারেনি সে।

অন্তত নিকোলাস ব্যালান্টাইন আছে যার কাছে নিজের উদ্বিগ্নতা তুলে ধরতে পারে জাহানারা। যেমন করে নিজের কথার প্রতি সম্মান রেখে মুরাদের সম্পর্কে জানিয়েছে, তেমনি খোলামেলা আর বিশ্বস্ততার সাথে এবার আওরঙ্গজেব ও হিন্দুকুশের প্রতিবন্ধকতা নিয়েও চিঠি লিখেছে।

খুব দ্রুতই জাহানারার পাঠানো চিঠির উত্তরে আগ্রা দুর্গের মাঝে বাস করা নিকোলাস জানিয়েছে আওরঙ্গজেব ও অভিযানে ব্যর্থতার কারণ নিয়ে। শুধু যদি পত্রের মাঝে এমন কিছু খুঁজে পেতো যাতে করে নিজের ভাইকে আরো একটু ভালোভাবে বুঝতে পারত... চোখ মেলে আবারো চিঠির সবচেয়ে দুঃশ্চিন্তার অংশে চলে গেল মন—অভিযানের শুরুতেই ঘটে যাওয়া একটা খণ্ডযুদ্ধ নিয়ে নিকোলাসের বক্তব্য।

যদিও এই ওতপাতা যুদ্ধ অনেকগুলোর মাঝে মাত্র একটা—অপ্রত্যাশিত আর সচরাচর যেগুলো হয় সেগুলোর তুলনায় শক্তিশালী ছিল, আমাদের উচ্চমানের শৃঙ্খলা আর উন্নত ধরনের অস্ত্র বিজয় করে তোলে সুনিশ্চিত, অন্তত আমার তাই মনে হয়। আপনার ভাই একজন জাত যোদ্ধা—কোন কাপুরুষ নন এটা নিশ্চিত—নিজের দেহরক্ষীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন দুইশ গজ দূরে একটু চূড়া মতন জায়গা থেকে নিচে আমাদের উপর গুলিবর্ষণ করতে থাকা কাফিরদের দিকে। আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমার কয়েকজন সৈন্য নিয়ে চক্রাকার ব্যূহ গড়ে তুলি সাহায্য করার জন্য। চলার জন্য প্রস্তুত আমরা, তলোয়ার খাপ ছেড়ে বাইরে এসেছে, জোরে জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, ঘোড়ার খুরে কেঁপে উঠছে মাটি। আশা করছি যে কোন মুহূর্তে ইশারা করবেন শাহজাদা; পরিবর্তে তিনি এমন একটি কাজ করলেন যে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না আমরা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন আওরঙ্গজেব, ব্যাগ থেকে বের করলেন কিছু একটা। ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল একটি নামাজের জায়নামাজ। দেহরক্ষীরা চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালে পর ভূমিতে জায়নামাজ পেতে তার উপরে হাঁটু গেড়ে নামাজ পড়তে লাগলেন আওরঙ্গজেব। সামনে ঝুঁকে জায়নামাজে কপাল ঠেকিয়ে তারপর বারংবার উঠ-বোস। আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যের অবস্থান দেখে আমি নিজে বুঝতে পারলাম যে তখন সান্ধ্য নামাজের সময়।

ততক্ষণে আমাদের চারপাশে নাচানাচি শুরু করেছে উড়ন্ত গুলি আর তীর। আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম মৃত আর আহতদের মধ্যে

মারা গেছে শাহজাদার সৈন্য প্রধান। কিন্তু তাদের চিৎকারেও কোন প্রতিক্রিয়া হল না আপনার ভাইয়ের। তাড়াহুড়া না করে শান্তভাবে নামাজ পড়ে যেতে লাগলেন তিনি। শেষ হলে জায়নামাজ গুটিয়ে জায়গামত ব্যাগে রেখে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আক্রমণের আদেশ দিলেন, যেন মাঝখানে কিছুই ঘটেনি। তারপরেও শত্রুকে পিছু হটতে বাধ্য করেছি আমরা। সেই সন্ধ্যায় মোল্লারা, সবসময়কার মত সেনাবাহিনীর সাথে পথ চলছে, পাশাপাশি তাঁবু বানানো হয়েছে, শাহজাদার ধর্মানুরাগ আর সাহসের প্রশংসা করে জানাল যে এই দুইয়ের কল্যাণেই বিজয়ী হবেন তিনি। যাই হোক, অন্যরা সত্যিকার অর্থে আমি আর অশোক সিংও মর্মাহত হয়েছিলাম। যুদ্ধের ময়দানে একজন সেনাপতির নামাজ পড়তে বসে যাওয়া যতটা ধর্মীয় আর সাহসী ততটাই হঠকারীতাও বটে। বেহেশতে নিজের স্থান গড়তে যতটাই আগ্রহী হোন না কেন, তাঁর কোন অধিকার নেই পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ নিয়ে অপরিণামদর্শী হবার।

এরপর থেকে হতাশা বেড়ে যায় সবার মাঝে, বিশেষ করে আপনার স্বধর্ম নয় এমন সৈন্যদের মাঝে। আমার সন্দেহ আপনার ভাই জানতেন যে নিজের লোকদের বিশ্বাস হারিয়েছেন তিনি। ফলে দেখা গেল কর্মকর্তাদের আর কোন পরামর্শই চাইতেন না। স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে গিয়েছিল তাঁর আদেশগুলো—মাঝে মাঝে অযৌক্তিক—নিজের ইচ্ছে চাপিয়ে দিয়ে সৈন্যদের বিশ্বস্ততা আদায় করতে চেয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর মনোবল ধরে রাখতে সম্ভব সবকিছু করেছেন অশোক সিং, কিন্তু তার মৃত্যুর পরে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও বেশ দুঃখ পেয়েছি;; বারবার মনে হচ্ছে যদি কিছু করতে পারতাম তাকে রক্ষা করার জন্য। আমার মনে হয় আপনার ভাইয়ের মনে সন্দেহ জাগে যে দীর্ঘ আর বিপজ্জনক অভিযান জুড়ে সেনাবাহিনীকে একত্রে ধরে রাখার ক্ষমতা নেই তাঁর আর আমার বিশ্বাস এ কারণেই অভিযান পরিত্যগ করেছেন তিনি। আমি অন্যান্য যেসব সেনপ্রধানের অধীনে কাজ করেছি, তেমন নন তিনি; অত্যন্ত কঠোর আর শীতল তাঁর মনে কী আছে বলা কঠিন আর আমার ধারণা কিছু নিশ্চয় আছে।

নিজের বিক্ষত গালের উপর হাত বোলালো জাহানারা। আগুন লেগে গিয়ে পুড়ে যাবার পর সেই ভয়ানক দিনগুলিতে তাড়াতাড়ি করে দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসেছিল আওরঙ্গজেব অসুস্থ ভগিনীর পাশে থাকার জন্য। স্নেহময়ী এই ভাই-ই কি হয়ে গেছে নিকোলাসের ধারণানুযায়ী বহুদূরের, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত একজন মানুষ? এখন ভেবে ভেবে উপলব্ধি করল জাহানারা যে নিজের সম্পর্কে কত কম বলেছে আওরঙ্গজেব। একসাথে বহু সময় কাটানোর পরেও নিজের উচ্চাকাঙ্খা অনুভূতি নিয়ে কিছুই প্রকাশ করেনি তার ভাই। যেমনটা নিকোলাস বর্ণনা করল যদি সত্যিই আওরঙ্গজেব তেমন একজন মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে কী এমন ঘটেছে যে এমন বদলে গেল সে? মার্বেল বা গ্রানাইটের মত কোন তিক্ততার বীজ কি বয়ে চলেছে তার শিরায়, ঠাণ্ডা আর কঠিন, একেবারে গভীরে না খোঁড়া পর্যন্ত খুঁজে পাবে না তুমি? পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে আর একজন বোন যে কিনা তাকে ভালোবাসে— এটা তার দায়িত্ব যে খুঁজে বের করা... মায়ের কাছে দায়ী রইবে সে, কেননা যদি মা বেঁচে থাকতেন নিশ্চয়ই পুত্রের মনের মাঝে প্রবেশ করে সত্যি উদ্‌ঘাটন করতে পারতেন।

নিজের ডেস্কে পা ভাঁজ করে বসে কলম তুলে নিয়ে নিকোলাসকে চিঠি লিখতে শুরু করল জাহানারা।

> *চিঠির জন্য ধন্যবাদ। যদিও বেশ বেদনাদায়ক এটি আমার জন্য। কঠোর অনুশাসনের মাঝে থেকে যেমন আমি রয়েছি, কীভাবে একজন নারী পুরোপুরি বুঝতে পারবে যে কী আছে পুরুষের হৃদয়ে তাদের ভাবনা, অনুভূতি, সত্যিকারের বাসনা। আপনি যা জানিয়েছেন তাতে উদয় হয়েছে আরো অসংখ্য প্রশ্নের আর তাই আরো বিশদ না জানা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না আমি। আপনার সাথে আমার দেখা করার দরকার। আগেও যেমনটা এসেছেন তেমনিভাবে আগামীকাল সন্ধ্যায় আমার প্রাসাদে আসুন।*

মোমবাতির উপর মোমের টুকরো গলিয়ে লাল মোমের ছোট্ট একটা গলিত পুকুর দিয়ে চিঠির উপরে সিল বসিয়ে দিল জাহানারা। গলিত

মোমের উপর ব্যবহার করল মায়ের আইভরি সীলমোহর। নিজের সেবাদাসীকেই চিঠিটা দিত সে, কিন্তু সেই দাসীর কন্যা প্রথম দৌহিত্রের জন্ম দিয়েছে শহরে আর সেখানে বেড়াতে গেছে জাহানারার দাসী। এইবার তাই অন্য কারো উপর ভরসা করতে হবে।

'নাসরিন!' সেবাদাসীকে ডেকে পাঠালো জাহানারা। 'জলদি এসো। তোমার জন্য একটা কাজ আছে।'

যেমনটা প্রায়শই করে থাকে আজ সন্ধ্যাতেও বিরক্ত না করার আদেশ জারি করেছেন তার পিতা। কিন্তু হাতে মসৃণ আইভরি রঙের কাগজের টুকরোটা প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে রোশনারাকে।

'পিতার জন্য এমন তথ্য পেয়েছি যা অপেক্ষা করার মত নয়। রাজকীয় হারেম থেকে সম্রাটের গৃহে যাবার প্রধান প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে থাকা তুর্কী নারী প্রহরীকে জানালো রোশনারা। তুর্কী প্রহরী আঁটসাঁট চামড়ার ফতুয়া পরনে চওড়া কাঠ আর পেশীবহুল প্রহরীকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা পুরুষের মত। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে তারপর মাথা নত করে কুর্নিশ করল। ইশারা পেতেই রুপালি পালিশ করা জোড়া দরজা খুলে মেলে ধরা হল রোশনারার জন্য। লম্বা একটা করিডোরে মশালের আলোয় দেখা গেল শেষ মাথায় দ্বিতীয় জোড়া দরজা ও একইভাবে পাহারা দিচ্ছে তুর্কি হারেম প্রহরীরা।

প্রহরীদের নেতাকে সাথে নিয়ে ভেতরে ঢোকার আগে খানিকটা সময় নিল রোশনারা। টারকোয়েজ সিল্কের আলখল্লার প্রান্তদেশ গড়াতে লাগল মেঝের উপর। যাই হোক, এমনিতেই অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছে সে... বস্তুত এ চিন্তাও মাথায় এসেছিল যে হয়ত নাসরিন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আনতে পারবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত পুরস্কৃত হল ধৈর্য। অবশেষে এমন কিছু পেয়েছে সে যাতে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে জাহানারাকে আর পিতার কাছেও প্রমাণ হয়ে যাবে যে রোশনারার সন্দেহ অমূলক ছিল না।

প্রহরীদের নেতা দ্বিতীয় দরজার গায়ে কি কি করে খোজা হারেম প্রহরীকে জানালো যে পিতার কাছে জরুরি প্রয়োজনে এসেছেন শাহজাদী রোশনারা। অপেক্ষা করছে রোশনারা।

কয়েক মুহূর্ত পরেই যমুনার দিকে তাকিয়ে থাকা পিতার পরিচিত কামরাতে পা রাখল শাহজাদী। প্রায়ই রাতের মত আজ রাতেও ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন শাহজাহান। প্রায় পূর্ণচন্দ্রের আলোতে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যমুনার ওপারে মমতাজের সমাধিসৌধের দিকে।

'কী হয়েছে রোশনারা?' ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে, কিন্তু এত রাতে বিরক্ত করার জন্য কোন ভর্ৎসনা নেই কণ্ঠে।

'আমার মনে হয়েছে যে এটা আপনার দেখা দরকার পিতা।' কাগজের টুকরাটা বাড়িয়ে ধরল রোশনারা।

'কী-এটা?'

'নিকোলাস ব্যালান্টাইনের কাছে জাহানারার পত্র। গতকাল জাহানারা তার পরিচারিকা নাসরিনের কথা আগেও আপনাকে বলেছি আমি—ওকে জানিয়েছে গোপনে এটি নিকোলাসের কাছে পৌঁছে দিতে। এই পুরুষের সাথে তার মনিবানি গোপন কোন যোগাযোগ করছে আর সাহায্য করার দায়ে সেও অভিযুক্ত হবে, এই ভয়ে পত্রখানা এনে আমার হাতে তুলে দিয়েছে নাসরিন। প্রথমে আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কী করব। তারপরেই মনে পড়ে গেল যখন আপনাকে বলেছিলাম যে নিকোলাস জাহানারার প্রাসাদে তার সাথে দেখা করেছে আপনি বলেছিলেন আমি সঠিক কাজটিই করেছি। আমি তাই পত্রখানা খুলে ফেললাম। আশা আর বিশ্বাস ছিল যে কিছুই খুঁজে পাব না। কিন্তু স্বীকার করছি এর ভাষ্যে শোকাভিভূত হয়ে গেছি আমি। বুঝতে পেরেছি তৎক্ষণাৎ আপনার কাছে এটি নিয়ে আসা আমার দায়িত্ব।'

'কী বলেছে জাহানারা?'

'আপনার নিজেরই পড়া উচিত। এই যে।'

চিঠি হাতে নিয়ে কাছাকাছি জ্বলতে থাকা একটা মশালের নিচে এগিয়ে গেলেন শাহজাহান। পৃষ্ঠা জুড়ে নাচতে লাগল কমলা আলোর শিখা। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারলেন না যা পড়ছেন, চোখের সামনে নাচতে লাগল অক্ষরগুলো। অর্থহীন মনে হল। গভীরভাবে শ্বাস ফেলে নিজেকে স্থির করে আবারো চোখ রাখলেন শব্দগুলোর উপরে। এইবার কন্যার অভিজাত লেখনী—সবসময়কার মত হালকা নীল কালিতে

লেখা—বোঝা গেল পরিষ্কারভাবে, যদিও চিঠিটি ধরে রাখা হাতটা সমানে কাঁপছে।

কঠোর অনুশাসনের মাঝে থেকে, যেমন আমি রয়েছি, কীভাবে একজন নারী পুরোপুরি বুঝতে পারবে যে কী আছে পুরুষের হৃদয়ে—তাদের ভাবনা, অনুভূতি, সত্যিকারের বাসনা...আপনার সাথে আমার দেখা করা দরকার...'

মাথা নাড়লেন শাহজাহান। প্রেমিকের কাছে নারীর পাঠানো পত্র ব্যতীত আর কিছু কি হতে পারে এটা? কীভাবে নিজের আর তার বংশের মুখে এত বড় লজ্জার ছায়া ফেলতে পারল জাহানারা? চোখ বন্ধ করলেও সামনে ভেসে উঠল কন্যার চেহারা, আগুন লাগার আগে যেমন ছিল, ঠিক সেভাবেই হাসছে যেভাবে হাসত মমতাজ। পৃথিবীতে তাঁর সবচেয়ে প্রিয়তম জিনিস হারিয়ে গেছে—তাঁর স্ত্রী—এখন মেয়েটার ভাবনা চিন্তাহীন অপবিত্র কর্মকাণ্ডের ফলে হারাতে চলেছেন জাহানারাকে... কিছুক্ষণের জন্য আঙুল দিয়ে চেপে ধরে রাখলেন চোখ জোড়া, যেন এমন করলেই মন থেকে ভেসে যাবে ছবিগুলো।

'আব্বাজান, আপনি ঠিক আছেন?'

কথা বলার জন্য যুদ্ধ শুরু করলেন যেন শাহজাহান, আবেগের ভারে জড়িয়ে আছে শব্দগুলো। শোক আর সন্দেহ ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথার মাঝে; কিন্তু চিঠির কথাগুলো ভুলে গিয়ে অনুভব করলেন ভিন্ন একটি জিনিস—বহু বছর ধরে এমন উন্মত্তের মত আর রেগে যাননি, সম্ভবত জিম্মি হিসেবে মেহরুন্নিসা তার দুই পুত্রকে চাইবার পর থেকে আর নয়। সেসব দিনে কিছুই না করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আর নয়—তিনি একজন সম্রাট। যার একটা কথাই একশ মিলিয়ন লোকের কাছে জীবন আর মৃত্যুর সমান। কেউ না—এমনকি অসম্ভব ভালোবাসার পাত্রী কন্যাও নয়—সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাঁর ক্রোধের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

চোখ মেলতেই দেখতে পেলেন চেহারায় মুচকি হাসি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে রোশনারা। হাসির মত কিছু তো হয়নি। রোশনারার কাঁধে অসম্ভব নম্রভাবে হাত রেখে নিজের দিকে টেনে আনলেন সম্রাট। ফলে নিজের থেকে মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরে রইল কন্যার মুখ। এই চিঠি সম্পর্কে আর কেউ কিছু জানে?

মাথা নাড়লো রোশনারা। হাসি মুছে গেল চেহারা থেকে।

'না। শুধু আমিই পড়েছি আর কাউকে জানাইওনি।'

'ভালো। তো এভাবেই থাকবে। আমি চাই না যে দরবারে তোমার ভগিনীকে নিয়ে রটনা ছড়াক। নিজের গৃহে ফিরে যাও আর এমন আচরণ কর যেন কিছুই ঘটেনি। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝতে পেরেছি, আমি।' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিল রোশনারা। ভেবেছিল যে পিতা রেগে গিয়ে চিৎকার শুরু করবেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল প্রায় বিলম্বিত ধরনের আর চোখ জোড়া পুরোপুরি শীতল। প্রথমবারের মত উপলব্ধি করল যে যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাকে কতটা নির্দয় দেখায় অথবা দরবারে যখন কারো বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেন। কী করেছে ভাবতে পেরে প্রায় অনুতপ্ত হয়ে পড়ল রোশনারা। সে তো শুধু চেয়েছিল পিতার চোখে জাহানারাকে হেয় করতে যেন আওরঙ্গজেবের জন্য যে নিন্দা করেছে সে শাস্তি পেয়ে যায় তার বোন। এখন ভেবে আতংকিত হয়ে উঠছে যে কী দুর্ভোগ ডেকে এনেছে জাহানারার উপর।

'শাহজাদী, দয়া করে, উঠুন।'

বিস্মিত হয়ে চোখ খুলতেই সাত্তি আল-নিসার উদ্বিগ্ন চেহারা তার উপর ঝুঁকে আছে দেখতে পেল জাহানারা। 'কী হয়েছে? আব্বাজানের কিছু হয়েছে?'

'না, সেরকম কিছু না। এটা আপনার ব্যাপারে। কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আপনার সঙ্গে। আলো ফোটার সাথে সাথেই সম্রাট আপনাকে দুর্গে ডেকে পাঠাবেন মনস্থির করেছেন, আপনার বক্তব্য শোনার জন্য।'

'মানে কী? এমনভাবে কথা বলছ যেন পিতা সন্দেহ করছেন যে আমি কোন অপরাধ করেছি।' উঠে বসে মুখমণ্ডল থেকে লম্বা কেশরাজি সরিয়ে দিয়ে সাত্তি আল-নিসার কথার অর্থ বুঝতে চাইল জাহানারা।

'ঠিক তাই, শাহজাদী। যদি আজ রাতে হারেমে যা শুনেছি তা সত্যি হয় তাহলে ইংরেজ লোকটাকে লেখা আপনার চিঠি পেয়ে গেছেন তিনি।'

'নিকোলাস ব্যালান্টাইনের কাছে লেখা আমার চিঠি? পিতা কীভাবে পেয়েছে এটা?'

'আমার পুরোন একজন বান্ধবী জানিয়েছে যে আপনার পরিচারিকা নাসরীন দাবি করছে যে আপনি তাকে একটা চিঠি দিয়েছেন ইংরেজ লোকটার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য; কিন্তু এর পরিবর্তে সম্রাটের কাছে পৌঁছে দিয়েছে সে। নাসরিন বলছে যে লোকটা আপনার প্রেমিক আর বিনিময়ে মূল্যবান পুরস্কার পেতে যাচ্ছে সে।

'আমার প্রেমিক...' হতভম্ব হয়ে সাত্তি আল-নিসার হাত চেপে ধরল জাহানারা। 'কিন্তু এটা তো সত্যি না। কেউ কীভাবে এরকম একটি বিষয় ভাবতে পারে... চিঠিতে এ জাতীয় কিছুই ছিল না। আমি যা বলেছি তা হল আমি আওরঙ্গজেব সম্পর্কে তার সাথে কথা বলতে চাই... উত্তরের অভিযান সম্পর্কে যেন বুঝতে পরি আর কী এমন ঘটল যাতে আমার ভাই এরকমটা করল।'

এখনো মাথা ঘুরছে, এই অবস্থায় উঠে দাঁড়াল জাহানারা। বেশ গরম পড়েছে বাইরে। তারপরেও প্রথমবারের মত হতাশায় মুষড়ে পড়ে চমকে গিয়ে ভাবলো যে অন্যরা কী ভাবছে তাকে নিয়ে। এত পরিণামদর্শী কীভাবে হল সে? কিন্তু এটাও কখনো আশা করেনি যে তার কোন ভৃত্য এতটা ছলনাময়ী হবে। যাই হোক, নিজেকে শান্ত করতে চাইল জাহানারা, আব্বাজান যখন বুঝতে পারবেন যে ভাইকে নিয়ে উদ্বিগ্নতার কারণেই এমনটা লিখেছে সে তাহলে নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করে দেবেন... আর ক্ষমা করার কিই বা আছে সেখানে?

'আমার এখনি পিতার কাছে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলা দরকার।'

'না! সাবধান শাহজাদী। আমি যদিও বহু বছর ধরে শ্রদ্ধা করে আসছি আপনার পিতাকে—এমনকি তিনি সম্রাট হবারও আগে থেকে—তাঁর ক্রটি সম্পর্কে অন্ধ হতে পারব না। আপনার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে যে তিক্ততা তৈরি হয়েছে তাঁর মনে, তা এখনো পুরোপুরি যায়নি। নিজের ভেতরে ডুবে গেছেন তিনি। আর সবসময়ে যুক্তি মেনে কাজ করেন না। সব সন্তানের মাঝে আপনাকে আর দারাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন—এটা তো সবারই জানা—কিন্তু যদি অনুভব করেন যে আপনাদের মাঝে কেউ একজন, তাঁর সবচেয়ে

প্রিয়জন কোনভাবে তাঁকে হেয় করেছেন তাহলে ক্রোধের মাত্রা ও সীমা ছাড়িয়ে যাবে। মনে রাখবেন অন্য বোনদের চেয়েও হীন হয়ে যাবেন আপনি।'

জাহানারার হাত ধরল সাত্তি আল নিসা। 'মততাজের মৃত্যুর পর যখন অন্য ভাই-বোনদের মাতৃছায়া দিতে চেয়েছেন আপনি, আমি চেয়েছি আপনাকে মাতৃছায়া দিতে। আর এই ভূমিকা পালন করতে এসেছি আমি আজ রাতে। পরামর্শ দিয়ে সতর্ক করে দিতে। দুর্গে যাবার তাগাদা করে কোন লাভ হবে না। পিতার রাগ প্রশমিত হবার সময় দিন, একই সাথে নিজেও ভাবুন যে কী বলবেন।

ঠিকই বলেছে সাত্তি আল-নিসা, ভাবলো জাহানারা। সে যখন ছোট ছিল ঠিক তখনকার মত করে মাথায় আদুরে ভঙ্গিতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল এই বয়স্কা নারী। কিন্তু হঠাৎ করেই আরেকটা চিন্তা মাথায় আসতে ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল শাহজাদী।' যদি পিতা আমার সাথেই এত রেগে গিয়ে থাকে তাহলে নিকোলাস ব্যালান্টাইনকে নিয়ে কী ভাবছে? তাকে মেরে ফেলবে নিশ্চয়... নিকোলাসকে সতর্ক করে দেয়া দরকার।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আর চিঠি নয়। আমাকেই আপনার বার্তাবাহক হতে দিন। আপনাকে সব বলা হয়ে গেছে যা পেরেছি এখন আমি দুর্গে ইংরেজ লোকটার গৃহে গিয়ে সব জানাব। অনেক দিন থেকেই আমাকে চেনে, তাই যা বলব শুনবে।'

'তাকে জানিয়ে দিও এখনি যেন আগ্রা ছেড়ে চলে যায় আর ছদ্মবেশে যতদূরে সম্ভব তত দূরে, পারলে সুরাট থেকে ইংরেজদের আবাসন থেকে জাহাজে করে নিজ মাতৃভূমে।' এক মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে ভেসে উঠল এলোমেলো সোনালি চুলে ঢাকা নিকোলাসের সহৃদয় মুখখানা। উত্তরে যাবার আগে আশ্বস্ত করেছিল যে যোগাযোগ বজায় রাখবে জাহানারার সাথে। তাদের সবার জীবনেই বিশ্বস্ততার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল লোকটা; কিন্তু জহানারার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কারণে আজ তার জীবন সংশয় দেখা দিয়েছে। 'আর তাঁকে জানিয়ো যে আমি দুঃখিত... ওনার কোন দোষ নেই। যাও, সাত্তি আল-নিসা, এখনি যাও! প্রার্থনা করব যেন ইতিমধ্যে দেরি না হয়ে যায়।'

'আর এক পাও এগোবে না।'

ব্যক্তিগত দর্শনার্থীদের কক্ষে মুক্তো দিয়ে সেলাই করা সবুজ সিল্কের শামিয়ানার নিচে রুপার তৈরি সিংহাসনে বসে আসেন শাহজাহান। অ্যামব্রয়ডারী করা শক্ত আলখাল্লা, গলায় রুবি ও পান্না বসানো হার, আঙ্গুলে দ্যুতি ছড়ানো আঙটি দেখে জাহানারা বুঝতে পারল যে কতটা সাবধানে এই সাক্ষাৎকারের জন্য তৈরি হয়েছেন তিনি। পিতাকে খুব ভালো করেই চেনে জাহানারা। জানে যে রাজকীয় জাঁকজমকের পেছনেই তিনি লুকিয়ে রাখেন নিজের হতাশা অথবা আঘাতকে। পুরো কক্ষে আর কেউ নেই। সবগুলো দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে বেশ শক্তভাবেই। তারপরেও জাহানারার মনে হল যে পিতার পাশাপাশি যেন পুরো দরবার তাকিয়ে আছে তার দিকে বিচারকের দৃষ্টিতে।

'আব্বাজান, আপনি বুঝতে পারেননি...

'চুপ! অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত একটাও কথা বলবে না তুমি।' জাহানারা এত কাছে দাঁড়িয়ে ছিল যে স্পষ্ট দেখতে পেল শাহজাহানের অপলক চোখের পাশের টানটান চামড়া, কুঞ্চিত মুখমণ্ডল, বুকের উপর হাপরের মত ওঠানামা করছে রত্নের সারি সিংহাসনের হাতলে সিংহের মাথার উপর দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাত। পিতার মুখ থেকে ছিটকে বের হওয়া শব্দ আর অভিব্যক্তির তীব্রতায় দুঃখিত হয়ে মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নিল জাহানারা।

'তো লজ্জায় আমার সামনে মাথা নামিয়ে নিতে পারো তুমি। কিছুদিন আগে আমি শুনেছি যে নিকোলাস ব্যালান্টাইনকে নিজের প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে তুমি। যেহেতু তোমাকে বিশ্বাস করি, ধরে নিয়ে ছিলাম যে এর কারণ অসাধু কিছু নয়। তোমার সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করতে চাইনি আর তাই মন থেকে দূর করে দিয়েছিলাম এই চিন্তা। এখন বুঝতে পারছি যে ভুল করেছিলাম। অন্তত বছর দুয়েক ধরে তুমি ইংরেজ পরস্পরের মাঝে আর পত্র বিনিময় করছ আর এগুলো মোটেই সরল কিছু নয়!'

আলখাল্লার ভেতর হাত ঢুকিয়ে জাহানারার সাম্প্রতিক চিঠিটা বের করে মেঝের উপর ছুড়ে ফেললেন শাহজাহান।

'তুমি, একজন রাজকীয় মোগল শাহজাদী, সাম্রাজ্যের সম্মানীয়া শীর্ষস্থানীয় নারী; একজন পুরুষকে অনুভূতি আর বাসনার কথা লিখছ... পূর্বপুরুষদের দিন হলে তৎক্ষণাৎ তোমাকে হত্যা করা হত পরিবারের উপর কলঙ্ক লেপনের দায়ে। জাহানারা... কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল খানিকটা, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, যা চেয়েছ সব দিয়েছি... এমনকি নিজের প্রাসাদও ... আর এইভাবে প্রতিদান দিয়েছ তুমি।'

জাহানারার ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলে ওঠে যে, একমাত্র তুমিই অসদাচরণ করেছ সবসময়, আমি নই। কিন্তু জানে যে সে বলতে পারবে না কথাগুলো। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টায় ডান হাতের নখ ঢুকিয়ে দিল বাম হাতের তালুতে।

'সারারাত নিজের ঘরে বসে বিস্ময় নিয়ে শুধু এটাই ভেবেছি যে কী হতে পারে এই অপরাধের শাস্তি—আর আমার চোখে এটি একটি জঘন্য অপরাধ। শুধুমাত্র একটা জিনিসই আমাকে থামিয়েছে কোন নিষ্ঠুর পদক্ষেপ না নিতে—

জানি যে শারীরিক ক্ষতচিহ্ন বহন করছ তা ছিল আমারই অপরাধ। আমার কারণেই নিজের খানিকটা সৌন্দর্য হারিয়েছ তুমি আর এই কারণেই ভুলে গেছ সত্যিকারে তুমি কী আর কামনা করছ পুরুষের স্পর্শ, তা যতটা অমূলক আর অসম্মানেরই হোক না কেন। এটাই বারেবারে নিজেকে বলতে চাইছি, কেননা শত চেষ্টা করেও—এখনও চেষ্টা করছি—তোমার এই অধঃপতনের কোন অজুহাত খুঁজে পাচ্ছি না। পরবর্তী কোন সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত দুর্গের মাঝে রাজকীয় হারেমে অবরুদ্ধ থাকবে তুমি। আর নিকোলাস ব্যালান্টাইন, আজ প্রভাতেই তাকে আটক করার জন্য আদেশ দিয়েছিলাম আমি, কিন্তু আমার প্রহরীরা যেতে যেতে পালিয়ে গেছে সে.... এটা কোন সরল মানুষের মত কর্ম নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো তুমি—তাকে খুঁজে আগ্রায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে আর বন্য ঘোড়া দিয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলব আমি।' সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে জাহানারার কাছে গেলেন শাহজাহান। মুখে এঁটে আছে অভিব্যক্তিহীন মুখোশ। 'আমি যা বলার ছিল তা বলেছি, এখন তুমি কথা বলতে পারো।'

মুখ খুললো জাহানারা। কিন্তু নিকোলাস আর আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার ইচ্ছেটাই উবে গেল মন থেকে। কী লাভ তাতে? আগুনে পোড়া ক্ষতও তাকে এতটা আঘাত করেনি, যতটা গভীরভাবে আজ আহত হয়েছে পিতার আচরণে। এতটা দূর থেকে আর স্বৈরশাসকের মত তার বিচার করা হয়েছে যেন সুজনে অচেনা মানুষ টেনে আনা হয়েছে সম্রাটের সামনে আর যেখানে তাঁর নিজেরই চরিত্র এত দুর্বল সেখানে এমনটা করার মানে কিছু নেই। লজ্জিত হবার মত কিছুই করেনি সে। এর বিপরীতটাই করেছে বরঞ্চ।

নিজের স্বার্থপর বাসনা চরিতার্থের বদলে চেষ্টা করেছে পরিবারকে এক সুতোয় গেঁথে রাখার। পিতার সামনে কখনোই নত হবে না সে। অথবা যতটুকু পেরেছে নিকোলাসের নিরাপদ পলায়নের ব্যবস্থা করেছে, তাই কোন অনুনয়ও করবে না সে। যদি জাহানারা সম্পর্কে এত নগণ্য বিশ্বাস থেকে থাকে তার তবে সে মতই হোক। যা কিছুই ঘটুক না কেন নিজের অহংকার আর সম্মান বজায় রাখবে সে। আর কোন একদিন আবারো তার কাছে ক্ষমা চাইবে পিতা।

পিঠ সোজা করে দাঁড়াল জাহানারা। 'আমি আপনাকে বা আমাদের পরিবারকে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিজেকে অসম্মানিত করার মত কিছু করিনি। আমার সর্বময় বিচারক আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি। এবার আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।'

জাহানারার চোখে জ্বলে উঠল আত্মপ্রত্যয়ের আলা। 'কিন্তু একটা ব্যাপার আমি অবশ্যই জানতে চাইব, কে আমার চিঠি আপনার কাছে নিয়ে এসেছে?'

'এমন কেউ আমাদের পরিবারের সম্মানের প্রতি যে তোমার চেয়েও বেশি শ্রদ্ধাশীল। তাদের পরিচয়ে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। এখন যাও।'

পিতা কন্যা দু'জনেই একে অন্যের দিকে থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। দু'জনেরই চোখে পানি—ক্রোধ, বিশ্বাসঘাতকতা আর কিছু একটা হারানোর বেদনা একাকার হয়ে মিশে গেল।

অধ্যায়-১৬

যমুনার তীরে মমতাজের সমাধির ঠিক বিপরীত পাশে নিজের চন্দ্র আলোর উদ্যান মাহতাব বাগের বারান্দায় অনেকগুলো পিলারের একটির গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন শাহজাহান। অল্প কয়েকটা জায়গার মাঝে এটি একটি, যেখানে মোম-সাদা চম্পা ফুল আর কমলা গাছগুলোর মাঝে শান্তি খুঁজে পান তিনি। এরকম রাতে প্রায় মনে হয় যেন ঠিক মমতাজ নিজে তাঁর পাশে বসে আছে। ছেলেমেয়েদের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কী বলত মমতাজ? কিন্তু নির্বোধের মত হয়ে গেল প্রশ্নটা—যদি মমতাজ বেঁচে থাকত তাহলে পিতার কাছ থেকে এত দূরে চলে যেত না তারা অথবা একে অন্যের কাছ থেকে আর হয়ত অন্য রকম হয়ে উঠত তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

গত বেশ কয়েকদিনের মত মন চলে গেল আবারো জাহানারার দিকে। রাজকীয় হারেমে জাহানারাকে সপ্তাহখানেকের মত অবরুদ্ধ করে রাখার পর প্রাথমিক উষ্মাটুকু অনেকটা কমে গেছে শাহজাহানের মন থেকে। কিন্তু নিকোলাস ব্যালান্টাইনের সাথে তার আচরণকে কখনোই ক্ষমা করতে পারবেন না তিনি। নিজের সব ছেলেমেয়েদের মাঝে একমাত্র জাহানারার সম্পর্কেই ভাবতেন যে কন্যাকে বুঝতে পারেন তিনি। বিশ্বাস করতেন আগুন লেগে যাবার পূর্বে তাদের মাঝে যে বন্ধন ছিল সেটির পুনর্জন্ম হয়েছিল আবার। এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ভ্রমের মাঝে বাস করেছেন তিনি। সত্যি দেখতে পাননি। তাই দেখেছেন যা দেখতে চেয়েছিলেন। বয়স এসে দেহে বাসা বাঁধলেই কি মানুষ এমন

করে? রোশনারা বা গওহর আরা এমনটা করলেও এতটা কষ্ট পেতেন না তিনি, যতটা পেয়েছেন জাহানারার বেলাতে। যদিও কনিষ্ঠ কন্যাদেরও একইভাবে স্নেহ করেন তারপরেও একই নয় তারা। জাহানারার অভাব বোধ করছেন তিনি... তার প্রতিদিনের দেখতে আসা, সাহচর্য আর বুদ্ধিমত্তা।

যাক, অন্তত আর কিছুদিনের মাঝেই গোয়ালিওরের কাছে গ্রেট ট্রাঙ্ক রোডে নতুন দুর্গ নির্মাণের কাজ পরিদর্শন শেষে ফিরে আসছে দারা। কেমনভাবে বোনকে নিয়ে এই রটনা মেনে নেবে সে? অন্য তিন পুত্রের বেলাতে বলতে গেলে কাউকেই গত কয়েক মাসের মাঝে দেখেননি তিনি। আওরঙ্গজেব এখনো দাক্ষিণাত্যে। একগুয়েমী অহংকার আর পৃথিবী সম্পর্কে কঠোর মনোভাবের আত্মবিশ্বাস নিয়েও নিজেকে একজন পরিশ্রমী ও দক্ষ প্রশাসক হিসেবে প্রমাণ করেছে সে। যদিও তার পাঠানো প্রতিবেদনগুলো বেশ সংক্ষিপ্ত আর তথ্যবিহীন। সমৃদ্ধশালী দক্ষিণাঞ্চল থেকে মসৃণ গতিতে কর এসে পৌঁছাচ্ছে মোগল রাজকোষে আর এই মুহূর্তে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত বেশ শান্তই আছে বলা চলে। সম্রাট এই ভেবে খুশি যে তৃতীয় পুত্র অবশেষে উত্তরের অভিযানের ব্যর্থতা পিছনে ফেলতে সমর্থ হয়েছে। এখন পিতারও উচিত তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোন সম্মানের ব্যবস্থা করে দরবারে ডেকে পাঠানো তা গ্রহণ করার জন্য। আওরঙ্গজেব এখনো দাবি করে যে পিতা তাকে ভালোবাসে না...এটা তো সত্যি হয় আর একরোখা পুত্রের কাছে তাই এর প্রমাণও করে দেবেন তিনি...'

এছাড়া শাহ সুজাকেও দরবারে ডেকে পাঠাবেন তিনি পুরস্কৃত করার জন্য। কেননা শান্তিময় ও সমৃদ্ধশালী বাংলার ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে দক্ষতা দেখিয়েছে সে; যদিও তার পাঠানো পত্রগুলোও আওরঙ্গজেবের ন্যায় ভাসাভাসা আর সংখ্যায় অনিয়মিত। সত্যিকারের দাবিদার হয়ত শাহ সুজার কঠোর পরিশ্রমী কর্মচারী, তার পরেও পুত্রের সাথে আবার দেখা হলে মন্দ হয় না। মুরাদকেও শীঘ্র আগ্রায় ডেকে পাঠাতে হবে। ভাইদের মত প্রশাসক হিসেবে তেমন সুবিধে করতে পারছে না সে। মাত্র গত সপ্তাহেই, গুজরাটের বিশ্বস্ত ও সৎ রাজস্বমন্ত্রী আলী নকী ব্যক্তিগত এক পত্রে সম্রাটকে জানিয়েছে যে—শ্রদ্ধা বজায় রাখলেও সত্যিকারভাবে

শাহজাহান নিজে মুরাদকে নির্দেশ দিয়েছেন যে সুরাটের ইংরেজ বণিকদের উপর যেন অধিক হারে কর ধার্য করা হয়। কিন্তু বিদেশীরা শাহজাদাকে মূল্যবান সব উপহার এনে দিচ্ছে আর শাহজাদাও তার প্রদেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা না করেই যথেচ্ছ অপচয় করছে। গঠনমূলক এই সমালোচনা কীভাবে নেবে মুরাদ? প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে মুরাদ এখনো অপরিপক্ক রয়ে গেছে—যদি তার লিখিত পত্রে সুরাটের ব্যবসায়ীদের প্রতি আচরণের পক্ষে সাফাইগুলোকে বাদ দেয়া যায় উত্তরের অভিযানের ব্যর্থতার পরেও তর্জন-গর্জনে ঢেকে রাখতে চায় নিজের অদক্ষতা।

চোখ বন্ধ করে ফেললেন শাহজাহান, অবসন্ন বোধ করছেন; ইদানিং যা প্রায়শই করে থাকেন। কয়েক ঘণ্টার পশু শিকার বা পাখি শিকারেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সেসব দিন বহু আগেই গত হয়েছে যখন শত শত মাইল ঘোড়া ছুটিয়েও প্রাণশক্তি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যেতেন পূর্বপুরুষের তলোয়ার আলমগীর নিয়ে। হয়ত মধ্যবয়সের এই বয়সে এসে এটাই স্বাভাবিক। শীঘ্রই দারার হাতে তুলে দেবেন এই তলোয়ার—জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতেই মানাবে এটি, 'বিশেষ করে দারা নিজেই এখন পুত্রদের জনক। সুলাইমান একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার আর বন্দুকবাজ; একই সাথে পিতার মত ভাবুক আর বিদ্বানও বটে। ছোট সিপির মোগল মাতা নাদিরার মতই হাসিখুশি আর বুদ্ধিমান। রাজপরিবারের রক্ত সুদৃঢ়তার সাথে বয়ে চলেছে তাদের শিরাতে।

শাহ সুজা, মুরাদ আর আওরঙ্গজেব তিনজনেই পুত্রেদের জনক; যদিও তিনি তাদের তেমন দেখেননি। যদি তারা আগামীকাল দরবারে আসে হয়ত তাদেরকে চিনতেও পারবেন না। সত্যিই পরিতাপের বিষয়। তাদের সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে চান তিনি, যেন তারাও তাঁর কাছ থেকে কিছু শিখতে পারে, যেমনটা তিনি শিখেছিলেন নিজের পিতামহ আকবরের কাছ থেকে। এ ভাবনা থেকেই মনে পড়ে গেল যে অনেক দিক থেকেই আকবরের মত হয়েছে দারা। প্রসন্ন হয়ে উঠল মন এই ভেবে যে আর বেশিদিন দূরে থাকবে না দারা।

পেঁচার ডাক শুনে চোখ মেলে তাকালেন শাহজাহান। আকাশের গায়ে দেখতে পেলেন পাখিটার আবছা আকৃতি। কত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে

নক্ষত্র-খচিত স্বর্গ, যা বড় ভালোবাসতেন প্রপিতামহ হুমায়ুন। বারান্দা থেকে নেমে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন সেই অপূর্ব সৌন্দর্য অবলোকন করতে। কিন্তু হঠাৎ করেই দুলে উঠল চারপাশের পৃথিবী। তারার দল এসে পড়ল পায়ের কাছে আর আকাশে মনে হল ফুটে আছে ফুল আর ঝরনা। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরতে চেষ্টা করলেও খুঁজে পেলেন না। পরিবর্তে গড়িয়ে পড়ে যেতে লাগলেন সামনের দিকে... শুনতে পাচ্ছেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে হালকা সব কণ্ঠস্বর। ঘন কুয়াশা এসে ঘিরে ফেলল সবকিছু।

'হাকিমেরা কী বলেছে? দয়া করে আমাকে সব বলো রোশনারা...' বোনের চেহারা দেখে দুরুদুরু করে উঠল জাহানারার বুক।

'তারা নিশ্চিত নয় যে সমস্যাটা কোথায়; কিন্তু এটুকু জানিয়েছে যে, শরীর আর মনের দিক থেকে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছেন পিতা। হাকিমেরা এর জন্য দায়ী করছে দায়িত্বের বিশাল বোঝাকে, বিচার কাজের জন্য দীর্ঘ সময় জনসাধারণের দর্শনকক্ষে বসে থাকা....ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যক্তিগত উপদেষ্টা আর সেনাপ্রধানদের সাথে কাটানো ...। আর সাম্প্রতিক সময়ে আরো অন্যান্য উদ্বিগ্নতা...'

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও কিছু বললো না জাহানারা। দুর্গের হারেমে অবরুদ্ধ হবার পর এই প্রথম তার সাথে দেখা করতে এসেছে রোশনারা। প্রথমে তো অবাক হত এই ভেবে যে শাহজাহান হয়ত বোনদেরকেও মানা করে দিয়েছেন যেন জাহানারার সাথে দেখা না করে। কিন্তু সাত্তি আল-নিসা জানিয়েছে যে এরকম কিছু ঘটেনি। তাই সন্দেহ নেই যে কনিষ্ঠ ভগিনীদ্বয় নিজেরাই তার সাথে দেখা করতে আগ্রহী নয়। অবশেষে এবার রোশনারা আসাতে এমন কিছু করতে চায় না জাহানারা যাতে চলে যায় রোশনারা, বিশেষ করে যখন পিতার কী হয়েছে পুরোপুরি জানা দরকার। 'কতটা খারাপ অবস্থা? সুস্থ হতে কত সময় লাগবে বলে মনে করে হাকিমেরা? সুস্থ হবেন তো, তাই না?'

'চিকিৎসকেরাও এটাই বিশ্বাস করে যদিও বলছে যে সময় লাগবে। তাদের একজন পুরোন আলী করিম পরামর্শ দিয়েছে যে পিতা একটু শক্ত

হলেই উত্তরে লাহোরে নিয়ে যেতে, প্রশান্ত বাতাসে ভালো বোধ করবেন। যদি যাওয়া হয় তাহলে আমি সঙ্গে যাবো—দারাও। পিতার অসুস্থতা জানানো হয়েছে তাকে, যত দ্রুত সম্ভব আগ্রায় ফিরে আসছে।' পোশাকের হাতায় কাজ করা ভারী অ্যামব্রয়ডারিতে হাত বুলালো রোশনারা।

'আর অন্য ভাইয়েরা? তাদেরকে পত্র দিয়েছ তুমি?'

'না, এখনো না। তাদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না আমি। আমার ধারণা পিতার অবস্থা আরো খানিকটা পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। তাহলে পাঠানোর মত ভালো সংবাদও পাওয়া যাবে।'

হাতায় হাত বুলাতে বুলাতে ভাবতে লাগল রোশনারা যে কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। সাথে সাথে চিঠি লিখেছে আওরঙ্গজেবের কাছে। এছাড়াও দরবারে ঘটে যাওয়া অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কেও তাকে জানিয়েছে রোশনারা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে আওরঙ্গজেব—হারেমে স্ত্রীদের কাছে স্বামীদের শত্রুতা, গোপন উচ্চাকাঙ্খা, দুর্বলতা আর মিত্রতা সম্পর্কে যা যা জেনেছে সব জানিয়েছে আওরঙ্গজেবকে। কারো কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে রোশনারা—জীবনে আর কখনো এর স্বাদ পায়নি আগে। দারা আর পিতার মতই, অন্তত আওরঙ্গজেবও বুঝতে পারছে যে তাকে কতটা মূল্য দেয়া উচিত।

খানিকক্ষণের জন্য চুপ করে রইল দুই বোন। দু'জনেই বুঁদ হয়ে রইল নিজস্ব চিন্তায়। নীরবতা ভাঙ্গলো জাহানারা, 'তোমাকে দেখে ভালো লাগছে রোশনারা। কেমন ছিলে তুমি? ... আর গওহর আরা? সাত্তি আল-নিসা জানিয়েছে যে গত সপ্তাহে দু'জনে একসাথে মাহফিল করেছিলে?'

'আমরা দু'জনেই ভালো আছি। নাদিরা গওহর আরাকে বেজী উপহার দিয়েছে। বাঁশির সুর শুনতে পেলেই পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে সুর শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘুরতে থাকে।' দরজার দিকে তাকাচ্ছে রোশনারা। পরিষ্কার বোঝা গেল যে চলে যেতে চাইছে।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না জাহানারা। 'কেন আমরা এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা বলছি? তুমি আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ না যে কী হয়েছিল নিকোলাস ব্যালান্টাইন আর আমাদের মাঝে। তুমি সত্যি

জানতে চাও না? যদিও পিতা আমার কথা শুনতে চাননি কিন্তু এটা ভেবে কষ্ট লাগছে তুমি, গওহর আরা আর ভাইয়েরাও আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাববে। মায়ের স্মৃতির নামে শপথ করে বলছি যে এরকমটা ভাবার কোন কারণ নেই। আমি নিরপরাধ। আমার সরলতাটুকু বুঝিয়ে বলো তাদেরকে। আমার পক্ষ নাও।'

'কেন তোমার মিথ্যে বহন করব আমি?'

'রোশনারা!' বোনের দিকে তাকিয়ে রইল জাহানারা। চমকে গেছে তার গলার স্বর আর চোখের কঠিন দৃষ্টি দেখে। 'আমি কখনো আব্বাজান বা তোমার কাছে মিথ্যে বলিনি। যেমনটা তাঁকে জানিয়েছি, লজ্জিত হবার মত কিছু করিনি আমি। নিকোলাস ব্যালান্টাইনের সাথে আমার সম্পর্কে কোন অপরাধ নেই।'

'কীভাবে একথা বল তুমি? তার কাছে লেখা তোমার নির্লজ্জ শব্দগুলো দেখেছি আর আমি ...' চুপ হয়ে গেল রোশনারা কিন্তু বহু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

কাছে এসে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জাহানারা। স্পষ্ট দেখতে পেল একটু ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেছে হতাশা।

হঠাৎ করেই বুঝতে পারল...

'তুমিই কি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ? নাসরিন আমার লেখা চিঠি নিকোলাসের পরিবর্তে তোমার কাছে নিয়ে এসেছে?'

কিছুই বলল না রোশনারা। জাহানারা, ইচ্ছে হল সজোরে একটা চড় কষিয়ে দেয় বোনের মসৃণ, গোলাকার মুখখানায়। বোনের সাথে সাথে নিজের উপরেও রাগ হল তার। মনে হল কৌতূহলী নাসরিন নিশ্চয়ই চিঠিটা খুলে পড়ার লোভ সমলাতে পারেনি আর পড়ার পরেই পুরস্কারের সুযোগও পেয়ে গেছে। কিন্তু নাসরিনই প্রথম না যে রাজকীয় গৃহস্থালিতে থাকার সুযোগ নিয়ে প্ররোচনামূলক কাজে আগ্রহী হয়েছে। কিন্তু এটা কখনোই তার মাথায় আসেনি যে অন্য কারো হয়ে কাজ করছে নাসরিন... আর কেউ না, তার নিজের বোন! 'এই পরিকল্পনা তোমার, তাই না? এই কারণেই নাসরিনকে গৃহকর্মে নিতে তাগাদা দিয়েছিলে আমাকে... তোমার চর হিসেবে কাজ করার জন্য। কেমন করে করলে এরকম একটি কাজ? আর যদি সে আমার চিঠি তোমার কাছে এনে দিয়েও থাকে তাহলে

পিতার কাছে নেয়ার আগে আমার কাছে এলে না কেন? আমাকে ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগই দাওনি।'

'না, এটা আমার পরিকল্পনা নয়। দুর্গে এলে নাসরিন আমার সাথে কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক আর তোমার চিঠি দেখার পরে ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনই ছিল না। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছি পিতার কাছে নিয়ে যাওয়াটাই ছিল আমার দায়িত্ব।'

রোশনারা ঘুরে দাঁড়াল; কিন্তু দ্রুতপায়ে গিয়ে দরজা আর তার মাঝখানে দাঁড়াল জাহানারা। তার সব প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত বোনকে যেতে দেবে না সে।

'আমি বোকা নই। অন্তত দু'বছর যাবৎ আমার প্রাসাদে আছে নাসরিন। আর এই পুরো সময়ে নিশ্চয়ই তুমি আশা করেছ যে সে কিছু একটা দেবে যা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে তুমি। যেটা আমি বুঝতে পারছি না তা হল কেন? তুমি আমার বোন। আমি সবসময় তোমার জন্য সাধ্যমত করতে চেয়েছি।'

'তাই? বছরের পর বছর ধরে তুমি আমাকে এমনভাবে অবহেলা করেছ বা দেখিয়েছ যে তোমার পাশে আমি কিছুই না। তুমি সাম্রাজ্যের মহান সম্মানীয়া সর্বশ্রেষ্ঠ নারী। সবসময় পিতার পাশে ছিলে তুমি, যেন নতুন সম্রাজ্ঞী আর আমরা সকলে তোমার অনুচর। মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীর পরে, রাতের বেলা পিতা যখন সমাধিস্থান ছেড়ে নদীর ওপাড়ে চন্দ্রআলোর উদ্যানে চলে গিয়েছিল, বলেছিলে যে একমাত্র তোমারই যাওয়া উচিত। যেন আমি কেউ না, একমাত্র তোমারই সেখানে যাবার অধিকার আছে, তুমিই তাকে শান্ত করতে পারবে।'

'এর অর্থ এরকম কিছু ছিল না... আমি সত্যিই দুঃখিত যদি ব্যাপারটা এমন দেখায়।' হঠাৎ করেই রোশনারার চোখে পানি দেখে তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল জাহানারা, কিন্তু ঝাঁকুনি দিয়ে দূরে সরে গেল রোশনারা। ডান হাত দিয়ে চোখ মুছে, লেপ্টে ফেলল চোখের কাজল।

'একদম না!'

হাত ছেড়ে দিল জাহানারা। 'আম্মাজান মারা যাবার পর থেকে আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের দিকে লক্ষ্য রাখার ... তোমাদের ভালোর জন্য কাজ করার...'

'যদি তুমি এরকমই ভাবো, তাহলে বলব আমাদের মত করে সমস্যাগুলোকে কষ্ট করোনি কখনো। তুমি নিজের জ্ঞান নিয়ে এত নিশ্চিত ছিলে কখনো জানতেই চাওনি যে আমরা কী ভাবি বা কী চাই। এখন তুমি প্রাপ্য অবস্থার মাঝে পড়েছ, মহান নারী হওয়া সত্ত্বেও একজন বিদেশীর সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছ... এখন বুঝতে পারবে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে কেমন লাগে।'

'কখনো কোন সম্পর্ক ছিল না। কখনোই না! আমি নিকোলাস ব্যালান্টাইনকে দেখা করতে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, কেননা আওরঙ্গজেবকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। জানতাম যে উত্তরের অভিযান নিয়ে পিতার সাথে খারাপভাবে কলহ হয়েছে তার। নিকোলাসও সেই অভিযানে ছিল। আশা করেছিলাম জানাতে পারবে যে কী ঘটেছিল আর সাহায্য করবে আওরঙ্গজেব ও পিতার মাঝে সবকিছু ঠিক করে দিতে।'

'তোমাকে বিশ্বাস করি না আমি। নিজেকে বাঁচানোর জন্য কাহিনী তৈরি করেছ।'

'তুমি বুঝতে পারছ না...নিকোলাস ব্যালান্টাইনকে বিশ্বাস করেছি কারণ সে আগেও সাহায্য করেছিল। যখন পিতা মুরাদকে উত্তরের অভিযানে সেনাপ্রধান নিয়োগ করেছিলেন, আমি নিকোলাসকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম যেন মুরাদকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে আর আমাকে অভিযান সম্পর্কে সব সময় জানায়। আমাকে নিরাশ করেনি সে আর এই কারণেই আওরঙ্গজেবের ব্যাপারেও তাকে বিশ্বাস করেছি আমি।'

'যদি এটাই সত্যি হয়, তাহলে আগ্রা থেকে পালিয়ে গেল কেন অবিশ্বাসীটা?'

'কারণ, যদি সে থেকে যেত তাহলে পিতা তাকে হত্যা করত। কেননা, পিতা কখনোই আমার কথা বিশ্বাস করত না, যেমন এখন তুমি করছ না।' গলা ক্রমশই চড়ে গেল জাহানারার, বহু কষ্টে নিজেকে শান্ত করে রাখল সে। 'নিকোলাসকে অবিশ্বাসী বললে তুমি—অপরাধী হিসেবে ডাকলে। এসবই সহজ, বোঝার চেষ্টা না করে কিছু একটা ডেকে বসা। মনে নেই তোমার বাল্যকালে আমাদের প্রতি কতটা সদয় ছিলেন তিনি... তাঁর সাহস আর বিশ্বস্ততা যখন আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম? আমাদের

পরিবার তাঁকে এত ঘৃণ্যভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছে যে লজ্জিত হয়েছি আমি, আর তোমারও তাই হওয়া উচিত।'

জাহানারার গাল বেয়ে গড়িয়ে নামল অশ্রু বিন্দু। যা ঘটে গেছে তার ভার বহন করা মাঝে মাঝে দুঃসহ হয়ে পড়ে। অন্তত নিকোলাস নিরাপদে আছে। সাত্তি আল-নিসা গুজরাট থেকে একটা চিঠি এনে দিয়েছে যেখানে নিকোলাস জানিয়েছে যে সুরাট থেকে ইংল্যান্ডের জাহাজ ধরার চিন্তা করছে নিকোলাস।

'শুধুমাত্র এই কারণে নিকোলাস ব্যালান্টাইন পালিয়ে যায়নি।' বোনের রাগ অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল রোশনারা। 'আমি দেখেছি তুমি কীভাবে তাকিয়ে ছিলে, তার সম্পর্কে বলতে গেলে কতটা নরম হয়ে যায় তোমার স্বর, যেমন এখন হয়েছে। প্রথমে বলেছ তোমাকে বোকা না ভাবতে, তো, আমি ও তোমাকে একই কথাই বলতে পারি!'

'ভুল ভাবছো তুমি, যদি ভাবো যে আমার কোন অনুভূতি আছে—তার প্রতি অন্য কোন অনুভূতি...'

কিন্তু রাঙা হয়ে গেল জাহানারা।

'তাই? যাই হোক, আমার রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও দয়া করে, সময় হয়েছে পিতার শয্যাপাশে ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

নিজের মহলের বাইরের দরজায় হঠাৎ করাঘাতের শব্দ শুনে চমকে গেল জাহানারা। হাত থেকে রেখে দিল তার অন্যতম পছন্দের লেখক, বিংশ শতাব্দীর রহস্যপুরুষ আবদুল কাদির আল জিলানীর বই। এত রাতে দর্শনার্থী—প্রায় মধ্যরাতের কাছাকাছি এখন। আব্বাজানের কিছু হয়নি তো? প্রথমবার অসুস্থ হবার পর থেকে প্রায় দুইমাস হয়ে গেছে, সুস্থ হওয়ার হারও অতি ধীর। মাত্র নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে, উদ্বিগ্ন বক্ষে দরজার কাছে এগিয়ে গেল কয়েক কদম, এমন সময় দরজা হাট করে খুলে ঢুকে পড়ল লম্বা ঋজু দেহ, মাথার কাপড় সরিয়ে দিতেই জাহানারার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল।

'দারা!' দৌড়ে ভাইয়ের কাছে গেল। 'আমি অনেক খুশি হয়েছি যে তুমি ফিরে এসেছ। এই মুহূর্তের জন্য আমি কত যে অপেক্ষা করেছি।'

'আমি সোজা তোমার কাছে এসেছি।' জাহানারাকে ছেড়ে দিয়ে জানালো দারা। 'পিতা এখনো জানে না যে আমি এসেছি। কেমন আছেন তিনি? গত কয়েক দিনে তাঁর স্বাস্থ্যের কোন খবর পাইনি আমি।'

'খবর ভালো। সাত্তি আল-নিসা জানিয়েছে উন্নতি ঘটছে। এ কয়দিনে এতটাই সুস্থ হয়েছেন যে দিনে তিন-চার ঘণ্টার জন্য হলেও উঠে বসতে পারেন—আর খাওয়া-দাওয়ারও উন্নতি হয়েছে। প্রথমে তো শুধু তেতো আর ঔষধি মধুর সুরুয়া খেতেন। যদিও এখনো বেশ দুর্বল। হাকিমেরা বার বার মানা করে দিয়েছে যেন রাষ্ট্রের কোন ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত না করা হয়।

'তাহলে তো তিনি জানেন না...'

'কী জানেন না?'

'আলো ফোটার সাথে সাথে তাঁর কাছে যাবো আমি। আমার কাছে যে সংবাদ আছে তা শীঘ্রি জানাতে হবে, যত দুর্বলই হোন না কেন।'

'কী হয়েছে দারা? কী সংবাদ?

দ্বিধায় পড়ে গেল দারা।

মোমবাতির কম্পমান শিখার আলোতে দারার চেহারায় উদ্বিগ্নতা দেখতে পেল জাহানারা। 'জানি তুমি নিজেও সমস্যায় আছো, কিন্তু আর নম্রভাবে বলার উপায় নেই। আওরঙ্গজেব, শাহ সুজা আর মুরাদ বিদ্রোহ শুরু করেছে। দাবি করছে যে পিতা শাসন করার পক্ষে বেশি অসুস্থ। নিজ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে আগ্রার দিকে এগিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।'

'কিন্তু এটা সত্যি হতে পারে না...'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে দারা'র দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল জাহানারা। 'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ। প্রথম শোনার পর আমি নিজেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। গোয়ালিওরের কাছে এসে বহুরাস্তা মিশে গেছে এক হয়ে। প্রথম যে সংবাদ আমি পেয়েছি তা হল আগ্রাতে ফিরে আসছে আওরঙ্গজেব। ভেবেছিলাম অসুস্থ পিতার পাশে থাকাটাই তার অভিপ্রায়—যেমনটা করেছিল তোমার দুর্ঘটনার পরে—আর আগ্রা থেকে দূরে থাকার জন্য হয়ত পিতার সাম্প্রতিক সুস্থতার সংবাদ ও পায়নি। তাই এটা নিয়ে আমি

তেমন চিন্তা করিনি। পরের দিন, একজন কসিড, গোয়ালিওরের প্রশাসকের কাছে জন্মদিনের শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছে বড় পুত্রের কাছ থেকে, যে কিনা এলাহাবাদে আমাদের প্রশাসক। আমার এক কর্চিকে কসিড লোকটা জানিয়েছে যে গুজব ছড়িয়েছে শাহ সুজা সেনাবাহিনী নিয়ে আগ্রার দিকে রওনা দিয়েছে। সচকিত হয়ে আমি তৎক্ষণাৎ বিষয়টির তদন্ত করার জন্য এলাহাবাদে বার্তাবাহক পাঠিয়ে দিয়েছি একের পর এক। ছত্রিশ ঘণ্টা পরে পরিষ্কার হয়ে গেল সত্যিকারের অবস্থা। আমার উজিরপুত্র তাঁবুতে এসে দেখা করতে চাইল। দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের প্রধান কার্যালয়ে কাজ করেছিল সে। পুরো একদিন আর রাত ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে আমাকে সতর্ক করে দেবার জন্য, জানে যে গোয়ালিওরে আছি আমি। উজির পুত্র আমাকে জানিয়েছে, আওরঙ্গজেব নাকি নিজের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে দাবি করেছে যে পিতা মৃত্যুশয্যায় অথবা সম্ভবত এরই মাঝে মারা গিয়েছেন আর সিংহাসনের উপর নিজের অধিকার কায়েমের জন্য এ সংবাদ এখনো গোপন রেখেছি আমি। আর তাই আমার হাত থেকে সাম্রাজ্য রক্ষায় আগ্রা অভিমুখে ছুটে আসছে সে সেনাবাহিনী নিয়ে। আরো দাবি করেছে শাহ সুজা শুধু নয় মুরাদের সাথে মিলেও কাজ করছে এখন।

জাহানারা এতটাই চমকে গেছে যে কথা বলা দূরে থাক চিন্তা করার শক্তিও যেন হারিয়ে স্থবির হয়ে গেছে। দারার সাথে এভাবে আবার সাক্ষাৎ হবে কখনো ভাবেনি। অনেকবারই ভেবে দেখছে নিজের সরলতার কথা কীভাবে জানাবে দারাকে, জানে যে তাকে বিশ্বাস করবে দারা, ফিরে গিয়ে পিতাকে সব বুঝিয়ে বলবে শাহজাদা আর তার কাছে এসে আবারো ক্ষমা চাইবেন। এখন পিতা অসুস্থ, নিজের আপন তিন ভাইই তার বিরুদ্ধে চলে গেছে আর সাম্রাজ্যে সম্ভবত গৃহযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে।

হঠাৎ করেই নিজের সব সমস্যা ভুলে গেল জাহানারা। 'আমি কিছুই শুনিনি।' অবশেষে ফিসফিসিয়ে জানালো জাহানারা। 'যদিও আমি এ কক্ষে বন্দি, সাত্তি আল-নিসা প্রতিদিন আমাকে দেখতে আসে। আমাকে নিশ্চয় জানাত যদি এরকম কোন গুজব দরবারে ছড়াত।'

'আমি আদেশ দিয়েছি যে আগ্রাতে ফেরার সাথে সাথে সব কসিডদেরকে যেন আমার কাছে পাঠানো হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না' পিতার

পাশে যেতে পারছি, আমি চাইনি যে তিনি চিন্তায় পড়ে যান। ফিরে আসার সময়ের সপ্তাহগুলোতে আরো বেশ কিছু খবর পেয়েছি আমি। বিশেষ করে যাদেরকে পূর্ব দিকে পাঠিয়েছিলাম, তারা নিশ্চিত করেছে যে সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা দিয়েছে শাহ সুজা। খুব বেশি দিন বাকি নেই যখন সকলে জেনে যাবে এ সংবাদ।'

'যত দিন সম্ভব ঠেকিয়ে রাখার জন্য এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদেরকে। অন্তত যেন ভাইদের কাছে বার্তা পাঠানো যায় যে পিতা সুস্থ হয়ে উঠছেন... আর তাই তাদের আচরণও চক্রান্তমূলক।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে হাসল দারা। 'সম্ভবত তারা এ দুটো বিষয়েই অবগত আছে—বিশেষ করে দ্বিতীয় সংবাদটি। অনেক দিন আগে থেকেই জানে যে পিতা আমাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চান। পিতার অসুস্থতার অজুহাত নিয়ে এমন কিছু করতে চায় তারা যেন কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না করতে পারেন সম্রাট। ফলে তাদের দাবিও বৈধতা পাবে।'

'কিন্তু তারা কী করতে চাইছে? তোমার আর পিতার সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই করবে সিংহাসনের জন্য?'

'আমি জানি না। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে এরকম কিছু ঘটবে এ সম্ভাবনা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে বহু আগেই। নিশ্চয় তারা একমত হয়েছিল যে পিতার কিছু হলেই একজোট হয়ে কাজ শুরু করবে তারা। হতে পারে নিজেদের মাঝে সাম্রাজ্যের বাটোয়া নিয়েও একমত হয়েছে। যাই হোক না কেন আমি নিশ্চিত আওরঙ্গজেবই তাদের নেতা।'

'আমাকে ঘৃণা করে সে।'

সহজ গলায় বলল দারা। 'অনেকবারই তার চোখে এটা দেখেছি আমি। মুখে যতই সান্ত্বনার কথা বলুক না কেন। আমার পেছনে, অন্য ধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাস আর আগ্রহকে ধর্মোদ্রোহিতা হিসেবে প্রচার করে আর যারা শোনে তাদের বেশির ভাগই নিজের স্বার্থে তাকে সমর্থন করে, আমার তাই ধারণা। আমি ভেবেছিলাম যে এত দূরে দাক্ষিণাত্যে বসে কোন ক্ষতি করতে পারবে না সে, কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম। পিতার আস্থা আর দরবারে নিজের অবস্থান নিয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম; কিন্তু উচিত ছিল অন্যত্র কী হচ্ছে তাতে মনোযোগ দেয়া। নিজের পুত্রদেরও

মাথা হেট করে দিয়েছি আমি। যদি এখন ব্যর্থ হই আমি, তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে সুলাইমান আর সিপিরকেও তার জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে।'

'এ সবকিছুই এখনো রুখে দেয়া সম্ভব। অসুস্থ হবার আগপর্যন্ত সাম্রাজ্যের প্রধান ছিলেন পিতা আর শীঘ্রিই আবারো সেইরূপ হয়ে যাবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, পিতা শাসন করার পক্ষে অসুস্থ, মৃতপ্রায় বা মৃত—এ রটনাগুলোকে থামিয়ে দেয়া... যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—যদি শক্তি ফিরে পান তাহলে সম্ভব হলে আগামীকাল সকালেই—ঝারোকা বারান্দায় গিয়ে জনগণের সামনে প্রাত্যহিক দর্শন দিতে হবে; যেন তারা বুঝতে পারে তাদের সম্রাট এখনো জীবিত আছেন। আর একই সাথে জানিয়ে দিতে হবে যে কী ঘটেছিল। আল্লাহ না করুণ যে তিনি এত অসুস্থ দায়িত্ব নিতে পারবেন না। ভাইয়েরা নিশ্চয়ই এতবড় সাহস করবে না যখন জানতে পারবে যে সম্রাট এখনো সক্ষম আছেন।'

'সবসময়কার মতই বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলছ তুমি... সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব না আমি। এখনি যাবো তাঁর কাছে...' তাড়াহুড়া করে দরজার কাছে এগিয়ে গেল দারা, কিন্তু কী মনে হতেই ফিরে তাকাল জাহানারার দিকে। 'তুমি আমার সাথে আসতে চাও?'

'পারব না। এখনো আমার সাথে দেখা করতে চান না পিতা। অসুস্থ হবার পরেও যখন আমি অনুমতি চেয়েছিলাম দেখা করতে, প্রত্যাখিত হয়েছি। আমার ভয় যে দেখা মাত্র বিরক্ত হয়ে উঠবেন, ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা যাবে না।'

'আমি জানাবো যে তোমাকে সন্দেহ করাটা কত বড় ভুল হয়েছে। সাত্তি আল-নিসা আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে সত্যিই কী ঘটেছিল। পিতাকে মানিয়ে নেব আমি। সবকিছু এখনো ঠিক হতে পারে—প্রতিজ্ঞা করছি আমি।'

কিন্তু সত্যিই কি সব ঠিক হয়ে যাবে—দারার প্রস্থানের শব্দ শুনতে শুনতে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল জাহানারা। নিশ্চিত নয়। তাকে অপরাধী করে পিতার অভিযোগ আর অনাস্থা জানতে পেরেছে যে এ কাজে হাত রয়েছে তারই আপন বোনের... পরিবারের উপর তার বিশ্বাস নাড়িয়ে দিয়েছে। ভাবত যে তারা সকলেই এক, কেউ কারো ব্যক্তিগত

স্বার্থান্বেষী নয়। আর এখন ভাইদের এ ধরনের সংবাদ তার ভয়কে এত বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে যে, সবচেয়ে বাজে দুঃস্বপ্নেও যা কখনো ভাবেনি।

কে জানত যে এমন কখনো কিছু ঘটতে পারে? তাক্ত ইয়া তক্তা—সিংহাসন অথবা কফিন—নিজেদের সাথে করেই এশিয়ার অনুর্বর ভূমি থেকে এই শব্দগুলো নিয়ে এসেছে তার মোগল পূর্বপুরুষেরা। উৎকৃষ্ট পোশাক আর রত্ন পরিধান করে, শাহজাদাদের আনুষ্ঠানিক কায়দা কানুন মেনে চলার পরেও কী ছিল তার ভাইয়েরা?

মহান আর আলোচিত একটি সাম্রাজ্যের সভ্য বংশধর নয়, বরঞ্চ বন্য জন্তু, একে অন্যের লাশের দিকে তাকিয়ে গড়গড় করছে। যেটি কিনা এখনো মরে যায়নি... পিতার হাতের ভারী স্বর্ণের আংটির দিকে তাকিয়ে গড়গড় করছে যা কিনা একসময় লালিমা ছড়িয়েছিল তৈমুরের হাতে।'

ছোট সিংহাসনটি থেকে উঠে দাঁড়ালেন শাহজাহান। ছোট ছোট পা ফেলে আস্তে আস্তে হেঁটে গেলেন নিজের শয্যাকক্ষের দিকে। এতক্ষণ এই চেয়ারে আসনটিতে বসেই দারার কাহিনী শুনেছেন তিনি। হাত দুটো আড়াআড়ি ভাঁজ করে নিজেকে জড়িয়ে ধরে মাথা নত করে এগোতে লাগলেন সম্রাট। দারার কথাগুলো শোনার পর প্রথমে তো এতটাই মর্মাহত হয়ে গিয়েছিলেন যে বসে রইলেন স্থাণুবৎ। এখনো মনে হচ্ছে হাকিমদের দেয়া ওষুদের ফলে মস্তিস্কের এলোমেলো চিন্তা কিনা। প্রায়শই বিশেষ করে অসুস্থ হবার পর প্রথম দিনগুলিতে, বেশিরভাগ সময় নিদ্রা আর জাগরণের মাঝামাঝি থাকতেন তিনি। নিশ্চিত হতে পারতেন না যে কোনটা সত্যি আর কোনটা ক্লান্ত, বিপর্যস্ত মস্তিষ্কের ভাবনা। অদ্ভুত সব ছবি ভেসে বেড়াত মাথার মাঝে, বেশির ভাগ সময়েই মৃতপিতামহ আবার, পিতা জাহাঙ্গীর আর সবচেয়ে বেশি হাস্যরত মমতাজ ফিসফিস করে বলত 'মুবারক মঞ্জিল', ফিরে আসা সম্রাটের উদ্দেশে একজন সম্রাজ্ঞীর সনাতন অভিবাদন।

এখন, বুঝতে পেরেছেন যে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন তিনি, সামনে সব কঠিন বাস্তবতা—বিদ্রোহ, আর বিদ্রোহের নেতা কোন বিশ্বাসঘাতক প্রজা নয়, তাঁরই পরিবারের সদস্য। কোন পাগলামিতে

মেতেছে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রেরা? তাদের কেউই তেমন হয়নি যেমনটা তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু কখনো সন্দেহ করেননি যে এত নগ্নভাবে ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়বে তারা। মনে হচ্ছে যেন ফিরে এসেছে অতীতের দিনগুলি—যখন একে-অন্যে ছিল মোগলদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তিনি নিজেও বিদ্রোহ করেছিলেন আপন পিতার বিরুদ্ধে আর সৎভাইদের সাথে লড়াই করেছিলেন সিংহাসনের জন্য। কিন্তু সেটা ছিল ভিন্ন হিসাব... মেহরুন্নিসার কথা মত তাঁকে এতে বাধ্য করেছিলেন জাহাঙ্গীর। নিজের পরিবারের সুরক্ষায় লড়েছিলেন তিনি। তাঁর নিজের পুত্রদের তো এমন কোন অজুহাত নেই আর সেই পুরোন পারিবারিক উচ্চাকাঙ্খা, রক্তপাত আর প্রতিশোধের বদলা নেবার চাকা পুনরায় ঘোরার অনুমতি দিবেন না তিনি। তাঁকে অবশ্যই—তিনি করবেন—এই বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটাতে হবে, যেন পরিবারের নিশ্চিহ্ন হওয়া আর মোগলদের এতদিনের অর্জন নষ্ট হওয়া রোধ করা যায়।

পায়চারি থামিয়ে দারার দিকে তাকালেন সম্রাট। 'তাদের প্রদেশ সমূহে দূত পাঠিয়ে দাও। খুঁজে বের কর, কত বড় সেনাবাহিনী। কতদূর এগিয়েছে আর কেই বা তাদের ঘোষণা দিয়েছে। যতদূর সম্ভব তথ্য চাই আমি। সকালবেলা উপদেষ্টাদের সভা ডেকে পাঠাবো আমি। তাদের সবাইকে শোনাতে হবে আমাকে যা বললে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার—আমাদেরকে দ্রুত আর নির্ভুলভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেন বিদ্রোহীরা পরবর্তী সুযোগ না পায়।'

'জাহানারা পরামর্শ দিয়েছে জনগণের সামনে দর্শন দেবার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব ঝারোকা বারান্দায় যেতে হবে আপনাকে। যেন এই রটনা শান্ত হয় যে আপনি মৃত।'

'জাহানারা? তার সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হ্যা। দুর্গে পৌঁছবার সাথে সাথে তার কাছে গিয়েছিলাম আমি।'

বক্র চোখে দারার দিকে তাকালেও কিছু বললেন না শাহজাহান। বলে চললো দারা, 'ও'র প্রতি অন্যায় করেছেন আপনি। নিকোলাস ব্যালান্টাইন আর জাহানারার কাহিনী ততটাই কদর্য আর ভিত্তিহীন যতটা আপনার মারা যাওয়ার কাহিনী। নিকোলাসকে শুধু মাত্র ডেকে পাঠিয়েছে কারণ আওরঙ্গজেবকে নিয়ে চিন্তিত ছিল সে। চেয়েছিল নিকোলাস যেন

জানায় যে উত্তরের অভিযানে সত্যিকারের কী ঘটেছিল। মায়ের স্মৃতির নামে শপথ করে বলেছে যে নিকোলাসের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না...আব্বাজান, আমার কর্কশ শব্দের জন্য ক্ষমা করেন; কিন্তু যা শুনেছি তাতে অবিচার করেছেন জাহানারার প্রতি। অন্তত এখন তার সাথে দেখা করেন... আমার বোনকে প্রমাণ করার সুযোগ দিন যে আপনি কত বড় ভুল করেছেন।' অপেক্ষা করল দারা। জাহানারার মত সদস্যদের একান্ত প্রয়োজন এখন পিতার, যে কিনা তাঁর প্রতি এখনো বিশ্বস্ত। আবারো চেষ্টা করল দারা। 'আব্বাজান... আমাকে বিশ্বাস করেন। আমি...'

এবার উত্তর দিলেন শাহজাহান। 'যথেষ্ট, দারা। যা বলেছ শুনেছি।'

'জাহানারার সাথে দেখা করবে?'

'সম্ভবত'।

তিন ঘণ্টা পরে, পূর্ব দিগন্তে ফুটে উঠেছে হালকা আলো, কর্চির হাত থেকে পানির গ্লাস নিয়ে চুমুক দিলেন শাহজাহান। কুয়া থেকে তুলে আনায় এখনো বেশ ঠাণ্ডা, তৃষ্ণার্তের মত পানিটুকু পান করলেন সম্রাট। যদিও পাত্র ধরে রাখা হাত দু'টো এখনো পুরোপুরি শক্ত আর স্থির হয়নি। এটা কি অসুস্থতার ফল—হঠাৎ করে এই যে দুর্বলতা চেপে বসল তাঁর উপর আর এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি হাকিমেরা? অথবা দারার মুখে বিদ্রোহের কথা শুনে ক্রোধ জেগেছে মনে? অথবা শীঘ্রই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবে জাহানারা আর আরো একবার তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে শাহজাহানকে?

গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকা অবস্থাতেই শুনতে পেলেন বাদ্যের গুরগুর আওয়াজ—তাঁর নির্দেশেই এই ইশারা দেয়া হয়েছে যেন আগ্রাবাসী ঘুম থেকে জেগে উঠে যমুনার তীরে এসে ঝারোকা বারান্দায় দেখে যায় তাদের সম্রাটকে। 'কর্চি আমার আলখাল্লা নিয়ে এসো।' সাধারণত বারান্দাতে সংক্ষিপ্ত দর্শন দানের জন্য আটপৌরে সুতির টিউনিক পরে যান সম্রাট; কিন্তু প্রায় তিন মাস হয়ে গেল জনগণ দেখেনি তাঁকে। আর তাই সবুজ রেশম আর রত্নপাথরের সজ্জিত হয়ে শয্যাকক্ষ ছেড়ে বের হবেন তিনি যখন উদিত সূর্যের উষ্ণ আলো এসে পৌঁছবে পৃথিবীতে, খোদাই করা বালিপাথরের বারান্দাতে। হাত তুলে তাদেরকে আর আসন্ন দিনের উপর আশীর্বাদ করবেন সম্রাট, অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু বেশি

সময়ই থাকবেন; যেন সম্রাটের সুস্থ হওয়া নিয়ে কারো মনে কোন সংশয় না থাকে। তাদের সামনে দেখতে পাবে মোগল সম্রাটকে।

আধা ঘণ্টা পরেই সমাপ্ত হয়ে গেল কাজ। নিচে উল্লসিত জনতার কাছে থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিজের মহলে ফিরে এলেন শাহজাহান। যেমনটা তিনি বলেছেন, তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত ছাদে অপেক্ষা করছে জাহানারা। এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করেও হাঁটা ধরলেন ছাদের দিকে। আবারো বাইরে আসায় তীব্র আলোর বিপরীতে হাত দিয়ে ছায়া দিলেন চোখের উপর। জাহানারা দাঁড়িয়ে আছে, সামনে এগিয়ে এলো না। এক মুহূর্তের জন্য একে অন্যের দিকে তাকিয়ে, শাহজাহান এগিয়ে গেলেন কন্যার দিকে।

শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না বলার মত। জাহানারার হয়ে অনেক কিছু বলেছে দারা, অনেক কিছু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছে, বারবার জোর দিয়ে বলেছে যে জাহানারা নিরপরাধ আর নিজের হৃদয়ের গভীরে শাহজাহানও উপলব্ধি করলেন যে পুরোপুরি সঠিক দারা। কেমন করে এমন অভাবনীয়ভাবে রেগে গেলেন তিনি? আরো একবার পরাজিত হলেন জাহানারার কাছে। 'ক্ষমা করো আমাকে।' অবশেষে বলতে পারলেন শাহজাহান। 'ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ত্রস্তপায়ে তোমার বিচার করেছি। কোন অজুহাত দিচ্ছি না...'

'এসবই এখন অতীত আব্বাজান। সম্ভবত এটা নিয়ে আর কথা বলা উচিত হবে না আমাদের।' মাপা কণ্ঠস্বরে জানিয়ে দিল জাহানারা। দমিয়ে রাখতে চাইছে নিজের ভেতরে উদ্‌গত হয়ে ওঠা আবেগকে।

'কিন্তু আমাকে বলো যে ক্ষমা করেছ, নয়ত শান্তি পাবো না আমি।'

'আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' কথাগুলো বলেই, জানে যে রাজপরিবারের স্বার্থে বলতে হবে, দৃশ্যত পিতাকে স্বস্তির শ্বাস ফেলতে দেখলো জাহানারা। কিন্তু আপন মনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল কথাগুলি কি সত্যি? সম্ভবত অনেক দিন লেগে যাবে এটা ভুলতে যে অযৌক্তিকভাবে রেগে গিয়ে তাকে অপরাধী হিসেবে বিশ্বাস করে বসেছিলেন পিতা। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ দূরে থাকার পর নতুন চোখে পিতার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল জাহানারা, কতটা বৃদ্ধ দেখাচ্ছে তাকে। চওড়া কাঁধ অবনত আর এক সময়কার পেশীবহুল শরীর—এক

যোদ্ধার শরীর—দেখাচ্ছে পাতলা আর ভঙ্গুর। এখনো সুদর্শন চেহারাতে আঁচড় কেটেছে গভীর রেখা। অসুস্থতা এসে এত বড় মূল্য চুকিয়ে গেল নাকি এখন যা দেখছে সম্রাট সবসময় তাই ছিলেন?

নিজের ভেতরেই অনুতপ্ত হল জাহানারা, হাসতে চাইল; কিন্তু আরেকটা কথা মনে হতেই মুছে গেল হাসি। 'শুধু আমার সাথেই যে অবিচার করা হয়েছে তা নয়। তুমি নিকোলাস ব্যালান্টাইনের সাথেও অন্যায় করেছ। যা ঘটেছে তাতে ওনার কোন অপরাধ নেই। আমি ওনার দ্বারস্থ হয়েছি কেননা ভাইদেরকে নিয়ে চিন্তিত ছিলাম, বিশেষ করে আওরঙ্গজেবকে নিয়ে। একটু বেশিই অবাধ্য হয়েছিলাম, আমি জানি। ভাবা উচিত ছিল যে এতে অন্যরা কী ভাববে। কিন্তু নিকোলাসের একমাত্র অপরাধ হলো আমাকে সাহায্য করতে চাওয়া। ইংল্যান্ডের জন্য জাহাজ ধরার কথা এখন। আমি তাকে পত্র লিখে জানিয়ে দেব। হয়ত সময় মত পৌঁছাবে না চিঠি। কিন্তু এটুকু জানিয়ে দিতে চাই যে সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে... আমাদের পরিবার জানে যে তার কাছে কতটা ঋণী আমরা।

'অবশ্যই। তাকে এও জানিয়ে দিও যে যা হয়েছে তার জন্য আমি অনুতপ্ত আর অতীতের সেবার জন্য কৃতজ্ঞ। আবারো যদি দরবারে ফিরে আসে সাদরে আমন্ত্রণ রইল।' জাহানারার বাহুতে হাত রাখলেন শাহজাহান। গভীর স্বস্তি পেলেন এই ভেবে যে অন্তত একটা ফাটল মেরামত করা গেছে; কিন্তু ঘনিয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ। নিঃশ্বাস ফেলে এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে ফেললেন চোখ।

'পিতা... তুমি ঠিক আছো? হাকিমদেরকে ডেকে পাঠাবো আমি?'

'না। অনেক দিন ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলাম আমি। আবারো একজন সম্রাট হয়ে উঠতে হবে।'

শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ালেন শাহজাহান। 'ভাইদের বিদ্রোহ সম্পর্কে তোমাকে কতটা বলেছে, দারা?'

'এতটুকুই যে তোমার অসুস্থতার অজুহাত খাড়া করে সেনাবাহিনী নিয়ে এগোচ্ছে সিংহাসন দখলের জন্য...'

বিমর্ষ হয়ে গেলেন সম্রাট। 'এটাই পুরো সারমর্ম। এই ভেবে সারা হচ্ছি যে তোমার মা থাকলে কী ভাবতেন আর তার স্মৃতির প্রতি কতটা অন্যায় করেছি আমি। তোমার ভাইয়েরা কী করছে তার উপরে আমার

আরো বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত ছিল আর নিয়ন্ত্রণ করাও। তাদের প্রদেশসমূহের নিয়মিত রাজকীয় উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। অথচ এর পরিবর্তে তাদেরকে আর তাদের উচ্চাকাংখী উপদেষ্টাদেরকে সময় আর সুযোগ দিয়েছি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করার জন্য।'

খানিকক্ষণ কোন উত্তর দিল না জাহানারা। ঠিকই বলেছেন পিতা। মমতাজের মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে এমনভাবে সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন যে আর বের হতে পারেননি তা থেকে। অশিষ্ট আচরণ করেছেন নিজের সব ছেলে-মেয়েদের সাথে, জাহানারার সাথেও, কেননা জাহানারার অপরাধ মেনে নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু এসবের কিছুই কি পিতাকে বলতে পারবে সে?

'বাবা, যা হয়েছে, হয়েছে। তুমি যা করেছ বা করতে ব্যর্থ হয়েছ তার কোন কিছুই ভাইদের বিদ্রোহকে বৈধ করে তুলবে না। এখন মনো‌যোগ দাও তাদেরকে কীভাবে পদানত করা যায় সেদিকে।'

চারপাশে তাকিয়ে নিজের উপদেষ্টাদের পরিচিত মুখগুলোর দিকে তাকালেন শাহজাহান। প্রত্যেকের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল যে কয়েক ঘণ্টা আগে পুত্রদের বিদ্রোহের সংবাদে তিনি নিজে যতটা বিস্মিত হয়েছিলেন, এদের প্রত্যেকের অবস্থাও তাই। কেউ কেউ অবশ্য বিস্ময় গোপনও করতে পেরেছে। অন্তত একজনের অন্যান্য আরো অনেক সমস্যা আছে। তার ভূমি খরার কবলে পড়েছে মারাত্মকভাবে। লোকটার দিকে শক্তভাবে তাকিয়ে মনে মনে অবাক হয়ে ভাবলেন শাহজাহান যে যদি এমন হয় আওরঙ্গজেব তাকে ঘুষ দিয়েছে সহায়তার জন্য। আর ওই তো দরজার কাছে বসে আছে যে উপদেষ্টা, মূল্যবান জায়গিরের দিকে লোভ ছিল তার সবাই জানে; অসুস্থ হবার আগপর্যন্ত কাউকে এর অনুমতি দেননি শাহজাহান। হয়ত এ লোকটাও বিক্রি হয়ে বসে আছে। কে বলতে পারে? বেশির ভাগেরই কোন না কোন বাসনা আছে। কিন্তু অন্তত তাঁর রাজপুত মিত্রেরা, আম্বারের রাজা জয় সিং আর মারওয়ারের রাজা যশয়ন্ত সিং পুরোপুরি বিশ্বস্ত। এ ব্যাপারে নিশ্চিত শাহজাহান। আকবরের সময় থেকেই পারিবারিক আর সম্মান উভয় দিক থেকেই আত্মীয়তার

বন্ধন গড়ে উঠেছে তাদের সাথে মোগলদের। হাত তুলে আবারো কথা বলে উঠলেন শাহজাহান। 'আমার কনিষ্ঠ তিনপুত্রের ষড়যন্ত্রের প্রধান অংশটুকুই কেবল বলেছি আমি। এখন শাহজাদা দারা তাদের অগ্রগতি আর সেনাবাহিনী সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতটুকু জানতে পেরেছে তা জানিয়ে দেবে সবার সামনে।'

'দাক্ষিণাত্য থেকে ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছে আওরঙ্গজেবের বাহিনী।' বলে উঠল দারা। 'যদিও সে দাবি করছে যে এটা কোন বিদ্রোহ নয় অনেক রটনা থাকলেও তার ইচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রায় এসে সম্রাটের বেঁচে থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। শাহ সুজার সেনাবাহিনীও মাঠে নেমেছে, পশ্চিম দিকে গঙ্গা ধরে এগোচ্ছে। আসামের জঙ্গলে বেড়ে উঠা বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হাতিসহ বিপুল সংখ্যক অশ্বারোহী আর পদাতিক সৈন্য আছে এ বাহিনীতে।'

'দক্ষিণের শাসকদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য সবসময় সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত রাখে আওরঙ্গজেব; কিন্তু শাহ সুজা কেমন করে এত দ্রুত সৈন্য একত্রিত করল?' জানতে চাইলেন জয় সিং।

উত্তর দিলেন শাহজাহান। 'বাংলার অর্থভাণ্ডার এত গভীর যে এর দুই গুণ বড় সেনাবাহিনীও চাইলে কিনতে পারবে সে আর এছাড়া বিহারের করের অর্থও আছে; সবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বোকার মত তাকে যেটা দিয়েছি আমি। বলে যাও, দারা।'

'আমার ভাই মুরাদও অন্যদের মত প্রস্তুতি নিয়েই এগোচ্ছে। সেনাবাহিনী জড়ো করে রসদ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করছে—অথবা করার চেষ্টা করছে। কেননা, ভাইদের রাজকোষের তুলনায় তার রাজকোষের অবস্থা প্রায় কপর্দকশূন্য। এক্ষেত্রে ধন্যবাদ দিতে হবে তার অযোগ্যতা আর অমিতব্যয়িতাকে। গুজরাটের ধনী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ ঋণের চেষ্টা চালাচ্ছে আর খানিকটা বিলম্ব হতে পারে, কিন্তু ভয় হচ্ছে হয়ত বেশি দেরি আর নেই...'

'আপনি নিশ্চিত যে তারা সকলে সেনাবাহিনী নিয়ে আগ্রায় আসতে চায়?' এবারে জিজ্ঞেস করলেন যশয়ন্ত সিং।

'তাই মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস যে একে অন্যের সাথে আঁতাত গড়েছে তারা। কিন্তু এটা কি যে কোন একজনকে সিংহাসনের জন্য

সাহায্য করা নাকি নিজেদের মাঝে সাম্রাজ্য ভাগ করে নেয়া, সেটা পরিষ্কার নয়।' উত্তরে জানালো দারা।

'তার মানে প্রতিহত না করতে পারলে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াবে।' এবার কথা বললেন শাহজাহান। 'ইতিমধ্যে বার্তাবাহকের হাতে প্রতিটি প্রদেশে আমার প্রাদেশিক শাসনকর্তা আর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের কাছে পত্র লিখে জানিয়ে দিয়েছি যে আমি সুস্থ হয়েছি আর বিদ্রোহী পুত্রদেরকে যারাই সাহায্য করবে, বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি ভোগ করবে তারা। পুত্রদের কাছেও পত্র লিখে দাবি করেছি বিদ্রোহ পরিত্যাগ করতে, মনে করিয়ে দিয়েছি পিতার প্রতি তাদের দায়িত্ব। কিন্তু জল অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। তাই এই অকৃতজ্ঞদের উপর এসব পত্র কতটা প্রভাব ফেলবে কে জানে। এ কারণে আমার হাতে আর কোন উপায় নেই আদেশ দেয়া ছাড়া যে রাজকীয় সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হোক। নিজেদের অঞ্চল থেকে ও প্রজারাজ্য থেকে যত সম্ভব সৈন্য একত্রিত করা হোক। সম্ভবত চক্রান্তকারীরা যখন দেখতে পাবে তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বাহিনী একত্রিত হচ্ছে, যুক্তিবোধ ফিরে পেয়ে পিছু হটবে মোগলদের রক্তে মোগলরা ঢেকে যাবার পূর্বেই।'

দুই ঘণ্টা পরে, সর্বশেষ উপদেষ্টা কক্ষ ছেড়ে যাবার পর খানিকটা কাঁপতে কাঁপতে রুপার সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শাহজাহান। দারা দৌড়ে এলো সাহায্য করার জন্য; কিন্তু হাত নেড়ে তাকে ফেরত পাঠালেন সম্রাট। 'না, আমাকে আবারো শক্ত হতে শিখতে হবে...আর দারা, তোমাকে কিছু কথা জানাতে চাই আমি। কয়েক বছর আগেই যদি তোমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করতাম, তাহলে এসব এখন ঘটতই না। এখন তোমাকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হবে যা তোমার অধিকার তার জন্য। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনুতপ্ত আমি; কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল সংশোধন করতে চাইছি আমি : আগামীকাল ময়ূর সিংহাসনে বসে দরবারে সকলের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে তোমাকে উত্তরাধিকারী আর তোমার ভাইদেরকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করব আমি।'

অধ্যায়-১৭

খড়ের বিছানার উপর শুয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমের আশায় এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল অশান্ত নিকোলাস ব্যালান্টাইন। আর মাত্র তিন দিনের মাঝেই সুরাট থেকে ব্রিস্টলের উদ্দেশে যাত্রা করবে জুনো। জাহাজের কার্গো ভর্তি হয়ে আছে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মোটাসোটা লাভ এনে দেবার আশায় ছাপানো সুতীর কাপড়, সিল্ক আর নীল দিয়ে। নিকোলাস নিজেও বিদেশ পাড়ি জমাবে। জুনোতে জায়গা পাবার জন্য ভালোই অর্থ দিতে হয়েছে লালমুখো ক্যাপ্টেনকে। কিন্তু উত্তমাশা অন্তরীপা ঘুরে যে দেশে পৌঁছাতে চাইছে, যেটিকে সে আদৌ গৃহ বলে মনে করে না, সেই দীর্ঘ আর বিপদসংকুল ভ্রমণের যাত্রাপথ যে আনন্দময় হবে না তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

নিদ্রার আশা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল নিকোলাস। আর মাত্র ঘণ্টাখানেকের মাঝেই দেখা দেবে প্রভাত, অথচ সরাইখানার নিচ তলার ছোট্ট কক্ষের কাদামাটি দিয়ে তৈরি ইটের দেয়াল থেকে এখনো গরম ভাপ বের হচ্ছে। নিকোলাসের প্রায় উলঙ্গ দেহ ভিজে গেছে ঘামে। বাইরের আঙিনাতে গিয়ে কুয়ো থেকে এক বালতি পানি তুলে নিজের গায়ে ঢেলে দিল। কুকুরের মত ভিজে গায়ে এগিয়ে গেল নিম গাছের ছায়ার নিচে বসতে। কাছেই একটা চারপেয়ে টুলের উপর বসে আছে—সম্ভবত নৈশ প্রহরী—ঘুমন্ত একজন মানুষ। যাক, অবশেষে শাহজাদী জাহানারাকে নিয়ে আর কোন চিন্তা রইল না। আগের দিন হাতে এসে পৌঁছানো সংক্ষিপ্ত চিঠিটা শান্তি এনে দিয়েছে মনের মাঝে, আগ্রা ছেড়ে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে দূর হয়ে গেল সব অপরাধবোধ।

বেশ শক্ত ধাঁচের মেয়ে জাহানারা। শিখে নিতে হয়েছে এমনটা, ছোট্টবেলাতে জাহাঙ্গীরের হাত থেকে পালাতে হয়েছিল পরিবারসহ। একই সাথে মন খারাপ হয়ে গেল কল্পিত অপরাধের বোঝা তার উপর চাপানো হয়েছে শুনতে পেয়ে, যদি সুরাটের ব্যবসায়ীদের মাঝে ছড়ানো রটনাগুলো সত্যি হয়ে থাকে। কিন্তু সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্রেরা কি সত্যিই বিদ্রোহে জড়িয়েছে? বিশদভাবে কিছুই লেখা ছিল না জাহানারার চিঠিতে। কিন্তু ভাগ্যে যাই থাকুক না কেন আবারো দারা আর পিতার পাশে থাকতে পেরে নিজের স্বস্তি প্রকাশ করেছে শাহজাদী। এতে কি যাত্রাপথে তাকে শঙ্কিত না হবার জন্য প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? সম্ভবত না। হতে পারে যে দারার ভাইয়েরা শুধুমাত্র আস্ফালন করছে। এই বিশাল দেশে, রাজকীয় ট্রাঙ্ক রোড আর বার্তা বাহকেরা ব্যতীত সংবাদ পৌঁছায় অতি ধীর গতিতে। প্রায় বিকৃতি লাভ করে পথিমধ্যে আর বোকার দলও অভাব নেই তা বিশ্বাস করার।

ভেতরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল নিকোলাস কিন্তু শুনতে পেল কিছু একটা ভেঙে পড়ার শব্দ, অনুভব করল কেঁপে উঠল মাটি। এক কি দুই মিনিট পরে আবারো শুরু হল আওয়াজ, এবার আর বন্ধ হবার নাম নেই। এটা একমাত্র কামানের গোলাই হতে পারে। সুরাটে আক্রমণ চালানো হচ্ছে? শব্দের গতিপথ শুনে বোঝা গেল যে গ্রামের দিক থেকে শহরের উপর গোলা ছোড়া হচ্ছে। পাশের রাস্তা থেকে হতচকিত চিৎকার শোনা গেল। দৌড়ে নিজের কক্ষে গেল নিকোলাস। তাড়াহুড়ো করে শার্ট গায়ে দিয়ে, পায়ে জুতো গলিয়ে পাশের গলিতে গিয়ে দেখল ইতিমধ্যে বেশ লোকজন জড়ো হয়ে গেছে—ইংরেজ ব্যবসায়ীরা, কারো কারো পরনে রাতের পোশাক। কারো হাতে ধরা ক্যাশ বাক্স; ভারতীয় কেরানী আর দোকানদার। নিশ্চয় দুর্গের নিরাপত্তার ভেতর যেতে চাইছে সকলে। মোটা দেয়াল দিয়ে তৈরি চতুর্ভুজ দুর্গ প্রায় এক মাইলের চারভাগের এক ভাগ দূরত্বে সমুদ্রের কাছাকাছি উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। দুর্গের ভূ-গর্ভস্থ ভল্টের গভীরে নিজেদের সম্পদ সঞ্চিত করে রেখেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। উৎকৃষ্ট দুর্গের পাহারার দায়িত্বে আছে ইংল্যান্ড থেকে পাঠানো কোম্পানি রেজিমেন্টের একদল সৈন্য। এর দেয়ালের নিচে

পুরোপুরি সজ্জিত, কামানসহ প্রস্তুত হয়ে নোঙ্গরে ভাসছে বেশ কয়েকটি জাহাজ যেন যে কোন অনাহূত বিপদের মোকাবেলা করা যায়।

আর বিপদ, মনে হচ্ছে অবশেষে এসেই গেছে... মানুষের ভিড়ের মাঝে বহুকষ্টে দরজার কাছে নিজেকে ঠেলে দিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে শহরের দেয়াল আর প্রভাতের ধূসর আলোয় ধোঁয়া আর ধুলা দেখতে পেল নিকোলাস। হঠাৎ করেই খানিকটা পরিচিত এক তরুণ ব্যবসায়ীর নজরে এলো। চামড়ায় মোড়ানো হিসেবের খাতা বুকের কাছে ধরে দৌড়ে আসছে তার দিকে। 'জন, কী হয়েছে?' হট্টগোল ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল নিকোলাস।

শুনতে পেল না তরুণ ব্যবসায়ী. পেশীবহুল হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল নিকোলাস। 'আমি নিকোলাস, তুমি জানো কী হচ্ছে আসলে? ডাকাত পড়েছে?' প্রশ্নটা করলেও নিকোলাস ভালো করেই জানে যে ডাকাতেরা শহরের বাইরে রসদবাহী রেলগাড়িতে আঘাত করতে পারলেও কামান কোথায় পাবে তাও এত বড় কামান?

'কেউ কেউ বলছে যে শাহজাদা মুরাদ তুর্কী ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে এসেছে সুরাট আক্রমণ করতে।

'কিন্তু সে তো গুজরাটের শাসনকর্তা। কেন তাহলে গুজরাটের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী শহরের উপর অতর্কিত হানা দিয়েছে—এই শহরই তো তাকে সবচেয়ে বেশি কর দেয়?' নিকোলাসের হাত ছেড়ে দৌড়ে পালাতে চাইছে তরুণ ব্যবসায়ী, বিবর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে বিপদ থেকে দৌড়ে পালিয়ে দুর্গের কাছে একে অন্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, ধাক্কা দিয়ে এগোতে থাকা ভিড়ের জনতার দিকে।

'কারণ শাহজাদা কোম্পানির কাছে বিশাল অঙ্কের ঋণ চেয়েছিল; কিন্তু বোর্ডের ডিরেক্টরেরা প্রত্যাখান করেছে।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল তরুণ ব্যবসায়ী, বুঝতে পারল তাকে আরো জোর করে আঁকড়ে ধরেছে নিকোলাস।

'তো এখন এভাবেই নিজের কার্য উদ্ধার করতে চাইছে...' হাত ছেড়ে দিল নিকোলাস আর জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেল লোকটা। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল নিকোলাস। তার নিজেরও কি এখন দুর্গের আশ্রয়ে ঢোকা উচিত?

এখন তো আর সে কোন মোগল সেনাপ্রধান নয়, শুধুমাত্র একজন বিদেশী যে কিনা গৃহে ফেরার সময় জড়িয়ে পড়েছে আরেকজনের সমস্যাতে। নিজেকে রক্ষা করাই তার প্রধান দায়িত্ব। সত্যিই তাই? যদি মুরাদ সত্যিই সুরাটের উপর আক্রমণ করে থাকে তাহলে অরাজকতা শুরু হয়েছে বলতে হবে। শাহজাহান কখনোই এমন কিছুর অনুমতি দেবেন না; তার মানে গুজবগুলো সত্য: সম্রাটের পুত্রেরা, অন্তত মুরাদ তো বটেই—পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছে।

দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে ভয়ার্ত মানুষগুলোকে পাশ কাটিয়ে আবারো সরাইখানার দিকে ফিরে চলল নিকোলাস। ইতিমধ্যেই সেখানকার সবাই পালিয়ে যেতে শুরু করেছে। ঘুমন্ত প্রহরী উধাও হয়ে গেছে, জীবনের চিহ্ন বলতে শুধুমাত্র বিছানার নিচে শুয়ে আছে লোম-ওঠা একটা কুকুর, সামনের পায়ের মাঝে মাথা গুঁজে ভয়ে কুইকুই করছে, অবিরাম চলছে গোলাবর্ষণ।

নিজের কক্ষে গিয়ে খড়ের তোষকের নিচে থেকে ব্যাগ দু'টো তুলে নিল নিকোলাস। তেমন একটা ভারী নয়—হিন্দুস্তানে এতদিনের সেবাদানের ফসল—কিন্তু এ ভূমির কাছে এখনো ঋণী সে, জানে কোথায় যেতে হবে।

রাজকীয় সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করার মত যথেষ্ট সময় নেই হাতে; কিন্তু বিলম্ব করাটা কোন উপায় নয়, আবারো উপদেষ্টামণ্ডলীর সভা ডেকে প্রস্তুতি নিতে বলবেন ভাবলেন শাহজাহান। তাঁর মতো, উপদেষ্টারাও বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে—সবাই পঞ্চাশের নিচে বলতে গেলে কেউই নেই। তিন সপ্তাহ আগে সংকট শুরু হবার পর প্রথমবারের মত দারার সামরিক অভিজ্ঞতা না থাকাটার জন্য অনুতাপ করলেন শাহজাহান। সবসময় নিজের পাশে, বিপদ আপদ থেকে মুক্তভাবে রাখতে চেয়েছেন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে। কখনো ভাবেননি এতে করে অন্য পুত্রেরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে যা কোনদিন যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর এবং দারার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে।

'আমার বিশ্বস্ত সভাসদগণ, বার্তাবাহক আর দূত মারফত জানতে পেরেছি যে শাহসুজার বাহিনী এখনো গঙ্গা ধরে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে,

ধীরে হলেও এগিয়ে আসছে।' শুরু করলেন সম্রাট। 'যেসব ভূমি পার হয়ে আসছে, তাদেরকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছি যেন শাহ সুজার বাহিনীকে থামিয়ে দেয়ার জন্য সবরকম চেষ্টা করা হয় ও রসদ সংগ্রহ করতে বাধা দেয়া হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য সেনাবাহিনীই প্রয়োজন। তাই শাহ সুজার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছি আমি। আমার দৌহিত্র, দারাপুত্র সুলাইমান নেতৃত্বদান করবে, আম্বারের রাজা জয় সিং থাকবে পরামর্শদাতা। বাহিনীতে থাকবে বিশ হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচ হাজার পদাতিক সৈন্য। গঙ্গার নিচে বরাবর গেলে আফগান জেনারেল দিলীর খান ও তার বাহিনী যোগ দেবে এ বাহিনীর সাথে।'

'শাহ সুজাকে কি জীবন্ত নিয়ে আসতে হবে?' জানতে চাইল রাজা।

'হ্যাঁ। পুত্রের রক্তপাত এড়িয়ে যেতে চাই। আমার অভিপ্রায় নিজের অপরাধ কবুল করার জন্য আমার সামনে নিয়ে আসা হবে তাকে।'

'আপনার অন্য দুই পুত্রের কোন সংবাদ, জাহাপনা?' জিজ্ঞেস করে উঠল উজবেক খলিলুল্লাহ খান, যার ক্ষত-বিক্ষত মুখমণ্ডল বহন করছে উত্তরের অভিযানে আওরঙ্গজেবের পাশে থেকে নিজের দেশীয় ভাইদের বিরুদ্ধে শক্ত যুদ্ধ করার চিহ্ন।

'মুরাদের বিরুদ্ধে পাওয়া তথ্যগুলো এখনো অস্পষ্ট। কোন কোন সংবাদে বলা হয়েছে যে নিজেকে গুজরাটের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেছে সে—মসজিদে তার নামে খুতবা পাঠ করা হচ্ছে আর মুদ্রায় নিজের শাসনামলের চিহ্ন খোদাইয়ের আদেশও নাকি দিয়েছে—এছাড়া অন্য সংবাদ বলছে নিজের রাজস্ব মন্ত্রীকে হত্যা করেছে—আলী নকি, যে কিনা সবসময় বিশ্বস্ত ছিল আমার প্রতি—মুরাদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজের সমালোচনা করার অপরাধে। সংবাদে শুনেছি মুরাদ নিজে নাকি তাকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করেছে। এছাড়াও গুজব আছে মুরাদ সুরাট আক্রমণ করে লুট করার পাঁয়তারা করছে; এরপর যুদ্ধের ব্যয় বহন করার মত অর্থ সংগ্রহ হয়ে গেলে নিজের রাজধানী আহমেদাবাদ থেকে রওনা দিবে দাক্ষিণাত্য থেকে আসা আওরঙ্গজেবের সাথে হাত মিলাতে। এরই মাঝে নিজের স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদেরকে চম্পনীর দুর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে, তার মানে দীর্ঘ অভিযানের পরিকল্পনা আছে।'

'যদি সত্যিই শাহজাদা মুরাদ নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে থাকে তাহলে তো আওরঙ্গজেবের সাথে যুদ্ধ করার কথা, যোগ দেবার নয়, তাই না?' জানতে চাইল মারওয়ারের রাজা যশয়ন্ত সিং। আঙুল ঢুকিয়ে রেখেছে কোমরের কাছে স্বর্ণের চেইনের সাথে ঝুলানো ছুরির রত্নখচিত খাপের মাঝে।

'আমার তা মনে হয় না। আমাদের দূতেরা উত্তরে আহমাদাবাদের দিকে যাবার সময় ধরে ফেলেছে আওরঙ্গজেবের এক বার্তাবাহককে। লোকটা আওরঙ্গজেবের সীল লাগান পত্র মুরাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। কি লেখা ছিল, আমি পড়ে শোনাচ্ছি!' ইশরায় পরিচারককে ডেকে পত্রখানা তুলে নিলেন শাহজাহান।

> 'সিংহাসন দখলের জন্য আমাদের পরিকল্পনা এগিয়ে চলেছে। ইসলাম আর মোগলদের উপর কলঙ্ক লেপন করা প্রতিমা পূজারী আর অবিশ্বাসীদেরকে একসাথে খতম করে এই পাপময় দেশে এক আল্লাহ তায়ালার নাম কায়েম করব। আমার প্রিয়তম ভাই, আমার সাথে এই মহতী কর্মে অংশ নিয়েছ তুমি আর তাই এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করছি যে, যখন আমরা সফল হবে—সফল হবই, কেননা আমাদের অভিপ্রায় সৎ—তোমার পুরস্কার হবে পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মির আর সিন্দু প্রদেশ, যেখানে কারো কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া আপন শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবে তুমি। আল্লাহ আমার স্বাক্ষী রইলেন। যখন একসাথে দেখা হবে, যেমন আমরা ঠিক করে রেখেছি আগ্রায় পৌঁছানোর আগে শত্রুকে পদানত করা ও এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সফলভাবে সম্পাদনের জন্য বাকি আলোচনা সার হবে।

এমনো হতে পারে যে আমার হাতে পৌঁছে এ পত্র আমাকে ভুল পথে পরিচালনার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এই চক্রান্ত করা হয়েছে। এরকম অসদোপায় অবলম্বন আওরঙ্গজেবের দ্বারা সম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয় এটা মিথ্যে নয়। মুরাদের বৃথা অহমিকা আর অন্তঃসারশূন্যতার সুবিধা নিচ্ছে আওরঙ্গজেব। সে জানে যে আগ্রা থেকে মুরাদের দূরত্ব কম। আর আমার সন্দেহ যৌথ বাহিনীর উপর আওরঙ্গজেব জোর দিচ্ছে যে তার

আগে মুরাদ যেন এখানে পৌঁছে কোন ধরনের সামরিক ও রাজনৈতিক সুযোগ না নিতে পারে। শাহ্ সুজার প্রতি আওরঙ্গজেবের কী মনোভাব সেটা শুধুমাত্র অনুমান। কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে মুরাদ বা আওরঙ্গজেব কাউকেই আগ্রাতে পৌছাতে দেয়া যাবে না। আর তাই রাজা যশয়ন্ত সিংয়ের নেতৃত্বে দক্ষিণে আরো একদল সেনাবাহিনী পাঠাতে চাই আমি, যেন তাদেরকে খুঁজে বের করে প্রতিহত করা যায়। একাকী বা যৌথ যেভাবেই তাদেরকে পাওয়া যাক না কেন। আল্লাহ্ আর ন্যায় আমাদের পাশে আছে—তাদের সাথে নয়।'

চুপ করে বসে এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেললেন শাহাজাহান। দারা জানে যে অবসণ্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। ক্রমাগত দুর্বলতা সত্ত্বেও রাতের বেশিভাগটাই জেগে বসে দারা। সুলাইমান, জয় সিং, যশয়ন্ত সিং আর অন্যান্য সেনাপ্রধানদের সাথে মানচিত্র দেখেছেন, রসদের ব্যাপারে কথা বলেছেন—যাত্রার জন্য কত সৈন্য প্রস্তুত আছে, পরবর্তী দল পাঠাতে কত সময় লাগবে, হাতে থাকা কামানের সংখ্যা কত, কতটি যুদ্ধহাতি আছে রাজকীয় হাতিশালে আর কতটাই বা দিতে পারবে রাজপুত মিত্রেরা। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও অসুস্থ শয্যায় পড়ে থাকতেন শাহজাহান আর এখন কৃশকায় দুর্বল শরীরে যদিও কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই, তাঁর ইস্পাত দৃঢ় মানসিকতা অন্যদের মাঝে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করছে। উপদেষ্টাদের চোখেমুখে তারই প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে দারা। নিজের ভেতরেও তা বেশ অনুভব করতে পারছে।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলল শাহজাদা। 'দীর্ঘজীবী হোন আমার পিতা, সম্রাট, জিন্দাবাদ বাদশা শাহজাহান'।

চারপাশে উপদেষ্টাদের উল্লসিত প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে তার নিজের উৎসাহও হয়ে গেল দ্বিগুণ। যেমনটা পিতা বলেছেন, তাদের অভিপ্রায় সৎ।

'আব্বাজান, রাজা জয় সিং এসেছেন।' ঘুমের মাঝে দারার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন শাহজাহান। সুস্থ হয়ে যাবার পরে'ও মধ্যাহ্নের খাবারের পরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন খানিকটা—যদিও আগের তুলনায় তেমন খেতেও

পারেন না। শুধুমাত্র তন্দুরে সেকা খানিকটা মুরগি আর অল্প একটু জাফরানী ভাত। চোখ থেকে ঘুম তাড়িয়ে সোনালি রেশমের কাউচের উপর উঠে বসলেন শাহজাহান, এর উপরে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দ্রুত মনোযোগ দিলেন বাস্তবে। গত কয়েক সপ্তাহে তেমন একটা সংবাদ পাননি সুলাইমানের সেনাবাহিনীর অগ্রগতি সম্পর্কে। 'কী সংবাদ এনেছে জয় সিং? কেন বা সে নিজে এলো?'

'আমি এখনো জানি না। এখনো তাকে দেখিনি। হারেমে নাদিরার সাথে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম এমন সময় একজন পরিচারক এসে জানালো রাজার আগমন সংবাদ। ভেবে দেখছি দু'জনে একসাথে তার সংবাদ শুনলেই ভালো হবে। খবর পাঠিয়ে দিয়েছি যেন পনের মিনিটের মাঝে ব্যক্তিগত দর্শনার্থীদের কক্ষে এসে দেখা করেন আমাদের সাথে।'

বস্তুত মাত্র দশ মিনিটের মাথাতেই পিতা-পুত্রের সামনে রাজার আগমন ঘোষণা করল এক কর্চি। রাজা প্রবেশ করতেই দেখা গেল সবসময়কার মতই নম্রভাবে রুচিশীল পোশাকে হাজির হয়েছেন; যার জমকালো গোঁফ নিপুণভাবে বাঁকানো আর সুগন্ধি তেল চর্চিত, ঘিয়ে রঙা আলখাল্লায় একটিও দাগ নেই। পাশে একটি কক্ষে বসে প্রাণপণে ময়ূরের পাখা দিয়ে তৈরি বিশাল পাখা টানছে পরিচারকেরা। সম্রাটের মাথার উপরে কোন এক অতিকায় প্রজাপতির পাখার মত করে আগুপিছু হয়ে বাতাস ছড়াচ্ছে এই পাখা। তারপরেও গরম আর গুমোট হয়ে আছে কক্ষ, অথচ জয় সিং একটুও ঘামছে না!

উদ্বিগ্ন হয়ে আর রাজার চেহারায় সংবাদের কোন প্রতিচ্ছায়া দেখতে না পেরে নিয়ম ভেঙে কথা বলে উঠল দারা। 'আপনার নিয়ে আসা সংবাদ কি ভালো না খারাপ, জয় সিং?'

খানিকটা বিস্মিত হয়ে উত্তর দিল রাজা, 'মিশ্র, সম্মানীয় !'

'ঠিক আছে, দারা।' বলে উঠলেন শাহজাহান। 'যেভাবে ঘটেছে সেভাবেই ঘটনাসমূহকে বর্ণনা করতে দাও জয় সিংকে, যেন আমি বিবেচনা করে দেখতে পারি।'

'আমি তাই করছি, জাহাপনা।' সম্রাটকে কুর্নিশ করলো রাজা, শাহজাহানের শব্দগুলোতে স্পষ্ট বুঝতে পারল ভর্ৎসনা করা হয়েছে অতি আগ্রহী পুত্রকে।

'প্রথমে যমুনা তারপর গঙ্গা ধরে দ্রুত এগিয়েছিল আমাদের জাহাজ বহর। মাঝে মাঝে শুধু থামা হয়েছে ঘোড়াদের অনুশীলনের জন্য। আর আল্লাহবাদে থামা হয়েছিল আরো অস্ত্র ও রসদ নিয়ে দিলীর খানের যোগ দেয়ার জন্য। এক মাসেরও কম সময়ে পাঁচ শত মাইল অতিক্রম করেছিল বহর, এরপর—স্থানীয় এক প্রজার নিয়ে আসা তথ্যানুসারে, যে কিনা নিজের নদীর কাছাকাছি দুর্গ থেকে দাঁড় বেয়ে এসেছে আমাদের সাথে যোগ দিতে—আপনার দৌহিত্র বারানসীর কাছে যাত্রা স্থগিতের আদেশ দেয়। এক্ষেত্রে আমার এবং দিলীর খানের পরামর্শ মতই কাজ করেছে শাহজাদা সুলাইমান। কয়েকটা ভারী যন্ত্রপাতি পেছনে রেখে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে যায় শাহ সুজা আর তার সৈন্যদের মোকাবেলা করতে। প্রজার দেয়া তথ্যানুযায়ী শাহ সুজা ও তার বাহিনী পশ্চিম দিকে বারো মাইল ভেতরে নদীর উত্তর অংশ ধরে এগোচ্ছে।'

'পরের দিন সন্ধ্যার পরে তাঁবুতে ফিরে আসলো আমাদের কয়েকজন চর। প্রধান সেনাবাহিনীর আগে গিয়ে চারপাশ ভালোভাবে তদারকি করে আসার সময় শিবিরে আগুনের আলো জ্বলতে দেখেছে। ঘোড়া থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে শাহ সুজার তাঁবু একেবারে নীরব দেখতে পায়; এমনকি একজন পাহারাদারও ছিল না। তাদের প্রতিবেদন শুনে যুদ্ধসভার মাধ্যমে মধ্যরাতের ঠিক পরপরই শাহ সুজার শিবিরে আক্রমণের ব্যাপারে একমত হয়ে যাই—আমরা সকলে, কেননা তখন আগত দিনের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করবে শাহ সুজার সৈন্যরা। পরিবারের রক্তে রঞ্জিত না হতে চাওয়া আপনার আদেশের কথা স্মরণ করে, শাহজাদা সুলাইমান আমাদেরকে গুলি ছুড়তে নিষেধ করে দেয়। হত্যা না করেই শাহ সুজাকে খুঁজে বের করাটাই ছিল উদ্দেশ্য।'

'শাহ সুজার তাঁবুর কাছাকাছি এক মাইলের কম দূরত্বের মাঝে ছোট ছোট ঝোপের কাছে যাবার আগপর্যন্ত সবকিছু ভালোই চলছিল। হঠাৎ করেই যন্ত্রণাকাতর এক চিৎকারে কেঁপে ওঠে বাতাস আর আমাদের পথ প্রদর্শক দূত ছিটকে পড়ে ঘোড়া থেকে। তার ভয়ার্ত ঘোড়া আমাদের দিকে ছুটে আসতে শুরু করে। লাগাম মাটিতে লুটোচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলাম, দেখতে পাইনি এমন কোন পাহারাদার হয়ত চরের গায়ে গুলি করেছে। কিন্তু ঘোড়া কাছে আসতেই দেখা গেল জন্তুটার

নিতম্বে রক্তাক্ত আঁচড়, আমাদের সারির মধ্য দিয়ে দৌড়ে চলে যেতে লাগল পেছনে বিশাল বড় একটা পুরুষ বাঘ। আমাদের ঘোড়াগুলোও বেসামাল হয়ে উঠল। বাঘটাই ছিল চরের চিৎকার আর ঘোড়ার ক্ষতের কারণ—শত্রু আক্রমণ নয়। কিন্তু আমাদের সংখ্যা দেখে আবারো রাতের আঁধারে হারিয়ে গেল বাঘ। কিন্তু হট্টগোলের শব্দে জেগে গেল শাহ সুজার কয়েকজন প্রহরী। সতর্ক হয়ে চিৎকার শুরু করে দিল তারা।'

'তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁবুর দিকে ছুটে গেলাম আমরা, হাতে বর্শা আর খোলা তলোয়ার। সবচেয়ে কাছের তাঁবুগুলো হয়ত আর একশ গজও দূরে নয়, এমন সময় ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি কামানের গোলা উড়ে আসতে লাগল আর ঘোড়া থেকে পড়ে গেল একজন কর্চি। তাঁবুগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে প্রথমেই তলোয়ার দিয়ে দড়ি কেটে দেয়া হল; ফলে তাঁবু ছিঁড়ে নিচে চাপা পড়লো সৈন্যরা। বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেলা হল আটকে পড়া সৈন্যদেরকে। রক্তে ভিজে গেল তাঁবুর কাপড়, আহত সৈন্যরা চিৎকার করে উঠল আত্মসমর্পনের জন্য। পনের মিনিটেরও কম সময়ে তাঁবুর ঠিক মাঝ বরাবর ঢুকে গেলাম আমরা। তখনি দেখতে পেলাম অশ্বারোহীদের বড়সড় একটি দল ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পূর্বের জঙ্গলে। চিৎকার করে শাহজাদা সুলাইমানকে জানালাম যে এদের মাঝে শাহ সুজাও নিশ্চয় আছে; কিন্তু তাদেরকে চলে যেতে দেবার কথার উত্তরে জানালো শাহজাদা... আমরা তাদেরকে পরে দেখে নেব। সেই মুহূর্তের জন্য জরুরি ছিল শাহ সুজার বাকি সৈন্যদের ব্যবস্থা করা। তাঁবুতে মূল্যবান সব জিনিস ছিল। এগুলোর মাঝে রাজকীয় যুদ্ধহাতিও ছিল যেগুলোকে কাজে লাগাবার সুযোগ পায়নি শাহ সুজা।'

'আমার পুত্র কি তাহলে পালিয়ে গেছে? যদি না হয়, তাহলে কী হল?'

'আমার বিশ্বাস শাহ সুজা পালিয়ে গেছে, জাহাপনা; কিন্তু আমি নিশ্চিতও নই। আর কোথাও শাহ সুজাকে ধরতে পারিনি আমরা–মৃত বা আহতদের মাঝেও ছিল না।' শাহজাহানের চেহারা দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল জয় সিং।

'কিন্তু এসব তো ভালোই সংবাদ? তোমার দিকনির্দেশনায় শাহ সুজাকে পরাজিত করেছে সুলাইমান।'

'হ্যা, জাহাপনা, কিন্তু তারপর যা ঘটল সেটা দুঃসংবাদ।'

‘তোমার কথার অর্থ কি শাহ সুজার দল পুনরায় একত্রিত হয়ে আক্রমণ করেছে?’

‘না, জাহাপনা, তা নয়—সহজ কথায় বলতে গেলে আপনার দৌহিত্র জেদ করেছে যেন শাহ সুজার পিছু ধাওয়া করি আমরা, যারা পূর্ব দিকে পাটনাতে পালিয়ে গেছে বলে জানতে পেরেছি। দিলীর খান আর আমি বহুবার বোঝাতে চেয়েছি যে শাহ্ সুজা ইতিমধ্যেই আপনার সিংহাসনের জন্য বিদ্রোহ শুরু করেছে আর জানামতে আওরঙ্গজেব আর মুরাদকেও এখনো পরাজিত করা সম্ভব হয়নি, তাই এটাই এখন সবচেয়ে বড় হুমকী। আমরা চেয়েছি সেনাবাহিনীকে, যেটি কিনা সৈন্যদের সেরা অংশ, পিছিয়ে এসে পশ্চিম দিকে নিয়ে যেতে, সেখানেই জরুরি বেশি। শাহজাদা সুলাইমান কিছুতেই একমত হয়নি। কিন্তু সেনাপ্রধান হিসেবে তার কথা মান্য করতেই হবে। আমি শুধু অনুমতি নিয়ে আগ্রাতে ফিরে এসেছি ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের নিয়ে, যেন আপনার কাছে প্রতিবেদন পেশ করতে পারি আর দিলীর খান রয়ে গেছে উপদেষ্টা হিসেবে।’

‘সুলাইমান বাহিনীর আর কোন সংবাদ পেয়েছ তুমি?’

‘হ্যা, মাত্র গতকালই। দিলীর খানের কাছ থেকে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে, একজন কসিড। সে আর সুলাইমান, বারানসী থেকে বিশ মাইল পূর্ব দিকে আছে, বাংলার জঙ্গল আর জলাভূমির—মাঝে পিছু ধাওয়া করছে প্রতিপক্ষের।’

হতাশ হলেন শাহজাহান। ঠিক কথাই বলেছে জয় সিং ঃ সংবাদ মিশ্র ধাঁচের। শাহ্ সুজা পালিয়ে গেছে কিন্তু সুলাইমান এমনভাব করছে যেন মরণপণ যুদ্ধে নয়, শিকার করতে গেছে। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে যদি যশয়ন্ত সিং আওরঙ্গজেব আর মুরাদকে পরাজিত করতে পারে। কিন্তু তা না হলে সুলাইমানের সৈন্যদের প্রয়োজন পড়বে। তাই শাহ্ সুজার পিছু ধাওয়া করার বেপরোয়া অভিযান থামাতে হবে। এই মুহূর্তেই আদেশ পাঠিয়ে শাহজাদাকে আগ্রায় ডেকে আনবেন শাহজাহান।

বসন্তের রৌদ্রতাপ—উষ্ণ কিন্তু তেমন কড়া নয়—আরামদায়ক লাগল চেহারার উপর এসে পড়াতে। নিজের হালকা বাদামি তেজী ঘোড়াটির

উপরে আবারো উঠে আনন্দিত হয়ে উঠলেন শাহজাহান। খুব বেশি সময় লাগল না, দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠল সিকান্দ্রাতে অবস্থিত আকবরের বিশাল সমাধির লাল বেলেপাথরের তৈরি ফটকদ্বার। সম্প্রতি পাওয়া সংবাদটা আত্মস্থ করার জন্য সময় আর একাকিত্বের খোঁজে হঠাৎ করেই মন চাইল পিতামহের শেষ নিদ্রার জায়গাটিতে আসতে, যিনি তাঁকে শিখিয়েছেন একজন সম্রাটের দায়িত্ব। প্রিয় দৌহিত্রের এহেন সংকটময় মুহূর্তে আকবর বেঁচে থাকলে কী বলতেন? আকবর নিজে কখনো এমন বিপর্যয়ের মোকাবেলা করেননি। কারণ তিনি হয়ত আরো উৎকৃষ্ট শাসক ছিলেন, আরো অধ্যবসায়ী আর সাম্রাজ্যের মনোভাব বোঝার ক্ষেত্রে আরো তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী....

সবুজ পাগড়ী পরিহিত প্রহরীর দল উঠে দাঁড়াতেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন শাহজাহান। হয় বয়সের ভারে নতুবা অসুস্থতার কারণে অথবা হয়ত উভয়ের কারণে—যতটা ভেবেছিলেন তার চেয়ে বেশি ব্যাথা হয়ে গেছে শরীরের হাড়গোড় আর মাংসপেশী। কর্চির হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে দেহরক্ষীকে ইশারা করে আদেশ দিলেন বাইরে থাকতে। একাকী প্রবেশ করলেন ফটকদ্বার দিয়ে। বাগানে যেতেই বিস্মিত হয়ে কিচ-কিচ শুরু করে দিল একটা বানর, মাথা তুলে তাকিয়ে রইল গাছের নিচে চড়ে বেড়াতে থাকা তিনটি হরিণ। কিন্তু শাহজাহান সোজা তাকিয়ে রইলেন গাছের ছাঁয়া দিয়ে ঢাকা বালি-পাথরের তৈরি পথের শেষ মাথায় পিতামহের সমাধির দিকে। সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে একটু বেশিই কঠিন এই সমাধি, কিন্তু এর দৃঢ়তা ফুটিয়ে তুলেছে আকবরের চেতনাকে। শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকেই বড় মাপের শক্তিশালী মানুষ ছিলেন সম্রাট আকবর। সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করে গভীর আর শক্ত করেছেন এর ভিত্তিকে, ঠিক যেমন তাঁর সমাধিকে ধরে রেখেছে এর খিলানগুলো।

ধীরে ধীরে পথের শেষ মাথায় গিয়ে বসলেন সমাধির দিকে মুখ করে থাকা দু'টি মার্বেল পাথরের বেঞ্চিতে। এখানে এসেছিলেন নির্জনে বসে খানিকটা ভাবতে; কিন্তু ঘোড়া ছুটিয়ে আসার পরিশ্রমে আর সারাদিনের ঘটনায় হতবিহবল থাকার ফলে প্রায় সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল চোখ জোড়া।

হঠাৎ করেই হতচকিত হয়ে জেগে গেলেন পাথুরে পথে পদশব্দ শুনতে পেয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন দ্রুতপায়ে তাঁর দিকে হেঁটে আসছে কেউ একজন কিন্তু গাছের ছায়া পড়ায় বোঝা যাচ্ছে না লোকটা কে। একাকী থাকতে চা্ওয়ার পরেও দেহরক্ষীরা কেন কাউকে ঢুকতে দিল? অবচেতনেই হাত চলে গেল কোমর-বন্ধনীর সাথে ঝুলন্ত ছুরির কাছে। 'কে তুমি? কে তোমাকে অনুমতি দিয়েছে আমার একাকিত্বে অনুপ্রবেশ করতে?' জানতে চাইলেন সম্রাট।

থেমে গেল আগন্তুক। সোনালী কেশ, দেখতে পেলেন শাহজাহান— পূর্বের মত উজ্জ্বল বা ঘন নয়; কিন্তু তারপরেও ভুল হবার কোন কারণ নেই।

'এগিয়ে এসো।' নিকোলাস ব্যালান্টাইন কাছে এগিয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন সম্রাট।

'জাহাপনা, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করুন। আপনার প্রহরীদের নেতা আমাকে চেনে। যখন আমি বলেছি যে আপনাকে দেয়ার জন্য জরুরি তথ্য নিয়ে এসেছি, আমাকে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছে।'

হাত একপাশে রেখে দিলেন শাহজাহান। আরো কাছে এগিয়ে আসার পর দেখতে পেলেন ইংরেজের কৃশকায় চেহারায় চোখের নিচে গভীর কালো দাগ। 'আমার কন্যা তোমার কাছে চিঠি লিখত, আমি জানি, আমি ... অনুতপ্ত ... ভুল বোঝাবোঝির জন্য তোমাকে আগ্রা ছেড়ে যেতে হল।'

'জাহাপনা, এই কারণে এত কষ্ট করে ঘোড়া ছুটিয়ে আপনাকে খুঁজতে আসিনি আমি। আমি এমন কিছু বলতে চাই, যা কোনভাবেই না—অপেক্ষা করা যাবে না।' গলার স্বর কেঁপে গেল নিকোলাসের।

'বলো।'

'ইংল্যান্ড যাত্রার উদ্দেশে সুরাটে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় শহরে আক্রমণ শুরু করে আপনার পুত্র শাহজাদা মুরাদ। শহরের দেয়াল কামান দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজকোষ লুট করে নিয়ে গেছে.... সুরাট থেকে ফেরার সময় পথিমধ্যে কয়েকজনের কাছে শুনেছি মুরাদেরই একজন সেনাপতি নেতৃত্ব দিয়েছে এই ধ্বংসলীলায়। শাহজাদা নিজে দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আরো

বিশাল বাহিনী নিয়ে, শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সাথে মিলিত হতে... বুঝতে পেরেছি যে সাথে সাথে এ সংবাদ আপনাকে জানানো প্রয়োজন। আমি...' শাহজাহানের মুখে দুঃখের বিমর্ষ হাসি ফুটে উঠতে দেখে থেমে গেল নিকোলাস।

'সাধুবাদ জানাই যে তুমি এসেছ, কিন্তু ইতিমধ্যেই সুরাটের উপর আক্রমণের সংবাদ পেয়েছি আমি। এমনকি ঘটনা ঘটার আগেই শুনেছি যে মুরাদ আক্রমণ আর রাজকোষ লুট করার পরিকল্পনা করছে; কিন্তু আমার হাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্য নেই যারা কিনা সময় মত পৌঁছতে পারবে...'

'আপনি জানেন ভেবে স্বস্তি পাচ্ছি, জাহাপনা। আমার ভয় ছিল যে দেরি না হয়ে যায়।'

'আর তোমার কী মনে হয় আমি কি পদক্ষেপ নিয়েছি?'

'সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেয়া যেন মুরাদ ও তার ভাই একত্রে মিলিত হতে না পারে?'

'ঠিক, তাই। বস্তুত, সুরাট সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন খবর পাবার আগেই আমি তা করেছি। তোমাকে বিস্মিত দেখাচ্ছে, নিকোলাস। তুমি আমার বিদ্রোহী পুত্রদের দাবি বিশ্বাস করোনি যে শাসন করার পক্ষে বেশি অসুস্থ হয়ে গেছি আমি?'

নিকোলাসের আহত অভিব্যক্তি দেখে গলার স্বর কোমল করলেন শাহজাহান—যাই হোক, মাতৃভূমির জন্য জাহাজ না ধরে এখানে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না ইংরেজ লোকটার।

'তুমি ভাবতেও পারবে না সবকিছু কত দ্রুত ঘটে গেছে। আমার সম্রাজ্ঞী মৃত্যুবরণ করার পর থেকে এতবড় অন্ধকার মুহূর্ত আর আসেনি আর এখন আগ্রায় ফিরে এসেছ তুমি। ভেবেছিলে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিবে—এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আমি তোমাকে জানাচ্ছি... মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই জানতে পেরেছি, রাজা যশয়ন্ত সিংয়ের নেতৃত্বে যে শক্তিশালী বাহিনী পাঠিয়েছি তাদের সাথে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের যৌথ বাহিনীর দেখা হয়েছে ধর্মতে। উজ্জয়নী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ভুল তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল যশয়ন্ত সিংকে—অথবা ইচ্ছেকৃতভাবে হয়ত ভুল পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—

শত্রুর গোলান্দাজ বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে না জেনেই সন্মুখ সমরের নির্দেশ দিয়ে বসে রাজা। খোলা ময়দানে তার রাজপুত অশ্বারোহীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে বিদ্রোহীদের কামান। কামানের গোলার সাথে সাথে বিদ্রোহী বাহিনীর অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে এগোতে দেখে ভীত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে আমাদের সৈন্যরা; অনেকেই—যশয়ন্ত সিং সহ—পালিয়ে যায় রাজস্তানী মরুভূমিতে।

'আওরঙ্গজেব আর মুরাদ এখন কোথায় আছে?'

'নিশ্চিতভাবে জানি না আমি। যদি তাদের জায়গায় আমি হতাম তাহলে চম্বল নদীর দিকে এগোতাম, আগ্রা আর তাদের মাঝে সবশেষ বাধা। আর তাই স্বাভাবিকভাবে দক্ষিণ দিকে গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিয়েছি যেন তারা পৌঁছানোর সাথে সাথে জানানো হয় আমাকে।

'এরপর কী করবেন, জাহাপনা?'

'একটা মাত্র কাজই করতে পারি—বাকি সৈন্যদেরকে পাঠিয়ে তাদেরকে বাধা দেয়া। সাম্রাজ্য আর সম্মান রক্ষার্থে মাঠে নামতে হবে শাহজাদা দারাকে—আমার পিতামহের সমস্ত অর্জন হুমকির মুখে ঝুলছে এখন।'

অধ্যায়-১৮

আগ্রা থেকে চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সমভূমি থেকে উঠে যাওয়া ছোট্ট একটা পাহাড়ের মাথায় নিজের বাদামি ঘোড়ার উপর শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে নিকোলাস। সকালের স্নিগ্ধ আলোতে দিগন্তের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল তাজমহলের পরিচিত অবয়ব। তার কাছে গম্বুজটাকে মনে হয় যেন অশ্রুবিন্দু। সম্রাটের অনুরোধে আবারো ভাড়াটে সৈন্যদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছে নিকোলাস। প্রভাতের আলো ফোটারও আগে নিকোলাস আর তার পাঁচশ সৈন্যকে নিয়ে বের হয়ে এসেছে দারা—রোগ, ক্ষত আর হতাশা মিলে যদিও উত্তরের অভিযানের সময়কার চেয়ে সংখ্যায় অনেক কমে গেছে তারা—চম্বল নদীর দিকে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা দেয়ার আগে সর্বশেষ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এভাবে।

হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে খাড়া পথ বেয়ে সুউচ্চ ফটকদ্বার দিয়ে নেমে এসেছে তারা। এরপর কোনরকম সামরিক বাধা ছাড়াই পার হয়ে এসেছে সমভূমি। বুক ভরে হিন্দুস্তানের অদ্বিতীয় আর অসাধারণ ঘ্রাণ টেনে নিল নিকোলাস—মাটি থেকে উঠে আসা গন্ধের সাথে মিশে গেছে রাতে ফোটা ফুলের গন্ধ যেমন চম্পা, মশলা আর গোবর দিয়ে আগুন জ্বালানোর গন্ধ, জেগে উঠছে সকলে, তৈরি হচ্ছে নতুন দিনের জন্য। সৈন্যদের ঘোড়ার খুড়ের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে একটা ময়ূর আর নিশাচর গ্রাম্য কুকুর।

যদিও আক্ষরিক অর্থেই শান্তি ভঙ্গ হতে যাচ্ছে এখন। দারা আর সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলেছে ভাইদ্বয় আওরঙ্গজেব আর মুরাদের সাথে সম্মুখ সমরে লড়তে। পারিবারিক বিভক্তি আর কদর্যতা নিয়ে ভেঙে

পড়তে যাচ্ছে গৃহযুদ্ধ! হিন্দুস্তানে আসার পর নিজের জীবনের প্রথম দিকটাতেও এসব দিন দেখেছে নিকোলাস। যখন রক্তাক্ত পরিণতি আর ধ্বংসের কথা জেনেও সিংহাসনের জন্য লড়াই করেছিল শাহজাহান। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের পশ্চিমে পারিবারিক এস্টেট থেকে পাঠানো বড় ভাইয়ের পত্রে জানতে পেরেছিল যে নিজের দেশেও শুরু হয়েছিল গৃহযুদ্ধ—রাজাকে হত্যা করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের সংসদ। আর এর গোঁড়া জননেতা অনুসরণকারীদের উপর আরোপ করেছে আওরঙ্গজেব আর মোল্লাদের মত মৌলিক একটি বিশ্বাসের কঠোর আর সাদাসিধে নীতি; এমনকি থিয়েটার আর ১লা মে তারিখে পুষ্পশোভিত দণ্ডের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করার মত নির্দোষ উৎসবকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

প্রায় অবচেতনেই কোমরের কাছে রাখা দু'টি পিস্তলের একটির উপর হাত রাখল নিকোলাস। ভাইয়ের শেষ চিঠির সাথে এগুলোও এসে পৌঁছেছে শক্ত করে বেঁধে রাখা একটি প্যাকেটের মাঝে। এ ধরনের অস্ত্র হিন্দুস্তানে প্রায় বিরল বলা চলে। যাই হোক, সামনের যুদ্ধে হয়ত কাজে লাগবে এ দু'টো। যদিও মনে হয় না যুদ্ধের মাঝে নতুন করে গুলি ভরে নেয়ার মত যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। তাই প্রতিটি গুলি করতে হবে ভেবে-চিন্তে, জায়গা মত। যদিও অনুশীলনের সময় পনের গজের বেশি লাগাতে পারেনি সে।

কানে তালা লেগে যাবার মত বিস্ফোরণের শব্দে কেটে গেল নিকোলাসের চিন্তার সুতো। সৈন্যদের এগিয়ে আসার শব্দ ভেসে এলো সামনের দিকে লম্বা-গলার বাদ্যের আওয়াজের মাধ্যমে।

পাশাপাশি ত্রিশ জন সৈন্য আছে একেবারে সামনের সারিতে। সকলের পরনে মোগলদের সবুজ পাগড়ি আর টিউনিক। একই রকমের দেখতে কালো ঘোড়ার উপর চড়ে বসেছে সকলে। প্রথম দিকে দুই সারিতে বাদক দলের সাথে দামামা বাজিয়েরাও আছে। নিজেদের ঘোড়ার দুই পাশে ছোট ছোট দামামাগুলোকে বেঁধে নিয়ে একই তালে বাজাচ্ছে সবাই আর জন্তুগুলোও এতটাই প্রশিক্ষিত হয়ে গেছে যে শব্দের ঝংকারেও কোন ভাবোদয় বোঝা গেল না। বাদ্য দলের পরেই আছে ঋজুদেহী অশ্বারোহীর দল। শুধুমাত্র তারা বাদে—প্রতি ছয় জনে একজন, ধারণা করল নিকোলাস—হাতে ধরা সবুজ ব্যানারের কাঠের দন্ড।

বাতাসে উড়ছে মোগল নিশান। প্রস্থ অপেক্ষা বেশি দৈর্ঘ্যের সবুজ পতাকার সাথে হাতে উদ্যত বর্শা। তাদের পেছনে আবারও অশ্বারোহীদের সারি। এদের হাতের বর্শার মাথায় বেঁধে রাখা সবুজ দৈর্ঘ্য বেশি পতাকাগুলো আরোহীদের দুলে ওঠার তালে তালে সৃষ্টি করে সমুদ্রের তরঙ্গ অথবা মনে হচ্ছে যেন শরতের শস্যক্ষেতের উপর বয়ে যাচ্ছে বাতাস।

কয়েক মিনিট পরে সোনালি ধুলার মাঝ দিয়ে নিকোলাসের চোখে পড়ল যুদ্ধহাতিদের সারি। প্রতিটির উপরে বিশাল হাওদা আর লোহার পাতের দেহবর্ম। পাতগুলো এত ছোট যে হাতিগুলো স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে না। নিকোলাসের মনে পড়ে গেল যে একবার গুনতে চেষ্টা করেছিল সংখ্যা, তিন হাজার পর্যন্ত গোনার পর—অবশেষে ক্ষান্ত দেয়। যুদ্ধবর্মের মতই প্রতিটি হাতির শুঁড় বেঁধে রাখা হয়েছে একদিকে ধারালো বাঁকা তলোয়ার দিয়ে। শুঁড়গুলোকে রক্তলাল রং দিয়ে রাঙানো হয়েছে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হাওদার মাঝ থেকে উঁকি দিচ্ছে গজনাল-এর ব্যারেল। এরকম চলন্ত যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত যুতসই ছোট কামান। হাতির দল একেবারে লড়াইয়ের মাঝখানে দ্রুত ঢুকে যেতে পারে এ কামানগুলো নিয়ে।

হাতিদের সারির একেবারে মাঝখানে আছে অপেক্ষাকৃত বড় জন্তুগুলো। এগুলোর শুঁড় লাল নয় সোনালি রঙে রাঙানো। একে অন্যের সাথে তালে তালে পা ফেলে চতুর্ভুজ আকৃতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। চারকোনার প্রতিটা কোণার হাওদা থেকে উড়ছে অশ্বারোহীদের চেয়েও বড় সবুজ ব্যানার। ছয় ফুট উঁচু আর সম্ভবত বিশ ফুট লম্বা ব্যানারগুলোতে সোনা দিয়ে অ্যামব্রয়ডারি করা হয়েছে সম্রাট আর দারা শুকোহ্‌র নাম। একেবারে মাঝখানে আছে সবচেয়ে বড় হাতি। সূর্যের আলোয় চকমক করছে সুউচ্চ হাওদার গায়ে লাগান মনি-মাণিক্য। ধীরে ধীরে হাতিটা কাছে এগিয়ে আসতেই পরিষ্কারভাবে দারার দেহাবয়ব দেখতে পেল নিকোলাস। প্রপিতামহ মহান আকবরের ন্যায় সোনার দেহবর্ম পরে বসে আছে হাওদার ঠিক মাঝখানে। পেছনে খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো দাঁড়িঅলা দুই দেহরক্ষী। পাশ দিয়ে যাবার সময় নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে একটা হাত তুলল দারা। কিন্তু নিকোলাস

নিশ্চিত হতে পারল না যে তাকে কি সত্যিই চিনতে পেরেছে দারা নাকি একজন ভালো জেনারেলের মত দায়িত্ব পালন করেছে শুধু পথের পাশে থাকা সৈন্যদেরকে অভিবাদন জানানো।

আধা ঘণ্টা পরে সেনাবাহিনীর কামান চলে গেল নিকোলাসের পাশ দিয়ে। তাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন নিজের সৈন্যদেরকে নিয়ে পশ্চাৎভাগের সৈন্যদের সাথে যোগ দেয়। সকালের কুয়াশা কেটে যেতেই গরম পড়তে শুরু করেছে আর নাক-মুখও ভরে যেতে লাগল ধুলায়। যাইহোক, দ্রুত নিজের চামড়ার বোতল থেকে এক চুমুক পানি মুখে দিয়ে নীল কাপড়ে আবার চেহারা ঢেকে নেবার মাঝে জমকালো গোলন্দাজ বাহিনী দেখে না চমকে পারল না। সবচেয়ে বড় কামানটি এ মুহূর্তে পার হয়ে গেল তার পাশ দিয়ে। এত বড় পিতলের ব্যারেল, রহস্যময় পাখি আর সাপের ছবি খোদাই করা—প্রায় বিশ ফুটের কাছাকাছি। আট চাকার দেহটা বইতে কতটা ষাঁড় লাগছে? গুনে দেখল একটা অস্ত্র টানতে ঘেমে নেয়ে উঠছে ত্রিশটা পশু, একটা থেকে আরেকটা পশুর মাঝে দৌড়ে তাড়া দিচ্ছে সাদা-কাপড় পরা, খালি পায়ের চালক। অবাধ্য পশুর গায়ে লম্বা চাবুকের আঘাত আর দড়ি ধরে টানার ফলে এত জোরে চিৎকার করে উঠছে ষাঁড়গুলো যে মাঝে মাঝে পুরো সৈন্য শোভাযাত্রার শব্দ ছাপিয়েও সে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

যুদ্ধহাতির চেয়েও কামান—বাবর হিন্দুস্তানে এদের আগমন ঘটিয়েছেন তাও প্রায় দেড়শ বছর হয়ে গেল—যে কোন সেনাবাহিনীর প্রাণকেন্দ্র, অশ্বারোহী বা হাতির দলের আক্রমণ ঠেকানো ছাড়াও বিস্ফোরণের মাধ্যমে দেয়াল আর ফটকদ্বার ভেঙে, গুঁড়িয়ে দিতে পারে একটা শহরের শক্তি। বারুদের প্রস্তুতকারীরা—বেশিরভাগই তুর্কি ভাড়াটে সৈন্য সবসময় আরো ভালো বারুদের মিশ্রণ তৈরি করছে যেন বেড়ে যায় কামানের দূরবর্তী আঘাত ক্ষমতা আর বিশ্বাসযোগ্যতা। শুধু যদি, ভাবলো নিকোলাস, কামারশালার কারিগর এই বিশাল অস্ত্রগুলোকে আরেকটা হালকা করে তৈরি করত তবে বহনে আর গোলা ছুড়তে আরো সহজ হত।

কামানের পরে এলো কাঠের গরুগাড়ি, কয়েকটিতে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা ঢাকনা—বারুদ বোঝাই গাড়ি—আর কয়েকটিতে ভর্তি

পাথর আর লোহা পুড়ে রাখা কামানের গোলা। এদের পেছনে, বেশিরভাগই ঘোড়ার পিঠে বসে আছে আবার কেউ কেউ পায়ে হেঁটে আসছে, বন্দুকধারীর লম্বা অস্ত্র আর বারুদ ভরার শলাকা ঝুলছে তাদের ঘোড়ার গায়ে থেকে বা নিজেদের পিঠ থেকে। একই সাথে আছে বারুদের শিঙা বা চামড়ার থলেতে ভরা বন্দুকের গুলি। এদের অস্ত্রগুলো বেশিরভাগই ম্যাচলক। হিন্দুস্তানী আবহাওয়ার জন্য বেশি কার্যকর। অন্যদিকে নতুন আবিষ্কৃত হওয়া ফ্লিন্টলক্ ধুলা অথবা স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় গুলি ছুড়তে ব্যর্থ হয়। বন্দুকধারীদের সাথে সাথে আসছে নতুন গুলি তৈরির জন্য রাসায়নিক বহন করে নিয়ে আসা সৈন্যরা।

তীরন্দাজরা পাশ দিয়ে চলে যেতেই গরমে আরো বেশি ক্লান্ত আর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল নিকোলাস। পূর্ববর্তী অভিযানের চেয়ে সংখ্যায় কম হলেও এদের জোড়া ধনুক আর পালক লাগান তীর এখনো বন্দুকের গুলির চেয়েও দ্রুত ছুটতে পারে, যদিও ততটা ভয়ংকর নয় আচরণে।

শেষের একেবারে আগে এলো পদাতিক বাহিনী। কারো পায়েই জুতা নেই বলতে গেলে। সূর্যের প্রখর গরম থেকে রক্ষা পেতে হালকা সুতি কাপড় আর সাধারণ পাগড়ি পরে আছে বেশির ভাগ। কয়েকজনের হাতে তলোয়ার। বেশিরভাগের হাতে সাধারণ বর্শা। কিন্তু কয়েকজন বহন করছে যন্ত্রপাতির মত অস্ত্র যেমন কাস্তে আর কোদাল, যা দিয়ে শস্য খেতে কাজ করতেই অভ্যস্ত তারা। কিন্তু বেশিরভাগ অভিজ্ঞ সৈন্য সুলাইমানের সাথে শাহ সুজার পিছনে চলে যাওয়ায় তাড়াহুড়ো করে এদেরকে শস্য খেত থেকে উঠিয়ে নিয়ে সেনাবাহিনীতে পাঠিয়ে দিয়েছে জমিদারেরা।

যুদ্ধে এরকম অদক্ষ পদাতিকের কোন ভূমিকা কখনো দেখেনি নিকোলাস। হয় দ্রুত আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যায় নয়ত প্রতিরোধ করতে গেলে সহজেই কচুকাটা হয় শত্রুর হাতে। সম্ভবত এদের প্রধান ভূমিকা হচ্ছে সংখ্যায় বেশি হয়ে সাধারণ জনগণ অথবা অনভিজ্ঞ সেনাবাহিনীকে ভয় পাইয়ে দেয়া। আরো আধ-ঘণ্টা কেটে গেল ইতিমধ্যেই বিশৃংখল হয়ে পড়া পদাতিক বাহিনীর এলোমেলো যাত্রা শেষ হতে। অতঃপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অশ্বারোহী পশ্চাদভাগের সৈন্যদের এগিয়ে আসতে দেখতে পেল নিকোলাস—হালকা হলুদ অথবা কমলা রঙের আলখাল্লা পরিহিত

সুঁচালো-কানের মেওয়ারী ঘোড়ার উপর বসে থাকা রাজপুত সৈন্য আর বিশাল সব ঘোড়ার উপর বসে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ভারী দেহের পাঞ্জাবী সৈন্যদের মিশ্র একটি দল।

আনন্দে নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে হাত ইশারা করল নিকোলাস। জুন মাসের তপ্ত সূর্যের নিচে সকলেই ঘামছে তার মত, শিরস্ত্রাণ বেয়ে শ্বেদকণিকা নামছে মুখের উপর, এরপর মেরুদণ্ড বেয়ে মিশে যাচ্ছে পৃষ্ঠদেশের উপর থাকা বর্মের মাঝে। কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানালো নিকোলাস যে রসদ বোঝাই বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে হল না। কেননা হেলেদুলে এগোতে থাকে ভারী মালবাহী উট, খচ্চর আর হাড় জিরজিরে গাধার দল। আর এর সাথে আছে তাঁবুর পিছনে আসা বিচিত্র পেশার মানুষের মিছিল, দম বন্ধ করা ধুলার মাঝে চোখে পড়ল প্রায় আগ্রার ফটকের কাছে হুড়োহুড়ি করছে দলটা। এখনো সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে আনন্দ-বিনোদনের ব্যবস্থা; রাঁধুনী, দড়িবাজ, দেহপসারিণী মেয়েরা আর সাপুড়ের দল তাঁবুর জীবনে শূন্যতা ভরিয়ে তোলার পাশাপাশি প্রশমিত করে দেয় যুদ্ধের উদ্বিগ্নতা। এই অভিযান যদি স্বল্প সময়ের জন্য হত আর দারা-ই হয়ে যেত বিজয়ী, আপন মনেই ভাবল নিকোলাস। ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিয়ে আগে বাড়ল সে আর তারই মত আরো একবার চলার সুযোগ পেয়ে আগ্রহী হয়ে উঠল বাদামি ঘোড়া ছোট্ট পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে যোগ দিল দারার বিশাল সেনাবাহিনীর সাথে।

চম্বল নদীর তীর থেকে আস্তে করে মাছের খোঁজে উড়াল দিল দুটা সারস বক। চম্বলের চিকচিকে পানির মাঝে ছায়া পড়েছে এগুলোর বিশাল লাল মাথা আর ধূসর-শুভ্র পালকের। একটা মরা গাছের গুড়ির উপর বসে কৃতজ্ঞচিত্ত নিকোলাস তাকিয়ে দেখছে, আস্তে আস্তে বিদায় নিচ্ছে দুপুরের কড়া রোদ, পানি থেকে হাঁক ছাড়ল লম্বা, কৃশকায় ঘরিয়াল। এটাও বেরিয়েছে খাবারের খোঁজে।

ঘরিয়ালের মত কুমির আর কখনো দেখেনি নিকোলাস। স্থানীয় লোকেরা তাকে এই বলে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে এটা ক্ষতি করে না কারো, শুধু মাত্র মাছ খায়। আবার একই সাথে এ বলেও সতর্ক করে দিয়েছে

যে, মাংশাসী কুমিরদেরকেও প্রায় অগভীর পানিতে দেখা যায়। তাই যত গরমই পড়ুক না কেন বা যতই ইচ্ছে করুক না কেন, নদীতে সাঁতার কাটা যাবে না।

পেছনে শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি ঘুরে তাকাল নিকোলাস। না কোন কুমির নয়—মাছ খেকো অথবা অন্য কোন জাতের—তার দুই কি তিনজন সঙ্গী কর্মকর্তা হেঁটে যাচ্ছে দারার তাঁবুর দিকে, যে মিটিংয়ের ডাক সেও পেয়েছে। সময়ের কথা স্মরণ করে উঠে দাঁড়াল নিকোলাস, কাপড় ঝেড়ে হাঁটা ধরল তাঁবুর দিকে। যেতে যেতে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল কী কারণে হতে পারে এই সভা। পাঁচ দিন ধরে গরম আর ধুলাময় ধীর গতির যাত্রা শেষে আজ সকালে চম্বলে পৌঁছেছে সেনাবাহিনী। অনুমান করল হয়ত নদী পার হয়ে আওরঙ্গজেব আর মুরাদের মুখোমুখি হবার ব্যাপারে কথা হবে সভাতে—চম্বল কি অগভীর আর আস্তে আস্তে বইছে যেন নিরাপদে পার হওয়া যায় নাকি নৌকা সেতু তৈরিতে আরো সময় লেগে যাবে।

মিটিংয়ে প্রবেশের পাঁচ মিনিট পরে শামিয়ানার নিচে নিচু ডিভানে বসে থাকা দারার চারপাশে জড়ো হওয়া আটজন সেনানায়কের দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়িয়ে নিকোলাস বুঝতে পারলো সে ভুল ভেবেছে। ডিভানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভ্রমণকারীর মত চেহারার একজনের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে উঠল দারা, 'রবি কুমার মাত্রই ফিরে এসেছে চম্বলের তীর ধরে দক্ষিণে দুই দিনের পরিদর্শন শেষে। রবি, আমার কর্মকর্তাদের সুবিধার্তে সেখানে কী দেখেছ আরেকবার খুলে বল।'

মাথা নাড়ল রবি কুমার। 'সন্ধ্যায় আওরঙ্গজেব আর মুরাদের সেনাবাহিনীকে বিশ মাইলের মত নদীর নিচের দিকে দেখেছি আমি। অগ্রবর্তী সৈন্যদের বেশির ভাগ ইতিমধ্যে পার হয়ে এসেছে; কিন্তু বাকি সৈন্যরা রান্নার জন্য আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত। দেখে মনে হয়েছে অপর পাড়েই রাত কাটাবার পরিকল্পনা আছে।'

গুপ্তচর রবি কুমারের প্রথম শব্দ শুনতে পেয়েই বিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে এসেছে উপস্থিত অফিসারদের মুখ থেকে। এবার কথা বলে উঠল লম্বা, সুন্দর করে ছাঁটা দাড়িঅলা একজন। গোয়ালিওরের কাছে ছোট্ট একটা অঞ্চলের শাসক রাজা রাম সিং রাঠোরকে চিনতে পারলো

নিকোলাস। সাহস আর সামরিক পাণ্ডিত্য উভয় বিষয়েই সুখ্যাতি আছে রাজার। জানতে চাইলো, 'আমরা যতটা ভেবেছি তার চেয়েও দ্রুত এগিয়ে এসেছে তারা, মাননীয় শাহজাদা। সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে তাদের সঙ্গে?'

রবি কুমারকে উত্তর দেবার জন্য ইশারা করল দারা।

'আমি খুব বেশিক্ষণ থাকি নি বা কাছাকাছি যেতে পারি নি। কিন্তু মনে হয় প্রথম দিককার রসদবাহী মালগাড়ি আছে তাদের সাথে। সবসময় অন্য গাড়িগুলোও আসছে একটা একটা করে। আর দিগন্তে ধুলার মেঘ দেখে মনে হয়েছে আরো সৈন্য আর রসদ আসার এখনো বাকি আছে। আমার অনুমান আগামীকাল পুরো দিন লেগে যাবে নদী পার হয়ে তীরের কাছে পুনরায় একত্রিত হতে।

'ধন্যবাদ, রবি কুমার।' বলে উঠল দারা। ফিরে তাকাল সেনাপ্রধানদের দিকে। 'আমরা তাঁবু ভেঙে দিয়ে নদী পারাপার শেষ করার আগে তাদেরকে ধরতে পারি না?'

খানিকক্ষণ বিরতির পর আবারো কথা বলে উঠল রাজা রাম সিং রাঠোর, 'না, মাননীয় শাহজাদা। যদি সাথে ভারী অস্ত্র আর যুদ্ধহাতি নিতে চাই, আমার মনে হয় আমরা পারব না। এখন পর্যন্ত একদিনে মাত্র আট মাইলের মত চলতে পেরেছি আমরা। প্রাণীগুলোকে সর্বোচ্চ গতি দিয়ে এগোতে চাইলেও মনে হয় না দুই দিনের কমে সেনাবাহিনী সর্বশক্তি দিয়েও নদীর কাছে পৌঁছাতে পারবে। ততক্ষণে আওরঙ্গজেব আর মুরাদ আগ্রার দিকে যাত্রা শুরু করে দেবে আর তাদেরকে ধরা আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েব।'

'আমিও এই ভয়টাই পাচ্ছি।' বলে উঠল দারা। 'রবি আর অন্যান্য গুপ্তচরেরা ফিরে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে যতটা পেরেছি মানচিত্র দেখে কথা বলেছি চম্বলের তীরের থেকে আসা নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে। শত্রুরা যদিও নদী পার হয়ে এসেছে, আমরা তাদের চেয়ে উত্তরে আর আগ্রার বেশি কাছাকাছি আছি। তাই তারা যতই দ্রুত এগোক না কেন আমার মনে হয় যদি ভোরের আগে তাঁবু ভেঙে দিয়ে এখন থেকে পশ্চিমে এগোতে শুরু করি, তাহলে তাদেরকে বাধা দেয়ার জন্য পথিমধ্যে সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে যাবো আমরা। আপনাদের কী মনে হয়?'

'কোন ধরনের ভূমি পার হতে হবে আমাদেরকে?' জিজ্ঞেস করে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। বক্তাকে দেখতে পেল না নিকোলাস।

'আমাকে বলা হয়েছে অল্প কিছু বাধা বিপত্তি ব্যতীত বেশির ভাগটাই সমভূমি। যদিও কয়েকটা জায়গায় গভীর বালি আছে, যার কারণে ভারী যন্ত্রপাতির গতি খানিকটা শ্লথ হয়ে যেতে পারে। তার পরেও আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে এগিয়ে যাবার জন্য।'

আবারো কথা বলে উঠল প্রশ্নকর্তা। 'ধন্যবাদ, শাহজাদা। এক্ষেত্রে আর কোন সমস্যাই রইল না। সৈন্য আর জন্তুগুলো এত নিঃশোষিত হয়ে যায়নি যে সারা রাতের বিশ্রামের পরেও তরতাজা হয়ে উঠবে না।' শব্দগুলো খানিকটা কুণ্ডলী পাকানো হলেও অর্থ বোঝা গেল পরিষ্কারভাবে। সমস্বরে চিৎকার করে একমত হল সকলে। পাগড়ি পরিহিত মাথা নাড়ল অন্য কর্মকর্তারা।

'সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তাহলে।' বলে উঠল দারা। 'প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের ভার আমি আপনাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি, আমার বিশ্বস্ত সেনাপ্রধানেরা। লক্ষ্য রাখবেন সৈন্যরা যেন খানিকটা বেশি খাবার পায়। খুশি হবে সকলে। তাদেরকে জানাবেন, আপনাদের মতই তাদেরকেও পুরস্কৃত করব আমি, যখন বিজয় হবে আমাদের।' এর সাথে উঠে গেল দারা। আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেল তাঁবুর ভেতরে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার সূর্যালোকে নিজের তাঁবুর দিকে ফিরতে গিয়ে আপন মনে নিকোলাস না ভেবে পারল না যে, সেনাবাহিনীর জন্য খাবার আর পুরস্কারের ব্যাপারে যতটা উদার দারা, নিজের কর্মকর্তাদের উপর যতটা তার আত্মবিশ্বাস, তাহলে শাহজাদা নিজে কেন আরেকটা প্রধান ভূমিকা পালন করলো না। অন্তত নিজের সেনাপ্রধানদেরকে আরো একটু ভালোভাবে জানার সুযোগ পেত দারা। বিশেষ করে যেসব প্রজা রাজ্যের শাসক, যারা সেনাবাহিনী আগ্রা ছাড়ার ঠিক আগমুহূর্তে সম্রাটের নির্দেশে শহরে এসে পৌঁছেছে; কিন্তু শাহজাদার সাথে মিলিত হবার সুযোগ পায়নি। একজন নেতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা আদায়ের জন্য—বিশেষ করে একজন সম্ভাব্য সম্রাট যে কিনা গৃহযুদ্ধ লড়ছে, অধঃস্তনের প্রয়োজন তাঁকে চেনা, জানা একই সাথে নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কেও আশাবাদী হয়ে উঠতে পারবে তাহলে নিম্নপদস্থরা। উত্তরের দুই অভিযানের নিজের

অভিজ্ঞতা থেকে নিকোলাস জানে যে আওরঙ্গজেব অথবা মুরাদ কেউই এমন সহজ আচরণ করেনি। কিন্তু দারার সহজাত চারিত্রিক মাধুর্যও তাদের ছিল না আর অভিযানগুলোও ভয়ংকর পরাজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। ঈশ্বর চাইলে তাদেরকে আবারো একই ভাগ্য বরণ করতে হবে।

আস্তে করে ঘোড়ার উপর থেকে বালুময় ভূমিতে পড়ে গেল ফরাসী লোকটা। দেখামাত্র নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে লোকটার কাছে চলে এলো নিকোলাস। নিশ্চিত যে অসহ্য গরমের কবলে পড়ল আরো এক ভুক্তভোগী। দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকা সৈন্যের কাছে গিয়ে চিৎকার করে তাকে শুইয়ে দিল নিকোলাস। তারপর অন্য সহকর্মীদের সহায়তায় তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল ভারী লোহার দেহবর্ম, তুলে নিল বুকের উপর থেকে এত তেতে আছে যে মনে হল হাতে ছ্যাকা লাগবে গরমে।

ফরাসী সৈন্যটার হাত দু'টো কাঁপছে। চেহারা হয়ে গেছে লালচে-বেগুনি আর ধূসর চোখ জোড়া মাথার মত ঘুরছে। নিকোলাস কোমরবন্ধনীর কাছ থেকে নিজের পানির বোতল নিয়ে চেষ্টা করল মানুষটার মুখে কয়েক ফোঁটা ঢালতে। অল্প একটুই কেবল গড়িয়ে পড়ল সৈন্যটার ফাটা ঠোঁট আর দাঁতের সারির ফাঁক গলে। বেশিরভাগটাই গড়িয়ে পড়ল চিবুক আর গলা বেয়ে।

কাশতে শুরু করতেই আরো একটু পানি ঢেলে দিল নিকোলাস। 'ঢুলি নিয়ে আসো—পালকি—তাঁবুতে ফিরিয়ে নিতে হবে, কিন্তু তার আগে কপালে ভেজা কাপড় জড়িয়ে দাও।' আদেশ দিল নিকোলাস। হয়ত বেঁচে যাবে লোকটা, তাই আশা করছে সে। শক্ত-সমর্থ যোদ্ধা এই ফরাসী লোকটা হিন্দুস্তানে এসেছে বোর্দুয়া থেকে ফরাসী এক বণিক দলের সাথে। এরপর দলটাকে ছেড়ে চলেও আসে, কারণটা পরিষ্কার করে না বললেও অন্যদের ধারণা হাঁসের ডিমের মত বড়সড় একটা হারানো রুবির হাত রয়েছে এতে। যদি বেঁচে যায় তাহলে অন্য অনেকের চেয়ে ভাগ্যবানই বলতে হবে তাকে।

পানির বোতল থেকে নিজেও খানিকটা চুমুক দিয়ে ভাবতে লাগল নিকোলাস। নিজের আরো তিনজন সৈন্য হারিয়েছে সে—দু'জন

ঘটনাস্থলেই মারা গেছে—প্রতিবেশী পদাতিক সেনাদল থেকেও অসংখ্য প্রাণহীন দেহ সরিয়ে নিতে দেখেছে, তালপাতা আর মরা ডাল দিয়ে বানানো সাধারণ স্ট্রেচারের পাশ দিয়ে ঝুলছিল হাতগুলো।

ঠিক যেমনটা পরিকল্পনা করেছিল, তিনদিন ব্যাপী অত্যন্ত অবসাদময় যাত্রা শেষে দারার সেনাবাহিনী অবশেষে সফল হয়েছে আগ্রা মুখে আওরাঙ্গজেব আর মুরাদের বাহিনীর পথ রোধ করতে। নিচু পাহাড়ের উপর তাঁবু খাটানো হয়েছে—বলতে হয় ছোট্ট পাহাড়—এটি গ্রেট ট্রাঙ্ক রোডকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে আগ্রা যাবার পথে শহর থেকে দশ মাইল দূরে জায়গাটা, যেটির নাম নিকোলাস শুনেছে সামুগড়।

যখন তারা উপলব্ধি করতে পারল যে উত্তর দিকে যাবার তাদের প্রাথমিক পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, আওরঙ্গজেব আর মুরাদ ধুলার মেঘ ছড়িয়ে পশ্চিমে ঘুরে গেল দারার বিশাল সেনাবাহিনীর মুখোমুখি না হওয়ার জন্য। উত্তরে একটা দিকে সৈন্য নিয়ে ধাওয়া করল দারা, পিছু নিল ভাইদের ছাঁয়ার আর মাঝে মাঝেই ঝটিকা দল পাঠিয়ে বন্দিদের ধরে নিয়ে এলো। পুরো প্রক্রিয়াতে তেমন কিছু শিখতে পারল না দারা আর তার কর্মকর্তারা। শুধু বুঝতে পারল যে শত্রুপক্ষ অনড়, ভীতও হবে না অথবা আত্মসমর্পণও করবে না।

এইভাবে সামুগড়ের সমভূমির চারপাশে আগু-পিছু করার পর ৭ জুন সকালবেলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল দুই পক্ষের সেনাবাহিনী। উঁচু জায়গায় থাকার কল্যাণে প্রাথমিকভাবে খানিকটা সুবিধা পেল দারা। বাতাসবিহীন সকালবেলা ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল সূর্যের তেজ, তিন ভাইয়ের একজনও সাহস করল না এগিয়ে এসে কোন কিছুতে জড়িয়ে পড়তে। এমনকি নিকোলাসও অবাক হয়ে ভাবতে লাগল আলোচনার কোন সুযোগ হবে কিনা, যদিও সেটা পুরোপুরি আকাশ-কুসুম। গত পাঁচ ঘণ্টা ধরে যা ঘটে চলেছে তা হলো উভয় পক্ষের সৈন্যরাই হয় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে নয়তো ঘোড়ার পিঠে বসে আছে উত্তপ্ত রোদের মাঝে। সূর্য এখন ঠিক মাথার উপরে। ইতিমধ্যে মারা যাওয়া জন্তুগুলোর উপর উড়তে শুরু করে দিয়েছে শকুনের দল, চেয়ে আছে চোখ আর পেট থেকে ফুলে বেরিয়ে থাকা নীলচে অন্ত্রের দিকে, অনিচ্ছাকৃতভাবেও নিজের সম্ভাব্য গতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সৈন্যদেরকে যখন যুদ্ধ আসলেই শুরু হবে।

চারপাশে তাকিয়ে নিকোলাসের চোখে পড়ল, কোন দিকের সেনাবাহিনীর মাঝেই কোন রকম নড়াচড়া নেই। শুধু কম বয়সী পানি বাহকেরা নিজেদের থলি আর বোতল নিয়ে সৈন্যদের মাঝে ঘুরছে তৃষ্ণার্তকে দেয়ার জন্য, যদিও যথেষ্ট নয়। পানি যথেষ্ট নেই—গরমে তাই থামানো যাচ্ছে না সৈন্যদের নিস্তেজ হয়ে পড়া।

পরবর্তী দুই ঘণ্টায় নিজের আরো দু'জন লোককে হারাল নিকোলাস, একজন—অল্প চুলঅলা স্কটিশ, নাম অ্যালেক্স গ্রাহাম—মুরাদের সাথে উত্তরে প্রথম অভিযানের সময় থেকেই আছে নিকোলাসের সাথে, অনুনয় করে গেছে, যেন কোমরের থলেতে থাকা পাঁচটা রুপার মুদ্রা স্কটিশ হাইল্যান্ডে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয় নিকোলাস। যদিও তাকে আশ্বাস দিয়েছে নিকোলাস; কিন্তু জানে যে কত অসম্ভব কাজ হবে এটা, এমনকি যদি সে বেঁচেও যায়, ব্রিটেনে তো হিন্দুস্তানের মতই গৃহযুদ্ধ চলছে।

গভীর চিন্তায় এই প্রশ্নটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ করে বিপরীত দিকে সেনাবাহিনীর মাঝে চাঞ্চল্য দেখা গেল। অবশেষে আক্রমণ করতে আসছে তারা? চিৎকার করে নিজের লোকদেরকে প্রস্তুত হতে জানিয়ে দিল, খুশি হল যে যাক, অপেক্ষার পালা শেষ হবে—ভয়ংকর গরমে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই বুঝতে পারল যে আজ আর কোন যুদ্ধ হবে না। নিজেদের তাঁবুর দিকে ফিরে চলেছে শত্রুপক্ষ, বর্তমান অবস্থান থেকে এক মাইল পেছনে শীঘ্রি একজন কর্চির মাধ্যমে দারা'ও নির্দেশ পাঠালো পাহাড়ের উপর নিজেদের তাঁবুতে ফিরে যেতে। অন্তত আরো একটা দিন বেঁচে রইল তাহলে, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে, নিজের লোকদের ইশারা করে যেতে যেতে ভাবল নিকোলাস।

অধ্যায়-১৯

পরের দিন সকালবেলা ভোর হবারও আগে ঘুম থেকে জেগে উঠল নিকোলাস। সত্যি বলতে, রাতে তেমন ঘুমই হয়নি। গতকাল সন্ধ্যায় যুদ্ধ উপদেষ্টাদের সভায় সবাই একমত হয়েছে যে আরো একটা দিন প্রতিপক্ষের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। তাদের উচিত সংখ্যার দিক থেকে বেশি হবার সুযোগ নেয়া—প্রতিপক্ষের পঞ্চাশ হাজারের তুলনায় দারার সৈন্য সংখ্যা আশি হাজার। সকাল হবার সাথে সাথেই অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আক্রমণ শুরু করতে হবে।

নিকোলাস আর তার ভাড়াটে সৈন্যের ক্ষেত্রে দারার আদেশ হল তার যুদ্ধ পরিচালনার তাঁবুর ঠিক পেছনেই সংরক্ষিত সৈন্য হিসেবে প্রস্তুত থাকা। যে কোন দুর্বল জায়গায় আঘাত হানার জন্য সদা তৎপর থাকা। এই কাজে নিজেদের সামরিক অভিজ্ঞতা আর তুমুল যুদ্ধের মাঝেও স্নায়ুর দৃঢ়তা বজায় রাখার ক্ষমতা কাজে লাগাতে হবে।

নিজের লোকদের মাঝে দ্রুত ঘুরে বেড়াতে লাগল নিকোলাস। এখনো ঘুমিয়ে আছে বা স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়েছে এরকম সৈন্যদেরকে ঝাঁকুনী দিয়ে জাগিয়ে দিল, উৎসাহের বাণী শোনালো প্রত্যেককে, তলোয়ারগুলোর ধার পরীক্ষা করে দেখল; কিন্তু সবাইকে বারবার সেটা স্মরণ করিয়ে দিল তা হচ্ছে নিজেদের সাথে যত বেশি সম্ভব পানি নিয়ে যাওয়া। এরপর সকালের নাস্তা নিয়ে উঠে গেল ছোট পাহাড়টার চূড়ায়, যেখানে তাঁবু গেড়েছে তার দল। জরিপ করে দেখতে লাগল বিপরীত পাশের শত্রুদের অবস্থা। শুকনো সমভূমির দুই পাশে একে অপরের দিকে মুখ করে খাটানো তাঁবুগুলোর মাঝে দূরত্ব দেড় মাইল। মাটির ভাঁড় থেকে

লাচ্ছিতে চুমুক দিতে দিতে—পানি আর দইয়ের মিশ্রণ। খেয়ে ফেলল বেশ কয়েকটা গোল পরোটা। তাওয়া থেকে গরম গরম নামানোর পর খেতে বেশ সুস্বাদু লাগে, ঠিক এখন যেমন লাগছে, সাথে মুরগির রানের হাড়;

দারার উজ্জ্বল লাল বর্ণের তাঁবু আর তার সেনাবাহিনীর সামনের সারি থেকে চোখ ঘুরে গেল শত্রুর তাঁবুর দিকে। দেখতে পেল আওরঙ্গজেব আর মুরাদের সৈন্যরাও ঘুম থেকে উঠে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি এতদূর থেকেও উৎসাহী দৃষ্টি মেলে দেখতে পেল, হাতির পিঠে হাওদা পেতে দেয়া হচ্ছে আর তাঁবুগুলোর সামনে অশ্বারোহী সৈন্যরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হঠাৎ করেই—ভোর হয়েছে এখনো হয়ত এক ঘন্টাও হয়নি—শুনতে পেল সাদা ধোঁয়া ছড়িয়ে গর্জন করে উঠল বিপরীত পাশের ভারী তামার কামান, শত্রুর অবস্থানের মাঝামাঝি বড়সড় একটা তাঁবুর কাছ থেকে, যেটা নিকোলাস ধারণা করল আওরঙ্গজেব আর মুরাদের প্রধান সামরিক দপ্তর । তার মানে দারার মত তার ভ্রাতৃদ্বয়ও আর অপেক্ষা সহ্য করতে পারছে না।

সাথে সাথে উত্তর দিয়ে গর্জে উঠল দারার কামানগুলো। অনেকগুলো গোলাই কাছাকাছি পড়ল যেমন শত্রুরগুলো, শুকনো ভূমিতে পড়ে কোন ক্ষয়-ক্ষতি ঘটালো না কেবল কাঁকড় আর ধুলার বর্ষণ ছাড়া। যাই হোক, ক্রমশ বেড়ে যাওয়া ধুলার মাঝে দিয়ে নিকোলাস দেখতে পেল গর্জে উঠল আরেকটা শত্রু কামান, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মুহূর্তখানেকের জন্য শ্রবণশক্তি হারিয়ে গেল যেন। শব্দটা এসেছে তার পেছন দিক থেকে, বাম পাশে মনে পড়ে গেল সেখানে ছিল দারা'র বারুদ রসদবাহী গাড়িতে বহর, যুদ্ধ সভার উপদেষ্টারা ভেবেছিল শত্রুর কামানের গোলা ততদূর যাবে না। হয় আওরঙ্গজেবের কোন এক ভাগ্যবান কামান রেকর্ড ভঙ্গ করে গোলা ছুড়েছে, নয়ত দারার নিজের কোন এক বেখেয়াল গোলন্দাজ অস্ত্রের গাড়িতে গোলা ছুড়েছে। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা এই যে, ক্ষয়ক্ষতি যেন বেশি না হয়।

এই বিপর্যয়ের উত্তরেই যেন নিকোলাস দেখতে পেল দারার অশ্বারোহী বাহিনীর একদল সৈন্য প্রস্তুত হতে শুরু করেছে। বন্দুকধারী আর পদাতিক সৈন্যদের পাশ কাটিয়ে অতঃপর এগিয়ে যেতে লাগল দুই

সেনাবাহিনীর মাঝখানের খোলা ময়দানে। সেই একই রাজপুত আর পাঞ্জাবী সৈন্যরা যারা আগ্রা ত্যাগ করার দিনে পশ্চাদভাগের বাহিনী গড়ে তুলেছে একত্রে। যুদ্ধে এসে এখন তারা প্রথম হবে। একটু পরেই টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা আওরঙ্গজেব আর মুরাদের কামানের দিকে ছুটে গেল দলটা। বাতাসে তাদের সবুজ ব্যানার উড়ছে পতপত করে, হাতে উদ্যত বর্শা আর কোনমতে নিজেদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে একজোট হয়ে দৌড়ানোর জন্য, নতুবা শত্রুর গুলির মধ্যে পরিণত হবে সহজ নিশানায়।

এমনকি এতদূর থেকেও রাজপুতদের রণহুঙ্কার শুনতে পেল নিকোলাস 'রাম! রাম! রাম!' ছুটছে সকলে। শত্রুপক্ষ থেকে আধা মাইল দূরত্বে থাকতেই আবারো তাদের উপর গর্জে উঠল আওরঙ্গজেব আর মুরাদের কামান। সাথে সাথে পড়ে গেল একেবারে প্রথম ব্যানার বহনকারীর তামাটে ঘোড়াটা। মাথার উপর বনবন করে করে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে আছড়ে পড়ল আরোহীর প্রাণহীন নিথর দেহ। কিন্তু দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া দেহটার সাথে জড়িয়ে বাতাসে উড়তে লাগল ব্যানার। পড়ে গেল আরো ঘোড়া আর তাদের আরোহীরা। একই সাথে অন্যরা আবার পথ করে নিয়ে ছুটে চলল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। হয় আহত হল নতুবা আরোহীরা জখম হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। তারপরেও বাকি অশ্বারোহীরা একটুও না থেমে, শিরস্ত্রাণ পরা মাথা ঘোড়ার গলার সাথে লেপ্টে রেখে ছুটে চলল শত্রুর দিকে।

বন্দুকধারী সৈন্যরা আওরঙ্গজেব আর মুরাদের কামানের ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের তেপায়াটুল আর লম্বা নলওয়ালা বন্দুক নিয়ে নিশানা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কামানের গোলার সাথে যুক্ত হল বন্দুকের গুলি। তাদের প্রথম যৌথ আক্রমণেই খালি হয়ে গেল আরো কিছু ঘোড়ার পিঠ, আরো অসংখ্য ঘোড়া হোঁচট খেয়ে পড়ল ধুলার মাঝে, গড়াতে গড়াতে ভেঙে গেল পা আর খুর। কিন্তু ততক্ষণে কামানের কাছে পৌঁছে গেল দারার অশ্বারোহী সৈন্যরা। বর্শা দিয়ে, তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে কচুকাটা করতে লাগল গোলন্দাজ আর বন্দুকধারীদের। একটু পরেই অস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেল বেশির ভাগ শত্রু বন্দুকধারীরা। আনন্দিত হয়ে উঠে নিকোলাস দেখতে পেল জিতে যাচ্ছে সম্রাটের সৈন্যরা। দারাও নিশ্চয়

একই কথা ভাবছে। নিজের রক্তলাল তাঁবুর পাশে বিশাল যুদ্ধহাতির পিঠে হাওদার মাঝে দাঁড়িয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে শাহজাদাকে মুষ্টিবদ্ধ হাত মাথার উপরে তুলতে দেখল নিকোলাস।

যাই হোক, এর এক কি দুই মিনিট পর আবার শত্রু কামানের পাশে যুদ্ধরত সৈন্যদের দিকে তাকাতেই দেখা গেল, আওরঙ্গজেব আর মুরাদের সেনাবাহিনীর বাম পাশ থেকে অশ্বারোহী সৈন্যদের বিশাল একটি অংশ টগবগিয়ে এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দারার বাহিনীর উপর। কয়েক মিনিটের জন্য মনে হল সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাথর খণ্ডের উপর, এমনভাবে কামানের কাছে-দূরে চলতে লাগল যুদ্ধ। ধীরে ধীরে ফলাফল চলে গেল শত্রুবাহিনীর অনুকূলে—আরো বেশি সংখ্যক সৈন্য এসে যোগ দিতে লাগল তাদের সাথে।

প্রায় বিশ মিনিট পরে দেখা গেল ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসতে শুরু করেছে দারার ব্যানার। আর কোন সন্দেহই রইল না। দারার অশ্বারোহীরা, সংখ্যায় একেবারে কমে গিয়ে দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসতে চাইছে নিজেদের সারির দিকে। মুরাদ আর আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা তাদের পিছু ধাওয়া না করলেও পড়ে যেতে লাগল আরোহী, বন্দুকের গুলি এসে ধাক্কা দিচ্ছে সবাইকে। কমলা পোশাকের এক রাজপুত সৈন্য পড়ে গিয়েও পা আটকে ফেলল পা-দানির সাথে। ঘোড়াটা তাকে বহুদূর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলো যতক্ষণ পর্যন্ত না ভেঙে গেল চামড়ার পা-দানি। নিথর হয়ে পড়ে যাবার আগে আরো বার কয়েক গড়িয়ে গেল দেহটা। অন্যদিকে আবার আরেক জন সাহসী অশ্বারোহী শত্রুর গুলির মুখে আঁকাবাঁকা হয়ে নিজের ধূসর রঙের ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে ছো করে তুলে নিয়ে এলো নিজের আহত সহযোদ্ধাকে। অন্যান্য ঘোড়াবিহীন সৈন্যরাও দৌড়ে, মাটি ঘষটে ঘষটে যেভাবে পারছে ফিরে আসতে চাইছে নিজেদের সারির দিকে, দেহবর্ম আর শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলে দিয়েছে অনেকে, যেন চলতে গিয়ে ভারের কারণে গতি না থেমে যায়।

একটা আরোহীবিহীন আতঙ্কিত ঘোড়া—অনেকগুলোই আছে এমন—মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল এক সৈন্যকে, বেচারা পাশ দিয়ে যাবার সময় চেষ্টা করেছিল ঘোড়ার লাগাম ধরতে। বহুকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে ডান পা টেনে টেনে ফিরে আসতে লাগল সৈন্যটা। শীঘ্রি বাকিরা যারা ঘোড়ার পিঠে

ছিল, এসে পড়ল নিজেদের সঙ্গীদের ভেতরে, নিরাপত্তার মাঝে। একেবারে শেষে যারা এসেছে, তাদের মাঝে আছে একজন ব্যানার বাহক সৈন্য, তার আহত ঘোড়াটা প্রায় শ'খানেক গজ দৌড়ে এসে এখন ঢলে পড়ল আস্তে করে। স্থূলকায় পাঞ্জাবী সৈন্যটা ভারী ব্যানার হাতে নিয়েই দৌড়ে পার হয়ে এল বাকি পথটুকু। অন্য দিকে সহিসেরা দৌড়ে এসে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল আহত সৈন্যদেরকে, মারাত্মকভাবে আহতদেরকে হাতে বানানো খাটিয়াতে যত্ন করে শুইয়ে দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল হাকিমদের তাঁবুর দিকে।

এর আগে একদিন হাকিমদের একটা তাঁবুতে উঁকি মেরেছিল নিকোলাস, দেখতে পেয়েছিল লাল-অ্যাপ্রন পরিহিত চিকিৎসকেরা শান্ত মুখে সাজিয়ে রেখেছে নিজেদের ছুরি, কাঁচি আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি, অন্যদিকে সাহায্যকারীরা আগুন জ্বেলে প্রস্তুত করে রেখেছে লোহার পাত। তাড়াতাড়ি অন্যপাশে চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল নিকোলাস, আহত হলে কী করা হবে তাকে নিয়ে সেটা আর ভাবতে চায়নি মন। এর পরিবর্তে গভীরভাবে ভেবে দেখতে চাইল, অশ্বারোহীদের উপর নিজেদের বিজয়ের সুযোগ নিয়ে কেন পিছু ধাওয়া করে এলো না আওরঙ্গজেব আর মুরাদ। এমন সময় এক কর্চি এসে জানালো নিজের তাঁবুতে যুদ্ধসভা ডেকেছে দারা।

কাছাকাছি থাকায় প্রথমেই পৌঁছে গেল নিকোলাস। শামিয়ানার নিচে ঢুকতেই দেখতে পেল স্বর্ণের দেহবর্ম পরে ভাইদের তাঁবুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দারা, সেখানে শ্রমিকেরা অসহ্য গরম উপেক্ষা করেও যুদ্ধ করছে প্রথম আক্রমণে ধরাশায়ী হয়ে যাওয়া কামানগুলোকে ঠিকঠাক করতে। অন্যরা ষাঁড় দিয়ে টেনে আনা গাড়ি থেকে কামানের গোলা আর বারুদ নামিয়ে সাজিয়ে রাখছে গোলন্দাজদের কাছে। আরো একদল সৈন্যের ছোট একটা দল ছুটে বেড়াচ্ছে আহত আর নিহত সৈন্যদের মাঝে। কয়েকজনকে বয়ে নিয়ে যেতে দেখতে পেল নিকোলাস, নিঃসন্দেহে নিজেদের সৈন্য। অন্য আরেকটা দল আহত ঘোড়াগুলোর গায়ে বিঁধিয়ে দিচ্ছে বর্শা। মনে হল জন্তুগুলোকে দুদর্শা থেকে মুক্তি দেবার গুরুভার কাঁধ থেকে নামিয়ে ছুটে গেল অন্য দেহগুলোর দিকে। ঝুঁকে পড়ে খুঁজে দেখল মূল্যবান কিছু পাওয়া যায় কিনা; এরপর বুকের মাঝে ঢুকিয়ে দিল বর্শার ফলা। একজন আহত সৈন্য কী ঘটছে দেখতে

পেয়ে হঠাৎ করেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দৌড়ে আসতে চাইল দারার সারির দিকে টলোমলো পায়ে। কিন্তু দেখতে পেল একজন হত্যাকারী। এক লাফে আহত সৈন্যের কাছে এসে সহজেই ধরে ফেলল, মাটিতে ফেলে আগ্রহের সাথে গেঁথে ফেলল নিজের বর্শা দিয়ে।

দারা, পরিষ্কারভাবে সেও দেখতে পেয়েছে পুরো ঘটনাটা। চিৎকার করে উঠল, 'কেমন করে তারা এত নিষ্ঠুর হচ্ছে?'

'মাননীয় শাহজাদা! এটা যুদ্ধ আর যুদ্ধ নির্মম হয়, বিশেষ করে গৃহযুদ্ধ। কিন্তু এর চেয়েও খারাপভাবে শত্রুহস্তে সৈন্যদেরকে মারা যেতে দেখেছি আমি উত্তরে অভিযানে।' উত্তর দিল নিকোলাস।

'যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি। সত্যি কথা বলতে আমার অভিজ্ঞতা একেবারে অল্প আর আমি অল্পই চাই। যত শীঘ্রি এই যুদ্ধ শেষ হয় ততই মঙ্গল।'

এই ফাঁকে দারার বাকি সেনাপতিরা এসে জড়ো হলো তার চারপাশে আর তাদেরকে স্বাভাবিক পদ্ধতি বা দরবারের ব্যঞ্জনাপূর্ণ স্বাগত না জানিয়েই শাহজাদা বলে উঠল, 'আমি দেখেছি কীভাবে আমাদের সাহসী লোকগুলোকে হত্যা করছে শত্রুরা, যারা অশ্বারোহীরা পিছু হটাতে আহত হয়ে পড়ে আছে সেখানে। আমি তাদেরকে আবারো এ সুযোগ দিতে চাই না। আমরা আর কখনো পিছু হটে আসবো না। আমাদের পরবর্তী আক্রমণ হবে হাতে থাকা সমস্ত সৈন্য নিয়ে একযোগে।'

'এটা বেশ সাহসী পদক্ষেপ, মাননীয় শাহজাদা; কিন্তু এটা কি ঠিক হবে?' জানতে চাইল রাজা জয় সিং, 'একটা আক্রমণে সমস্ত বাহিনীকে ব্যবহার করা? অনিশ্চিত ভবিষ্যত বা কোন প্রতিরোধের জন্য কয়েক রেজিমেন্ট সৈন্যকে রিজার্ভ রাখা উচিত নয় কি?'

'সৈন্যদেরকে ধরে রাখলেই বরঞ্চ প্রতিরোধ বেশি আসবে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবার সুনিপুণভাবে আঘাত করে আজকের মাঝেই শেষ করতে হবে এ যুদ্ধ। আমাদের সৈন্যদের প্রস্তুত হতে কত সময় লাগবে?'

'এক ঘণ্টা, সম্ভবত, শাহজাদা।' উত্তরে জানালো রাজা। 'আর এবার, আমি পরামর্শ দেবো আক্রমণের সফলতার জন্য শত্রুর সারিতে কামানের গোলা ছুড়ে সৈন্যদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া সহ তাদের বাকি কামানগুলোকে অকেজো করে দেওয়ার জন্য।'

'প্রয়োজনীয় আদেশ দিয়ে দিন।'

'ভুলে যাবেন না, মাননীয় শাহজাদা, যখন আমরা নিজেদের প্রস্তুতি নিতে থাকবো', পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'আমাদের খেয়াল রাখতে হবে শত্রু সৈন্যরা জড়ো হয়ে আমাদের উপর চড়াও হবার কোন পাঁয়তারা করছে কিনা।'

আরেকটা বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, ভেবে দেখল নিকোলাস। যুদ্ধের ক্ষেত্রে, ঠিক যেমন প্রতিযোগিতায় হয়, শুধুমাত্র নিজের পরিকল্পনা নিখুঁত করাটাই যথেষ্ট নয়, শত্রুর দিকেও তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর উত্তর দেবার ব্যাপারেও সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

'হ্যা, অবশ্যই। আমরা আরো বেশ কিছু গুপ্তচর পাঠিয়ে দেব, যেন শত্রুপক্ষের যে কোন তৎপরতা তৎক্ষণাৎ জানা যায়। যাই হোক, আমার মনে হচ্ছে সংখ্যায় কম হবার কারণে আমার ভাইয়েরা আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করেছে। আমি নই। আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিন, জয় সিং। আমার বিশ্বস্ত আর বিজ্ঞ উপদেষ্টামণ্ডলী, আমি আপনাদের সবার কাছে ঋণী। আর আমার পিতা, আমাদের সত্যিকার সম্রাটও একই কথাই বলবেন। সবাইকে সৌভাগ্যের শুভেচ্ছা আর আল্লাহ বিজয় দিয়ে আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন। সভা শেষ করা হল।

আবারো বিস্মিত হয়ে নিকোলাস ভাবতে লাগল, শেষ মন্তব্যের মাধ্যমে দারার আন্তরিক বদান্যতা ভাব ফুটে উঠলেও কর্মকর্তারদের সাথে আরেকটু সময় না কাটানোর সিদ্ধান্তটা হয়ত ভালো হয়নি। কেননা, সেনাপতিদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা, তার সহজ রণকৌশল সম্পর্কে আরো পরামর্শ নেয়া, নিদেনপক্ষে সকলকে উৎসাহী করে তোলার জন্য বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন ছিল যে এই বিজয় কেন সাম্রাজ্যের আর তাদের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে দারাকে চেনার সুবাদে পরিবার, ব্যক্তিগত জীবন আর ঘনিষ্ঠ মিত্রদের সাথে দারার উষ্ণ আর মনোমুগ্ধকর আচরণ সম্পর্কে যথেষ্ঠ ওয়াকিবহাল নিকোলাস। এখন মনে হল সমর্থকদের সাথে এহেন আলোচনার ক্ষেত্রেও আরেকটু খোলামেলা, সহজ হতে পারত দারা। এখন পর্যন্ত দারার হাতে সৈন্যের যে সর্বাধিক সংখ্যা আছে, তাতে

তার রণকৌশল সফল হওয়া উচিত আর আল্লাহ চাইলে, সন্ধ্যার মাঝে সে আর তার সৈন্যরা বিজয়ীর বেশে ঘোড়া ছুটাতে পারবে আগ্রার দিকে।

দেড় ঘণ্টা পরে, নিজের বাদামি ঘোড়ায় চড়ে দারার তাঁবুর পেছনে আবারো ছোট্ট পাহাড়টার মাথায় উঠে গেল নিকোলাস। পুরোদস্তুর রণ সাজে সজ্জিত হয়ে এবার ঘামতে লাগল বুক আর পিঠের বর্মের নিচে, ডান পাশে লম্বা তলোয়ার আর নীল কোমরবন্ধনীর সাথে আটকে আছে কন্দাকৃতি-হাতলঅলা দুইটা পিস্তল। ঢাকের বাজনা বেজে উঠতেই তাকিয়ে দেখতে পেল সামনের সারিতে প্রায় দেড় মাইল লম্বা লাইন ধরে একত্রে এগোতে শুরু করেছে দারার সৈন্যরা। ডান পাশে রাজা রাম সিং রাঠোরের রাজপুত সৈন্যরা আর বাম পাশে খলিল উল্লাহ খানের উজবেক সৈন্যগণ। একটু আগে দুই সেনাবাহিনীর মাঝে কামানের গোলা বিনিময়ের ফলে সৃষ্ঠ সাদা ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে চলতে শুরু করল দলটা। একটু আগেই আশি মিনিট ধরে উভয় পক্ষ যথেষ্ট গোলাবারুদ খরচ করে ফেললেও কোন পক্ষই মনে হল না তেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। শুধুমাত্র স্পষ্ঠভাবে চোখে পড়ল একে অন্যের কাছে থেকে কয়েক ফুট দূরত্বে বিশাল ধূসর পাথরখণ্ডের মত পড়ে আছে দারা আর মুরাদের তিনটা হাতি। কামানগুলোকে আরো একটু এগিয়ে আনতে গিয়ে কুপোকাত হয়ে গেছে বিশাল জন্তু তিনটা।

একে একে আরো সৈন্য এসে এগোতে শুরু করল দারার বাহিনী থেকে। একটু পরে দারার নিজের বিশাল হাতিও এগোতে শুরু করতেই রত্নখচিত সুউচ্চ হাওদা থেকে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল শাহজাদা। তার হাতির আকার আর হাউদা'র নির্মাণগুণে সকল সৈন্যরা শাহজাদাকে দেখছে আর সে নিজেও অন্যদেরকে দেখতে পাচ্ছে যা ভিন্ন কোন উপায়ে সম্ভব হত না।

নিজ সৈন্যদেরকে নিয়ে যেখানে ছিল সেখানেই থাকার জন্য শাহজাদার আদেশ পালন করতে গিয়ে ছোট্ট পাহাড়টার উপরে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সেনাবাহিনীর এগিয়ে যাওয়া সহ যুদ্ধের গতি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নিকোলাস। মাঝে মাঝে কুণ্ডুলি পাকানো ধোঁয়া এসে দৃষ্টিপথে বাধা দিচ্ছে, বুঝতে কষ্ট হচ্ছে যে কতটা এগোল যুদ্ধ।

ডান দিকে রাজা রাম সিং রাঠোরের কমলা আর কেশর রঙা পোশাক পরিহিত অশ্বারোহী সৈন্যরা বাকিদেরকে ছেড়ে এগিয়ে গেল দ্রুত—শত্রুপক্ষের একেবারে মাঝখানে গিয়ে আঘাত হানল।

আরো একবার ধোঁয়া এসে বাধা দেয়ার পর তাকাতেই নিকোলাস অনুমান করতে পারল এর কারণ। সৈন্যসারির পাশাপাশি হাওদাসহ দু'টি বিশাল হাতি চলতে শুরু করেছে, চারপাশে ব্যানার বাহকদের। নিজের সৈন্যদেরকে দৃঢ় হতে উৎসাহ দিচ্ছে আওরঙ্গজেব আর মুরাদ। রাজা রাম সিং রাঠোর নির্ঘাৎ বিজয়ীর খেতাব নিতে চাইছে নিজের মাথায়, যেন রাজপুত সৈন্যদের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে সবাই। আবার বিদ্রোহী দুই ভাইকে হত্যা অথবা বন্দি করার মাধ্যমে প্রতিশোধ নেয়া হবে ধর্মতের যুদ্ধে চাচাত ভাই যশয়ন্ত সিংয়ের পরাজয়ের। কিন্তু পরিষ্কারভাবে দেখা গেল এই বেপরোয়া মনোভাবের কারণে মূল্য দিতে হচ্ছে তার সৈন্যদের, শত্রু সারির মাঝখান থেকে গর্জে ওঠা কামান বা বন্দুকের গুলিতে পড়ে যেতে লাগল একের পর এক সৈন্য।

শ্বেত-শুভ্র তেজী ঘোড়ার উপর থাকা রাজা রাম সিং রাঠোর আর তার দুই পাশের ব্যানার বাহকেরা অলৌকিকভাবে রয়ে গেল একেবারে অক্ষত আর তাই সবার আগে পৌঁছে গেল বিদ্রোহী দুই ভাইয়ের চারপাশ ঘিরে থাকা সৈন্যদের মাঝে, ঠিক পেছনেই আছে প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসা রাজপুত বাহিনী।

এতদূর থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সবকিছু দেখা বেশ কষ্টকর হলেও নিকোলাসের চোখে পড়ল, একজন রাজপুত সৈন্য গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা হাতির উপর। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত আর রণসাজে সজ্জিত আরো কয়েকটি অশ্বের মত এ ঘোড়ার মুখে মুখোশ লাগান, হাতির মাহুতের উপর আঘাত করল রাজপুত সৈন্য। কিন্তু হাওদার একজন দেহরক্ষী উঠে দাঁড়িয়ে দু'বার চালাল তার হাতের বর্শা। চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল ঘোড়া আর তার রাজপুত আরোহী।

রাজা রাম সিং রাঠোরের একজন ব্যানার বাহক পড়ে গেল। কিন্তু অন্যান্যরা রয়ে গেল নেতার কাছাকাছি। অন্য আরেক রাজকীয় হাতির দিকে ছুটে গেল রাজা। প্রতিপক্ষ হয় তার কাছ থেকে সরে গেল নয়ত কেঁপে উঠল আঘাতের চোটে। হঠাৎ করেই বাকি ব্যানার বাহক সামনের

দিকে পড়ে গেল ঘোড়া থেকে আর মাটির উপর নিজের কমলা রঙা ব্যানার নিয়েই জড়িয়ে গেল। এরপর গর্জে উঠল রাজার নিজের সাদা ঘোড়া। সেও কি হাতির মাহুতকে আঘাত করার কথা ভাবছিল? কিন্তু পেছন দিকে সরে এলো ঘোড়া, আর যেই মুহূর্তে পেছনে হেলে গেল জন্তুটা, সাথে সাথে নেমে উদ্যত তলোয়ার বাগিয়ে ধরে আর নিচু হয়ে হাতির দিকে ছুটে গেল রাজা। লেবুরঙা পাগড়ি আর কমলা-সাদা জোব্বা পরিহিত রাজাকে চিনতে একটুও কষ্ট হল না। সাহসের সাথে চেষ্টা করল হাতির পেটের নিচে ঢুকে যেতে; সম্ভবত হাওদার জায়গায় পেটের নাড়ী কেটে দেয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন সফল হতে পারল না রাজা; পড়ে গিয়ে আহত হল আর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই চ্যাপ্টা হয়ে গেল হাতির পায়ের নিচে পড়ে।

রাজার অকুতোভয় সৈন্যরা তারপরেও যুদ্ধ করতে লাগল। দ্রুত বাড়তে থাকা ধোঁয়ার মাঝে দিয়েও নিকোলাসের চোখে পড়ল রাজপুতদের সাথে আরো যোগ দিতে শুরু করেছে দারার মধ্যভাগের অশ্বারোহী সৈন্যরা—অযোধ্যা, কাশ্মির আর অন্যান্য জায়গা থেকে আগত বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ যোদ্ধারা। আওরঙ্গজেব আর মুরাদের হাতিদ্বয় ইতিমধ্যে ঘুরে গিয়ে অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনী সহ নিজেদের সৈন্যগণের মাঝে ঢুকে গেল নিরাপত্তা বলয়ের ভেতরে। তলোয়ার দিয়ে কচুকাটা করতে করতে তাদের পিছু নিল দারার অশ্বারোহী বাহিনী। দারার বাহিনী অল্প একটু এগিয়ে গেলেও যুদ্ধ যে কঠিন আর সমানে সমান হচ্ছে তা পরিষ্কারভাবেই বোঝা গেল। দারার সুউচ্চ হাওদা ধীরে ধীরে একেবারে যুদ্ধের মাঝখানে এগিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেল নিকোলাস। এমনকি দারা মাত্র আধা ঘণ্টারও কম সময় আগে নিজের সত্যিকারের যাত্রা শুরু করলেও নিকোলাসের কাছে মনে হল যুদ্ধের গতি বড় বেশি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বুঝতে পারল এখনই নিজের সৈন্যদের নিয়ে তারও উচিত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া, কিন্তু কোথায়? আবারো ময়দানের প্রতিটি অংশ ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখল নিকোলাস, খেয়াল করল বাম পাশে খলিল উল্লাহ খান আর তার সৈন্যরা যেন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে পড়েছে।

নিকোলাস বুঝতে পারল না এর কারণ। উত্তরের যুদ্ধে কখনো পিছু হটতে দেখেনি খলিল উল্লাহ খানকে। আবারো তাকিয়ে শূন্যস্থানটাকে ক্রমশ বেড়ে যেতে দেখল নিকোলাস। আতঙ্কিত হয়ে দেখতে পেল যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে, দারার পক্ষ ত্যাগ করে চলে আসছে খলিল উল্লাহ খান আর তার উজবেক সৈন্যরা। এটা নিশ্চয়ই পূর্ব-পরিকল্পিত। সমরকন্দের বিরুদ্ধে অভিযানে আওরঙ্গজেবের বেশ কাছাকাছি ছিল খলিল উল্লাহ খান। আর দারার বাহিনীতে তাকে দেখতে পেয়ে একটু বিস্মিতই হয়েছিল নিকোলাস। কিন্তু কথা বলার সময় সহজ সুরে সংক্ষিপ্তভাবে খলিল উল্লাহ খান শুধু এটুকুই জানিয়েছিল যে একমাত্র মুকুটধারী সম্রাটের প্রতিই বিশ্বস্ত সে, অতীতে আওরঙ্গজেবের দক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধা যাই থাকুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। এখন বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কারভাবে ভণিতা করেছে খলিল উল্লাহ খান; অপেক্ষা করেছে কখন মোক্ষম আঘাত হানতে পারবে।

যেন নিকোলাসের সন্দেহকে সত্যি প্রমাণ করতেই দারার সামনে সৃষ্টি হওয়া শূন্যস্থানের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এলো একদল বিদ্রোহী বাহিনীর অশ্বারোহী সৈন্য। খলিল উল্লাহ খানের প্রস্থানগামী সৈন্যদের পাশ দিয়ে এগিয়ে এলো, যেন নিশ্চিতভাবেই জানে যে কোন ধরণের সাবধানতার প্রয়োজন নেই। খলিল উল্লাহ খানের কীর্তি দারাও দেখতে পেয়েছে নির্ঘাৎ, কেননা ঘুরে গিয়ে তার হাতিও হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসতে চাইল, পেছনে দেহরক্ষীর দল। ইশারা করে নিজের সৈন্যদের ঘোড়ায় উঠে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিল নিকোলাস। জানে এখন তাদের দায়িত্ব কী—দারার দিকে এগিয়ে গিয়ে ফাটলটাকে মেরামত করতে সাহায্য করা।

দুই কি তিন মিনিটের মাথায় যুদ্ধের ময়দানের ঘন ধোঁয়ার ভেতরে ঢুকে গিয়ে জ্বালা করে উঠল নিকোলাসের চোখ আর নাক। একটু ফাঁক পেতেই দেখতে পেল তিন থেকে চারশ গজ দূরে থেমে আছে দারার হাতি। হাত আর পা দিয়ে সমানে তাগাদা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেল এর কারণ। হাওদা থেকে নিচে নেমে আসছে দারা। আরেকটু কাছে এগিয়ে যেতেই যুদ্ধের চিৎকার-চেঁচামেচি আর অস্ত্রের গর্জন ছাপিয়ে দারার দেহরক্ষীদের প্রধানের কাছে জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার? শাহজাদা কেন নেমে যাচ্ছে? হাতি আহত হয়েছে?

'না, হাতি ঠিকই আছে। শাহজাদা ঘোড়ায় চেপে আরো দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে খলিল উল্লাহ্ খান থেকে পাওয়া অপ্রত্যাশিত ষড়যন্ত্রের জবাব দিতে।'

এক কি দুই মিনিটের মাথায় কপালে সাদা রঙের উজ্জ্বল দাগঅলা একটা কালো তেজী ঘোড়ার উপর উঠে বসল দারা। এগিয়ে গেল বাম দিকের যুদ্ধের মাঝে, পেছনে গেল দেহরক্ষীদের দল, নিকোলাস আর তার সৈন্যরা। মাহুতকে রেখে গেল রাজকীয় হাতিকে শূন্য হাওদা সহ দারার শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

একটু পরেই দারা, নিকোলাস আর তাদের অনুসরণকারীরা এগিয়ে গেল রণ-সাজে সজ্জিত বিদ্রোহী সৈন্যদের দিকে। তীরের মত করে আশেপাশের সৈন্যদেরকে কচুকাটা করতে করতে এগিয়ে আসছে দারাদের দিকে। নিজের লম্বা দ্বি-ফলা তলোয়ার বের করে পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময় এক বিদ্রোহী সৈন্যের দিকে আঘাত করল নিকোলাস। নিজের তলোয়ার দিয়ে নিকোলাসের আঘাত ঠেকিয়ে দিল সৈন্যটা আর একই সাথে নিজের ভোজালি দিয়ে আঘাত করতে চাইল নিকোলাসকে। ঘোড়ার পিঠে বসে ঘুরে গেল নিকোলাস, নাকের সামনে দিয়ে বাতাস কেটে বের হয়ে গেল বিদ্রোহী সেনার খড়্গ। প্রায় সাথে সাথে নিজের চঞ্চল দ্রুত ঘোড়াকেও ঘুরিয়ে নিল বিদ্রোহী লোকটা—টাট্টু ঘোড়ার চেয়ে একটু বড়। আরো একবার আঘাত করতে এগিয়ে এলো নিকোলাসের দিকে; প্রথম বার আঘাতের ধাক্কায় এখনো বেসামাল হয়ে আছে দারার ইংরেজ সেনাপ্রধান।

নিকোলাসের এই অবস্থা দেখে আর প্রতিপক্ষকে খতম করে দেয়ার আশায় বিদ্রোহী সৈন্যটা সাবধানে হাত মাথার পিছনে নিয়ে চাইল সর্বশক্তি দিয়ে খড়্গ তুলে নিকোলাসের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে। এই ফাঁকে নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে নিজ তলোয়ারের অসম্ভব লম্বা দৈর্ঘ্যকে কাজে লাগিয়ে নিকোলাস অস্ত্রটা ছুড়ে দিল বিদ্রোহী সেনার অরক্ষিত বগলে। চিৎকার করে উঠে একপাশে সরে গিয়ে হাতের খড়্গ মাটিতে ফেলে দিল লোকটা। দ্বিতীয় আরেক বিদ্রোহী সেনা বর্শা বাগিয়ে ধরে এগিয়ে এলো নিকোলাসের দিকে। কিন্তু নিকোলাসের শক্ত ইস্পাতের দেহবর্মে লেগে পিছলে গেল বর্শার ফলা আর তড়িঘড়ি করে লোকটার

হাতের উপরের দিকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল নিকোলাস। চিৎকার করে কেঁপে উঠল দ্বিতীয় বিদ্রোহী সেনা, ছুড়ে ফেলে দিল অকমর্ণ্য বর্শাটা, ক্ষত থেকে হাত বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল রক্ত।

চারপাশে তাকিয়ে নিকোলাসের চোখে পড়ল দারার দেহরক্ষীরা আর তার নিজের ভাড়াটে সৈন্যটা শক্তভাবে প্রতিহত করছে আওরঙ্গজেব আর মুরাদের সৈন্যদের, যাদের বেশির ভাগই পড়ে রইল আহত বা মৃত হয়ে। কিন্তু নিকোলাসের সৈন্যদের মাঝেও ক্ষয়ক্ষতি কম হয়নি। বহু বছর ধরে তার সাথে কাজ করা একজন বুর্গুন্ডিয়ান নিজের রক্তের পুকুরে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে আছে মাটিতে, আদারঙা চুলে জড়িয়ে আছে ছিন্নভিন্ন মগজ আর খুলি ফেটে বেরিয়ে আসছে তরল।

আবারো যুদ্ধে এগিয়ে যেতে উদ্যত হল নিকোলাস। সহযোদ্ধার হয়ে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর এখন সে, বিদ্রোহী সেনাদের কারণে যাকে প্রাণ দিতে হল। যুদ্ধের সমস্ত শোরগোল ছাপিয়েও শুনতে পেল পেছনে এগিয়ে আসছে অসংখ্য খুরের শব্দ। ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেল, সবুজ ব্যানার উড়িয়ে বন্য উন্মত্তে ছুটতে ছুটতে আসছে একদল অশ্বারোহী। নিঃসন্দেহে দারার সৈন্য।

একেবারে সামনের জনের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল নিকোলাস, 'কেন পিছু হটছো তোমরা?' প্রথম কয়েকজন নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে এতটাই বিচলিত যে উত্তর দেবারও সময় হলনা তাদের; কিন্তু কিশোর অবস্থার থেকে একটু বড় হবে বয়সে এমন একজন অশ্বারোহী এক মুহূর্তের জন্য টেনে ধরল ঘোড়ার লাগাম। 'শাহজাদা দারা পালিয়ে যাচ্ছে, তাই আমরাও। নিজের জীবনের মায়া থাকলে তুমিও তাই কর।'

'কিন্তু শাহজাদা তো পালিয়ে যায়নি।' পাল্টা চিৎকার করে উত্তর দিল নিকোলাস।

'ভুল করছ তুমি। রাজকীয় হাতিকে পেছন দিকে চলে যেতে দেখেছি।' 'কিন্তু হাওদা যে খালি তা দেখোনি?'

'না। কিন্তু তার মানে তো শাহজাদা নিশ্চয় মৃত।' এই কথা বলে নিকোলাসকে আর একটিও শব্দ করার সুযোগ না দিয়ে ঘোড়ার পেটে পা দিয়ে গুঁতো মেরে নিজের সঙ্গীদের পিছু নিল তরুণ। চারপাশে তাকিয়ে দারাকে খুঁজল নিকোলাস। কিন্তু ভিড়ের চাপে নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে

থাকতে পারছে না সে। এমনকি সামনের দিকে চোখ মেলেও কিছু না পেয়ে পেছনে ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ শুনতে পেল। আরো একবার ঘুরে তাকিয়ে দেখতে পেল তার নিজের পাশ থেকে সৈন্যরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে সামনে দিকে।

'শাহজাদা দারা নিরাপদ আছে! আমরা যুদ্ধ জিততে চলেছি!' চিৎকার করে আশেপাশের যোদ্ধাদেরকে জানাতে চাইল নিকোলাস, কিন্তু জানে যে যদি সেও এ অবস্থায় পড়ত, মন দিয়ে শোনার পর্যায়ে থাকত না।

ঠিকই ভেবেছে সে। পুরো দলটা পার হয়ে গেল তার দিকে একবারও না তাকিয়ে, শুধুমাত্র একজন সবুজ পোশাক পরিহিত অশ্বারোহী ঘোড়া সহ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মৃত বিদ্রোহী সৈন্যের গায়ের উপর। দুমড়ে মুচড়ে ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে বস্তার মত মাটিতে পড়ে গেল সৈন্যটা। আবারো উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই পেছন থেকে এগিয়ে আসা সৈন্যরা পায়ের চাপে পিষ্ট করে ফেলল তাকে, এতটাই ভীত তারা যে সঙ্গীকে পাশ কাটানোর চিন্তাও মাথায় রইল না!

দারার উচিত এখনি এসে সবার সামনে দেখা দেয়া, নয়ত অনেক দেরি হয়ে যাবে। শোধরানোর অযোগ্যভাবে পরাজয় ঘটবে যুদ্ধে আর আগ্রার রাস্তা খুলে যাবে আওরঙ্গজেব আর মুরাদের জন্য।

ভালোভাবে যুদ্ধের মতিগতির দিকে তাকাতেই প্রায় দুইশ গজ দূরে হট্টগোলের মাঝে সাদা উজ্জ্বল চিহ্নঅলা কালো ঘোড়া দেখতে পেল নিকোলাস। প্রায় খোঁড়াতে লাগল ঘোড়াটা আর নিতম্বের কাছ থেকে গড়িয়ে পড়ছে উষ্ণ তরল রক্ত, কিন্তু পিঠের উপরে থাকা আরোহীর কোন দেখা নেই। দারা নিশ্চয়ই আঘাত পেয়ে পড়ে আছে কোথাও। তাড়াতাড়ি করে ঘোড়া ছুটিয়ে সেই তেজী ঘোড়াটাকে প্রথম যেখানে দেখতে পেয়েছে সেদিকে ছুটে গেল নিকোলাস। কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেল সবুজ আর সোনালি পোশাক পরিহিত দারার তিনজন দেহরক্ষী ঘোড়ায় চেপেই আপ্রাণ চেষ্টা করছে সোনার দেহবর্ম পরে মাটিতে শুয়ে থাকা স্থবির দেহটাকে নিরাপত্তা দিয়ে ঢেকে রাখতে।

প্রায় সাথে সাথে কালো পোশাকের এক বিদ্রোহী অশ্বারোহী এসে ঘোড়ার উপর থেকে আঘাত করে ফেলে দিল দারার একজন দেহরক্ষীকে। এর মুহূর্তখানেকের মাঝে দ্বিতীয় দেহরক্ষী মুখ থুবড়ে পড়ল ঘোড়ার গলা

জড়িয়ে ধরে, নির্ঘাৎ আহত হয়েছে। তৃতীয় জন একা লড়ে চলেছে চারজন বিদ্রোহী আক্রমণকারীর সাথে।

যত জোরে সম্ভব নিজের সব সৈন্যকে তার পিছু নিতে বলে খণ্ডযুদ্ধের দিকে এগোতে শুরু করল নিকোলাস। ভয় হচ্ছে পাছে দেরি না হয়ে যায়। হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল নিজের পিস্তল দু'টোর কথা। ভারী দস্তানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে কোমরের কাছ থেকে টেনে নিল একটি পিস্তল। ঘর্মাক্ত হাত বারবার পিছলে যাচ্ছে গোলাকার হাতলের উপরে, কিন্তু দ্রুতই নিজেকে সামলে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়ে ধরল পিস্তলের হাতল, নিশানা ঠিক করে গুলি ছুড়ে বসল, উপরের দিকে হাত তুলে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল এক বিদ্রোহী। কিন্তু নিকোলাস জানে যে এত দূর থেকে এ শট লাগাটাকে সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। অন্য আরেকটা পিস্তলে হাত দিতেই তলোয়ারের আঘাতে আরেকজন বিদ্রোহীকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিল দারার দেহরক্ষী।

দ্বিতীয় পিস্তলের নিশানা ঠিক করে বাকি দু'জন বিদ্রোহী যোদ্ধার একজনের দিকে গুলি ছুড়ল নিকোলাস। কিন্তু গুলি করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল নিজের ঘোড়ার, ফলে আরোহীর গায়ে না লেগে গুলি গিয়ে লাগল ঘোড়ার নিতম্বে। ভীত হয়ে আহত ঘোড়াটা ডাক ছেড়ে দাপাদাপি শুরু করতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল বিদ্রোহী লোকটা। এলোমেলো দৌড়াতে শুরু করল ঘোড়া, কিন্তু খানিক দূর যেতেই আরোহীকে পেটের নিচে নিয়ে ভেঙেচুড়ে মাটিতে পড়ে গেল ঘোড়া, বাকি আছে আর একজন কিন্তু নিকোলাস তার কাছে এগিয়ে যেতেই বেঁচে থাকা তৃতীয় দেহরক্ষীকে তলোয়ারের আঘাতে মাটিতে ফেলে দিল বিদ্রোহী সেনা।

ততক্ষণে পৌঁছে গেল নিকোলাস। এবার তার দিকে উন্মত্তের মত আঘাত হানল বিদ্রোহী। কিন্তু নিকোলাসের হাতে এখনো পিস্তল, অস্ত্রটাকে ঘুরিয়ে ধরে কন্দাকৃতি হাতল দিয়ে জোরে আঘাত করল বিদ্রোহী সৈন্যের মুখমণ্ডলের উপর। ফেনিল রক্ত আর দাঁতের ভাঙ্গা কণা এসে মিশে গেল লোকটার কালো দাড়িতে। ধাতস্থ হবার আগেই পিস্তল এক পাশে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তলোয়ার হাতে নিল নিকোলাস, আঘাত করল শত্রুর ঘাড়ের উপর, শিরস্ত্রাণের ঠিক নিচে, গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল হাড় আর শ্বাসনালী। পড়ে গেল বিদ্রোহী সেনা।

এরই মাঝে নিকোলাসের নিজের সৈন্যরা আর দারার দেহরীক্ষরা এসে পৌঁছতেই ঘোড়ার উপর থেকে লাফিয়ে নেমে দারার কাছে এগিয়ে গেল নিকোলাস। শাহজাদাকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি শরীর পরখ করে দেখল। কপালের কাছে ভেজা কাটা দাগ ছাড়া আর কোন বড় ক্ষতের দেখা মিলল না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালো যেন শুধুমাত্র সংজ্ঞা হারানোই হয় এটা। কোমরের কাছ থেকে পানির বোতল বের করে দারা'র চোখেমুখে কয়েক ফোঁটা ফেলতেই মনে হল নড়ে উঠল শাহজাদা। এরপর সাবধানে দারার মুখে মাঝেও খানিকটা পানি ঢালতেই কাশতে শুরু করল শাহজাদা।

'বেঁচে আছে।' চারপাশে ঘিরে থাকা সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল নিকোলাস। 'যার কাছে আছে সবচেয়ে সেরা ঘোড়াটা, নেমে এসো, শাহজাদাকে চড়তে দাও। অন্য কারো ঘোড়ায় উঠে যাও। বাকি তিনজন দেহরক্ষীকে পরীক্ষা করে দেখো জীবনের আশা আছে কিনা। যদি থাকে তাদেরকেও ঘোড়ার উপর তুলে নাও, যদি নিজেদের আসনের সাথে বেঁধে নিতে হয়, তাই নাও।'

ছুড়ে ফেলে দেয়া পিস্তলটাকে তুলে নিয়ে কোমরের কাছে প্রথমটার সাথে রেখে দিয়ে চারপাশে তাকাল নিকোলাস। ধোঁয়ার আস্তরণ ভেদ করে যেদিকেই তাকাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে পিছু হটছে দারার সৈন্যরা। ভদ্রভাবে বলতে গেলে এটাই সমাপ্তি। বেশিরভাগই ছুটছে আপন প্রাণ বাঁচাতে। নিকোলাস ভালো করেই জানে যে এরকম অর্ধ-অচেতন দারাকে নিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার কোন সম্ভাবনাই নেই। শাহজাদার এখন একমাত্র আশা আগ্রাতে পৌঁছে হাকিমদের কাছে যাওয়া যেন বেঁচে থাকতে পারে আরেকটা যুদ্ধের জন্য।

'ঘোড়ায় উঠে পড় সকলে।' চিৎকার করে নির্দেশ দিল নিকোলাস। 'যত দ্রুত সম্ভব আগ্রায় পৌঁছাতে হবে।'

অধ্যায়-২০

আগ্রা দুর্গের ছাদে একাকী বেলেপাথরের তৈরি গুলি চালাবার জন্য ফোকর বিশিষ্ট প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে সূর্য তাপের মাঝে পুড়তে থাকা দিগন্তের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রইলেন শাহ্‌জাহান। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে ঝুলে থাকা ধুলার মেঘ দেখে এটা নিশ্চিত হওয়া গেল যে বার্তাবাহকদের বয়ে আনা দুই সেনাবাহিনীর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার খবর সত্য। যদি তিনি নিজেও থাকতে পারতেন সেখানটায় ঝাঁকের নিচে কামানের ধোঁয়ার গন্ধ আর শিরায় বয়ে চলা যুদ্ধের উদ্দামতা নিয়ে। এর পরিবর্তে বয়স আর স্বাস্থ্যের কাছে ন্যূজ হয়ে অথর্বের মত অপেক্ষা করছেন শুভ কিছু ঘটার আশায়। মনে হল তাঁর মনের কথাই সত্যি প্রমাণিত হল, দেখতে পেলেন যমুনার শেষ তীর ধরে এগিয়ে আসছে কয়েকজন অশ্বারোহী। কাছাকাছি হতেই দেখা গেল কয়েকজনের সাথে পিছনে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে দ্বিতীয় আরোহী অথবা দেখে মনে হল অত্যন্ত অসুস্থ কাউকে বহন করে আনা হচ্ছে। নদী পার হয়ে দুর্গের কাছে এগিয়ে আসতেই পোশাক দেখে বুঝতে পারলেন এরা দারার সৈন্য। অশ্বারোহীদের ছোট্ট বিন্দু দ্রুত পরিণত হল একটা প্রবাহে। এর অর্থ কী? চিকিৎসকের প্রয়োজনে যুদ্ধ ছেড়ে আসতে হয়েছে, নাকি দারার সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে আসছে?

পাকস্থলীতে মোচড় দিয়ে উঠল শীতল কিছু একটা, উজ্জ্বল দেহবর্ম দেখে বুঝতে পারলেন এ সৈন্যরা রাজকীয় দেহরক্ষীর দল। একে অন্যের কাছাকাছি থেকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে প্রায় দু'ডজন সৈন্যর একটা দল। এদের মাঝে নিকোলাস ব্যালান্টাইনকেও দেখতে পেলেন, কিন্তু

মাঝখানে দারাকে দেখে ভুলে গেলেন বাকি সবকিছু। জিনের সামনের অংশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দারা, লাগাম ধরে আছে পেছনেই থাকা কর্চি। আর অপেক্ষা করতে পারলেন না শাহজাহান। ঘুরে দাঁড়িয়েই ধুলি মাখা অট্টালিকার প্রাচীর ছেড়ে দ্রুত নেমে যেতে লাগলেন তেমন একটা ব্যবহৃত না হওয়া এমন এক পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে সোজা প্রধান আঙিনাতে। সংকীর্ণ, তীক্ষ্ণ সিঁড়ির ধাপগুলো বেয়ে নামার সময় একটু পরপর মুখের সামনে থেকে সরিয়ে দিতে হল মাকড়সার জাল। তিনিও আঙিনাতে পৌঁছে গেছেন আর একই সাথে লম্বা, কারুকাজ করা ফটকদ্বার দিয়ে প্রবেশ করল দারা আর তার রক্ষীবাহিনী। পিতাকে দেখে সোজা হয়ে বসে কথা বলার চেষ্টা করে উঠল দারা। কিন্তু এমনভাবে মাথা নেড়ে উঠল যেন কথা বলাটাও ভারী হয়ে যাবে। ক্ষত-বিক্ষত মুখ দেখে মনে হল মাথা ঘুরছে আর ডান কপালের উপর জমাট বেঁধে আছে রক্ত। ত্রস্ত পায়ে সামনে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে পুত্রকে ধরলেন শাহজাহান। পরিচারকেরাও এগিয়ে এলো; কিন্তু হাতের ইশারায় সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন তিনি। নিজের পুত্রকে তিনিই সাহায্য করবেন। আঙিনাতে হাজারো চোখ চেয়ে আছে তাদের দিকে আর যুদ্ধের ফলাফল আর পুত্রকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে, তাই একজন কর্চিকে আদেশ দিলেন হাকিমকে ডেকে আনতে। এরপর দারার কাঁধে হাত জড়িয়ে ধীরে ধীরে আঙিনা বেয়ে উঠে গেলেন চওড়া, প্রধান সিঁড়ি দিয়ে রাজগৃহের দিকে।

পিতা-পুত্রের প্রবেশ করতেই সংবাদের জন্য অপেক্ষারত জাহানারা দৌড়ে এগিয়ে এলো সামনে। পিতার সাথে মিলে সে'ও আস্তে আস্তে দারাকে নামিয়ে রাখল তেপায়ার উপর। মুহূর্তখানেকের মাঝেই এসে পড়ল হাকিম। দারার উপর ঝুঁকে পড়ে চোখের দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল শাহজাদার চোখ জোড়া। এরপর গরম পানির পাত্রে কাপড় ভিজিয়ে মুছে দিল জমাট বাধা রক্ত, যেন পরীক্ষা করে দেখতে পারে কপাল। অবশেষে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'ক্ষতটা তেমন মারাত্মক নয়, জাহাপনা। শাহজাদার স্থায়ী কোন আঘাত লাগেনি। যদিও মনে হচ্ছে বিপর্যস্ত তিনি। কি হয়েছিল?'

সবার সাথে কক্ষে প্রবেশ করা নিকোলাস উত্তর দিল, 'ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেছেন ভীষণভাবে।'

দারা নিজেও মাথা নেড়ে চাইল উঠে দাঁড়াতে, কিন্তু কাঁধে হাত রেখে নিবৃত্ত করলেন শাহজাহান।

'আব্বাজান...আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে... যুদ্ধের মাঝখানে আমাদেরকে ছেড়ে গেছে খলিল উল্লাহ খান। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সৈন্যরা। আমি আমার যুদ্ধহাতি থেকে নেমে এসেছিলাম। কেননা তাদের সাথেই ঘোড়া ছুটিয়ে উৎসাহ দিতে চেয়েছিলাম যেন যুদ্ধে এগিয়ে যায়, কিন্তু ভুল হয়ে গেছে... আমার সৈন্যরা বুঝতেই পারেনি যে আমি কী করছি। যখন তারা দেখতে পেল যে আমি হাওদাতে নেই, ভাবল নিশ্চয় আমি আহত হয়েছি বা মারা গেছি... এমনকি এটাও ভাবল যে হয়ত আমি পালিয়ে গেছি। চারপাশে আতঙ্কিত চিৎকার চেঁচামেচি শুনেছি আমি। চেয়েছি দেখাতে যে আমি তখনো তাদের সাথেই আছি, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল... সবাই ইতিমধ্যে পিছু হটতে শুরু করে দিয়েছে... আর তারপর ঘোড়া থেকে পড়ে গেছি। আব্বাজান, আমি আপনাকে দেয়া কথা রাখতে পারি নি... আওরঙ্গজেব আর মুরাদ আর খুব বেশি দূরে নেই। সব শেষ হয়ে গেছে।' দু'হাতে মুখ ঢেকে মনে হল কেঁদে উঠতে চাইছে দারা।

'আমাদেরকে একা থাকতে দাও।' হাকিমকে আদেশ করলেন শাহজাহান। 'তোমরাও যাও।' পরিচারকদের একই কথা জানালেন। দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই, পুত্রের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁধে আস্তে আস্তে চাপড় দিলেন। 'তুমি আমাকে নিরাশ করোনি... কখনোই না।' এক মুহূর্ত দারাকে জড়িয়ে ধরে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে নিকোলাসের দিকে তাকালেন। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে যাবে না থাকবে বুঝতে না পেরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে নিকোলাস।

'সত্যিকারের কী অবস্থা? যেমনটা আমার পুত্র বিশ্বাস করে, যুদ্ধে কি সত্যিই পরাজিত আমরা?'

'হ্যাঁ জাহাপনা। সে ভয়ই পাচ্ছি আমি। শাহজাদা যেমনটা বলেছেন সেভাবেই সব ঘটেছে। যখন তাঁকে ময়দান থেকে উঠিয়ে নিচ্ছিলাম আমাদের সৈন্যদের দল যুদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুদের হাতে ঘিরে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে থাকে। বাকিদের মাঝে বেশিরভাগই মৃত অথবা বলতে কষ্ট হচ্ছে অস্ত্র ফেলে

দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পিছিয়ে গেছে। পুরো দল ধরে পিছু হটা আর কিছু না... আমার ইচ্ছে ছিল আপনাকে ভালো কোন সংবাদ শোনানো কিন্তু সত্যিটা আপনার জানা প্রয়োজন।' মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল নিকোলাস।

চুপ করে রইলেন শাহজাহান। সাম্রাজ্যের এবং নিজেদের সকলের জন্য অনুভব করলেন তাঁকে শান্ত মাথায় ভেবে দেখতে হবে সবকিছু, তারচেয়েও বড় কথা সকলের সামনে নিজেকে স্থির রাখতে হবে। 'পরিষ্কার যে আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।' কয়েক মুহূর্ত পরে কথা বলে উঠলেন সম্রাট। 'আওরঙ্গজেব আর মুরাদ আগ্রার দিকে এগিয়ে আসার জন্য আর বেশি দেরি করবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, দারা তুমি আর তোমার পরিবার এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যাও... কোনমতেই তোমাকে বন্দি হতে দেয়া যাবে না।'

'না!' বলে উঠল দারা। 'আমাদের সৈন্যরা নিশ্চয়ই আগ্রা ফিরে এসে ভাইদের বিরুদ্ধে দুর্গ রক্ষা করতে পারবে। পূর্ব দিক থেকে সুলাইমান আর তার বাহিনী ফিরে না আসা পর্যন্ত নিশ্চয় রুখতে পারব আমরা...'

'সুলাইমান কোথায় আছে এ ব্যাপারে এখনো কোন সংবাদ পাইনি আমরা আর ঝুঁকিও নিতে চাইনা। যদি তোমার ভাইয়েরা তোমাকে বন্দি করে ফেলে তাদের অবস্থানের নিষ্ঠুরতা নিয়ে আর কোন সন্দেহ রইবে না। তোমার জীবনে দ্বিতীয়বারের মত তোমাকে বন্দি হতে দিতে চাই না আমি...'

'কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি যাবো না...'

'আমি আওরঙ্গজেব আর মুরাদকে ভয় পাই না—আমার পুত্র তারা। যাই হোক, তোমাকে বেছে নেয়ার কোন সুযোগ দিচ্ছি না আমি। তোমার সম্রাট আর পিতা হিসেবে যাবার আদেশ করছি।' জাহানারার দিকে ফিরলেন শাহজাহান, ভাইয়ের পাশে একেবারে চুপচাপ, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'নাদিরা বেগমের কাছে যাও। রোশনারা আর গওহর আরার সাথে আছে। কী হয়েছে জানিয়ে এখনি আগ্রা ছাড়ার প্রস্তুতি নিতে বলো। সিপিরকে জানাও প্রস্তুত হতে।' তাড়াহুড়ো করে কক্ষ ছেড়ে বের হয়ে গেল জাহানারা। পুত্রের দিকে তাকালেন শাহজাহান। 'আমার নির্দেশ

শোন। নিজের যতজন সম্ভব সৈন্য যোগাড় করে দিল্লি চলে যাও। সুলাইমান এখনো অনুপস্থিত, যশয়ন্ত সিংয়ের বাহিনী ছড়িয়ে আছে উজ্জয়নীতে আর এইমাত্র যে পরাজয় বরণ করলে তুমি আগ্রা অঞ্চল বাঁচাবার মত যথেষ্ঠ সৈন্য নেই আমাদের হাতে। অবশিষ্ট শক্তিটুকু—আর এটাই সংগতিপূর্ণ হবে—পড়ে আছে উত্তর আর উত্তর-পশ্চিমে। তাদেরকে দক্ষতার সাথে একত্রিত করো, জয় আমাদেরই হবে। দিল্লির শাসনকর্তাকে দেয়ার জন্য তোমাকে একটা পত্র দেব আমি, তাতে তাকে এই আদেশ করব যেন তার অধীনে থাকা রাজসৈন্যদেরকে তোমার কাছে হস্তার্পণ করে। তাহলে ভাইদের বিরুদ্ধে শহরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে তুমি। আমার মনে হয় না তারা দু'জন তোমাকে অনুসরণ করতে খুব বেশি দেরি করবে। এছাড়া রাজকোষ তোমার কাছে খুলে দেবার নির্দেশও দিয়ে দেব, যেন সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য নিয়োগ করতে পারো।'

পুত্রের চোখে এখনো সন্দেহের চিহ্ন দেখে দারার মাথা নিজের দু'হাতে ধরে তার চোখের দিকে তাকালেন শাহজাহান। 'আমার কথা শোন, দারা। এখনি তোমাকে আগ্রা ছাড়তে হবে শুধু আমার আদেশ পালন করার জন্যই নয়, বরঞ্চ এটা নিজের আর পরিবারের প্রতি তোমার দায়িত্বও বটে। তুমি সামুগড়ে পরাজিত হয়েছ; কিন্তু এটা শুধুমাত্র এই যুদ্ধের একটি সংঘর্ষ। মনোবল হারাবে না। যুদ্ধের ময়দানে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছি আমি, কিন্তু কখনো এতে নিজেকে ভেঙে পড়তে দিইনি। বস্তুত এতে করে আমার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হয়েছে যে পরের বার বিজয়ী আমি হব-ই। মনে রাখবে, ভাইদের চেয়ে এখনো তুমি এগিয়ে আছ। তোমাকে মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছি আমি। এর ফলে তুমি এমন এক ক্ষমতা আর আধিপত্য পাচ্ছো যেটা তাদের নেই। এ ক্ষমতা কাজে লাগাও, এখনো ঘুরে দাঁড়াবার সময় আছে।' পুত্রের উপর নেতৃত্বের ভারী একটি বোঝা চাপিয়ে দিলেন তিনি; মনে মনে ভাবলেন শাহজাহান। এতদিন পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে আড়াল দিয়েছিলেন পুত্রকে, কিন্তু এখন আর কোন উপায় রইল না।

'জাহাপনা, শাহজাদা অনুমতি দিলে আমি দিল্লি পর্যন্ত তাঁর সাথে যেতে পারি।' বলে উঠল নিকোলাস।

বিবর্ণ মুখে হাসল দারা। 'আমি অসম্ভব খুশি হব তাহলে। আজ এমনিতেই আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। হতে পারে সময় হয়ত আসবে যখন আমি এ পাওনা পরিশোধ করতে পারব... এখন নাদিরার সাথে গিয়ে প্রস্তুত হতে সাহায্য করতে হবে... নিশ্চয়ই বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।'

'তোমার সাথে আমিও যাব হারেমে।' আবারো দারাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল শাহজাহান, তারপর নিয়ে গেল কক্ষের বাইরে। 'জাহাপনা আগমন করছেন' বলে প্রথাগত নির্দেশ শুনতে পেল নিকোলাস সামনে থেকে। আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল আওয়াজ, একের পর এক দরজা পেরিয়ে হারেমের দিকে এগিয়ে চললেন পিতা-পুত্র। কিন্তু শাহজাহান আর কতক্ষণ সম্রাট হিসেবে থাকতে পারবেন, ভ্রু মুছে ভাবতে লাগল নিকোলাস। এটি অচিন্ত্যনীয় একটি ব্যাপার যে মাত্র একটি যুদ্ধ এসে এরকম শক্তিশালী এক শাসককে সিংহাসনচ্যুত করে দেবে, আর কেই বা ভাবতে পেরেছিল যে আওরঙ্গজেব আর মুরাদের বিদ্রোহ এতদূর গড়াবে?

নিকোলাস নিজেও কক্ষ ছেড়ে বের হতে যাবে, নিজের যা কিছু সম্বল জড়ো করে দিল্লি রওনা হবে, এমন সময় তাকে অবাক করে দিয়ে ফিরে এলো জাহানারা। কয়েক মুহূর্ত একে অন্যের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল দু'জনেই। এরপরই চিৎকার করে উঠল জাহানারা, 'দারা আমাকে জানিয়েছে যে আপনি তার সাথে যাবার প্রস্তাব করেছেন... এত কিছু হয়ে যাবার পরেও কেন এত দয়াশীল হচ্ছেন আমাদের প্রতি?

'এটা দয়া নয়। হিন্দুস্তান আমার ভূমি। চলে যেতে মনস্থির করার আগপর্যন্ত তা উপলব্ধি করিনি আমি। আপনি যেটার উল্লেখ করেছেন সেটা ছাড়াও অনেক দয়া দেখিয়েছে আপনার পরিবার আমার প্রতি...' মুহূর্তখানেকের জন্য ধরে গেল নিকোলাসের গলা, এরপর আবারো বলে উঠল, 'দারার জন্য সংগ্রাম করতে পেরে আমি সম্মানীত হব যেমনটা একদা করেছিলাম আপনার পিতার জন্য।'

'তাহলে পিতা আর দারার হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু একই সাথে ক্ষমা প্রার্থনাও করছি। কোন রকম ভাবনা-চিন্তা না করেই আমি আপনাকে অনেক বড় বিপদের মাঝে ফেলে দিয়েছিলাম... আমি দুঃখিত ... আমি শুধুমাত্র নিজের বিষয়েই চিন্তিত ছিলাম, কখনো ভাবিনি...'

'দুঃখিত হবার মত কোন কারণ ঘটেনি আপনার', নম্রভাবে জাহানারাকে থামিয়ে দিল নিকোলাস। 'আপনি সৎ উদ্দেশ্যেই এসব করেছেন।'

পাতলা বেগুনি ওড়নার উপর দিয়েই দেখা গেল জাহানারার চোখ ভর্তি জল। আপনি ছাড়া সত্যিকারের আর কোন বন্ধু নেই আমার আর আমি জানি যেভাবে সম্ভব দারাকে সাহায্য করবেন আপনি। আমাদের মহান প্রপিতামহ আকবরের যোগ্য উত্তসূরী সে—ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, সবার প্রতি ন্যায়বিচারক। আওরঙ্গজেব শুধু আমাদের জনগণের মাঝে বিভেদই সৃষ্টি করবে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদেরকে দাঁড় করিয়ে দেবে। যদি সে কখনো সম্রাট হয়ে যায় অসহিষ্ণুতা এ ভূমিকে ঠিক সেভাবেই ক্ষত-বিক্ষত করে তুলবে, একদা যেভাবে আগুন করেছিল আমার সাথে।' ডান হাত দিয়ে আস্তে করে নিজের ওড়না সরিয়ে গালের উপরে পোড়া চিহ্ন দেখাল জাহানারা। এক মুহূর্তের জন্য দাগটার দিকে তাকিয়ে রইল নিকোলাস, আলতো করে হাত এগিয়ে দিল ছুঁয়ে দেখার জন্য, নীল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল জাহানারার অন্তরের গভীরে। কিন্তু ঠিক তখনই দূর থেকে ভেসে এলো বাদ্যের ধ্বনি, নির্ঘাৎ দারার সৈন্যরা প্রস্থানের জন্য জড়ো হয়েছে।

হাত সরিয়ে নিল নিকোলাস। 'আমাকে যেতে হবে... কিন্তু আমি যা পারি করব, প্রতিজ্ঞা করছি আপনার কাছে।' একবারও পিছনে না তাকিয়ে চলে গেল নিকোলাস।

আধা ঘণ্টা পরে, জালি পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দুর্গ থেকে ছোট্ট একটা দলকে বের হয়ে যেতে দেখল জাহানারা। অশ্বারোহীদের মাঝেই কোথাও আছে তার ভাই আর নিকোলাস। গোধূলী আলোয় সৈন্য সারি অদৃশ্য হয়ে যেতেই মনে হল দারাকে বিদায় জানানো হল না।

তিন দিন পরে, নিকোলাসকে পাশে নিয়ে নিজের ঘর্মাক্ত কালো ঘোড়া ছুটিয়ে নিচু একটা পর্বতের কাছে পৌঁছালো দারা। চূড়ায় পৌঁছতেই দেখতে পেল সামনে ছড়িয়ে আছে দিল্লি শহর। মসজিদের দেয়ালের উপর সাদা মার্বেলের গম্বুজ চমকাচ্ছে সূর্যের আলো পড়ে, বেশিরভাগেরই আবৃত হয়ে আছে বেগুনি ছাড়া দিয়ে।

'অবশেষে দিল্লি।' বলে উঠল দারা। 'পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা কোন বিদ্রোহী দলকেও দেখা যাচ্ছে না।'

'ভাগ্য আবারও আমাদের সহায় হল মাননীয় শাহজাদা, যেমনটা হয়েছিল মথুরাতে।'

'এছাড়া যত মানুষ আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে, খোলা ময়দানে আমাদের বিরুদ্ধে লাগার জন্য বেশ শক্তিশালী বাহিনী প্রয়োজন হবে এখন।'

মাথা নাড়ল নিকোলাস। তাদের পিছনে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি এক বহর, গত বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে যারা দারার পতাকাতলে যাত্রা করেছে। এদের মাঝে কেউ আছে সামুগড়ে পরাজিত হওয়া রাজসৈন্য, অন্যরা পথিমধ্যে থাকা ছোট ছোট দুর্গের সৈন্যরা আর বাকিরা শাহজাহানের জরুরি আদেশ পেয়ে ছুটে আসা স্থানীয় শাসকদের নিয়োগকৃত সৈন্য।

'শহরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কি আমরা অপেক্ষা করব?'

'প্রতিপক্ষের কোন দেখা যেহেতু নেই, তাই এরও প্রয়োজন নেই। তাড়াতাড়ি করা যাক, চলুন। শীঘ্রই হয়ত শাসনকর্তার প্রাসাদে আরাম করার পাশাপাশি ভাইদেরকে পরাজিত করার জন্য যৌথ বাহিনীর পরিকল্পনা করতে পারব।' জানিয়ে দিল দারা। হাতের ইশারায় দেহরক্ষীদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে কালো ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পাঁচ মাইল দূরে শহরের উদ্দেশে।

দারার অভিব্যক্তিতে কতটা পরিবর্তন এসেছে, ভাবল নিকোলাস, দারার পিছনে যেতে যেতে। বিপর্যস্ত, মনোবলহীন শাহজাদা, পিছনে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই প্রাণশক্তিতে ভরপর হয়ে উঠেছে। নিজের ঘোড়ার পিঠে বসে শারীরিক আর মানসিকভাবেও হয়ে উঠেছে শক্তিশালী।

পনের মিনিট পরে, সূর্য তাপের বিরুদ্ধে চোখের উপর ছায়া দিয়ে এক মাইল দূরে দিল্লির বিশাল দক্ষিণ ফটকদ্বারের দিকে তাকাল নিকোলাস। ফটকগুলো তো মনে হচ্ছে বন্ধ, তাই না...?

'মাননীয় শাহজাদা, ফটকদ্বার বন্ধ।'

'এরকম সমস্যার সময়ে এক বিজ্ঞ সতর্কতা।' উত্তরে জানালো দারা।' প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে আমাদের আগমন সংবাদ জানানোর জন্য পাঠানো গুপ্তচর একটু পরেই ফিরে আসবে। আমার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি দূর এগিয়ে গেছে তারা।'

ঠিক বলেছে দারা। প্রায় সাথে সাথেই ফটকের পাল্লা দু'টো ঠিক ততটাই খুলে গেল যতটা হলে ছোট্ট একটা সৈন্যদল এগিয়ে আসতে পারে। কয়েক মিনিট পরে অশ্বারোহী সৈন্যরা—যেমনটা প্রত্যাশিত ছিল, দারার গুপ্তচরেরা—পিছনে সান্ধ্য বাতাসে সোনালি ধুলার মেঘ ছড়িয়ে এগিয়ে এলো সামনে।

'শাসনকর্তা আমার জন্য গৃহ প্রস্তুত করে রেখেছেন? চেহারার চওড়া হাসি ছড়িয়ে জানতে চাইল দারা।

গুপ্তচরদের প্রধান লম্বা দাঁড়িঅলা পাঞ্জাবি সৈন্যের চেহারাতে কিন্তু পাল্টা হাসির প্রতুৎত্তর দেখা গেল না। 'তারা আপনাকে অনুমতি দিবে না, মাননীয় শাহজাদা।' সহজ সুরে জানালো লোকটা।

'কী বলতে চাও? পিতার চিঠি দেখাওনি শাসনকর্তাকে...'

'দেখিয়েছি, মাননীয় শাহজাদা। প্রহরীদলের নেতা শাসনকর্তার কাছে নিয়ে গেছে পত্রখানা। আধা ঘণ্টা ধরেও সে ফিরে না এলে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। যখন আসল, তখন সাথে শাসনকর্তাও ছিলেন। তিনি আমাদেরকে জানিয়েছে যে, পত্রখানা একটা চক্রান্ত আর আমরা স্বধর্মত্যাগী। এছাড়াও আমরা নাকি ভাগ্যবান যে তিনি আমাদেরকে হত্যার আদেশ দেননি। তারপর আমাদের হাতে এ চিঠি তুলে দেয়া হয়েছে।' সবুজ টিউনিকের ভেতর থেকে ভাঁজ করা খাম বের করে দিল পাঞ্জাবী সৈন্যটা।

দারা, চোখে-মুখে অবিশ্বাস নিয়ে ছো মেরে তুলে নিল চিঠিটা। সীলমোহর ভেঙে পড়া শুরু করতেই ক্রোধ ফুটে উঠল চেহারাতে। 'কতটা নিচে নামতে পারে আমার ভাইয়েরা? সত্য অথবা আমার পিতার প্রতি কি কোন শ্রদ্ধা নেই তাদের? পড়ে দেখুন, নিকোলাস।'

শাহজাদা দারা,

আমাকে পাঠানো আপনার পত্র একটা চক্রান্ত। আপনার ভাইয়েরা আমাকে আগেই সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে যে পিতার সিংহাসন হস্তগত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন যিনি কিনা মানসিকভাবে এতটা অসুস্থ যে

> *শাসন করার অথবা আপনার বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পারার মত অবস্থায় নেই। আমাকে তারা এও জানিয়েছে যে, বিশ্বস্ত পুত্র হিসেবে—যেটি আপনি নন—পিতাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে তারা আর ইতিমধ্যে যুদ্ধে আপনাকে একবার পরাজিতও করেছে। আমাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, অসাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার রক্ষীবাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সর্পতুল্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠতে পারেন আপনি। আমি তাদেরকে জানিয়েছি যে, একজন বিশ্বস্ত প্রজা হিসেবে আদেশ মান্য করব আমি। তাই চলে যান। শহরের আরেকটু কাছে এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন যে আমার সৈন্যরা গুলি ছুড়বে আপনার উপর।*

'কতটা সাহস হলে এমন মিথ্যে রটনা ছড়ানো যায়—সত্যের ঠিক পুরোপুরি বিপরীত—আর এই শাসনকর্তাই বা কেমন বোকা যে তাদের কথা বিশ্বাস করল?'

'অথবা ভণিতা করছে।' বলে উঠল নিকোলাস। 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সামুগড়ে আপনার পরাজিত হবার সংবাদ জানে সে। আওরঙ্গজেব আর মুরাদের বার্তাবাহকেরা নিশ্চয়ই জানিয়েছে যে আপনি আসতে পারেন আর আমার সন্দেহ, নিশ্চয়ই শাসনকর্তাকে মোটা মানের পুরস্কারের লোভ দেখানো হয়েছে যদি তাদের কথা মেনে নিয়ে আপনাকে রুখে দেয় ভাগ্য পরিবর্তনের পথে।'

'আমি পথে বসব না। তারই দখলকৃত দুর্গের আঙিনাতে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে এ অভদ্রতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে শাসনকর্তাকে। আক্রমণের পরিকল্পনা করতে এখনি একটি যুদ্ধসভার আহবান করব আমি।' তীব্রস্বরে বলে উঠল দারা, জিনের উপর বসে এতজোরে কাঁপতে লাগল ক্রোধে যে পা হড়কে গেল কালো ঘোড়ার।

'সম্মানীয় শাহজাদা যুদ্ধসভা ডাকার আগে ভেবে দেখুন সম্ভাবনা আর বাস্তবতার ব্যাপারগুলো। সেনাপতিদের সামনে সফল হবার বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা তুলে ধরতে হবে আপনাদেরকে, নয়ত ইতিমধ্যে যারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে অতি দ্রুত আমাদেরকে ছেড়ে চলেও যাবে। আর—যদি আমি খোলামেলাভাবে বলার সুযোগ পাই—পুরোপুরি সম্মুখ আক্রমণ

তো দূরের কথা, দিল্লি অবরোধের পদক্ষেপও আমাদের জন্য যৌক্তিক হবে না এখন। আমাদের সৈন্যসংখ্যা পর্যাপ্ত নয় আর দ্রুত ছুটে আসার কারণে কামান নেই। এছাড়া ভালোভাবেই জানি যে আওরঙ্গজেব আর মুরাদের সৈন্যরা হয়ত আর বেশি দূরে নেই। তাদের চেয়ে যে এতটা পথ এগিয়ে আসতে পেরেছি সেটাই আমাদের ভাগ্য। শহরের উপর আমরা যখন আঘাত হানব তখন অনায়াসে পিছন দিকে আক্রমণ করে বসবে তারা। দেয়ালের বাইরে ছিন্নভিন্ন করে দিবে আমাদেরকে।'

আশার আলো নিভে যেতে লাগল দারার চোখে, যেমন করে দিনের আলো বিদায় নিচ্ছে এই দিল্লি শহর ছেড়ে। কথা বলার আগে খানিকটা সময় নিল শাহজাদা। 'হয়ত আপনিই ঠিক বলছেন নিকোলাস... হয়ত নিজের ভাগ্য প্রবাহের গতিপথ পাল্টানোর জন্য আমি আর একটা মাত্রই সুযোগ পাব। তাই তাড়াহুড়া করে কিছু করাটা ঠিক হবে না, বিশেষ করে যখন নাদিরা আর সিপির আছে আমার সাথে। সম্ভবত উত্তর-পশ্চিমে সরে গেলেই ভালো হবে এখন যেখানে আপনার আর অন্যান্য সেনাপতিদের সাথে বসে নিরাপদে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা চিন্তা করা যাবে।

ঘন আম গাছের নিচে পাতার ছায়ায় ঘোড়া থামিয়ে জন্তুটার ঘর্মাক্ত গলায় হাত বুলালো নিকোলাস। পাশেই ছুটে এসেছে দারা। দু'জনেই নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। শাখা-প্রশাখার মাঝে দিয়ে চুইয়ে আসা আলোতে বিমর্ষ দেখালো শাহজাদার মুখমণ্ডল। দিল্লি থেকে আসার পথে রাস্তায় প্রায় তেমন কোন কথাই বলেনি দারা। নিকোলাস যেমন সন্দেহ করেছিল যুদ্ধ সভা উত্ত-পশ্চিমে লাহারে চলে যেতে যেন কোন সাহায্যের সংস্থান করা যায়। যাই হোক, আর বলার কিই বা আছে? কেই বা ভাবতে পেরেছিল যে দিল্লির শাসনকর্তা শাহজাহানের পত্র থাকা সত্ত্বেও রুদ্ধ করে দিবে শহরের প্রবেশদ্বার? সামুগড়ে দারার পরাজয়ের ফলে ভারসাম্য কতটা দ্রুত পাল্টে গেছে, এটা তারই ইশারা করেছে।

এখন না জানে কী অপেক্ষা করে আছে দারার ভাগ্যে? দিল্লির বিশাল লাল দুর্গের নিরাপত্তার মাঝে দারা হয়ত শক্তিশালী অবস্থানে চলে যেতে পারত। রাজকোষের সম্পদ ব্যবহার করে আরো সৈন্য আর সহায়তা ক্রয়

করতে পারত। এর পরিবর্তে এখন কী হল পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া? আরো বেশ কয়েকবারের মত আবারো মনে পড়ে গেল সেসব দিনের কথা মমতাজ আর তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে শাহজাহানের সাথে পালিয়েছেন নিকোলাস। কিন্তু দারার পারিপার্শ্বিক আরো বেশি ভয়ংকর। শাহজাহানের অন্তত কিছু মিত্র ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দিল্লি ছাড়ার ফলে দারার পক্ষে তেমন কেউ রইল না। যদিও কয়েকজন বার্তাবাহক পাঠানো হয়েছে যাদের বিশ্বস্ততার উপর ভেবেছিল নির্ভর করা যাবে এমন কয়েকজন অভিজাত ব্যক্তির কাছে, কিন্তু একটি কোন আশ্বাসবাণী পায়নি শাহজাদা—শুধুমাত্র বাকসর্বস্ব অজুহাত আর কয়েক ক্ষেত্রে তো সেটাও নয়। অদ্ভুত আর ভাসা ভাসা সব কারণ দেখিয়ে দিনের পর দিন কমে যেতে লাগল দারার সৈন্যসংখ্যা। কয়েকজন নিশ্চয়ই গিয়ে জুটে যাবে তার ভাইদের দলে, অন্যরা ফিরে যাবে নিজেদের গ্রামে অথবা জায়গীর অপেক্ষা করবে হিন্দুস্তানের উপর ভেঙে পড়ার জন্য এগিয়ে আসা নিশ্চিত ঝড়ের জন্য।

'আমার স্ত্রীর শরীর এখনো খারাপ। পালকি থেকে নিশ্চয় তার কাশির শব্দ পেয়েছেন আপনি। ছায়ার মাঝে তার জন্য একটি তাঁবু তৈরির নির্দেশ দিয়েছি আমি। তাকে সুস্থ হতে সাহায্য করার জন্য গরম না কমা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করব আমরা—সম্ভবত কাল আসা পর্যন্ত তাঁবু নির্মাণ হয়ে যাবে। এই ঘন ঝাড় আর গাছের ভিড়ে যথেষ্ট নিরাপদ আমরা।' পানির বোতল খুলে লম্বা চুমুক দিল দারা। 'আওরঙ্গজেব আর মুরাদ নিশ্চয় জানে যে আমরা দিল্লি থেকে উত্তর-পশ্চিমে গেছি। তাহলে ছড়িয়ে থাকা আমার গুপ্তচররা পিছু ধাওয়াকারীদের হদিস পায়নি কেন? ভাইদের কি ধারণা যে আমার মত অপ্রয়োজনীকে নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই?'

'হতে পারে তারা প্রথমে দিল্লি আর আগ্রাতে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে চেয়েছে প্রথমে... যুক্তি নিশ্চয়ই আছে।'

'আমিও সেরকমই আশা করছি। আমার আরো সময় প্রয়োজন। গত রাতে আমার পাশে শুয়ে কাশির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল নাদিরা, জেগে থেকে আমি ভাবছিলাম সুলাইমান আর তার সেনাবাহিনীর কথা—

সে কি ফিরে আসার জন্য পিতার আদেশ পায়নি নাকি এখনো শাহ সুজার পিছু ধাওয়া করে চলেছে? রাজকীয় বাহিনীর শ্রেষ্ঠ সৈন্যরা গেছে তার সঙ্গে আর তারা থাকলে একটা সুযোগ নিতে পারতাম আমি...আরো চিন্তা হচ্ছে না জানি কি ঘটছে আগ্রাতে আব্বাজান আর বোনের সাথে।'

'এত সহজে ধরা দেবার পাত্র নন সম্রাট। আমি নিশ্চিত যতক্ষণ সম্ভব দুর্গ আঁকড়ে ধরে রাখবেন তিনি।'

মাটির উপর উবু হয়ে বসে একটা কাঠি খুঁজে নিয়ে আঁকিবুকি কাটতে লাগল দারা লাল ভূমির উপর। যদি তাঁর সাথে যোগাযোগ করার কোন পথ খুঁজে পেতাম—জানতে পারতাম এখন আমাকে কী করতে বলতেন তিনি এরকম উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরতে হত না।'

'মাননীয় শাহজাদা, আমার দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে: "যদি ইচ্ছেগুলো ঘোড়া হত, ভিক্ষুকেরাও ছুটে বেড়াত।" আমরা সবাই চাই যে ঘটনাগুলো ভিন্নভাবে ঘটতো যদি; কিন্তু সত্যটাকেই মেনে নিতে হবে। ভুলে যাবেন না বাবরের বিরুদ্ধে তাঁর পরিবারও ফারগানার গুহায় থেকে জীবন ধারণ করেছে, তাদের সৈন্যসংখ্যা আপনার চেয়ে কম ছিল। নিজের উপর বিশ্বাস ধরে রাখতে হবে আপনাকে।'

'আমার দুর্বলতার জন্য ক্ষমা করুন। হঠাৎ করে আমার ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পুনরায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠার পরিকল্পনাকে প্রথম ধাপ হিসেবে শেষ বার গণনার সময় কত জন সৈন্য ছিল আমাদের হাতে?'

'পনেরশ বা এর কাছাকাছি।'

'এটা কোন সেনাবাহিনীই নয়...আমাকে কেন এত কম সংখ্যক সৈন্য অনুসরণ করেছে? আমি তো পিতার পছন্দের নির্বাচিত উত্তরাধিকারী।'

'এখনকার মত অনিশ্চিত সময়ে বেশিরভাগই চিন্তা করেছে এড়িয়ে যেতে পারলে আপনার পক্ষ না-ই নিতে। ফলাফল নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মিত্রতা করা ঝুঁকিপূর্ণ।'

'কিন্তু আমার প্রতি তাদের দায়িত্ব আছে। তাদের সম্মান এর দাবিদার।'

'জীবন আর সম্পত্তি বিপণ্ন হতে বসলে মানুষ প্রায়শই সম্মানের চিন্তা বাদ দেয়।' দারাকে বিমর্ষ হয়ে পড়তে দেখল নিকোলাস। মনে মনে ভাবল এতটা কঠোরভাবে না বলতে পারলেই ভালো হত। নিজের সমস্ত বুদ্ধিমত্তা আর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও দরবারের বাইরের মানুষের উদ্দেশ্য আর সত্যিকারের পৃথিবী সম্পর্কে শাহজাদাকে মাঝে মাঝে অজ্ঞই মনে হয়। কিন্তু তাহলে কতটা যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হবে এর সাথে?

যাই হোক, পরিষ্কার বোঝা গেল যে দারা অন্য কিছু চিন্তা করছে। হঠাৎ করেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা আর কাঠিটাকে একপাশে ছুড়ে ফেলে ঝটকা মেরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'আমি একটা বোকা যে আগে কেন এটা মাথায় আসেনি। একজন আছে যার কাছে আমি সাহায্য চাইতে পারব আর জানি সেও আমাকে প্রত্যাখান করবে না।'

'কে?'

'মালিক জিউয়ান নামে একজন বালুচি নেতা। কয়েক বছর আগে একজন মোগল কর সংগ্রাহককে হত্যার আদেশ দিয়েছিল। প্রদেশের শাসনকর্তা তাকে শিকলে বেঁধে দিল্লি পাঠিয়ে দিলে পিতা তার শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করে হাতির পায়ের নিচে মৃত্যু। কিন্তু আমার কাছে আবেদন করেছিল মালিক জিউয়ান। দাবি করেছিল যে কর সংগ্রাহক নিজ জায়গীর খুন করেছিল এক কৃষককে, যে কৃষক কিনা ঘুষ দিতে অস্বীকার করে তার সম্রাটের কাছে আর্জি জানাবার হুমকি দেয়। মালিক জিউয়ানের মতে কর সংগ্রাহকের সে মৃত্যু পাওনা ছিল। তাকে বিশ্বাস করে পিতাকে জানিয়েছিলাম মৃত্যুদণ্ড মুলতবী করার জন্য। এ মামলার তদন্ত কাজে পাঠানো কর্মকর্তার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম যে তার দাবি পুরোপুরি সত্য, তাই পিতাকে অনুনয় করেছি মালিক জিউয়ানকে ক্ষমা করে দিতে, তিনি তাই করেছেন। এছাড়া মালিককে জায়গির হিসেবে সমৃদ্ধ ক্ষতিপূরণও দিয়েছেন যেটা এখান থেকে সম্ভবত পঞ্চাশ বা ষাট মাইল উত্তরদিকে। সাথে একটি দুর্গও ছিল, যেখানে আবাসস্থল তৈরি করেছে মালিক। সে নিশ্চয় আমাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। আমরা এখানেই থাকব, গুপ্তচর পাঠিয়ে আমার কাছে ডেকে পাঠাবো মালিককে।'

গুপ্তচররা দ্রুত কাজ দেখিয়েছে ভালোই; দু'দিন পরে ঠিক সূর্যাস্তের আগে নীল পাগড়ি পরিহিত দেহরক্ষীদের ছোট্ট দল নিয়ে মালিক

জিউয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখে ভাবলো নিকোলাস। লম্বা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বছর চল্লিশের লোকটা নেমে এলো মাখনরঙা ঘোটকী থেকে; দারাকে দেখতে পেয়ে অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠল আনন্দ আর আন্তরিকতা।

'সুস্বাগতম মালিক জিউয়ান।'

'আপনার সংবাদ পেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটে এসেছি। একদা আমার প্রতি অনেক সদয় আচরণ করেছেন আপনি আর আমি খুশি যে এখন সময় এসেছে তা পরিশোধ করার।'

'ঠিক তাই। কিন্তু তার আগে আমার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমাকে কিছু প্রদান করতে চাই আমি।' হাততালি দিয়ে উঠল দারা আর ইশারা পেয়ে বাকি শিবির থেকে পর্দার মাধ্যমে আলাদা করা হারেমের তাঁবু থেকে বের হয়ে এলো অবগুণ্ঠনবিহীন দারার স্ত্রী। নাদিরা পরিষ্কারভাবেই বোঝা গেল যে অসুস্থ, হাতে করে নিয়ে আসছে ছোট্ট একটি রুপার কাপ, একজন পরিচারিকার হাতের উপর শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে হেঁটে আসছে। আরেকজন পরিচারিকার হাতে রুপার পাত্রের অর্ধেক পূর্ণ হয়ে আছে তরলে। ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে নিকোলাসও এগিয়ে এলো খানিকটা। এমনকি এখনকার মত যেনতেন একটি তাঁবুর ক্ষেত্রেও নারীরা হারেম খোপের অন্দরমহলেই থাকে। হিন্দুস্তানে এত বছর ধরে বাস করার পরেও কখনোই দেখেনি যে নাদিরার সমান সামাজিক মর্যাদার কোন নারী—একজন শাহজাদী আর শাহজাদার মাতা—পুরোপুরি অচেনা কারো সামনে এসেছে এভাবে। এমনকি আগন্তুকের জন্য কোন অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দারা'ও কিছু বলেনি।

'আমার স্ত্রী, সম্মানীয়া নাদিরা বেগম।' বালুচি প্রধানকে জানালো দারা। বিস্মিত হয়ে মাথা নত করে কুর্নিশ করল মালিক জিউয়ান।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললেও নাদিরার কণ্ঠস্বর এত ভাঙ্গা ভাঙ্গা শোনা গেল যে নিকোলাস বাঁকা হয়ে গেল এর মর্মোদ্ধার করতে। 'আমাদের তাঁবুতে আপনি একজন সম্মানিত অতিথি। একজন বালুচি হিসেবে আমার লোকদের প্রাচীন প্রথা সম্পর্কে জানেন না আপনি। দয়া করে আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন। এই পাত্রের পানি দিয়ে আমি আমার স্তন ধৌত করেছি। আমি আপনাকে প্রস্তাব করছি আমার স্বামীর শ্রদ্ধার চিহ্ন হিসেবে এক কাপ পান করতে। এর মাধ্যমে আমার দুধের চিহ্ন

হিসেবে—আপনি পরিণত হবেন মোগল রাজপরিবারের সদস্য আর আমার স্বামীর আপন ভাইতে।' ধীরে ধীরে আর আভিজাত্যের সাথে নাদিরা পরিচারিকার হাতে থাকা পাত্রের মাঝে কাপ ডুবিয়ে বাড়িয়ে ধরল মালিকের দিকে। এক মুহূর্ত দ্বিধার পরে কাপটা হাতে নিয়ে, চুমুক দিয়ে আবার ভদ্রতাসূচকভাবে মাথা নেড়ে ফিরিয়ে দিল মালিক। এরপর ফিরে তাকাল দারার দিকে। 'আমি বেশ সম্মানিত বোধ করছি, জাহাপনা। বুঝতে পারছি না কী বলব...'

'কিছু বলার দরকার নেই। প্রয়োজনের সময় আমার ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছেন আপনি, আর তাই কাউকে আমি দিতে পারি এমন শ্রেষ্ঠ উপহারটাই প্রদান করেছি—জীবনের বন্ধন তৈরি করতে পারে এমন কিছু। যখন, আপনার সাহায্য নিয়ে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, আমার পিতা, সম্রাট আপনাকে ভরে দেবে সোনা আর রুপার স্তূপ দিয়ে, আমার নতুন ভাই। এখন চলুন একত্রে বসা যাক।'

আস্তে আস্তে নিজের তাঁবুর দিকে চলে গেল নাদিরা। গতি ধীর হয়ে গেল কাশির দমকে। মালিক জিউয়ানের কাঁধে হাত দিয়ে কার্পেট আর তাকিয়া পেতে রাখা আসনের দিকে নিয়ে গেল দারা। একটু পরেই ডুবে গেল গভীর আলোচনায়।

পরের দিন সকালবেলা ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি আর বলকা লাগাম ইত্যাদি সহযোগে জন্তুগুলোকে সাজানোর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নিকোলাসের। মুহূর্তের মাঝে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে হাতে তুলে নিল তলোয়ার, প্রভাতের ম্লান আলোয় পিটপিট করে তাকাল বাইরের দিকে। তাঁবুতে আক্রমণ হয়েছে, এরকম দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে অস্থির নিদ্রাহীন রাত কেটেছে তার। এখনো আধো ঘুম আধো জাগরণে মনে হল সত্যিই তাই ঘটছে নাকি। এরপর ইতিমধ্যেই রান্নার জন্য জ্বালানো আলোতে দেখা গেল দারার দেহরক্ষীরা ঘোড়ায় লাগাম পরানো শুরু করেছে আর মাহুতদেরকে তৈরি করে দিচ্ছে সহিসেরা। অবাক হয়ে চারপাশে তাকাতেই, দারা কাঁধের উপর অশ্বারোহণের উপযোগী ঢাকা কাপড় পরিহিত হয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে, চেহারায় দীপ্যমান হয়ে আছে আরো একবার ফিরে পাওয়া আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

'কী হয়েছে, মাননীয় শাহজাদা? আমরা কি তাঁবু গুটিয়ে নিচ্ছি।'

'না। সিপির আর দেহরক্ষীদের নিয়ে মালিক জিউয়ানের সাথে তার দুর্গে যাচ্ছি আমি। সেখানে থাকা সৈন্যদল ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা শুরু হয়ে গেছে। সৈন্যদের দক্ষতা আর প্রস্তুতি সম্পর্কে নিজের চোখে দেখতে চাই আমি। এছাড়াও মালিকের মতে, যদি আমি আর আমার পুত্র সৈন্যদের সামনে গিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করি, তাহলে অন্যেরাও তার ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসবে। তাঁবুর প্রধান হিসেবে আপনাকে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি আমি।'

'কিন্তু মাত্র পঞ্চাশের মত দেহরক্ষী প্রস্তুত হয়েছে আপনার সাথে যাবার জন্য। পুরো বাহিনী নিয়ে গেলেই কি ভালো হত?' চারপাশে তাকিয়ে গলার স্বর নিচু করে আবারো বলে উঠল নিকোলাস, 'যদি মালিক জিউয়ান আপনার সাথে কোন কৌশল খেলতে চায়? আপনি নিশ্চিত যে সে পুরোপুরি বিশ্বস্ত?

'গতকাল কী ঘটেছে দেখেছেন আপনি। জানি, অনেক বছর ধরেই হিন্দুস্তানে বাস করছেন আপনি; কিন্তু সম্ভবত এখনো আমাদের আচার প্রথায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেননি। মালিক জিউয়ানকে নাদিরা যে সম্মান দিয়েছে তা সচরাচর দেখা যায় না। এখন মালিক আমার সাথে এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ যা অবিচ্ছেদ্য।' হঠাৎ করে সামনে এগিয়ে এসে নিকোলাসের বাহুতে হাত রাখল দারা। 'আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করছি না। বস্তুত আমি আপনাকে আরো বড় দায়িত্ব দিতে চাই। আমার স্ত্রীর শরীর ভালো নয়। বলা যায় আরো খারাপের দিকে, ক্ষণে ক্ষণে ঘামছে আর কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাই আমি চাই সে এখানেই থেকে বিশ্রাম নিক। আমি কি আপনার ভরসায় তাকে রেখে যেতে পারি? তার নিরাপত্তা রক্ষাই এখন আপনার প্রধান দায়িত্ব। প্রতিজ্ঞা করুন যে তার এবং তার সম্মানের দিকে খেয়াল রাখবেন আপনি।'

'আমি কথা দিলাম।'

পনের মিনিট বাদে সিপির আর মালিক জিউয়ানকে দু'পাশে নিয়ে, দেহরক্ষী আর বলুচি নেতার রক্ষী বাহিনী সমভিব্যাহারে তাঁবু ছেড়ে বের হয়ে গেল দারা ঘোড়া ছুটিয়ে। গাছের ঘন ছায়ার নিচে একটু পরেই হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

‘শাহজাদীর জ্বর আরো বেড়ে গেছে।’ মাটির উপর উপুড় হয়ে বসে নিজের বন্দুকের ব্যারেল পরিষ্কারে ব্যস্ত নিকোলাস চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পায় নাদিরার একজন পরিচারিকাকে—সেলিমা নামে বয়স্ক এক নারী, যে সিপির ধাত্রীর কাজও করেছিল—দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। সাদা সুতির ওড়না ছাপিয়েও উদ্বিগ্ন চোখ জোড়া দেখা যাচ্ছে।

‘কতটা খারাপ অবস্থা?’

‘রাতের বেলা কাশি আরো খারাপের দিকে গিয়ে ঝাঁকুনি খেয়ে কাঁদতে শুরু করে দেন। পোশাক আর বিছানাও ভিজে গেছে ঘামে। আমি চেষ্টা করেছি শান্ত করতে কিন্তু কোন লাভ হয়নি, পরের কয়েক ঘণ্টার মাঝে বিকারগ্রস্থের মত হয়ে পড়েন। আমি কে বা কোথায় আছেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। ভাবতে থাকেন যে আগ্রার হারেমে ফিরে গেছেন। এমন সব জিনিসের কথা বলতে শুরু করেন যেগুলো আমি আনতে পারি নি। বুঝতে পারছি না কী করব...’

উঠে দাঁড়ালো নিকোলাস। কিন্তু সত্যি আসলে, নয়। যখন দারাকে কথা দিয়েছিল যে নাদিরাকে নিরাপত্তা দেবে, সেটা তো কোন আক্রমণের মুখে... অসুস্থতার হাত থেকে নয়। তাদের সাথে কোন হাকিম নেই। যদি শাহজাদী কোন পুরুষ হত, তাহলে অন্তত একবার চোখের দেখা যেত—বিভিন্ন অভিযানে নিজের যোদ্ধাদের মাঝে অনেক ধরনের জ্বর দেখেছে সে—কিন্তু যদি নাদিরার অবস্থা সত্যিই বেশি খারাপ হয়, পথিমধ্যে ফেলে আসা জন-জীবনের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইতে হবে। এতে সময় লাগবে আর ঝুঁকিও আছে। কিন্তু আর কোন উপায়ও তো নেই। এর মাঝে সাহায্য করার অন্য উপায়ও ভাবতে হবে। সোমরাজ (তিক্ত উদ্ভিদ বিশেষ) গাছের পাতা নাকি জ্বরের জন্য উপকারী—বিভিন্ন অভিযানে চিকিৎসকদের দেখেছেন পাতা ছিঁড়ে গরম পানি দিয়ে চা তৈরি করতে। আরো দেখেছেন হাকিমেরা নিমের পাতার পেস্ট বানিয়ে আহতের জিহবায় রেখে দিতেন।

‘তোমার মালিকার কাছে ফিরে যাও। প্রচুর পানি পান করিয়ে বাতাস করতে থাকো। গ্রামের দিক থেকে সাহায্য নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠাচ্ছি আমি, এছাড়া কাজে লাগতে পারে এমন লতাপাতার ব্যবস্থাও

করছি।' ত্রস্ত পায়ে সেলিমা চলে যেতেই আপন মনে নিকোলাস ভাবল, এখন কি দারার জন্য লোক পাঠানো উচিত হবে কিনা। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনদিন পার হয়ে গেছে শাহজাদা গিয়েছেন, নিশ্চয়ই শীঘ্রি ফিরে আসবেন। এছাড়া দারার দেয়া মালিক জিউয়ানের দুর্গের অবস্থানও স্পষ্ট নয়। অনর্থক অন্বেষণে লোক পাঠিয়ে তাঁবুর নিরাপত্তা কমিয়ে দেয়াটা বোধ হয় বোকামি হবে। না, তার চেয়ে মনোযোগ দেয়া উচিত চিকিৎসক খুঁজে বের করার কাজে। নিজের বন্দুক নামিয়ে রেখে এদিক ওদিক তাকিয়ে দু'জন গুপ্তচরকে খুঁজল নিকোলাস আমুল আর রাজিক—জানে এদের উপর ভরসা করতে পারবে সে।

চার ঘণ্টা পরে, আকাশের গভীরে গেছে সূর্য, তাঁবুতে ফিরে এলো নিকোলাস। নিজের চওড়া-কানাওয়ালা টুপির মাথায় করে নিয়ে এসেছে লম্বা সোমরাজ বৃক্ষের স্তূপীকৃত পাতা। সাবধানে দুই হাত দিয়ে ধরে বহন করে এনেছে এতদূর। জানে না সত্যিই এর চা কাজে দেবে কিনা; কিন্তু চেষ্টা করাটা জরুরি। হিন্দুস্তানে থাকার এত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে জ্বরতপ্ত রোগীর সবচেয়ে বড় ভরসা হলো তার নিজের শারীরিক শক্তি। নাদিরা এখনো বেশ তরুণী, আশা করা যায় সেরে উঠবে। নিজের শক্তিই তাকে সারিয়ে তুলবে। একইভাবে নিকোলাসের নিজের মাঝেও স্ফূর্তি ফিরে এলো যখন শিবিরের চৌহদ্দির মাঝে প্রবেশ করার পর দেখতে পেল দু'জনে গুপ্তচর একজন লম্বা পাঞ্জাবী, আমুল ফিরে এসে তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করছে তার জন্য।

'তো আমুল, ভাগ্য নিশ্চয়ই তোমার সহায় হয়েছে?' বলে উঠল নিকোলাস। কিন্তু কাছাকাছি হতেই পাঞ্জাবীর মুখের বিমর্ষ ভাব দেখতে পেল স্পষ্ট। 'কী হয়েছে? শাহজাদী কেমন আছেন? আরো অবনতি...?

মাথা নাড়ল আমুল। 'ঐ ব্যাপারে কিছু জানি না আমি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

নিজের তাঁবুতে ঢুকে ইশারা করে আমুলকেও ভেতরে ডাকল নিকোলাস। বাইরের আলো দ্রুত নিভে আসায় জ্বালিয়ে নিল তেলের বাতি। তাঁবুর দেয়াল আর ছাদে নাচতে লাগল কালির ছায়া। এরপর বন্ধ করে দিল তাঁবুর প্রবেশদ্বার।

'কী হয়েছে আমুল?'

'কারো চোখে যাতে না পড়ে যাই এমনভাবে গাছের ছায়ার সাথে মিশে অবশেষে এমন এক রাস্তায় পৌঁছেছি, ভেবেছি যেটি কিনা কোন বসতির দিকে নিয়ে যাবে। এখান থেকে হয়ত কয়েক ঘণ্টার পথও যাইনি, দেখতে পেয়েছি ঘোড়ার বিশাল বড় এক যাত্রীদল, সাথে খচ্চর আর উটও ছিল, আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে পশ্চিম দিকে। এরকম যাত্রী দলের সাথে প্রায়শ হাকিম থাকে, জানা থাকায় ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে গেছি। তৎক্ষণাৎ কাহিনী তৈরি করে বলেছি যে শিকার অভিযানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমাদের এক সদস্য। কিন্তু আমাদের কথা পুরো শোনার আগেই বয়স্ক, কাফেলার মালিক নিজের কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করে দেয়। আগের দিন একদল সৈন্য দু'জন বন্দি নিয়ে তার কাফেলার পাশ দিয়ে দিল্লি গেছে। কাফেলা থেকে মাংস আর উটের দুধ কেনার জন্য থেমেছিল সৈন্যরা, একজন গর্ব ভরে কাফেলার মালিককে জানায় যে তাদের কাছে বন্দি দু'জন কোন সাধারণ মানুষ নয়। সম্রাটের পুত্র আর দৌহিত্র, আওরঙ্গজেব আর মুরাদের কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠাচ্ছে মালিক জিউয়ান। কাফেলা মালিক এও জানিয়েছে যে, সে নিজের চোখে হাত পেছনে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়েছে দুই শাহজাদাকে।'

'রাজিক কোথায়?'

'ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে কাফেলা মালিকের কথা সত্য কিনা যাচাই করে দেখতে। আমি ফিরে এসেছি আপনাকে জানাতে। যদি আমরা এখনি তাঁবু গুটিয়ে নেই তাহলে হয়ত গিয়ে উদ্ধার করে আনতে পারব শাহজাদারকে। কাফেলা মালিকের কথা মত মাত্র শ'খানেকের মত সৈন্য আছে সে দলে।'

'আমরা তা পারব না। শাহজাদাকে কথা দিয়েছে আমি যে তার স্ত্রীর দিকে খেয়াল রাখব। অবস্থা ভালো না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে আমাদেরকে। আমাদের ছোট্ট বাহিনীকে বিভক্ত করতে পারব না। এখানেই থাকো...' তাঁবু থেকে বের হয়ে গেল নিকোলাস। দারাকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিল সে... আরো বেশি জোর করা উচিত ছিল। 'সেলিমাকে ডেকে আনো আমার কাছে।' একজন কর্চিকে আদেশ দিল নিকোলাস। অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল বৃদ্ধার জন্য। কাছে আসতেই দেখা গেল পরিচারিকার চেহারা উদভ্রান্ত হয়ে আছে।

'তোমার মালিকা কেমন আছেন?'

'খুব খারাপ।' ওড়না সরিয়ে নিল সেলিমা। বলিরেখাময় চেহারা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুজল। 'এখনো আমাকে চিনতে পারছেন না, কাশির দমকে কেঁপে উঠছে শরীর, আগুনের মত গরম চামড়া আর নাড়ীর গতিও হালকা, দপদপ করছে।'

সোমরাজ পাতার কথা মনে পড়ে গেল নিকোলাসের, নিচু হয়ে টুপি থেকে তুলে নিল এক মুঠ। তাঁবুর বাইরে পড়েছিল এতক্ষণ।

'এগুলো দিয়ে চা বানিয়ে দাও শাহজাদীকে। কাজে লাগতে পারে। মোলায়েম স্বরে জানালো নিকোলাস। কিন্তু সেলিমার মুখে ভেসে উঠল অসন্তুষ্টি।

'কোন হাকিম পাওয়া যায়নি।'

'না। যদি অবস্থার আরো অবনতি হয়, আমাকে জানাবে।'

এমনভাবে তাকাল সেলিমা যে স্পষ্ট পড়া গেল তার ভাষা। 'কেন জানাবো? কোন সাহায্য করেছেন আপনি?' প্রাচীন পা দুটো টেনে শক্ত হয়ে চলে গেল সেলিমা। মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে ইতিমধ্যেই নরম হতে থাকা সোমরাজ পাতা। নাদিরার যাই ঘটুক না কেন, মৃত্যু অথবা সুস্থতা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক, প্রার্থনা করতে লাগল নিকোলাস। এছাড়া আর কিইবা আশা আছে দারাকে মুক্ত করে আনার?

কঠিন নীলরঙা মেঘহীন আকাশের নিচে একাকী ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রেট ট্রাঙ্ক রোড ধরে দিল্লির দিকে চলেছে নিকোলাস। এড়িয়ে চলেছে পথের উপর চড়ে বেড়ানো গরু, নগ্ন ধুলাবালিতে খেলায় ব্যস্ত ছেলে-মেয়ে, কাঁধে কাস্তে নিয়ে মাঠের দিকে যেতে উদ্যত কৃষক আর মাঝে মাঝে ব্যবসায়ীদের গরুর গাড়ি অথবা উট। এই গ্রাম্য ভারতই তার পছন্দ; কিন্তু এখন হাতে সময় নেই এ আনন্দ উপভোগ করার। ছয় দিন আগে ঘোড়ায় চড়ে বসার আগেই নাদিরার সাধারণ সমাধিতে ফেলা হয়ে গেছে শেষ মুঠো মাটি, শেষ বারের মত পড়া হয়েছে প্রার্থনা দরুদ। যদিও তৃতীয় আরেকজন গুপ্তচর গিয়ে জোগাড় করে এনেছিল এক হাকিমকে নাদিরার জন্য কিছুই করতে পারেনি লোকটা। শাহজাদীর বিকারগ্রস্থ

আচরণ শেষ কয়েক ঘণ্টায় আরো বেড়ে গিয়েছিল। হারেমের তাঁবুর চারপাশে ঘিরে থাকা পর্দার বাইরে অসহায়ের মত শুনতে হয়েছে ফুসফুস ফেটে যাবার মত দমকা কাশির শব্দ আর দারার জন্য শাহজাদীর উন্মাদের মত চিৎকার। অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না নিকোলাসের। এখন শান্তি পেয়েছে নাদিরা। দারা আর সিপিরের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা দেখার জন্য মুক্তি পেয়েছে নিকোলাস।

একজন ইউরোপীয়ানের কাছে যতই অদ্ভুত দেখাক না কেন স্তন ধোয়া জলের মত মহৎ আর সম্মানজনক উপহার পেয়েও কেন বিশ্বাসঘাতকতা করল মালিক জিউয়ান? মরিয়া এই উপহার পেয়ে মালিক কি ইশারা পেয়েছে যে তার জয়ীদের দলেই যোগ দেয়া উচিত? সম্ভবত দারাকে অনুসরণ করে আসা কম সংখ্যক সৈন্যও এতে ভূমিকা রেখেছে। নাকি ইতিমধ্যেই আওরঙ্গজেব আর মুরাদের সাগরেদ হয়ে গেছে সে?

শাহজাহানের ক্ষমতা আর দারার প্রত্যাশার আলো এত দ্রুত নিভে গেছে যে পরিষ্কার হয়ে গেছে এসব একদিনে হয়নি। আগ্রাতে থেকে আর দারাকে নিজের পাশেই রেখে প্রাদেশিক সেনাপ্রধানদের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন শাহজাহান। কিন্তু অন্য পুত্রদেরকে সুযোগ দিয়েছেন বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করার। আগ্রা আসা-যাওয়ার পথে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে নিজেদের মিত্র তৈরি করে রেখেছে তারা। দারার চেয়ে, যে কিনা পিতার পছন্দনীয় হওয়ায় নিজের সফলতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিল, তার অন্য ভাইয়েরা উপলব্ধি করেছিল যে নিজেদের উচ্চাকাঙ্খা পূরণ করতে হলে পদক্ষেপ নিতে হবে। যাই ঘটে থাকুক না কেন, হয়ত দারাকে সাহায্য করার আর কোন উপায় নেই নিকোলাসের... তাঁবুর মাঝে শাহজাদার বন্দি হবার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সৈন্যরা সব চলে যেতে শুরু করে। প্রথম প্রথম একজন দু'জন করে নিঃশব্দে সরে পড়তে শুরু করে আর তারপর দলে দলে চলে যায় সবাই। শেষতক এত কম সংখ্যক সৈন্য টিকে ছিল যে দিল্লিতে একাকীই আসার সিদ্ধান্ত নেয় নিকোলাস। অন্তত এভাবে তাকে কেউ ততটা খেয়াল করবে না।

অবশেষে দিগন্তের কাছে শহরের বালি-পাথরের দেয়াল চোখে পড়তেই, ঘোড়া থেকে নেমে গেল নিকোলাস, ভাবতে চেষ্টা করল কী ঘটছে এখন সেখানে। আওরঙ্গজেব আর মুরাদ কি সত্যিই ক্ষতি করবে তাদের জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের? সত্য আবিষ্কারের আগে নিজের ছদ্মবেশ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সচরাচর যে ধরনের পাজামা আর চামড়ার ফতুয়া পরে থাকে সেটি বদলে ইতিমধ্যেই গায়ে চাপিয়েছে পিঙ্গলবর্ণের সুতীর প্যান্টালুন আর লম্বা টিউনিক। সাথে চওড়া বেগুনি কোমরবন্ধনী, এটার মাঝে গুঁজে রেখেছে পিস্তল আর ছুরি। এবার মাথায় পরে নিল আমুলের দেয়া গোলাকার পশমী টুপি, চুলগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে ধুলিমাখা সুতির গলার মাফলার একটু উপরে তুলে দিতেই ঢাকা পড়ে গেল মুখের নিচের অংশ।

দুই ঘণ্টা পরে, নিজের ক্লান্ত ঘোড়াটাকে শহরের ঠিক বাইরেই একটা সরাইখানায় রেখে সচরাচর চোখে পড়ে না এত বড় একটা ভিড়ের সাথে মিশে ঢুকে গেল মূল ফটকদ্বার দিয়ে। ফটকদ্বার আর পার্শ্ববর্তী দেয়াল সর্বত্র উড়ছে মোগল সবুজরঙা সিল্কের পতাকা—সাধারণ সময়ে এর মানে সম্রাট বাস করছেন এ শহরে, কিন্তু আজ তারা কাকে সম্মান দেখাচ্ছে? সম্রাটের বিশ্বাসঘাতক পুত্রদ্বয়কে? ফটকের ভেতরে কয়েক শ'খানেক গজ গিয়ে বাঁক নিয়ে চওড়া উত্তরের প্রধান রাস্তা ধরে দিল্লির নতুন লাল দুর্গে হাঁটা ধরল নিকোলাস। সবাই মনে হচ্ছে এখন এদিকেই যাচ্ছে। একে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে নিজেরা আগে পৌঁছাতে চাইছে, মনে হচ্ছে কিছু একটা মিস হয়ে যাবে সে চিন্তায় উদ্বিগ্ন। হতে পারে আজ কোন উৎসবের দিন। ভিড়ের সাথে মিশে নিকোলাস নিজেও হেঁটে এসে অবশেষে থামল দুর্গের সামনে চৌকোনা জায়গাটাতে, যেটির বিশাল বেলে-পাথরের তৈরি দেয়াল অপর পাশে চলে গেছে দুইশ গজ পর্যন্ত। হাজারো মাথার উপর দিয়ে নিকোলাসের চোখে পড়ল কোনমতে জড়ো করা একস্তূপ কাঠের উপর তৈরি করা হয়েছে একটি মঞ্চ। ঠিক দুর্গের দেয়াল থেকে উদগত হওয়া খোদাই করা সুদৃশ্য বারান্দার নিচে—শহরে আসলে এ স্থান থেকেই জনগণের উদ্দেশে বক্তৃতা দিতেন শাহাজাহান। মঞ্চটার চারপাশ ঘিরে রেখেছে সৈন্যরা।

সামনের দিকে যেতে চেষ্টা করল নিকোলাস, যেন স্পষ্ট দেখা যায় সবকিছু। ভিড়ের শব্দ ছাপিয়ে মনে হল বাদ্যের তালে তালে বাজনা শোনা যাচ্ছে। অন্যরাও শুনতে পেয়েছে আর তাদের টুকরো টুকরো সংলাপ কানে এলো। 'তারা আসছে...' বলে উঠল এক বৃদ্ধ, নিজের শুকনো গলা বাড়িয়ে, 'আর বেশি দেরি নেই।' কে আসছে? আর কেন? হতে পারে আওরঙ্গজেব আর মুরাদ বিজয়ীর বেশে দখলকৃত শহরে ঘুরে বেড়াতে চায়? এখন বোঝা গেল ফটক দ্বারে পতাকার অর্থ। বাদ্যের বাজনা আরো তীব্র হয়ে উঠল, এরপরই নিকোলাসের চোখে পড়ল পদাতিক সৈন্যদের সারি, হাতে হাত ধরে দুর্গের বাম পাশের রাস্তা থেকে প্রবেশ করল চৌকোনা জায়গায়। ভিড়ের মাঝে দিয়ে নিজেদেরকে দাঁড় করিয়ে পথ করে নিল মঞ্চ পর্যন্ত। অত্যন্ত কর্কশ আচরণ করতে লাগল, ফলে হাতাহাতি-মারামারি বেঁধে গেল কয়েক জায়গায়। কিন্তু শীঘ্রি দেখা গেল পাঁচ থেকে ছয় গজ চওড়া একটা রাস্তা তৈরি হয়ে গেল, দু'পাশে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে গেল সৈন্যরা।

ভিড়ের জনতা উৎসাহী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল যে পথ দিয়ে এইমাত্র সৈন্যরা প্রবেশ করেছে সেদিকে। সমান্তরালভাবে দুই সারি অশ্বারোহী সৈন্যের একটি দল প্রবেশ করতেই চারপাশে শুরু হয়ে গেল হট্টগোল। একেবারে প্রথমে থাকা দু'জন সৈন্যের লাগামের সাথে লাগান আছে ড্রাম, একের পর এক বাজিয়ে চলেছে দু'জনে : প্রথমে একজন, পরে আরেকজন, তারপর দু'জন একসাথে। যাই ঘটতে চলুক না কেন ভিড়ের জনতার সহ্য শক্তির যেন বাঁধ ভেঙে পড়তে চাইছে। পেছন থেকে সবাই মিলে আবারো ধাক্কা দিল নিকোলাসকে। কেউ একজন পড়ে গেল, শব্দ পেল নিকোলাস, সাথে সাথে মাড়িয়ে দিল পেছনের লোকেরা, অবাধ্য স্রোতের মত মানুষের ঢেউ ক্রমাগত ধাক্কা দিচ্ছে সামনের দিকে।

এরপর যেমন হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল তেমনিভাবে থেমে গেল সবকিছু। হতাশাবোধক অদ্ভুত একটা শব্দ শোনা গেল, যেন সবাই মিলে একসাথে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। নিকোলাস দেখতে পেল এর কারণ.... একটা মাত্র হাতি এগিয়ে আসছে চৌকোনা জায়গাটার দিকে। রাজকীয় হাতি মহলের কোন জমকালোভাবে সজ্জিত জন্তু নয়, মুক্তাখচিত শিরস্ত্রাণ

অথবা স্বর্ণমণ্ডিত গজদন্তও নেই—বয়সের ভারে ন্যূজ, ক্ষত-চিহ্ন আর ঝোলানো কানওয়ালা জন্তুটাকে পথ দেখাচ্ছে সাধারণ ধূতি পরিহিত লম্বা চুলের এক লোক। কিন্তু অন্য সকলের মত নিকোলাসও তাকিয়ে আছে হাতির দিকে নয়, বরঞ্চ হাতির পিঠে অমসৃণ কাঠ দিয়ে কোনমতে তৈরি হাওদার উপর বসে থাকা কৃশকায় চেহারা দু'টোর দিকে তাকিয়ে আছে—দারা আর সিপির, ন্যাকড়া ধরনের ছেঁড়া কাপড় গায়ে, পচা ফুলের মালা জড়ানো গলায়। ঋজু হয়ে বসে আছে দারা, ডান বা বাম কোন পাশেই তাকাচ্ছে না, কিন্তু তার পুত্র ঝুঁকে আছে সামনে দিকে।

আতঙ্কিত হয়ে উঠল নিকোলাস। অবচেতনেই চেষ্টা করল সবাইকে ধাক্কা দিয়ে বন্দিদের কাছে ছুটে যেতে; কিন্তু তার সামনে মানুষের ঘন দেয়াল আর ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা লাল পাগড়ি পরিহিত এক লোক ঘুরে তাকিয়ে গালি দিয়ে উঠল নিকোলাসকে। কিন্তু থু থু মিশ্রিত অশ্রাব্য ভাষা পাত্তা দিল না নিকোলাস। মাথা জুড়ে শুধু একটাই চিন্তা যে দিল্লির রাস্তা ধরে ভাই আর ভ্রাতুস্পুত্রকে সাধারণ অপরাধীর মত করে প্যারেড করাচ্ছে আওরঙ্গজেব আর মুরাদ। কিন্তু এরপর ভিন্ন কিছু উপলব্ধি করল নিকোলাস। বিশ্বাসঘাতকেরা যদি ভেবে থাকে যে এ ধরনের প্রদর্শনীতে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়বে তাহলে ভুল ভেবেছে। চারপাশ থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে চিৎকার করে উঠল সকলে আর কয়েকজন তো পাথর, গোবরের স্তূপ তুলে নিয়ে ছুড়ে মারতে লাগল সৈন্যদিগের দিকে। কাঠের মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে অবশেষে থামল হাতি।

ঠিক সেই মুহূর্তে থেমে গেল বাজনা আর উপরের বারান্দাতে দেখা গেল চওড়া কাঁধ আর লম্বাদেহী একজনকে। তৎক্ষণাৎ আওরঙ্গজেবকে দেখতে পেল নিকোলাস। হঠাৎ করেই চিৎকার থামিয়ে সবাই ঘুরে তাকাল তার দিকে। কী করতে যাচ্ছে সে? বক্তৃতা দেবে? দারাকে প্রকাশ্যে নিন্দা করবে? কিন্তু মনে হল এরকম কোন অভিপ্রায় নেই আওরঙ্গজেবের। হাত তুলতেই তার মাথার উপরে থাকা গুলি ছোড়ার ফোকর প্রাচীর থেকে তিনবার বাদ্য বেজে উঠল ত্বারস্বরে। ইশারা পেয়ে মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন সৈন্য সামনে এগিয়ে এসে দারাকে টেনে-হিঁচড়ে নামালো হাওদা থেকে। দারা মাটিতে পড়ে যেতেই বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল ভিড়ের জনতা। এক মুহূর্তের জন্য নিকোলাসের

সামনে থেকে মুছে গেল দারার দৃশ্য, তারপর আবারো তাকাতেই দেখতে পেল বহুকষ্ঠে হাত বাঁধা অবস্থায় উঠে দাঁড়াল দারা। সৈন্য দু'জন আবারো ধরে ফেলল তাকে, এইবার ধাক্কা দিল মঞ্চে ওঠার তিন ধাপ কাঠের সিঁড়ির উপর।

মুখ ঘুরিয়ে সৈন্যদের হাতের গণ্ডি পার হবার জন্য উন্মত্ত জনতার দিকে তাকাল দারা। এত দূর থেকেও দেখা গেল শাহজাদার উস্কুখুস্কু, আলুলায়িত চুল কাঁধের উপর পড়ে আছে ইঁদুরের লেজের মত। তারপরেও দেহভঙ্গিমায় ফুটে উঠল আভিজাত্য আর আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। ভাইয়েরা একজন শাহজাদার সমস্ত বাহ্যিক চিহ্ন কেড়ে নিলেও হরণ করতে পারেনি তার আত্মসম্মান, আপন মনে ভাবল নিকোলাস। ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে আওরঙ্গজেবের দিকে সোজাসুজি তাকাল দারা। উপরের বারান্দায় প্রস্তরবৎ মূর্তি হয়ে তাকিয়ে আছে আওরঙ্গজেব। নিকোলাস শুনতে পেল কিছু একটা বলে উঠল দারা, কিন্তু বুঝতে পারল না শব্দগুলো। যদিও আওরঙ্গজেব স্পষ্ট শুনেছে। সাথে সাথে দারার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন সৈন্যকে ইশারা করতেই তারা দারাকে ধরে জনতার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বাধ্য করল হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে।

এরপর মঞ্চের ডানপাশে দুর্গের দেয়ালে থাকা ফটক দিয়ে বের হয়ে এলো শক্তিশালী এক লোক। প্রায় মাটিতে লুটাচ্ছে এরকম এক চামড়ার অ্যাপ্রন পরিহিত লোকটার হাতে চমকাচ্ছে চওড়া ফলার ভোজালি। চিৎকরে করে উঠল নিকোলাস, 'না!...না!' লোকটা মঞ্চে উঠে আসতেই উন্মাদের মত ছাড়া পেতে চেষ্টা শুরু করল দারা। মুক্তি পেতেই লাফ দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে হাতির দিকে দৌড়ে সিপিরের পাশে গেল। পুত্রকে ছোঁয়ার চেষ্টা করল; কিন্তু আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা তাকে আবারো ধরে ফেলে ছুড়ে দিল মঞ্চের দিকে। সেখানে আগের সৈন্য দু'জন আবারো ধরে ফেলল দারাকে। আবারো হাঁটু ভেঙে বসতে বাধ্য হল দারা; প্রত্যেকে শাহজাদার একটি করে বাহু পেছনে টেনে ধরতেই দারার মাথা চলে এলো সামনের দিকে। আওরঙ্গজেবের দিকে তাকাল জল্লাদ, মাথা নাড়ল বিশ্বাসঘাতক ভাই। ভয়ংকর শব্দে আর্তচিৎকার করে উঠল ভিড়ের জনতা, জল্লাদ মাথার উপরে ভোজালি তুলেই নামিয়ে আনল নিচে। একটা মাত্র কোপে সাঙ্গ হল হত্যা। রক্তাক্ত হয়ে দারার শরীর ছিটকে

পড়ল সামনের দিকে। কিন্তু মাথা গড়িয়ে গেল মঞ্চের সামনের দিকে, পড়ে গেল মাটিতে। একজন সৈন্য তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিল সেটা।

আরো ভালোভাবে দেখার জন্য পেছন থেকে সকলে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করায় মুখ তুলে বারান্দার দিকে তাকাল নিকোলাস। চলে গেছে আওরঙ্গজেব। হাঁটুতে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল সিপির। হাতি আবার চলতে শুরু করল দুর্গের দিকে, তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে খুনী চাচার বরাদ্দ করে রাখা ভবিৎষতের দিকে।

অধ্যায়-২১

'এখনো কি কোন খারাপ সংবাদ পাওয়া গেছে, আব্বাজান?' কথা বলতে বলতেই বহুদূরে বুম করে আওয়াজ শুনতে পেল জাহানারা। এতক্ষণে তো দুর্গের প্রাত্যহিক বোমাবাজি বন্ধ হয়ে যাবার কথা। রাত নেমে এসেছে আর গাছের ফাঁক দিয়ে আধা মাইল দূরে যমুনার তীরে বিদ্রোহীদের তাঁবুতে রান্নার চুলার আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। অবরোধ শুরু হবার পর থেকে শাহজাহানের অভ্যাস হয়ে গেছে সন্ধ্যা বেলা দুর্গের গুলি করার ফোকর বিশিষ্ট প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী আর তাঁর নিজের দলের পাল্টা-পাল্টি বোমা বিনিময়ের দৃশ্য দেখা। পিতাকে এখানেই পাওয়া যাবে অনুমান করতে পেরে হারেম থেকে মাত্রই এসে যোগ দিয়েছে জাহানারা।

মাথা নাড়লেন শাহাজাহান, 'না। তারা এখনো ছোট কামান ব্যবহার করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ছে, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের উপর। শুধুমাত্র তাদের সবচেয়ে বড় কামান দিয়ে একটানা গুলিবর্ষণ করলেই সম্ভব হবে জোড়া দেয়ালে ফাটল ধরানো। আমার মনে আছে দুর্গ পুনর্নির্মাণের সময় এর নকশা আমাকে দেখিয়েছিলেন দাদাজান। দেয়ালের মজবুত নির্মাণ আর উচ্চতা নিয়ে গর্বিত ছিলেন তিনি। আমার মনে হয় না কখনো স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে একদিন তাঁরই পরিবারের এক সদস্য এদের উপর হামলা চালাবে। একইভাবে আমিও কখনো ভাবিনি যে নিজ পুত্রই আক্রমণ করে বসবে....'

'মুরাদ কেন তার ভারী অস্ত্র নিয়ে আসছে না? প্রায় একমাস হতে চলল অবরোধের কিন্তু কতটা উন্নতি করেছে সে? একটুও না!'

'আমিও একমত এ ব্যাপারে। যদি মুরাদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হত তাহলে পুরো সামর্থ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু সম্ভবত এমন করবে না। হয়ত দুর্গে ঢোকার আসলেই কোন ইচ্ছে নেই তার।

'তাহলে আমাদের উপর বোমাবর্ষণই বা করছে কেন?'

'আমার ধারণা নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে সতর্ক করে দিতে চায় যেন দুর্গ থেকে তাদের উপর আক্রমণের চেষ্টা না করা হয়। জানে যে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারলে বিদ্রোহীদের সত্যিকারের রূপ প্রকাশ করে সমর্থক জোগাড় করতে পারব না আমরা। একই সাথে অবশিষ্ট বিশ্বস্ত সৈন্যদেরকেও ব্যবহার করতে পারব না। প্রদেশ জুড়ে শুধু তাদের অংশই প্রচারিত হবে আর কর্মচারিরা যদি তাদের কথা বিশ্বাসও করে, দোষ দেব না আমি—অন্তত এ ব্যাপারে কিছু জানতেও চাইব না। কেননা যুদ্ধের ফলাফল যেখানে এখনো অনিশ্চিত।

'হতে পারে দুর্গের সৈন্যদের মনোবল ভেঙে দিয়ে আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে চায়।'

'হতে, কিন্তু যাই হোক না কেন আমি পরোয়া করি না। আমাদের কাছে যথেষ্ট খাবার, পানি আর সৈন্য, গোলাবারুদও আছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা ছাড়াও শত্রুর উপর আঘাতও হানতে পারব আমি। নিজের সৈন্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি প্রতি একটি বিদ্রোহী কামান নিশ্চুপ করার জন্য পাঁচশ রুপি করে উপহার পাবে।'

'হয়ত তুমি যা ভাবছ মুরাদের লক্ষ্য সেটা না। হতে পারে যা কিছু ঘটে গেছে তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। তোমার যেন কোন ক্ষতি না হয়ে যায়... অথবা ওর বোনেদের। হয়ত সে নিজেও সমঝোতার কথা চিন্তা করছে...'

'মুরাদ অবশ্যই জানে যে সে এতটা এগিয়ে গেছে যে চাইলেও আর আমার ক্ষমা লাভ করতে পারবে না। সে আর আওরঙ্গজেব মিলে ময়দানে আমার সৈন্যদেরকে হত্যা করেছে, বাধ্য করেছে আমার নির্বাচিত উত্তরাধিকারী, তাদের নিজ ভাইকে পালিয়ে যেতে।' দারার নাম শুনতেই জাহানারার বিমর্ষভাব খেয়াল করলেন শাহজাহান।

'আমি জানি তোমার জন্য কতটা কঠিন এটা।' আরো একটু মোলায়েম স্বরে বলে উঠলেন, 'গত কয়েক সপ্তাহ আমাদের সকলের

জন্যই কঠিন সময় যাচ্ছে। প্রতিটি দিনই, তোমার মত আমিও আশা করছি যে দারার সংবাদ পাব।'

'কিছু জানতে না পারাটাই বেশি কঠিন। এই দুর্গের মাঝে বন্দি হয়ে বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে কিছুই জানতে পারছি না আমরা। আর একমাত্র যে সংবাদ পেয়েছি সেটাও দুঃসংবাদ...'

শাহজাহান ভালো করেই জানেন কী বলতে চাইছে জাহানারা—দিল্লির সুবাদারের কাছ থেকে বার্তাবাহকের নিয়ে আসা পত্র, তিন সপ্তাহ আগে যাকে আসতে অনুমতি দিয়েছিল মুরাদ, যেটিতে দারা'কে শহরে প্রবেশ করতে দিতে সুবাদারের অস্বীকৃতি লেখা ছিল। সুবাদারের দাবি ছিল, আওরঙ্গজেব তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে সম্রাট এতটাই অসুস্থ; ফলে শহর আর এর রাজকোষ দারার হাতে তুলে দেবার মত কোন পত্র লেখারও ক্ষমতা নেই...

> *শাহজাদা আওরঙ্গজেব আমাকে জানিয়েছে যে শাহজাদা দারা সিংহাসন দখলের জন্য নিজের কার্য সিদ্ধি করার উদ্দেশ্যে জাহাপনার কাছ থেকে যে নির্দেশপত্র এনেছে তা সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র। আর তাই তাকে অস্বীকার করে সাম্রাজ্য আর সম্রাটের প্রতি আমার দায়িত্ব পালন করেছি আমি। এর পরিবর্তে দিল্লির তত্ত্বাবধানের ভার তুলে দিচ্ছি শাহজাদা আওরঙ্গজেবের উপর। যে কিনা আমার মতে একজন অনুগত পুত্র হিসেবে মহান জাহাপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। পরম করুনাময় আল্লাহ দ্রুত আপনার আরোগ্য লাভে সহায়তা করুন।*

'আশা করি কোন একদিন দারা আর আমি একসাথে হয়ে সুবাদারকে তার প্রতারণা আর ভণ্ডামির জন্য শাস্তি প্রদান করতে পারব। জল্লাদের হাতের নিচে দিতে পারলেই বেশি খুশি হব। একটা প্রতিউত্তরও পাঠাতে পরিনি তাকে অভিযুক্ত করে। সাম্রাজ্যের উপর আমার ইচ্ছে চাপিয়ে দেয়ার পক্ষে আমি এতটাই অলস হয়ে পড়েছি।

'তোমার কি মনে হয় আওরঙ্গজেব এখনো দারার পিছু নিচ্ছে?'

'হ্যা। দারাই তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। আমার মনে হয় না আগ্রা আর দিল্লি থেকে দারাকে বহুদূরে না পাঠিয়ে দেয়া পর্যন্ত সুস্থির

হবে আওরঙ্গজেব। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পারে এখানেও ফিরে আসতে চাইবে সে। বেশি সময়ের জন্য মুরাদের হাতে পুরো দায়িত্ব ছেড়ে রাখারও ঝুঁকি নিতে চাইবে না। নিশ্চয় গোপনে তার মনে এ ভয়ও থাকবে যে যদি মুরাদ একাকী পুরো সাম্রাজ্য দখল করে নিতে চায়—যেমনটা সে নিজে করেছে। আশা করছি যে শীঘ্রি তাদের দু'জনের মাঝেই ঝগড়া বেধে যাবে। যদি এমনটা হয় তাহলে দারা আরেকটা সুযোগ পেয়ে যাবে। বিশেষ করে যদি পূর্বদিক থেকে সৈন্য নিয়ে ফিরে আসতে পারে সুলাইমান। এই যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি...'

খানিকক্ষণের জন্য চুপচাপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পিতা-কন্যা। গত কয়েকটা দিন ধরেই প্রায় এরকম ঘটছে, ভাবল জাহানারা। বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় কথা বলার আর কিইবা আছে?

সারাক্ষণ বিভিন্ন কিছু কল্পনা করা বেদনাদায়ক। নিত্য নতুন দুশ্চিন্তা এসে যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দেয়। প্রতিটা দিন অনুভব করছে নিজের ভেতরে আরো বেশি করে ডুবে যাচ্ছেন পিতা, যেমনটা সে নিজে। মাঝে মাঝে মনে হয় নিকোলাসের কথা। তার চারপাশের দুনিয়া—একদা পূর্ণ ছিল নিশ্চয়তায়—হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত। জানে যে নিকোলাসের উপর এখনো বিশ্বাস করতে পারে সে—ভুলে যায়নি বিক্ষত মুখে নিকোলাসের নম্র ছোঁয়া। সেই মুহূর্তে কী মনে হয়েছিল তার? বিস্ময় বা চমক নয়, কিন্তু... খানিকটা সময় লেগেছে এটা উপলব্ধি করতে.. এরকম দুঃসময়ে কৃতজ্ঞতা। যদি রোশনারা এটা দেখতে পেত, কোন সন্দেহ নেই যে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিত পুরো ব্যাপারটার।

রোশনারার কথা মনে হতেই স্মরণ হল সান্ধ্য খাবারের জন্য হারেমে ফিরে যাওয়া উচিত। অবরোধের শুরু থেকেই ভগিনীদ্বয়ের সাথেই খাবার গ্রহণ করে সে। রোশনারার সাথে তার সম্পর্ক এখনো বেশ শীতল, পারতপক্ষে একে অন্যের সাথে তেমন কথা বলে না। কিন্তু জানে কামানের গর্জন ভীত করে তোলে গওহর আরাকে। যদিও এখন আর সে কোন শিশু নয়, পূর্ণবয়স্ক নারী, তার কনিষ্ঠ ভগিনী খেতে পারছে না তেমন, ঘুমাচ্ছেও অল্প। প্রতি সন্ধ্যায় জাহানারা চেষ্টা করে গওহর আরার মনোযোগ আনন্দে ভুলিয়ে রাখতে।

'আব্বাজান, তোমার অনুমতি নিয়ে হারেমে ফিরে যেতে চাই আমি।' মাথা নাড়লেও কিছু বললেন না শাহজাহান। শান্তিকালীন সময়ের মতই প্রাত্যহিক সান্ধ্য মশাল জ্বলে উঠল হারেমের প্রধান আঙিনায় যাবার ফটকের উভয় পার্শ্বে, পা বাড়াল জাহানারা।

তুর্কি নারী সৈন্যরা তার জন্য দরজা মেলে ধরতেই হাসির আওয়াজ শুনতে পেল জাহানারা। আঙিনার মাঝখানে ঝরনার ধারে মার্বেলের উপর বসে আছে তিন নারী। এক মুহূর্তের জন্য তাদের হাস্যরসের শব্দে ভান করল যেন কিছুই অনর্থ হচ্ছে না চারপাশে। এরপর নিজের আর বোনদের জন্য সান্ধ্য খাবার আয়োজনের নির্দেশ দিল; কিন্তু তার আগে রোশনারার কাছে গিয়ে দুর্গের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে পিতার ভাষ্য জানাতে হবে।

কিন্তু আঙিনার দূরতম কোণে রোশনারার গৃহে প্রবেশ করতেই দেখতে পেল বোন সেখানে নেই। এমনকি তার পরিচারিকারাও নেই। হতে পারে স্নানঘরে গেছে? চলে যেতে উদ্যত হতেই বোনের জমকালো কারুকাজ করা গহনার বাক্সের উপরে ভাঁজ করা একটা কাগজ পড়ে আছে দেখতে পেল জাহানারা। কৌতূহলী হয়ে তুলে নিয়ে খুলতেই দেখতে পেল রোশনারা পরিষ্কার অক্ষরে সম্বোধন করেছে পিতাকে, বোনের ময়ূরের সীলমোহরও নজরে পড়ল। কেমন বেখাপ্পা দেখাল পুরো ব্যাপারটা। পত্র লেখার কী দরকার যখন চাইলেই পিতার সাথে দেখা করতে পারে সে... জাহানারা পত্রখানা ফিরিয়ে রাখতে গিয়েই দেখতে পেল আরেকটা জিনিস—বাক্সের রুপার ঢাকনা খোলা, অথচ নিজের শ্রেষ্ঠ আর সুন্দর রুবি, খোদাই করা পান্না আর তাদের গ্রেট দাদীজান হামিদা বানুর নেকলেসও ওখানেই রাখে রোশনারা। তার পরিচারিকারা কেমন করে এতটা ভুলো মন হতে পারে? ঢাকনা তুলে ভেতরে তাকাল জাহানারা। বাক্স খালি, শুধু কয়েকটা রুপার চুড়ি পড়ে আছে। ভারী ঢাকনাটা আবার জায়গা মত রেখে পুরো কক্ষের দিকে নজর বুলালো জাহানারা। যেমনটা সবসময় থাকে তেমন পরিষ্কার নয়। ড্রয়ার থেকে ঝুলে আছে একটা কাশ্মিরি শাল, মেঝেতে গড়াচ্ছে সোনার পাড়ওয়ালা সিল্কের স্কার্ট। ডাকাতি হয়েছে নাকি? এত সুরক্ষিত হারেমে তো সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু এরপরই মনে হলো আরেকটা কথা—চমকে

গিয়ে... কি করছে ভাবার আগেই পত্রের সীলমোহর খুলে পড়ে ফেলল বোনের লেখা, কার্পেটের উপর ঝরে পড়ল সবুজ মোমের গুঁড়া।

প্রিয় পিতা,
আপনি এই চিঠি পড়তে পড়তে দুর্গ ছেড়ে ভাইদের কাছে বেরিয়ে পড়েছি আমি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আপনি যাদেরকে ভুল বুঝেছেন তাদের প্রতি বিশ্বস্ত আমি, যাদের হৃদয়ে সাম্রাজ্যের জন্য সৎ অভিপ্রায় ছাড়া আর কিছু নেই, আমার বিবেকের কথা মান্য করতে হবে আমাকে। হয়ত আবারো আনন্দময় সময়ে আমাদের দেখা হবে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হল যেন জমে গেল জাহানারা, হাতে ধরা পত্রখানার লাইনগুলোর অর্থই যেন বোধগম্য হল না। এরপর ধাতস্থ হতেই চিঠিটা ভাঁজ করে দরজার কাছে গিয়ে ডেকে পাঠালো পরিচারিকাকে।

'এখনি খাজাসারাকে ডেকে পাঠাও। বলো যে এটা অত্যন্ত জরুরি।'

দুই মিনিটেরও কম সময়ের মাঝে এসে হাজির হল হারেমের তত্ত্বাবধায়ক। সদা প্রশান্ত আর অভিজাত চেহারাতে উদ্বিগ্নতার ছাপ। মাননীয় শাহজাদী?

'আমি যখন বোনের সাথে দেখা করতে এসেছি, সে এখানে ছিল না। পরিবর্তে এই চিঠিটা পেয়েছি যাতে লেখা যে দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে সে।'

'কিন্তু এটা তো অসম্ভব... একেবারে, কিছুতেই সম্ভব নয়।'

'আমার মনে হয় ভুল বলছ তুমি, শেষবার কখন দেখেছ তাকে?'

দ্বিধায় পড়ে গেল খাজাসারা। 'সম্ভবত আজ সকালবেলা কথা হয়েছিল... হারেমের একটা ব্যাপারে...

'কোন ব্যাপারে?'

'আমি ভাবিনি যে এটা নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করা উচিত। গতকাল সন্ধ্যায় হারেমের এক ভৃত্য, বয়স্ক, শৌচাগার পরিষ্কারক মারা গেছে। শহর থেকে আসা হিন্দু ছিল বৃদ্ধা আর তার শেষ ইচ্ছে ছিল শহরে চিতায় পোড়ানোর জন্য যেন তার মৃতদেহ আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

শেষ মুহূর্তে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল বেচারা আর আমিও কথা দিয়েছি যে সাধ্যমত সব করব, যদিও বিশ্বাস করুন বুঝতে পারছিলাম না যে কীভাবে সম্ভব। কোন একভাবে শাহজাদী রোশনারা মৃতের কথা জানতে পেরে আমাকে ডেকে পাঠান। বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কর্মচারিদের প্রতি সচরাচর কোন আগ্রহ দেখান না তিনি। সহৃদয়ভাবে আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করার পর জানান যে, মৃতা নারীর অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আজ সকালে প্রথম আলো ফোটার সাথে সাথে দুর্গের সেনাপ্রধানের কাছে বার্তা পাঠান যেন শাহজাদা মুরাদের শিবিরে বার্তাবাহক ও যুদ্ধবিরতীর পতাকা পাঠিয়ে দেয়া হয় দিনের বোমা বর্ষণ শুরুর আগেই। বার্তাবাহকের কাছে ইতিমধ্যেই স্বহস্তে লিখে রাখা পত্র ছিল। সীল করা চিঠিতে দুর্গ থেকে মৃতদেহ বের করে নেবার আকুতি লেখা ছিল... অন্তত তিনি তাই দাবি করেছেন...; গলা কেঁপে গেল খাজাসারার।

'মাননীয়া আমি...'

'বলে যাও।'

'গোধূলি বেলায় বার্তাবাহক ফিরে এসে জানায় যে দুর্গ থেকে নিরাপদে মৃত নারীর দেহ বের করে নেবার অনুমতি দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। আমরা সবকিছু প্রস্তুত করে রেখেছিলাম আর আপনি মহান জাহাপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবার পরপরই চারজন সাদা পোশাকধারী হারেমের পরিচারক দুর্গ থেকে মৃতদেহ বাইরে নিয়ে গেছে...; মুখের উপর হাত চাপা দিল খাজাসারা। 'নিশ্চয় এভাবেই ঘটেছে পুরো কাণ্ডটা। আপনার ভগিনী কোন এক নারীর ছদ্মবেশ নিয়েছে নিশ্চয়। তাদের সবারই মুখ ঢাকা ছিল ওড়নায় আর তাদেরকে চেক করে' দেখার কথা আমার মাথাতেই আসেনি...'

'কোন ফটক ব্যবহার করেছে তারা?'

'বার্তাবাহকের ব্যবহার করা পাশের ফটক—শহরের দিকে মুখ করে থাকা ছোট ফটকটা।'

তো এই কারণেই সে আর পিতা যমুনার দিকে তাকিয়ে থাকলেও কিছুই দেখতে পায়নি, ভাবল জাহানারা। যখন তারা দাঁড়িয়ে কথা বলছি, রোশনারা পালিয়ে গেছে... কীভাবে করল এমন একটা কাজ? আর কত

বড় সাহস বিবেকের কথা লিখেছে যখন আসলে তার কোনই বিবেক নাই? কিন্তু এরপরই নতুন চিন্তা এলো মাথায়।

'শাহজাদী গওহর আরার কী খবর? তাকে শেষবার কখন দেখেছ তুমি?'

'সারাদিন মাথা ব্যথায় নিজের ঘরেই শুয়েছিলেন তিনি। এটাই জানিয়েছে তাঁর পরিচারিকা আর তাদেরকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই আমার... আমি শপথ করে বলছি দায়িত্বের ব্যাপারে আমি সবসময় সচেতন।'

কিন্তু শুনছিল না জাহানারা। শশব্যস্ত পায়ে আঙিনার ওপাশে ছোট বোনের কক্ষের দিকে চলল, সাথে পিছনেই খাজাসারা। গওহর আরাও নিশ্চয়ই পিতাকে ছেড়ে যায়নি, নাকি? আইভরি রঙা দরজাগুলো বন্ধ, ঠিক যেমন রোশনারার গৃহের দরজা বন্ধ ছিল। দুরুদুরু বক্ষে খুলে ফেলল, জাহানারা। গরাদের উপর পর্দা নামানো আর অল্প কয়েকটা বাতি জ্বলছে। কোন একটা লতা জাতীয় গন্ধে—সম্ভবত কোন সুগন্ধি ফুল—ভরে আছে বাতাস—অন্ধকারে চোখ সইয়ে আসতেই ডিভানের উপর শুয়ে থাকা একটা দেহ নজরে এলো জাহানারার এরপর শুনতে পেল জড়ানো কণ্ঠস্বর। 'কে? আমার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে?'

গলার স্বরে মনে হল গওহর আরাই, তারপরেও নিশ্চিত হতে হবে যে এটা কোন কৌশল নয়। কুলুঙ্গি থেকে তেলের বাতি নিয়ে কাছে এগিয়ে গেল জাহানারা। শিখার আভায় দেখা গেল বোনের পাতলা মুখমণ্ডল... অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ।

'ওহ, তুমি, জাহানারা। আমি ভেবেছি বোধ হয় সাত্তি আল-নিসা। সারাদিন তাকে ডেকেছি। একমাত্র সে-ই জানে কীভাবে এই ব্যথা দূর করতে হয়, কিন্তু কাছাকাছি নেই সে।'

'শাহজাদী আজ সকালের পর থেকে সাত্তি-আল-নিসাকে দেখিনি আমি।' জাহানারার পিছুপিছু রুমে আসা খাজাসারা বলে উঠল।

কাঁধের উপর দিয়ে ইশারা দিল জাহানারা যেন আর কিছু না বলে ফেলে। এখনি গওহর আরাকে রোশনারার পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কিছু বলে লাভ নেই। বোনের দিকে ফিরে তাকাল। 'আমার খারাপ লাগছে যে তোমার শরীর ভালো না। আমি দেখছি তোমার জন্য সাত্তি আল-নিসাকে খুঁজে পাই কিনা।'

আবারো খাজাসারাকে সাথে নিয়ে জাহানারা গেল মোটা কার্পেট পাতা দেয়ালে সিল্ক ঝোলানো করিডোরের শেষ মাথায় প্রায় তিন দশক ধরে বরাদ্দকৃত সাত্তি আল-নিসার কক্ষে—যখন থেকে সে মমতাজের বিশ্বস্ত পরিচারকের কাজ পেয়েছে। একমাত্র সাত্তি আল-নিসা'কেই সে নির্ভয়ে বলতে পারবে যে কী ঘটছে, যদিও এখন পর্যন্ত রোশনারার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু টের পায়নি সে। তার বোন কি হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার সুযোগ নিয়েছে নাকি বহু আগে থেকেই এটির পরিকল্পনা করছিল?

পর্দা সরিয়ে কক্ষের মাঝে প্রবেশ করার সাথে সাথে বোঝা গেল যে কোথাও কোন সমস্যা হয়েছে। মেঝেতে বড় একটা সিল্কের পাশ বালিশের উপর উপুড় হয়ে আছে সাত্তি আল-নিসা, চারপাশে ছড়িয়ে আছে রুপালি ধূসর কেশরাজি। সে কি মূর্ছা গিয়েছে? এখনো এত পরিশ্রমী যে বয়সের কথা মনেই হত না। সাত্তি আল-নিসার পাশে হাঁটু গেড়ে তার হাত নিজের হাতে তুলে নিল জাহানারা। ঠাণ্ডা হাত, তালু ঘষার পরেও কোন প্রতিক্রিয়া নেই... এমনকি বুকেও ওঠা-নামার কোন চিহ্ন নেই। না, এটা হতে পারে না... সাত্তি আল-নিসার কাছে মুখ নামিয়ে নিতেই জাহানারার চোখ ভরে গেল জলে। এরপরই অনুভব করল অথবা তার মনে হল—নিজের ত্বকের গায়ে অত্যন্ত হালকা নিঃশ্বাসের উষ্ণতা। আস্তে করে সাত্তি আল-নিসার হাত নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো জাহানারা। 'বেশ অসুস্থ হলেও আমার ধারণা এখনো বেঁচে আছে... দ্রুত সাহায্য করার জন্য কাউকে নিয়ে এসো।' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা খাজাসারাকে চিৎকার করে আদেশ দিল জাহানারা।

কয়েক মিনিটের মাঝেই বেগুনি আলখাল্লা পরিহিত সঙ্গীকে নিয়ে এলো খাজাসারা, যার কপালে অদ্ভুত ট্যাটু আঁকা।

'এই হল ইয়াসমীন। আরব থেকে এসেছে। হাকিম পিতার কাছ থেকে এ বিদ্যার কিছু দক্ষতা শিখেছে সে।'

এক পাশে সরে গিয়ে ইয়াসমীনকে জায়গা দিল জাহানারা, সাত্তি-আল-নিসার উপর ঝুঁকে নাড়ি পরীক্ষা করে এক চোখের পাতা তুলতেই দেখা গেল ঘন, প্রশস্ত মণি।

'কী হয়েছে তার? জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে?' জিজ্ঞেস করল জাহানারা।

'না, মাননীয়। আমার ধারণা আফিম খেয়ে গভীর ঘুমে মত্ত হয়ে আছে।'

'আফিম? তুমি নিশ্চিত? কখনো তার এই অভ্যাসের কথা শুনিনি আমি।'

ঘুরে তাকিয়ে, নিচু মার্বেলের সাদা টেবিলের উপর রুপালি কাপ দেখতে পেয়ে নিজের ডান হাতের তর্জনী চুবিয়ে দিয়ে চুষে দেখল, 'কোন সন্দেহ নেই, পপি ফুলের কটু স্বাদ, এমনকি গোলাপের সুগন্ধি মেশানো শরবতে মেশানো হলেও, যায়নি।'

'কেউ একজন ইচ্ছেকৃতভাবে তাকে নেশা করিয়েছে। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।' জাহানারা ভালোভাবেই অনুমান করতে পারল যে কে এই ব্যক্তি; রোশনারা কোন সুযোগ রেখে যেতে চায়নি আর তাই বৃদ্ধা এই নারীকে নেশা করিয়েছে যে কিনা প্রায় তার সারা জীবন দেখভাল করেছে। 'তুমি একেবারে নিশ্চিত যে ভয়ের কোন কারণ নেই?'

'দীর্ঘস্থায়ী কোন ক্ষতি হবার কথা না। কয়েক ঘণ্টার মাঝেই চেতনা ফিরে পাবে, কিন্তু মাথাব্যথা থাকবে আর দুর্বল ও অসুস্থও বোধ করবে।'

'এখানেই থাকো। জেগে ওঠার সাথে সাথে আমাকে খবর পাঠাবে।' এই কথা বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে কক্ষ ছেড়ে এলো জাহানারা। কেমন করে পিতাকে জানাবে এসব খবর? তারপরেও জানাতে হবে আর যত দ্রুত সম্ভব...

কয়েক মিনিট পরে, হাঁপাতে হাঁপাতে পিতার কাছে গেল জাহানারা।

'কী হয়েছে? এত শীঘ্রি ফিরে এলে কেন?'

দ্বিধায় পড়ে গেল জাহানারা, কিন্তু সত্য লুকানোর আর কোন পথ নেই—যে আবারো নিজের রক্ত-মাংস দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছেন পিতা। 'রোশনারা দুর্গ ছেড়ে মুরাদের কাছে চলে গেছে। এই চিঠি লিখে গেছে... ক্ষমা চাইছি। কী ঘটেছে তাড়াতাড়ি জানার জন্য খুলে ফেলেছি আমি।'

শাহজাহান রোশনারার চিঠি হাতে নিয়ে পড়ে দেখলেন সংক্ষিপ্ত বার্তাটা। তারপর দলামোচড়া করে মাটিতে ফেলে দিলেন কাগজটা।

'মনে হচ্ছে মৃত হিন্দু নারীর দেহ বহনকারীদের দলে লুকিয়ে দুর্গ ছেড়ে গেছে সে। আর...'

হাত তুললেন শাহজাহান। 'কীভাবে সে এটা করেছে তা কোন বিষয় নয়।' আস্তে করে বলে উঠলেন শাহজাহান। 'গওহর আরার কি খবর?'

'এখনো এখানেই আছে।'

'খুশি হয়েছি আমি। আর কিছু না বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন কন্যার কাছ থেকে যেন তাঁর চেহারা না দেখা যায়। ভেবেছিল রেগে উঠবেন তিনি; কিন্তু তার বদলে অনুভব করল পিতার গভীর বিমর্ষতা। ভালোই বুঝতে পারল জাহানারা। কেননা সে নিজেও ঠিক একই জিনিস অনুভব করছে। কেমন করে এতটা বিভেদ তৈরি হয়ে গেল তাদের পরিবারে? কোন পরিবারে এহেন বিচ্ছেদ—বিশেষ করে একটি রাজপরিবারে কখনো সত্যিকারে সারবে? হয়ত না।

'আমার শিবিরে স্বাগতম। তুমি আর আমি একত্রে মিলেমিশে এখন এই আনন্দ উদ্‌যাপন করতে পারব যে আমি আগ্রাতে ফিরে এসেছি।' মুরাদের পিঠে চাপড় মেরে বলে উঠল আওরঙ্গজেব।

'তোমার রক্ষীবাহিনীকে আলাদাভাবে খাবার পরিবেশন করার আয়োজন করেছি আমি। কিন্তু আমরা দু'জনে একসাথে আহার করব। আমার তাঁবুতে।'

'তোমার আমন্ত্রণ পাবার সাথে সাথে ছুটে এসেছি আমি। রোশনারাও অভিনন্দন পাঠিয়েছে। ভালোই হয়েছে তাই না, সে দুর্গ থেকে বের হবার পথ করে নিয়ে আমার সাথে এসে যোগ দিয়েছে।'

'আমার শুধু মনে হচ্ছে জাহানারাও যদি থাকত, কিন্তু তুমি তো জানো তার ধরন। সাম্রাজ্যের কিসে ভালো হবে তার চেয়েও উপরে পিতার প্রতি বিশ্বস্ততাকে স্থান দিয়েছে সে...' নিজের তাঁবুর দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আওরঙ্গজেব, যেখানে শতরঞ্জি দিয়ে ঢাকা মেঝের উপর পেতে দেয়া হয়েছে সিল্কের কুশন আর খাবার পরিবেশনের জন্য নিচু একটা টেবিলের উপর ইতিমধ্যেই পেতে দেয়া হয়েছে কাপড়।

মুরাদ বসে কয়েকটা তাকিয়ার গায়ে হেলান দিতেই একজন পরিচারক পিতলের পাত্রে পানি ঢেলে দিল হাত ধোবার জন্য। এরপর আরেকজন নিয়ে এলো মদ। আমি ভেবেছিলাম তুমি মাদক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছ আওরঙ্গজেব?

হেসে ফেলল আওরঙ্গজেব, তাই করেছি, কেননা ধর্মীয় সব নীতিতে বিশ্বাসী আমি। কিন্তু জানি তুমি নও। আর যেমনটা বলেছি, এখন সময় হয়েছে ভোজনরসিক আর হৃদয় খুলে দেবার, কঠোরতার নয়... আমি পান করব না; কিন্তু উদ্‌যাপনের নিমিত্তে তুমি যত চাও পান করতে পারো।'

'তোমার কি সত্যিই মনে হয় আমরা জিতে গেছি?'

'হ্যা, ভেবে দেখ তুমি, দারা মৃত। আর কে আছে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার? নিশ্চিতভাবে এটাই ভাবছে গুরুত্বপূর্ণ সব অভিজাত আর প্রজাবর্গ... এমনকি যারা দারার হয়ে যুদ্ধ করেছে তারাও এখন তাড়াহুড়া করে নিজেদেরকে আমাদের সমর্থক হিসেবে প্রমাণ করতে ব্যস্ত। প্রায় প্রতিদিনই এ জাতীয় বার্তা পাচ্ছি আমি, তুমিও নিশ্চয়।'

মাথা নেড়ে মুরাদ বলে উঠল, 'কিন্তু পিতা আর দুর্গের অবশিষ্ট সৈন্যরা? হাল ছেড়ে দেবার কোন চিহ্নই নেই এখনো।'

'আগেকার মত নেই আর পিতা। খুব বেশি সময় লাগবে না যুক্তি দিয়ে বুঝতে—বিশেষ করে যখন শুনবেন যে সেনাবাহিনী নিয়ে আগ্রাতে ফিরে এসেছি আমি। আর যদি তা নাও হয় তাহলে কোন না কোন রাস্তা ঠিকই বের করে ফেলব বন্দি হতে বাধ্য করাতে।'

কাপ থেকে লম্বা চুমুক দিয়ে গলায় মদ ঢালল মুরাদ, হাসতে হাসতে, পিছনে হেলান দিল। 'তাহলে তুমিই ঠিক বলেছিলে... আমার অবিশ্বাস সত্ত্বেও সবসময় বলতে যে আমরাই জিতব—এমনকি সামুগড়ের পরেও। যদিও দারার পেছনে ছিল পিতা আর রাজকীয় সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ অংশ...'

'হ্যা, কিন্তু নিজের সুযোগগুলো হেলায় হারিয়েছে সে, বিশেষ করে যখন অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। খলিল উল্লাহ খানের মত শক্তিশালী সমর্থককেও পরোয়া করার প্রয়োজন মনে করেনি—ধরেই নিয়েছিল যে সবাই তাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু উত্তরে অভিযানের সময়

থেকে খলিল উল্লাহ খানকে চিনি আমি, আর তাই জানতাম যে, কী বলা যায় "উৎসাহী" ছিল আমাদের সাথে যোগ দেবার প্রতি...'

'গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দারার কথা অনেক ভেবেছি আমি... তার মৃত্যু সত্যিই কী প্রয়োজনীয় ছিল কিনা। আমাদের ভাই ছিল সে। অন্য কোন পথ নিশ্চয়ই ছিল... দেশান্তরী বা মক্কায় তীর্থযাত্রী হিসেবে পাঠিয়ে দেয়া?'

'সবসময় একটা শিশুর মত ভাবো তুমি। ব্যাপারটা ছিল সে অথবা আমরা। যদি তাকে বেঁচে থাকার সুযোগ দিতাম, আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত সে। পুরো সংঘর্ষ আবারো দানা বেঁধে উঠে, আরো কতকগুলো জীবন ধ্বংস হত।'

'মনে হয় তুমি ঠিকই বলছ।'

'আমি জানি আমি তাই। যাই হোক, হয়ে গেছে সবকিছু। এখন তোমার মাথা থেকে তাড়িয়ে দাও এসব। সিদ্ধান্ত আমি একাই নিয়েছি, জবাবও আমিই দেব।'

'ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত, তাই না? পিতা আমাদের দু'জনকেই ভর্ৎসনা করেছিলেন উত্তরের অভিযানে ব্যর্থতা নিয়ে অথচ শেষতক আমরাই বিজয়ী হলাম। হতে পারে এখন পিতা পস্তাবেন এতটা রূঢ় হবার জন্য।' আরো একবার চুমুক দিয়ে বলে চলল মুরাদ, 'পরিতাপের বিষয় যে শাহ সুজা আমাদের সাথে নেই। এটা তো তারও বিজয় আর আমাদের সাথে উদ্‌যাপনও করতে পারত। হতে পারে এর ফলে মেরুদণ্ডে বল ফিরে পাবে সুলাইমানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য।'

'মেরুদণ্ডে বল?'

'হ্যাঁ। সুলাইমানকে তাকে পরাজিত করার সুযোগ দিয়ে আর পালিয়ে গিয়ে আমাদের কাছে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে সে।'

'কিন্তু এক অর্থে এতে আমাদের সুবিধা হয়েছে। শাহ সুজা আগ্রায় আসার পরিবর্তে পূর্বদিকেই আটকে রেখেছে সুলাইমানকে। যদি সুলাইমান তার পিতার সাথে সামুগড়ে যোগ দিত, ফলাফলও ভিন্ন হত হয়ত।'

'হতে পারে... যদিও চূড়ান্ত রূপ পেত না। সুলাইমানের নিজের কিছু ভুল ছিল যেমনটা ছিল তার পিতার... অসহিষ্ণু, অতি আত্মবিশ্বাসী আর চিন্তার কোন ধার ধারত না।'

'তো সে কোন হুমকি নয়?'

'বেশি গুরুত্ব দেবার মত নয়। একবার দারার মৃত্যুসংবাদ সুলাইমানের শিবিরে পৌঁছালেই, আমার ধারণা তার কিছু সৈন্য চলে যাবে আর বাকিরা মনোবল হারিয়ে ফেলবে। ভালো হয় যদি এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে শাহ সুজা তাকে পরাজিত করে। কিন্তু যদি শাহ সুজার মনে হয় যে তার জনবল কমে গেছে তাহলে আমি বলব যেন নিজের সৈন্য নিয়ে সোজা আগ্রাতে চলে আসে। এখন সময় হয়েছে আমাদের তিনজনের একত্রিত হবার। যেন একসাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলো কীভাবে নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেব। কিন্তু অনেক গুরুগম্ভীর কথা হয়েছে... চলো, খাবার গ্রহণ করা যাক।'

মুরাদ পরিচারকের কাছে পেয়ালা বাড়িয়ে দিল পূর্ণ করে দেয়ার জন্য। অন্য পরিচারকেরা একে একে ভেড়ার রোস্ট, কিসমিস দেয়া কোয়েল, কেশরের সুগন্ধিলা পাখির মাংস আর শুকনো চেরি ও অ্যাপ্রিকট ছড়িয়ে দেয়া পোলাওয়ের ডিশগুলো নিয়ে আসতে লাগল। খানিকক্ষণের জন্য চুপচাপ খেয়ে চলল দুই ভাই। মুরাদ খেল ক্ষুধার্তের মত, পরিমাণেও বেশি। অন্যদিকে আওরঙ্গজেব খেল অল্প একটু। তাঁবুর আধ-খোলা ফটক দিয়ে দেখা গেল তারা ভরা আকাশ, অর্ধাচন্দ্রাকৃতি চাঁদও উঠে গেছে, তৃপ্তির ঢেকুর তুলে পিছনে হেলান দিল মুরাদ, মদের পেয়ালা থেকে আরেক চুমুক মুখে দিয়ে বলে উঠল, 'তোমার মনে আছে আমার পছন্দের খাবারগুলো কী। আমি খুব খুশি হয়েছি...

'অবশ্যই, আনন্দ পিয়াসী ভাই আমার। আর তুমি পছন্দ কর এরকম আরেকটা জিনিসেরও ব্যবস্থা করেছি আমি।' আওরঙ্গজেব হাততালি দিয়ে উঠতেই তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করল মুখমণ্ডল সহ সারা শরীর ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখা, বুকের উপর হাত জড়ো করা এক নারী। 'তোমাকে একা রেখে যাচ্ছি আমার উপহার উপভোগ করার জন্য। আমি জানি তার এমন সব দক্ষতা আছে যে খুশি হবে তুমি। যদি চাও তোমার সেবা করতে নিয়ে যেতে পারো তাকে। অনেক রাত হয়ে গেছে। এখানেই রাত কাটাও না কেন যেন সকালবেলা আবার কথা বলতে পারি?'

আওরঙ্গজেব চলে যেতেই, তাঁবুর পর্দা নেমে প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে গেল। ইশারা করে আগন্তুক নারীকে কাছে ডাকল মুরাদ, 'তোমার চেহারা

দেখাও আমাকে।' ওড়না সরিয়ে নিতেই বাদামি চোখ জোড়া তার দিকে চেয়ে আছে দেখতে পেল মুরাদ। আর কোন আদেশের অপেক্ষা না করেই মাথার কাপড় ফেলে দিতেই ঘন এলো চুল বেরিয়ে পড়ল।

চওড়া হল মুরাদের হাসি। সুন্দরী নারী ভালোবাসে সে, ভালোভাবেই জানে তার ভাই... আওরঙ্গজেব সত্যিই তার কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করেছে মুরাদের উপর।

'নাম কী তোমার?'

'জয়নাব।'

'তো জয়নাব, দেখা যাক আমার ভাইয়ের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারো কিনা তুমি...'

মদের প্রভাবে খানিক টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মুরাদ, খুলে দিল জয়নাবের কাপড়ের একটামাত্র হুক। মেঝেতে পোশাক লুটিয়ে পড়তেই বেরিয়ে পড়ল নগ্ন শরীর, মার্বেলের মত উজ্জ্বল দেহত্বক আর সোনালি উন্নত বক্ষ। কাছে এগিয়ে কৃশকায় কোমর, নরম নিতম্ব সহ শরীরের প্রতিটি বাঁকে ঘুরে বেড়াতে লাগল মুরাদের হাত, কেশগুচ্ছে মুখ ডুবিয়ে দিতেই নাকে লাগল জেসমিনের সুগন্ধ। একেবারে পরিপূর্ণ এই নারী... ডান নিতম্বে এক হাত রেখে, অন্য হাত পৌঁছে গেল দু'পায়ের ফাঁকে।

'অপেক্ষা করুন, শাহজাদা আগে আপনাকে মালিশ করতে দিন। এতে আনন্দ বেড়ে যাবে বহুগুণ, কথা দিচ্ছি। আপনার ভাই তো জানিয়েছেন যে আমার বিশেষ দক্ষতা আছে... তিনি চান যেন সেসব প্রয়োগ করে আপনাকে সন্তুষ্ট করি আমি... তাকে মনোকষ্ট পেতে দেবেন না।'

কৌতূহলী হয়ে জয়নাবকে ছেড়ে দিয়ে মাথা নাড়ল মুরাদ। 'ভালো। দুঃখ পাবেন না আপনি। প্রথমে, আপনার পোশাক খুলতে দিন।' দ্রুত হাতে মুরাদের পোশাক খুলে নিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে খানিক তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলল জয়নাব। 'আপনার সাথে রাত কাটাতে পেরে ধন্য হবে যে কোন নারী... আসুন, কুশনের মাঝে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

মুরাদ কথামত কাজ করতেই অনুভব করল তার দুই পা ফাঁক করে দিল জয়নাব। এরপর নিজের বুক দিয়ে মসৃণভাবে চাপ দিতে লাগল মুরাদের কাঁধে, দেহত্বকে ঘসতে লাগল স্তনবৃন্ত। একই সাথে নিজের

কোমর আর শরীরের সবচেয়ে নাজুক অংশ দিয়ে ঘষতে লাগল মুরাদের নিতম্ব। উচ্চ স্বরে চিৎকার করে উঠল মুরাদ। 'দেখেছেন, আমি বলেছি না এটা কত ভালো হবে? একটু পরে আপনার পালা আসবে আমাকে তৃপ্ত করা, শাহজাদা, তবে এত শীঘ্রি না...' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তেই জয়নাবের চুল মুরাদের উপর ছড়িয়ে পড়ল সুগন্ধি কার্পেটের মত। তাঁবুর বাইরে কোথাও থেকে ভেসে এলো হাতির ঢাকের বাজনা; কিন্তু কোন দিকে হুঁশ নেই মুরাদের। শুধু অনুভব করছে জয়নাবের মাংসল দেহ, নিজেকে তার হাতে সঁপে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল মুরাদ।

মদ আর লীলাখেলায় মত্ত সুখে খানিক সময় লাগল বুঝতে যে জয়নাব উঠে গেছে তার উপর থেকে, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে সে। এখন কী? এখন কি আনন্দ বাড়িয়ে দেবার জন্য অন্য কোন খেলা খেলবে জয়নাব নাকি চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে গেছে? ঘুরে গিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল কোন বড় বড় নারী চক্ষু নয়, সরু, কালো আর পুরুষালী এক জোড়া চোখ। কী...?'

আর কিছু বলার আগেই, তাঁবুর প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে কোন একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'বেঁধে ফেল!' বিপদের গন্ধ বেশ দেরিতে পাওয়ায় উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই কালো চোখের সৈন্যটা নিজের ছুরির ফলা ধরল মুরাদের গলায় আর ছায়া থেকে বের হয়ে এসে অন্য দু'জন বেঁধে ফেলল তার হাত। দেহরক্ষীদের ডাকার জন্য মুখ খুলল, আশা করল হয়ত কেউ থাকবে কাছাকাছি; কিন্তু ছুরি দিয়ে চামড়ায় খোঁচা দিল লোকটা, রক্ত বের হয়ে আসল, তার উপর নিচু হয়ে চিৎকার করে উঠল।

'একটুও নড়বে না!'

'কত বড় সাহস! এখানে কীভাবে ঢুকলে তুমি? আমার ভাই কোথায়?

'তিনি তোমার মুখ দেখতে চান না। আমরা তাঁরই লোক। তিনি চলে গেছেন তোমার শিবিরের দায়িত্ব নিতে। আর তুমিও ভ্রমণে বের হবে—দীর্ঘ ভ্রমণ।' এরপর তাড়াতাড়ি নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল মুরাদকে নিচে চেপে ধরে আছে, বলে উঠল, 'তাড়াতাড়ি দাঁড় করাও।

মানুষ দু'টো অবষণ্ন আর প্রতিরোধবিহীন মুরাদকে তুলে ধরতেই কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দেয়া হল। আধো চেতনে মুরাদ বুঝতে পারল

এগুলো তার কাপড় নয়, কোন প্রহরীর পোশাক। ছুরি দিয়ে তাঁবুর পর্দা একটু উঁচিয়ে ধরে কালো তে-কোনা রাতের আকাশের দিকে তাকাল লোকটা। আস্তে করে উঁকি দিয়ে চারপাশ দেখে নিল দ্রুত।

'ভালো।' মাথা নেড়ে দুই প্রহরীকে জানালো, বাইরে নিয়ে এসো। হাতিরা অপেক্ষা করছে। তোমরা জানো কী করতে হবে।'

'আমার তলোয়ার নিয়ে এসো, আলমগীর!' বিস্মিত কর্চিকে আদেশ দিতেই ত্রস্তভাবে ব্যক্তিগত কামরা ছেড়ে চলে গেল পরিচারক। যদি এর আগে শাহজাহান ভেবেছিলেন মোগলদের পারিবারিক, প্রাচীন তলোয়ার—হিন্দুস্তানে এই অস্ত্র প্রথম নিয়ে এসেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ বাবর—দারাকে দেবেন; কিন্তু তিনি এখনো ময়ূর সিংহাসনে আসীন, এই অবস্থায় এটিকে কাছছাড়া করাটা অমঙ্গল হতে পারে ভেবে, থেমে যান আবার।

কয়েক মিনিট পরে নিজের হাতে আবারো তলোয়ার নিয়ে অনুভব করলেন এটির সুদৃশ্য ঈগলের হাতল—যতটা শক্ত, ততটাই সুন্দর, পাখিটার লাল রুবির চোখ দেখেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে খুশি হয়ে উঠলেন। আগামীকাল আলমগীরের সাথে, কোমরে তলোয়ারের রত্নখচিত খাপ আর আঙ্গুলে তৈমুরের ভারী সোনার আংটি প'রে যুদ্ধে যাবেন তিনি হয়ত শেষ বারের মত। যাই ঘটুক না কেন তাঁর—এমনকি মৃত্যু হলেও—আরো একবার একজন পুরুষ আর যোদ্ধা হতে পেরে, এই সুনিপুণ অস্ত্র নিয়ে খেলতে পারার অনুভূতি মন্দ হবে না। আগেও বহুবার কোন এক সংঘর্ষের শুরুতে যেমন করতেন ঠিক সেভাবে ইস্পাতের ফলার একপাশে আঙুল বুলাতে লাগলেন। যদি চামড়া কেটে যায় বুঝতে পারবেন এখনো ধার আছে। ডান তর্জনী দিয়ে চাপ দিলেন কিন্তু কোন রক্তের কুড়ি দেখা গেল না। 'আমার অস্ত্র নির্মাতার কাছে পাঠিয়ে দাও তীক্ষ্ণ করে তোলার জন্য।' কর্চিকে আদেশ দিলেন শাহজাহান।

তরুণটা গেছে বেশিক্ষণ হয়নি, আবারো দরজা খুলে গেল জাহানারার জন্য। মেয়েটার কী প্রতিক্রিয়া হবে তাঁর পরিকল্পনা শোনার পর বেশ ভালোই বুঝতে পারছেন শাহজাহান; কিন্তু কিছুতেই দমে যাবেন

না তিনি। হতে পারে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন কিন্তু এখনো একজন সম্রাট আর যোদ্ধা হিসেবে নিজের বিদ্রোহী সন্তানদের দেখিয়ে দিতে পারেন—পুত্র আর কন্যা উভয়কেই—সত্যিকারে এর অর্থ কী।

'এটা কি সত্যি যে আওরঙ্গজেব অবশেষে চিঠি লিখেছে? শোনার সাথে সাথে হারেম থেকে এখানে এসেছি আমি।'

মাথা নাড়লেন শাহাজাহান। এক সপ্তাহ আগে আগ্রাতে ফিরে এসেছে আওরঙ্গজেব—পুত্রের গর্বিত আগমন, উড়ন্ত ব্যানার, ঢাকের বাজনা সবই নিজের চোখে দেখেছেন তিনি গুলি করার জন্য প্রাচীরের ফোকার দিয়ে—কিন্তু এতদিন লেগে গেল যোগাযোগের ক্ষেত্র স্থাপনে।

'কী বলেছে সে? সেই কি কামান দাগা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। লিখেছে আমার মত এত বৃদ্ধ আর অথর্ব এক লোক বাস করছে এমন দুর্গে বোমাবর্ষণ শুরু করাটাই উচিত হয়নি মুরাদের। যাই হোক, এর মানে এই না যে সে আমাদের ভালো চায়। তার দাবি এটা তার দায়িত্ব, আমার প্রতি—যে কিনা শাসন করার বা দুর্গ নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত নই আর—আর সাম্রাজ্যের প্রতি, আমাকে বাধ্য করা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আত্মসমর্পণ করে ফেলি, তাহলে পুনরায় শৃংখলা স্থাপন করতে পারবে সে। এছাড়াও, সে দাবি করছে যে উপায়ও সে খুঁজে পেয়েছে তা করার।'

'কীভাবে?'

'দুর্গের পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে। এক বিদ্রোহী দুর্গের পানির বাঁধ খুলে দিয়েছে, ফলে যমুনার পানি ঢুকে পড়াতে আর বিশুদ্ধ পানি পাবো না আমরা। বাকি আছে আমাদের জন্য বহুদিনের অব্যবহৃত অল্প কয়েকটা কুয়া... সে আশা করছে এই গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে মনোবল হারাবে আমার সৈন্যরা।'

'আমি বুঝতে পারছি না... আশা করেছিলাম এতদূর এসেও হয়ত পিছু হটে যাবে তারা দুজন...'

'লজ্জাবোধ বা অপরাধের কোন অনুভূতিই নেই তাদের।'

'দারা সম্পর্কে কিছু বলেছে আওরঙ্গজেব?'

'না। আশা করছি যে আওরঙ্গজেব আগ্রাতে ফিরে এসেছে কারণ দারা তাকে কৌশলে এড়িয়ে যেতে পেরেছে।'

'আমি চিঠি লিখব ভাইদের কাছে... যুক্তি দিয়ে বোঝাব আওরঙ্গজেব আর মুরাদকে।'

'তারা শুনবে না আর বিশ্বাসঘাতকদের কাছে অনুনয় করে নিজেকে ছোট করতে তোমাকে দেব না আমি।'

'আমি অনুনয় করব না...আমিও তাদের সমকক্ষ...'

'তার পরেও আমি মানা করব। আমিই এখনো সম্রাট। মেরুদণ্ডহীনের মত দুর্গে বসে পুত্রদের জন্য অপেক্ষা করব না আমি যে তারা পরবর্তী কোন পদক্ষেপ নেবে আমার জন্য। দুনিয়ার কাছে প্রচার করেছে আমি এতটাই বৃদ্ধ আর অসুস্থ যে শাসন করার উপযুক্ত নই, কিন্তু তাদেরকে আর আমার প্রজাদেরকে এর বিপরীত চিত্র দেখাবো আমি।'

'কী করতে চান আপনি?'

'সৈন্যদের প্রধান হয়ে তাদের সাথে লড়াই করতে যাব। দুর্গের সৈন্যরা এখনো বিশ্বস্ত আর আমাকে অনুসরণ করবে আমি নিশ্চিত।' কথা বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ালেন শাহজাহান। 'বহুদিন ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছি। দারাকে ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে না পাঠিয়ে উচিত ছিল আমার যাওয়া। বুঝতে পারত তারা যে আমি আমার শক্তি হারাইনি, তবে এখনো তত বেশি দেরি হয়ে যায়নি। আর যদি আমি মারাও যাই, আত্ম গরিমা ফিরে পাবো আমি আর এরই মাঝে দারা আর সুলাইমান ফিরে এসে আমাকে হত্যার প্রতিশোধ নেবে।'

'আব্বাজান, অনুগ্রহ করে আপনি এমনটা করবেন না...'

'এটাই এখন একমাত্র পথ। আমি আমার কর্মচারীর কাছে আওরঙ্গজেব আর মুরাদকে দেয়ার জন্য একটা চিঠি রেখে দিয়েছি, লেখা আছে আমার শেষ ইচ্ছে তারা যেন তোমার সাথে সম্মান আর শ্রদ্ধামূলক আচরণ করে। যা কিছু ঘটে গেছে আর আমার প্রতি তারা যতই বিরাগ থাকুক না কেন, আমার বিশ্বাস এ দায়িত্ব তারা পালন করবে। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'আমি ভয় পাচ্ছি না—অন্তত নিজের জন্য তো নয়ই, কিন্তু আপনার কথা ভেবে সাড়া হচ্ছি... আওরঙ্গজেব জানে আপনার প্রকৃতি। সে জেনে বুঝেই আপনাকে প্ররোচিত করতে চেয়েছে। ক্ষমা চাইছি, কিন্তু একটু বেশিই তাড়াহুড়ো করছেন, আব্বাজান।'

'হতে পারে, কিন্তু অন্তত কর্মক্ষম তো হয়ে উঠেছি। হয়ত যোদ্ধা সুলভ স্বাস্থ্য নেই, কিন্তু উদ্দীপনা ঠিকই আছে।'

এক মুহূর্তের জন্য পত্নীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে। অসংখ্য বার পত্নীকে রেখে যুদ্ধে গিয়েছেন, আবার তার কাছে ফিরেও এসেছেন। কখনোই মনে হয়নি মমতাজই—মৃত্যুবরণ করে তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে... কিন্তু এসবই বহুদিন আগের কথা আর সম্ভবত শীঘ্রিই স্বর্গে দেখা হবে দু'জনের।

দরজায় করাঘাতের শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন শাহাজান, ওড়না টেনে নিল জাহানারা। কর্চি কি তলোয়ার নিয়ে ফিরে এসেছে? যদি তাই হয়, তাহলে দ্রুত কাজ করেছে এই তরুণ। কিন্তু দরজা খুলে যেতেই দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে দুর্গের সেনাপতি।

'জাহাপনা,' যুদ্ধ বিরতীর পতাকাতলে আরো একজন বার্তাবাহক এসে পৌঁছেছে আপনার পুত্রদ্বয়ের কাছ থেকে। জোর দিয়েছে যেন আপনি একাকী এটি দেখেন। বার্তাবাহকের দাবি শাহজাদা আওরঙ্গজেব কিছু পাঠিয়েছে আপনার জন্য।'

'কী? আরেকটা পত্র?'

'না, জাহাপনা। মনে হচ্ছে কোন পার্সেল। পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমার লোকদেরকে আদেশ দিলে বাধা দিয়েছে বার্তাবাহক। বলছে এটা শুধুমাত্র আপনার হাতে দিতে আর কাউকে দিতে চাইছে না সে। যদি আপনি চান, জাহাপনা, আমি আমার সৈন্যদেরকে আদেশ দেব তার কাছ থেকে নিয়ে নিতে।'

'না। অস্ত্র আছে কিনা তার সাথে খোঁজ করে, প্রহরী দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

শাহজাহান আর জাহানারা একে অন্যের দিকে তাকালেও কিছু না বলে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলো সেনাপতি, পেছনে এসেছে পরিষ্কার কালো পাগড়ি আর কর্মকর্তাদের সাধারণ আলখাল্লা পরিহিত, দাড়িঅলা আর লম্বা একজনকে নিয়ে আটজন প্রহরী। বিশাল বড় এক রেশমি থলে, সিল্কের রশি দিয়ে আটকানো কিছু একটা ধরে আছে লোকটা।

'আমি বুঝতে পেরেছি আমার জন্য কিছু একটা নিয়ে এসেছ তুমি। কী', জিজ্ঞেস করলেন শাহ্জাহান।

'আমার প্রভু আমাকে জানাননি শুধু এটুকুই যে যেন আপনার হাতেই দেই, অন্য কারো হাতে নয়।'

'খুব ভালো। তোমার সামনে কার্পেটের উপর রেখে পিছিয়ে যাও। প্রহরী, চোখ রাখবে তার উপর।' লোক পিছিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন শাহজাহান, এরপর প্রহরীরা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল বার্তাবাহক লোকটাকে। সাবধানে রেশমের থলেটার কাছে গিয়ে তুলে নিলেন। বিশাল চেহারা সত্ত্বেও তেমন একটা ভারী নয়। কার্পেটের উপর রেখে দিয়ে ঝুঁকে সিল্কের রশিটা খুলে ফেলেলেন শাহজাহান। ভেতরে পাওয়া গেল আরেকটা থলে। তবে নিকৃষ্টমানের, গোলাকার মুখের কাছে পাতর রশি দিয়ে বাঁধা। সাবধানে এটাও তুলে নিলেন শাহজাহান। রশির সাথে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ। তুলে নিয়ে খুলে ফেললেন শাহজাহান : ধর্মদ্রোহীতার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে আর বেহেশতের উদ্যানে সকলেই আনন্দে মেতেছে।

কাগজটাকে একপাশে রেখে ব্যাগ খুলে ফেললেন শাহজাহান। সাথে সাথে নাকে এসে লাগল অস্বস্তিকর মিষ্টি গন্ধ—একবার এ গন্ধ পেয়েছেন তিনি, মৃত্যুর গন্ধ তাই ভুলে যাননি—বমি ঠেলে এলো মুখে। ব্যাগের ভিতরে পাওয়া গেল আরো একটা ব্যাগ। এবার কালো সিল্ক দিয়ে মোড়ানো। কাঁপা কাঁপা হাতে সিল্ক খুলে ফেললেন। আর অবশেষে কিছু একটা বের হয়ে গড়িয়ে পড়ল কার্পেটের উপর : দারার খণ্ডিত মস্তক, কুৎসিত, মৃত চোখ জোড়ার চারপাশে নড়ছে ক্রিম রঙা পোকা, মুখ আর রক্তাক্ত নাকের ভেতরে বাইরে যাওয়া-আসা করছে কীটগুলো।

বহুদূর থেকে মনে হল ভেসে এলো জাহানারার আর্তচিৎকার, বেশ কিছু সময় ধরে গলিত কাঠামোটার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন শাহজাহান। প্রায় না শোনার মত করে বলে উঠলেন, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না। শেষ হোক এবার। দরজাগুলো খুলে দাও...'

অধ্যায়-২২

শাহজাহান অবাক হয়ে গেলেন যখন আওরঙ্গজেবের পক্ষ থেকে আগ্রা দুর্গের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা নিজে এলো তাঁর কাছে। তিনি ইতিমধ্যেই শুনেছেন যে লোকটা উজবেক খলিল উল্লাহ খানের সৈন্য, যে কিনা সেনাপতির সাথে সামুগড়ের যুদ্ধে দারাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে মাখদুমী খান। লম্বা, মাখদুমী খানের ডান ভ্রুর নিচে সাম্প্রতিক সময়ে কেটে যাবার গোলাপি দাগের চিহ্ন ধূসর দাড়ি। অভিবাদন জানানোর কোন চেষ্টা করল না লোকটা আবার একই সাথে শাহজাহানের স্থির দৃষ্টির দিকে তাকাতেও পারল না। অন্য পাশে সরিয়ে রেখেছে চোখ জোড়া।

'আমার পাঠানো বার্তা কেন অগ্রাহ্য করেছ? উত্তর দাও! আমার কন্যারা কোথায়?' জানতে চাইলেন শাহজাহান।

'শাহজাদী গওহর আরা নিজ ইচ্ছেতেই যমুনার তীরে প্রাসাদে অবস্থানরত শাহজাদী রোশনারার কাছে চলে গেছেন। আপনার অন্য কন্যা রাজকীয় হারেমে অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন।'

'যত শীঘ্রি সম্ভব শাহজাদী জাহানারার সাথে দেখা করতে চাই আমি। আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা হচ্ছে তার সাথে।'

'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আপনার কন্যা ভালো আছেন আর তাঁর সাথে কোন দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে না। এটা আমার বলার কথা নয় যে কখন আপনারা একে অন্যের সাথে দেখা করতে পারবেন। আপনার পুত্র আওরঙ্গজেব আপনাকে যা জানাতে বলেছেন দয়া করে তা

শুনুন। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে আপনি এখানেই আপনার গৃহে অবরুদ্ধ থাকবেন। আরো নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনার নিরাপত্তার জন্য বাইরে দিন-রাত প্রহরী নিযুক্ত থাকে।'

'আমার দরজায় সর্বদাই প্রহরী থাকে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। আমার ধারণা, আমাকে কোথাও যেতে বাধা দেবার জন্যই এমনটা করা হচ্ছে?'

কিছুই বলল না মাখদুমী খান।

'আর আমার পরিচালক আর কর্চিদেরকেই বা কেন পরিবর্তন করা হয়েছে? আমি চিনি না বা বিশ্বাস করি না এমন আগন্তুক আমার সেবা করুক চাই না আমি।'

'এসব জাহাপনারই আদেশ...'

'জাহাপনা' বলতে কাকে বোঝাতে চাও? কার কথা বলছ?'

'সম্রাট আওরঙ্গজেব।'

'এরকম তো কেউ নেই। আমি শাহজাহান, হিন্দুস্তানের সম্রাট, আর কেউ নয়।'

'আমি শুধুমাত্র জাহাপনা, সম্রাট আওরঙ্গজেবের বার্তা বহনকারী। আমি আপনার সাথে তর্ক করব না।' কর্কশভাবে বলে উঠল মাখদুমী খান।

অসম্ভব ইচ্ছেশক্তির জোরে এখন পর্যন্ত শান্তভাবে ধীরে ধীরে কথা বলছেন শাহজাহান। নিজের অন্তরের বিষাদকে ঢেকে রেখেছেন। প্রায় তিন সপ্তাহের কাছাকাছি হয়ে গেল দেখেছেন দারার গলিত মস্তক আর জেনেছেন ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের বাস্তবতা। দুর্গের আত্মসমর্পণের আদেশ দেয়ার পরপরই নিজ কক্ষে ফিরে এসেছেন। ভেবেছেন নিজের জীবন শেষ করে দেবেন। কিন্তু শুধুমাত্র জাহানারার চিন্তা, যে কিনা তিনি জানেন তাঁর মতই মর্মবেদনায় ভুগছে আর যাকে এভাবে ছেড়ে যেতে পারেন না তিনি, তার জন্যই থেমে গেল হাত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, অগ্রাহ্য করার দৃঢ় মনোভাব—আর চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা—তাঁর কুচক্রী পুত্রদ্বয়কে, শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন শাহজাহান-। ধীরে ধীরে অধৈর্য হয়ে উঠতে থাকলেও অপেক্ষা করছেন আওরঙ্গজেব আর মুরাদকে সামনা-সামনি দেখতে পাবার মুহূর্তটুকুর জন্য। বারেবারে অনুশীলন করছেন তাদেরকে কী বলবেন। কিন্তু একজনও আসছে না তাঁর কাছে।

এর পরিবর্তে যেমন বিশ্বাসঘাতক তেমনি কাপুরুষ, পুত্রদ্বয় শুধুমাত্র সৈন্য পাঠিয়ে দখল করে নিয়েছে দুর্গ।

হঠাৎ করেই সেনাপতির শব্দের কোন একটা অংশ আঘাত করল শাহজাহানকে। 'অন্তত এটা বলো, কেন শুধুমাত্র আওরঙ্গজেবের কথা বললে তুমি? বিদ্রোহে তার মিত্র, আমার পুত্র মুরাদের কী খবর?'

অবাক হয়ে গেল মাখদুমী খান। আপনি জানেন না?'

'কীভাবে কিছু জানবো এরকম বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করলে?'

'আমি ভেবেছি হয়ত কোন পরিচারক আপনাকে জানিয়েছে... আগ্রাতে ফিরে আসার খানিক পরেই আওরঙ্গজেব শাহজাদা মুরাদকে বন্দি করার আদেশ দিয়েছে।

'কোন অভিযোগে?'

'গুজরাটে আপনার সুবেদার থাকাকালীন অর্থমন্ত্রী আলী নাকীকে হত্যা করেছিলেন তিনি। আওরঙ্গজেবের মতে, এটি মানুষ এবং আল্লাহ উভয়ের চোখেই অপরাধ, আর নিজ ভাই হওয়া সত্ত্বেও এমন অপরাধের শাস্তি না দিয়ে পারেন না তিনি।'

প্রায় হেসেই ফেলছিলেন শাহজাহান। তিনি ভেবে ভেবে সারা হচ্ছিলেন যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কীভাবে সম্ভাবে আওরঙ্গজেব তার কপটতা শ্বাসরুদ্ধকর—আওরঙ্গজেব নিজে দারার হত্যাকাণ্ডের আদেশ দেয়ার পর ভণিতা করছে ভাইয়ের হাতে একজন কর্মকর্তা খুন হওয়ায় বিস্মিত সে। 'মুরাদ বাধা দেয়নি?'

'তিনি বুঝতেই পারেননি যে কী ঘটছে, যখন বুঝেছেন বহু দেরি হয়ে গেছে। আওরঙ্গজেব তাকে তার নিজের তাঁবু থেকে এক মাইল বা সেরকম দূরত্বে নিমন্ত্রণ করেছিলেন একত্রে আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য। নিজে কোন রকম পানাহারের বিরুদ্ধে কঠোর হলেও ভাইকে নির্দেশ দিয়েছেন ইচ্ছেমত পান করতে। এরপর এক দেহপসারিণীকে ডেকে পাঠিয়েছেন ভাইকে মালিশ করে দেহসুখ দিতে। নগ্ন অবস্থায় প্রহরী বিহীন ভাইয়ের শিবিরে থাকাকালীন আওরঙ্গজেবের প্রহরীরা এসে বন্দি করেছে শাহজাদা মুরাদকে।'

একা, নির্বোধের মত দারার ভূগর্ভস্থ কক্ষে যেতে ভয় পেয়েছিল আওরঙ্গজেব। একইভাবে মুরাদও কেন সাবধান হল না একাকী

আওরঙ্গজেবের তাঁবুতে যেতে, এটা জানার পরেও যে বড় ভাইকে খুন করেছে আওরঙ্গজেব, আপন মনে ভাবলেন শাহজাহান। 'মুরাদের নিজের সৈন্যরা নিশ্চয় কী ঘটেছে জানার পর তাকে বাঁচাতে চেয়েছিল?'

'এক্ষেত্রে মহান জাহাপনা অসম্ভব চতুরতার পরিচয় দিয়েছেন।' উজবেক লোকটার চেহারায় এমন এক হাসি দেখা গেল বোঝা গেল যে আওরঙ্গজেবের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করছে সে। 'শাহজাদা জানতেন যে সকাল হবার আগপর্যন্ত তার ভাইকে খোঁজ করা হবে না। আর আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যেন একই রকম দেখতে চারটি হাতি প্রস্তুত করে রাখা হয় ও পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখা হবে হাওদাগুলো। বেশিরভাগ তাঁবুতে সবাই ঘুমিয়ে আছে, এমন সময় তিনি শাহজাদা মুরাদকে মদের ঘোরে আচ্ছন্ন করে বসিয়ে দেন একটা হাওদাতে। এরপর আওরঙ্গজেব ভাইদের যেসব সৈন্যদেরকে অর্থ ও উন্নতির লোভ দেখিয়েও নিজের দলে টানতে পারেনি তারা যেন মুরাদকে অনুসরণ করতে না পারে এই উদ্দেশে অন্ধকার থাকতেই প্রতিটি হাতিকে কম্পাস ধরে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেয়া হয় প্রহরী সহ। বস্তুত পক্ষে, মুরাদকে বহনকারী হাতি চলে যায় দক্ষিণ দিকে, গোয়ালিওর দুর্গে। যতক্ষণে তার বিশ্বস্ত কয়েকজন প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে ততক্ষণে পিছু নেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে আর তারা তাই সহজেই স্বীকার করে নেয় পরাজয়।'

গোয়ালিওর... চূড়ার উপরে থাকা বিশাল দুর্গ, উজ্জ্বল রঙের দেয়াল আর অসংখ্য কামান রাখার গম্বুজ সমেত একটা দুর্ভেদ্য জেলখানা। মোগলদের অনেক শত্রুই এর গভীর নালাগুলোতে উধাও হয়ে গেছে, আর কখনো দিনের আলো দেখার সুযোগ পায়নি।

'আমি শুনেছি যে তিনি আপনার দৌহিত্র সিপিরের কাছের একটা কামরাতে বন্দি।' বলে চলল সুবাদার।

'সিপির?' দারার কনিষ্ঠ পুত্র তাহলে এখনো বেঁচে আছে... আপন মনেই আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালেন শাহজাহান।

'হ্যাঁ, আওরঙ্গজেব এখনো তার ভাগ্য নির্ধারণ করেননি।'

'মুরাদ? তাকে নিয়ে কী করবে?'

'জাহাপনা জানিয়েছেন, যে ভাই তার সাথে ধর্মদ্রোহী দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তার রক্ত দেখতে চান না তিনি। তাই, হত্যা করা হবে না। এর পরিবর্তে প্রতিদিন তাকে পোস্ত খাওয়ানো হবে।'

একদৃষ্টে উজবেক লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন শাহজাহান। দু'জনেই জানেন এর মানে কী। পপি থেকে তৈরি আফিমের এক ধরনের দুধময় রস এই পোস্ত, যাকে এটি খাওয়ানো হয় সেই ব্যক্তি প্রথমে তোতলা, নির্বোধ হয়ে তারপর ধীরে ধীরে—এতে বছরের পর বছর লেগে যেতে পারে—মৃত্যুবরণ করে। এটা এত ভয়ংকর একটা পরিসমাপ্তি—এর চেয়ে যুদ্ধের ময়দানে ধ্বংস হয়ে যাওয়াও ভালো ছিল।

এক মুহূর্তের জন্য ছেলেবেলার মুরাদের কথা মনে পড়ে গেল শাহজাহানের—অসম্ভব সুদর্শন, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর আর দুঃসাহসী যে কোন পুরুষ গর্বিত হবেন এমন পুত্র পেয়ে। তারপরেও এটাই তার ভাগ্যলিপি—প্রথমে আপন পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, এরপর আপন ভাই কর্তৃক চক্রান্তের শিকার হয়ে ধীর মৃত্যু, যেটি কিনা শরীর আর চেতনা উভয়কে ধ্বংস করে ফেলবে। মুরাদের দুর্দশা আর পুত্রকে সাহায্য করতে না পারার নিজের অক্ষমতার কথা মনে হতেই এমন একভাবের উদয় হলো শাহজাহানের মনে, যা ক্রোধের সাথে কোনভাবেই খাপ খায় না। হতে পারে এক পুত্রের প্রতি পিতার অনুভূতির প্রমাণ এটি, বিশেষ করে যাই ঘটুক না কেন, সন্তানকে রক্ষা করার প্রবণতা... সন্তান যতই অধঃপতনে চলে যাক না কেন। সম্ভবত নিজ মনে তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরও একই রকমটাই অনুভব করেছিলেন তাকে নিয়ে।

'সম্রাটের কাছ থেকে আরো কয়েকটা আদেশ নিয়ে এসেছি আমি।' শাহজাহানের চিন্তায় বাধা দিল মাখদুমী খান। আপনার কর্মচারীরা ইতিমধ্যেই রাজকোষের চাবি দিয়ে দিয়েছে; কিন্তু আপনার, ব্যক্তিগত রত্ন আমাকে দিয়ে দিতে হবে যেহেতু এরকম অবসর জীবনে আর এগুলো প্রয়োজন হবে না আপনার। বিশেষ করে, মহান তৈমুরের সোনার আংটি আছে আপনার কাছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আপনার সব রত্নের মাঝে আংটিটি আছে কিনা, তা যাচাই করে নেয়া হয়।'

'না! আমি কিছুই দেব না—এমনকি ছোট্ট একটা হীরা বা মুক্তাও না। আর যদি আমার পুত্র তৈমুরের আংটি চায় তাহলে তাকে নিজে এসে

আমার আঙুল থেকে কেটে নিতে হবে!' আত্মপ্রত্যয়ে জ্বলে উঠল শাহজাহানের চোখ জোড়া, ডান হাতের মাঝখানের আঙ্গুলের উপর চেপে ধরলেন বাম হাত, মধ্যমাতে পরে আছে গর্জে ওঠা বাঘ খোদাইকৃত ভারী আংটিটা। আমার পুত্রকে জানিয়ে দিও যে আইনগত সম্রাটের কাছ থেকে এমন চুরি করাতে সে মামুলি একটা চোর বৈকি আর কিছু নয়। আর নিজেকে যতটা সৎ মুসলিম হিসেবে দাবি করে তার নিশ্চয়ই জানা আছে যে এ জীবনে না হলেও পরবর্তী জীবনে এর ন্যায্য পাওনা পাবে সে।

'আমি আপনার প্রত্যাখানের কথা আপনার পুত্রকে জানিয়ে দিয়ে পরবর্তী নির্দেশও জেনে নেব।'

তাঁর প্রতি উজবেক সেনার অভিব্যক্তিতে আলোচনা শুরু হবার পূর্বের তুলনায় একটু বেশিই শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করলেন শাহজাহান। উঠে দাঁড়ালেন, সচেতন আছেন যে বন্দি হওয়া সত্ত্বেও রাজকীয় ক্ষমতার শৌর্য এখনো বহন করছেন তিনি, যা পিতামহ আকবর বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—টিকিয়ে রাখতে।

একটু দ্বিধা করলেও, মোলায়েম স্বরে বলে উঠল সুবাদার, আপনি ভাবছেন আপনি এখনো সম্রাট কিন্তু আজ সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের দিকে যদি নিজের ছাদ থেকে তাকিয়ে দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে সময় আর ঘটনা প্রবাহ কাউকে ছাড় দেয় না।'

'তুমি কী বুঝাতে চাইছ?'

কিন্তু পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে যা বলার ছিল বলে ফেলেছে মাখদুমী খান। কক্ষ ছেড়ে বের হয়ে যাবার আগে প্রায় না দেখার মত করেই মাথা নত করে কুর্নিশ করল উজবেক সেনাপ্রধান।

পুরো দুপুর ধরে অসম্ভব হট্টগোল হল শাহজাহানের আবাসস্থলের ওপারে যমুনার তীরে। প্রথম দিকে কোন মনোযোগ দিলেন না তিনি। সমস্ত চিন্তা জুড়ে রইল মৃত পুত্রের কথা, আর জীবিত দৌহিত্র আর পুত্র যারা বেঁচে থাকলেও গোয়ালিওরে অন্তরীণ। সিপিরকেও কি পোস্ত খাওয়াবার আদেশ দিয়েছে আওরঙ্গজেব? মনে হল এ সময় জাহানারা সাথে থাকলে ভালো হত... মেয়েটার সদুপদেশ আর সহজাত বোধের বড় বেশি প্রয়োজন এসময়, যখন অন্ধকার এসে ঢেকে ফেলেছে পুরো পরিবারকে। এমন একটা কারণে সবকিছু বিষবাষ্পে দূষিত করে ফেলেছে

যা তিনি এখনো ভাবতে পারছেন না। উচ্চাকাঙ্খা অন্য জিনিস—এর ফলেই মোগলরা প্ররোচিত হয়েছিল মহান আর ভয়ানক সব কাণ্ড ঘটাতে—কিন্তু আক্রোশ আর প্রতিহিংসাপরায়ণতা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

দারার দ্বিখণ্ডিত গলিত মস্তক পাঠানো ইচ্ছেকৃত দ্বেষ। কেন আওরঙ্গজেব তাঁকে এতটা ঘৃণা করে আর এসবের সূচনাই বা কবে থেকে? যখন দারার ভূগর্ভস্থ কক্ষ দেখতে যাবার তাঁর আদেশ অমান্য করেছিল তখন কি ইতিমধ্যেই পিতার প্রতি এত বিষিয়ে উঠেছিল তার মন? সে সময় তিনি এতটাই ক্রোধান্বিত ছিলেন যে পুত্রের অদ্ভুত আচরণের পিছনের কারণ সম্পর্কেও ভেবে দেখেননি... সে কি সত্যিই ভেবেছিল যে দারা তাকে খুন করতে চাইছে আর তার পিতাও এতে সায় দিচ্ছে। নিশ্চয় না। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সন্দেহ আর নিরাপত্তার অভাব বোধ দিনে দিনে আরো ঘনীভূত হয়েছে যা শাহজাহান কখনো চিন্তাই করেননি। দারার প্রতি দুর্ব্যবহার আর তাকে হত্যা করাটা ছিল আওরঙ্গজেবের বহুদিনের হিসেব। ঠাণ্ডা মাথায়, শীতল হৃদয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে পিতা আর ভাইয়ের প্রতি যাকে সে অবজ্ঞা আর ঘৃণা করত। এটি ইশারা করছে যে তার পথে হুমকী হয়ে ওঠা সকলকে খতম করে ফেলবে আওরঙ্গজেব। প্রথম দারা, তারপর মুরাদ। এরপরে কার পালা? হয়ত শাহ সুজা—যেখানেই সে থাকুক না কেন—আর তার দৌহিত্র সুলাইমান। সামুগড়ের যুদ্ধের পর দারা আগ্রা ছেড়ে চলে যাবার পর সুলাইমানকে নিয়ে অনেকটা আশা করেছিলেন শাহজাহান। অপেক্ষা করেছেন শুনতে পাবেন যে সেনাবাহিনী নিয়ে আগ্রাতে ফিরে এসেছে সে কিন্তু কিছুই হয়নি। দারাকে হত্যা করার মাধ্যমে আওরঙ্গজেব একটুও দ্বিধা করেনি তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র, সিংহাসনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীকে শেষ করে দিতে। তাই পরিষ্কারভাবে যুদ্ধের ময়দানে হোক অথবা ভাড়াটে গুপ্তঘাতক দিয়েই হোক, সুলাইমানের তাঁবুতে আঘাত করতে পিছপা হবে না সে। একভাবে না একভাবে নিজের পথ ঠিকই করে নেবে আওরঙ্গজেব।

গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন শাহজাহান—পুরোটাই তিক্ত আর অন্ধকার—শেষপর্যন্ত বাইরের চেঁচামেচি আর হট্টগোল এতটাই বেড়ে গেল যে অবহেলা করার উপায় রইল না। ছাদে যাবার কোন ইচ্ছেই নেই

তাঁর যেখান থেকে তাঁকে হয়ত দেখা যাবে। কিন্তু খোদাই করা জালি পর্দার ফাঁক দিয়ে কী ঘটছে বেশ ভালোই দেখতে পাবেন। প্রায় দুইশ ফুট দূরে যমুনা'র অপর দিকে সৈন্যরা বড়সড় সবুজ রঙের সিল্কের একটি মঞ্চের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে, কিনার পুরো সোনালি। মঞ্চটা দাঁড়িয়ে আছে সবুজ আর সোনালি ডোরা কাটা, চিকন কয়েকটা থামের সাহায্যে। প্রতিটি কোনাতে কাপড়কে টানটান করে বেঁধে রাখার জন্য যে সোনালি দড়ি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে সেলাই করে দেয়া হয়েছে উজ্জ্বল রত্ন। শামিয়ানার নিচের ভূমিতে সৈন্যরা পেতে দিয়েছে বহুমূল্যবান কার্পেট; এছাড়া নদী আর মঞ্চে মাঝামাঝি রাস্তার উপর সারিবদ্ধভাবে আরো কার্পেট পেতে দেয়া হয়েছে যেন মসজিদে জায়নামাজ পাতা হয়েছে। মঞ্চের উভয় পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকা বাঘের আকৃতির আর প্রায় সেই সাইজেরই ধূপদান জ্বালানো হয়েছে। বাঘগুলোর খোলা মুখের চোয়াল থেকে এরই মাঝে বের হতে শুরু করেছে সাদা ধোঁয়ার চিকন একটি রেখা। ভেতরে নিশ্চয়ই সুগন্ধি স্ফটিক জ্বালানো হয়েছে।

ইতিমধ্যেই জড়ো হতে শুরু করেছে কৌতূহলী জনতার ভিড়। কী ঘটছে দেখার হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও শামিয়ানার একপাশ থেকে শুরু করে অন্যপাশে গোলাকার বৃত্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যের দল তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে উত্তেজিত চিৎকার চেঁচামেচি। বহুদিন আগেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে—এমনকি তাঁর হত্যাকাণ্ডের আগেই—কতটা খামখেয়ালী হতে পারে জনগণ, কতটা অস্থির তাদের স্মৃতি আর বিশ্বস্ততা। অসংখ্যবার ঘোড়া ছুটিয়ে সৈন্যপ্রধান হিসেবে আগ্রা দুর্গে এসেছেন তিনি আর তাঁর পরিচারকেরা উল্লসিত জনতার উপর গহনার টুকরো স্বর্ণ ছুড়ে দিয়েছে, শাসকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রজারা। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা উৎসাহী মুখগুলোর মাঝে একজনও কি ভাবছে যে তাদের সত্যিকারের সম্রাট বিশ্বাসঘাকতার স্বীকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ওপারে? হয়ত না। আনন্দ আর স্বল্প মূল্যের মণি প্রিয় শিশুদের মত, কোথা থেকে আসছে সে পরোয়া না করে সবাই নিমগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে অনাগত প্রদর্শনী আর সম্ভবত আওরঙ্গজেবের অকাতরে দান করা অর্থের জন্য।

কোন পরিকল্পনা আঁটছে আওরঙ্গজেবে? খুব বেশি সময় লাগল না উত্তর পেতে। নিম্ন অববাহিকা থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো বিশাল বড় একটা, সমান্তরাল তলা বিশিষ্ট বজরা; এমন নকশা আর কখনো দেখেননি শাহজাহান। যে ডজনখানেক মাঝি বজরার দাঁড় বাইছে, তাদেরকেও চিনতে পারলেন শাহজাহান। সাধারণত দুর্গের দেয়ালের মাঝে সম্রাটের ব্যবহারের জন্য নোঙ্গর করে রাখা নৌকার মাঝি ছিল এরা। পড়ন্ত দিনের সূর্যের আলোয় চকচক করছে শূন্য পিঠ। বহুকষ্টে দাঁড় বাইছে লোকগুলো, শুধুমাত্র যে ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে তা নয়, নৌকার ঠিক মাঝখানে লম্বা, ভারি কিছু একটা ঢেকে রাখা হয়েছে অয়েল ক্লথে মুড়ে। এতটাই ভারী যে পানির মাঝে অনেকটাই ডুবে গেছে নৌকাটা। তীর থেকে বেশ দূরে থাকতেই সৈন্যরা দৌড়ে গিয়ে মাঝির ছুঁড়ে দেয়া রশি ধরে ফেলে নৌকাটাকে টেনে তুলে আনল কর্দমাক্ত তীরে।

এবার অন্য সৈন্যরাও উঠে গেল নৌকাতে। একজন ছুরি বের করে ভারী জিনিসটাকে জায়গা মত আটকে রাখা মোটা দড়ি কাটতে শুরু করে দিল। কয়েক মিনিট লাগল দড়িটা কাটা শেষ হতে আর অন্যরা সবাই মিলে অবশেষে অয়েল ক্লথটাকে সরিয়ে ফেলল। এতক্ষণ কি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল দেখতে পেয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল শাহজাহানের। বারোটি পান্না খচিত পিলার ধরে রাখা গম্বুজঅলা ছাদের সবুজ রঙ জ্বলতে লাগল সূর্যের আলোয়। রত্নখচিত ময়ূর আর পিলারের উপরকার রুবি, হীরা, পান্না আর মুক্তাখচিত গাছগুলো দেখাচ্ছে অবিশ্বস্য রকমের উজ্জ্বল।

এক মুহূর্তের জন্য গর্বিত হয়ে উঠে শাহজাহান ভুলে গেলেন নিজের সব সমস্যা। তিনি, আর তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন এই অনিন্দ্য সৌন্দর্য, সাম্রাজ্যের সম্পদ থেকে নিজে পছন্দ করে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ সব রত্ন। রাজা সলোমানের পর থেকে আর কোন শাসকের কাছে এমন একটি সিংহাসন নেই...নিজের রাজত্বের শুরুতে প্রথম যখন চিন্তাটা এসেছিল মাথায়, তখনো তিনি বেশ তরুণ ছিলেন আর অন্তর ছিল আশায় পরিপূর্ণ। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন আবার ফিরে গেলেন সেসব দিনে, যেন সামনে এখনো বাকি আছে গৌরবময় দিনগুলো, পাশে আছে তাঁর পরিবার, কিন্তু তারপরই ঝাপসা হয়ে গেল সব অনুভূতি। ভেঙে পড়েছে পরিবার। এই সিংহাসন আর তাঁর নয়। এই কুচক্রী পুত্র চুরি করে নিয়েছে তাঁর কাছ

থেকে। তাকিয়ে দেখলেন দু'জন দাঁড়ী মিলে নিচু করে ধরল বজরার সামনের অংশটা। নিশ্চয় এই উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে নৌকাটা। সিংহাসনের পেছনে একদল সৈন্য দাঁড়িয়ে ধাক্কা দেয়া শুরু করল। অতিধীরে আর বহুকষ্টে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এটি সামনে এগোতে লাগল। অবশেষে নৌকা থেকে তীরের কাছাকাছি আসার পর সিংহাসনটাকে দু'পাশে রোলার লাগান কাঠের মঞ্চে রাখা হলো দেখতে পেলেন শাহজাহান। এরপর বিশ মিনিট ধাক্কা দেবার পর অবশেষে শামিয়ানার নিচে এনে রাখা হল সিংহাসন, এটির চকচকে, উজ্জ্বল, সম্মুখভাগ রাখা হয়েছে সরাসরি দুর্গের দিকে মুখ করে।

সূর্যাস্তের দিকে, মাখদুমী খান যেমনটা বলেছিল... দিগন্তের দিকে তাকিয়ে শাহজাহান দেখতে পেলেন আর খুব বেশি দেরি নেই সূর্যি মামার পাটে যেত। মনে হল তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরেই মুহূর্তখানেক পরে একসাথে বেজে উঠল বাদ্যের বাজনা, মনে হল দুর্গের কাছাকাছি কোন প্রাচীর থেকে। এরপর বিশাল রুপার দাঁড়ের রাজকীয় বজরা—তাঁর নিজের বজরা—ঠিক সেই দিক থেকে উদয় হল যেখান থেকে এসেছিল সিংহাসন বহনকারী বজরাটা। পুনরায় রং করে কারুকাজ করা হয়েছে, সামনে আর পেছনে উড়ছে মোগলদের সবুজ ব্যানার আর ডেকের উপর ছড়িয়ে রাখা হয়েছে গোলাপের পাপড়ি, মৃদু বাতাসে উড়তে লাগল গোলাপি তুষার কণার ন্যায়। জলযানের ঠিক মাঝখানে বড়সড় একটা সবুজ ছাতার নিচে সূর্যের তাপ থেকে বাঁচতে দাঁড়িয়ে আছে আওরঙ্গজেব। পরনে ক্রিম রঙা আলখাল্লা আর গলায় মুক্তার লম্বা মতো। মাথার উপরে সাদা বকের পালকওয়ালা রাজকীয় পাগড়ি আর আঙ্গুলে চমকাচ্ছে মণি-রত্ন। নিজেকে যেভাবে স্থির আর অচঞ্চল রেখেছেন, উন্নত শিরদাঁড়া থেকে শুরু করে উদ্ধত চিবুক সবকিছুতেই প্রকাশ পাচ্ছে গর্বিত আর ক্ষমতার আভা।

পিছনে অনুসরণ করে আসছে আর দু'টি নৌকা। ত্রিশ জনের প্রায় প্রত্যেকে, জমকালো পোশাক পরিহিত সভাসদকে চিনতে পারলেন শাহজাহান। কয়েকজন আরঙ্গজেবের সেনাপতি আর অনুসরণকারী অভিজাত বর্গ; কিন্তু তাদের মাঝে এমন কয়েকজন আছে যাদেরকে তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ভাবতেন। এমনকি কয়েকজন তো অবরোধের মুখেও

দুর্গের প্রতিরক্ষা কাজে সাহায্য করেছিল। আওরঙ্গজেব তাদের সবাইকে কিনে নিয়েছে...নাকি তারা সাধারণভাবেই নিয়তির কাছে মাথা নত করে ফেলেছে?

দৃশ্যটা দেখে দুঃখিত শাহজাহান জালি পর্দা ছেড়ে চলে এলেন কক্ষের মাঝে, নিজের ছোট্ট শিকারি চিতাটা যেমন করে অশান্তভাবে খাঁচার ভেতরে আস্ফালন করে ঠিক তেমন বোধ করছেন এমন—পার্থক্য শুধু এই যে চিতাটা মাঝে মাঝে মুক্ত হয়ে দৌড়ে বেড়াবার স্বাধীনতা পায়। হয়ত আর কখনো মুক্তি পাবেন না তিনি...কিন্তু জানেন যে যা দেখবেন বেদনা শুধু বাড়বে। আবারো ঢাকের বাড়ি আর দামামার ধুমধুম আওয়াজে ফিরে গেলেন জালি পর্দার কাছে।

নৌকা থেকে নেমে রুপার দেহবর্ম পরিহিত আওরঙ্গজেব উত্তর পার্শ্বে বারো জন দেহরক্ষী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সিংহাসনের দিকে। সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করে চলেছে সভাসদদের দল। সিংহাসনের কাছে পৌঁছে, মুহূর্তের জন্য থেমে গেল আওরঙ্গজেব, মুখ তুলে তাকাল আত্যজ্বল শামিয়ানের দিকে। এরপর সোনালি সিঁড়িতে পা দিয়ে উঠে ঘুরে তাকাল, বসল। সভাসদেরাও সার বেঁধে দাঁড়াল তার সামনে। তারপর একটামাত্র ঢাকের বাড়ির সাথে সভাসদবৃন্দ ভূমি শয়ান হয়ে হাত দু'পাশে ছড়িয়ে, মাটিতে মুখ ডুবিয়ে প্রাচীন প্রথানুযায়ী কুর্নিশ করল। আবারো বাজনার শব্দে উঠে দাঁড়াল তারা। এরপর আগে খেয়াল করেননি শাহজাহান এরকম এক দাঁড়িঅলা লোক এগিয়ে এলেন সামনে। সাদা আলখাল্লা আর কালো পাগড়ি পরিহিত লোকটাকে দেখে মনে হল মোল্লা। আওরঙ্গজেবের এক ইশরাতে সভাসদদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতে লাগলেন। শাহজাহান সাথে সাথে বুঝতে পারলেন নতুন মোগল সম্রাটের রাজত্বকালের ঘোষণা স্বরূপ প্রার্থনা দোয়া তেলোয়াত করছেন মোল্লা:

'আল্লাহর আর্শিবাদ ধন্য হয়ে এবং অসীম শক্তিশালী চেঙ্গিস খান ও তৈমুর, মহান বাবর এবং হুমায়ুন, আকবর এবং জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের উত্তরাধিকারী হিসেবে...'

নিজের নাম শোনার সাথে সাথে ক্ষণিকের জন্যে দু'চোখের পাতা শক্তভাবে বন্ধ করে রইলেন শাহজাহান।

'...আমি ঘোষণা করছি যে, আওরঙ্গজেব হলেন হিন্দুস্তানের নতুন সম্রাট। তাঁর গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বকালের আলোক শিখা ছড়িয়ে পড়ুক জনতার উপর যেন তারা এবং তাদের উত্তরসূরীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁর নামে জয়ধ্বনি করবে আর সূর্যের আলোর মত তাঁর স্মৃতি পৃথিবী থেকে দূর করে দেবে সকল অন্ধকার। দীর্ঘজীবী হোক মহান শাসক।

মোল্লার সুমধুর কণ্ঠে নিজের ঘোষণা শেষ হতেই ডান হাত তুলল আওরজেব। সিংহাসনের পেছন থেকে এগিয়ে আসতে লাগল কর্চিদের সারি। সকলের হাতের ট্রে উপচে পড়ছে। চকচকে ভাব দেখে শাহজাহান অনুমান করে নিলেন যে তারা কী বহন করছে—সোনার রুপী, জনতার উদ্দেশে নতুন সম্রাটের পক্ষ থেকে ঐতিহ্যবাহী উপহার। আওরঙ্গজেব মাথা নাড়াতেই, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কর্চিরা। অর্ধেক এগিয়ে গেল ডান দিকে, আরেক দল বাম দিকে অপেক্ষারত দর্শনার্থীদের দিকে। সৈন্যদের কর্ডনের কাছে পৌঁছে বাতাসে ছুঁড়ে মারল ট্রে-র জিনিসগুলোকে, ফলে উপস্থিত জনতার উপর শুরু হল মুদ্রাবৃষ্টি, বন্য হুংকারে ছোটাছুটি শুরু করে দিল মানুষ, নতুন সম্রাটেরা দেয়া উপহার সুলভ মুদ্রার ভাগ পাবার জন্য। এরই মাঝে আরো কর্চিরা এসে পৌঁছল, সাথে নিয়ে এলো সিল্কের আলখাল্লা, সাধারণত সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে—যা কাউকে দান করা হয় আর ছোট ছোট থলে, কোন সন্দেহ নেই এগুলো ভর্তি অর্থ আর রত্নপাথর। একের পর এক সিংহাসনের সামনে এসে সম্রাটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা অভিজাতদের হাতে একেকটা করে থলে তুলে দিতে লাগল আওরঙ্গজেব। শাহজাহান চোখ সরু করে তাকিয়ে রইলেন লম্বাদেহী খলিলউল্লাহ খানকে এগিয়ে যেতে দেখে। আওরঙ্গজেব তাকে উপহার হিসেবে দিল একটি তলোয়ার, শেষ বেলার সূর্যের আলোতে চকচক করতে লাগল মণি-মুক্তি খচিত খাপ। ষড়যন্ত্রে অংশ নেবার পুরস্কার।

আওরঙ্গজেবের কাজ শেষ হতে কমে যেতে লাগল দিনের আলো। নদীর তীরে একটু পর পর জ্বলন্ত মশাল জ্বালানোর জন্য ছোটাছুটি শুরু করে দিল পরিচারকেরা। দুর্গের প্রাচীরের গুলি করার ফোকর থেকে পাওয়া গেল আতশবাজি পোড়ানোর হুশহুম শব্দ। আওরঙ্গজেবের মাথায়

উপরের আকাশে জ্বলে উঠল সবুজ আর সোনালি তারা। অদেখা ঢাক বা বাদ বেজে উঠল। হাতে লণ্ঠন নিয়ে ভৃত্যের দল অপেক্ষা করতে লাগল সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের নৌকায় তুলে নেয়ার জন্য। রাজকীয় বজরাতে এত আলো জ্বলে উঠল যে চারপাশে যমুনার কালো পানি সোনালি আভা ছড়াতে লাগল।

বিস্মিত শাহজাহান ভাবতে লাগলেন যে এতসব আয়োজনের আসল মানেটা কী। দুর্গের ভেতরে ব্যক্তিগত দর্শনার্থীদের হল ছেড়ে নদীর তীরকে কেন আওরঙ্গজেব বেছে নিল নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করার মঞ্চ হিসেবে? এর এককটাই মাত্র উত্তর...আওরঙ্গজেব এমন একটা স্থান বেছে নিয়েছে যা দুর্গে তার পিতার আবাসস্থলের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত, কেননা সে চেয়েছে, যেমনটা মাখদুমী খান ইঙ্গিত করেছিল, পিতাকে দেখাতে যে সত্যিকারের সম্রাট এখন কে। জালির মাঝে দিয়ে শেষবারের মত তাকিয়ে শাহজাহান দেখতে পেলেন তাঁর পুত্র এখনো স্থির আর খাড়া হয়ে বসে আছে সিংহাসনে, তাকিয়ে আছে সরাসরি তাঁর দিকে, যেন সে জানেই যে পিতা তাকিয়ে আছেন আর অবশেষে এত বছর পরে পিতার পূর্ণ মনোযোগ পেয়েছে সে।

অধ্যায়-২৩

'আগ্রাতে আমার সাথে দেখা করতে আসতে প্রত্যাখান করেছে সে। দেখ কী লিখেছে...আমি একজন পিতা সুলভ সমস্ত অধিকার হারিয়ে ফেলেছি...' জাহানারার সামনে আওরঙ্গজেবের চিঠি বাড়িয়ে ধরলেন শাহজাহান। মাখদুমী খান এখন প্রতিদিন পিতা-কন্যার সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছে।

তাদের কারাদণ্ড শুরু হবার পর থেকে গত ছয় মাস ধরে বহুবার আওরঙ্গজেবকে অনুনয় করে পত্র লিখেছে জাহানারা, যেন পিতার সাথে দেখা করতে আসে সে। যা যা ভাবতে পেরেছে সমস্ত যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে—শাহজাহানের বয়স, তাঁর অসুস্থতা, পিতার প্রতি একজন পুত্রের দায়িত্ব, এমনকি একদা তার প্রতি আওরঙ্গজেবের ভালোবাসার কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে। স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে কেমন করে আগুনে পুড়ে গিয়ে প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হবার পর বোনের শয্যাপাশে থাকার জন্য ছুটে এসেছিল সে। আওরঙ্গজেবের উত্তরগুলো বেশ নম্র কিন্তু শীতল। স্পষ্টতাই বুঝিয়ে দিয়েছে যে পিতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আওরঙ্গজেবের স্নেহ ও মনোযোগ পাবার সমস্ত অধিকার হারিয়েছে সে। কিন্তু শাহজাহানকে লেখা আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুর শব্দগুলো পড়ে দম বন্ধ হয়ে এলো জাহানারার।

> *'আপনি আমাকে আপনার কাছে আসতে বলেছেন। কিন্তু কেন আসব আমি? এতে আমাদের দু'জনের কী-ই বা লাভ হবে?*
> *জানতে চেয়েছেন আমার পিতা হওয়াতে আপনার সাথে আমি এমন আচরণ কীভাবে করেছি? কিন্তু আমার কাছে কখনোই একজন পিতা*

ছিলেন না আপনি; তাই আমার উপর কোন দাবিও করতে পারেন না।

আমাকে কখনোই ভালোবাসেননি। অন্য সন্তানদের সুবিধাতে অবহেলা করেছেন—মায়ের মৃত্যুর পর থেকে আরো বেশি। উপহাস করেছেন যখন আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, নিজ জীবনে আর সাম্রাজের ক্ষেত্রেও আমাদের ধর্মীয় শিক্ষাগুলোকে আরো কাছ থেকে অনুসরণ করুন।

ধর্মদ্রোহী দারা আর খুনী মুরাদের প্রতি আমার আচরণকে তিরষ্কার করেছেন আপনি—যেন ব্যাপারটা এরকম যে আমার ভাই হওয়াতে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া উচিত ছিল আমার। নিজেদের ভাগ্যেরই উপযুক্ত তারা আর আইনের মাঝে থেকেই তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি আমি। বস্তুত এমনটা না করলে আমিই নিন্দনীয় হতাম। এর চেয়েও বড় কথা আপনার প্রতিবাদ বিশুদ্ধ কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনি ভুলে যাবার ভান করছেন যে আপনি আমাদের চাচা খসরু আর শাহরিয়ারকে হত্যা করেছেন অন্য কোন কারণে নয়, এই কারণে যে তারা আপনার আর আপনার উচ্চাকাঙ্খার মাঝে বাধা ছিল। অথচ আমাদের লোকদের প্রথানুযায়ী সিংহাসনের উপরে তাদের দাবি আপনার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আপনি, আমি নই, হত্যাকারী—সত্যিকারের অপরাধী।

এক কি দুই মিনিটের মত চুপচাপ বসে রইল পিতা আর কন্যা। এরপর শাহজাহান বলে উঠলেন 'সে যা লিখেছে তাতে খানিকটা সত্যিও আছে। আমার সৎভাইদের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। কিন্তু তোমাদের নিরাপত্তার জন্যেই তারা মারা গিয়েছে—আমার সন্তানদের নিরাপত্তা—আর রাজপরিবারের। তাই মারা গেছে যেন আমার পুত্রেরা, আপন ভাই হিসেবে কখনো এমন বিপদের মুখোমুখি না হতে যা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল। নিজের কাছেও তাদের মৃত্যু নিয়ে সহজ হতে পারি নি কখনো। এখন মনে হচ্ছে অনর্থক হয়েছে সবকিছু...রক্তের প্রাচীন চক্র, পিতার বিরুদ্ধে পুত্র, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই আবারো শুরু হয়েছে। আমি নিজেকেই দোষ দিচ্ছি। আমি আত্মপ্রসন্নতায় ডুবে ছিলাম যখন আমার

উচিত ছিল কঠোর আর উদ্যমী হবার। বিশ্বাস করেছিলাম প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে যে শত্রুতা মোগলদেরকে চুরমার করে দিয়েছে তা কখনো আমার পরিবারে ঘটবে না।'

'আওরঙ্গজেবের আচরণ এমন হবে তুমি তো জানতে না।'

'তুমি বুঝতে পেরেছিলে—তার সম্পর্কে সর্তক করতে চেয়েছিলে!'

'না। আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম যে আপনারা দু'জন একে অপরের কাছ থেকে দূর সরে যাচ্ছেন। কিন্তু কখনোই ভাবিনি যে অতৃপ্তির বশে আপনার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করবে বা দারাকে হত্যা করবে...' কেঁপে উঠল জাহানারার কণ্ঠস্বর। নিজেকের শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে পড়তে লাগল আওরঙ্গজেবের পত্রের বাকি অংশটুকু।

> *'কিন্তু এখন বাস্তব ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে আমাকে। আমি দয়ালু হয়ে নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্যে আপনাকে সময় দিতে চাই। আপনার দুর্ব্যবহার আর অভিযোগ ভরা পত্রগুলোকে মেনে নিয়েছি এমন এক বৃদ্ধের প্রলাপ হিসেবে যার শারীরিক আর মানসিক শক্তি নিঃশেষের দোরগোড়ায় আর যে কিনা মেনে নিতে পারছে না যে সময় বয়ে চলেছে, তিনি আর সম্রাট নন। গত কয়েক মাস ধরে আপনার রাজকীয় মণি-মুক্তা দিয়ে দিতে ক্রমাগত প্রত্যাখান শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। কিন্তু আমার ধৈর্য্যও শেষ হবার পথে। হয় আমি যা চেয়েছি তা পাঠিয়ে দেবেন—তৈমুরের আংটি সহ অথবা আপনার কাছে থেকে নিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করব আমি। আশা করছি মর্যাদা বজায় রেখে পদক্ষেপ নেবেন, বাকি আপনার মর্জি।'*

নড়াচড়ার শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকাল জাহানারা। নিজের সব দামি আর মূল্যবান সম্পদ রাখা চামড়ায় মোড়ানো সিন্দুকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন পিতা। গলায় পেঁচানো পাতলা স্বর্ণের চেন থেকে একটা চাবি নিয়ে খুলে ফেললেন সিন্দুক, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ছড়িয়ে ফেলতে লাগলেন ভেতরের জিনিস—মিনা করা চেন, রুবির হার, পান্না আর হীরা, সোনার ভারী কঙ্কন। কার্পেটের উপর ছড়িয়ে পড়ে আলো ছড়াতে লাগল সবকিছু।

'পিতা, কী করছেন আপনি?'

'সে আমার সিংহাসন চুরি করেছে; কিন্তু কিছু জিনিস কখনোই তার হবে না...যেমন তৈমুরের আংটি, সেটি আমার সাথে কবরে যাবে—অথবা এটি!'

বলার সাথে সাথে বের করে আনলেন যেটি খুঁজছিলেন, গাঢ় সবুজের ভেলভেটের একটা রোল। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে কার্পেটের উপর উপুড় করে দিলেন, বের হয়ে পড়ল একটা লম্বা, তিন প্রস্থ সুনিপুণ, দীপ্তিমান আর মসৃণ মুক্তার মালা। আমার পিতা এটা আমাকে দিয়েছিলেন যখন আমি আমার প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলাম। কোন এক সময় এটি ছিল পিতামহ আকবরের।'

খানিকটা কষ্ট করে দাঁড়িয়ে, ডান হাতে মুক্তার মালাটা ঝুলন্ত অবস্থায় কক্ষের কোণার দিকে হেঁটে গেলেন শাহজাহান। তারপর আবার হাঁটু গেড়ে বসলেন; এবার বড়সড় একটা খোদাই করা কার্পেটের বাটখারার পাশে। নিজের সামনে মুক্তগুলো ছড়িয়ে দিয়ে, দু'হাতে তুলে নিলেন বাটখারা, সজোরে নামিয়ে এনে গুঁড়ো করতে লাগলেন মুক্তাগুলোকে। কয়েকটা চূর্ণ হয়ে গুঁড়ো হয়ে গেল বাকিগুলো গুঁড়ো একত্রে বেঁধে রাখা সিল্কের দড়ি থেকে মুক্ত হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে গেল।

'আব্বাজান আব্বাজান, দয়া করে থামুন!' কিন্তু জাহানারার দিকে কোন মনোযোগ নেই শাহজাহানের। ভয়ংকর মনে হল এই শীতল অভিব্যক্তি। মনোযোগ দিয়ে একের পর এক মুক্তা গুঁড়ো করে সূক্ষ্ম সাদা ধুলার মেঘ বানিয়ে চললেন শাহজাহান। শেষ করে চোখ তুলে তাকালেন মেয়ের দিকে। কঠিন পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছেন, বুকের ওঠানামার সাথে দেখা গেল চিকচিক অশ্রুবিন্দু।

জাহানারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রোশনারা। 'তৈমুরের আংটি খুঁজে পেতেই হবে।'

ঘণ্টাখানেক আগে বাদ্যের আওয়াজে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল জাহানারা। শশব্যস্ত হয়ে বাইরে এসে দেখে একদা তার থাকা রঙিন হাতিটা বন্ধ রুপালি হাউদাতে করে বোনকে নিয়ে আস্তে আস্তে প্রবেশ

করছে হারেমের আঙিনাতে। রোশনারার পরনে জমকালো সোনালি অ্যামব্রয়ডারী করা মেরুন সিল্কের পোশাক। আঙ্গুলে চমকাচ্ছে রত্নপাথর আর গলাতেও একই। হেনায় রাঙানো চুলে জড়ানো হয়েছে রুবি বসানো সোনার সেট। অথচ রং না লাগান হলে চুলগুলো একেবারে জাহানারারই মতন ধূসর। এখন জাহানারা জানে যে এত মাস পরে আগ্রা দুর্গে রোশনারা কেন এসেছে।

'ইতিমধ্যেই তোমাকে জানিয়েছি যে আমি জানি না আব্বাজান এটি কী করেছেন। নিজের বাকি সব রত্ন তো দিয়ে দিয়েছেন..যথেষ্ট হয়নি?'

'না। তৈমুরের আংটিই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় পারিবারিক নিদর্শন। আওরঙ্গজেব জানিয়েছে যে আব্বাজানকে অবশ্যই মনে করাতে হবে।'

'এ কারণেই মাখদুমী খানকে সরিয়ে তার প্রধান নপুংসককে সুবাদার বানিয়েছে?'

'হ্যাঁ। আওরঙ্গজেবের ধারণা মাখদুমী খান পিতার প্রতি একটু বেশিই প্রশ্রয়শীল ছিল। পিতার জেদ আর একগুয়েমিতাকেও বাহবা দিয়েছে। কিন্তু ইতিবার খান নিজের দায়িত্ব ঠিকই আরো ভালো করে বুঝবে।'

'আব্বাজানকে আবাসকক্ষ ছেড়ে বাগানে হাঁটতেও প্রত্যাখানের মাধ্যমে? পিতার পরিচালকদের সংখ্যা আরো কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে? তাঁর সাথে দেখা করার জন্য আমার উপর বাধা আরোপের মাধ্যমে?'

'হ্যাঁ, সবকিছুই হয়েছে আওরঙ্গজেবের আদেশে।

'এটা তো একজন বৃদ্ধ মানুষের প্রতি আক্রোশ আর প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছুই নয়—তার আপন পিতা।'

'আংটি না পাওয়া পর্যন্ত সুস্থির হবে না আওরঙ্গজেব। তুমি জানো সে কতটা অবাধ্য হতে পারে।'

'পিতাও একইভাবে একগুয়ে। আর এর কারণও আছে। তুমি আর আওরঙ্গজেব জানো না যে এই আংটির কী মানে তাঁর কাছে? আওরঙ্গজেব তো বাকি সব জিনিস নিয়েই নিয়েছে—দিল্লিতে লাল দুর্গে যে ময়ূর সিংহাসনে বসে আছে সে এখন, রাজকোষ, মোগলদের সব প্রাসাদ আর জায়গীর সমূহ। এখনো কি তার তৃপ্তি হয়নি? নিজেকে একজন সম্রাট মনে করে সে কিন্তু আচরণ করছে দুর্বলের উপর ডাকাতির মত।'

'এই ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না আমি। দুর্গে তোমার সাথে দেখা করিতে এসেছি, কারণ আওরঙ্গজেবই এমনটা বলেছে। তার বিশ্বাস তুমি চাইলেই আব্বাজানকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারো। যদি তুমি এ কাজে সাহায্য কর তাহলে তোমার জন্য আরো আয়েশের ব্যবস্থা করে দেবে সে। আর যদি তুমি প্রত্যাখান কর...'

'আওরঙ্গজেবকে বলো যে আমি আব্বাজানকে বোঝাতে চেষ্টা করব যেন আংটি'টা দিয়ে দেয়, কিন্তু কোন পুরস্কারের আশায় বা হুমকির ভয়ে নয়। পিতার জন্যই এটা করব আমি। যতবার আওরঙ্গজেব আংটি চায়, আব্বাজান এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে আমি ভয় পেয়ে যাই। আমি চাই তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি যেন শান্তিতে আর নিরুপদ্রবে কাটাতে পারেন তিনি—তোমারও ঠিক তাই করা উচিত।'

কিছুই বলল না রোশনারা।

'এতগুলো মাস ধরে তোমার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করেছি আমি।' বলে চলল জাহানারা, ভেতরে উথলে উঠছে আবেগ। যদি তুমি আমাদেরকে দেখতে নাও আসতে পারো আমাকে অথবা আব্বাজানকে কয়েকটা শব্দ লিখে পাঠাতে কি খুব বেশি কষ্ট হত? তোমার নিশ্চয় জানা ছিল যে দারার মৃত্যুতে কেমন অনুভূতি হবে পিতার? তুমি কি জানতে যে আওরাঙ্গজেব দারার খণ্ডিত মস্তক পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে? কল্পনা করে দেখো থলে থেকে বের করে এটা দেখে কেমন লেগেছে তাঁর...এমন নিষ্ঠুর আচরণ করতে আওরঙ্গজেবকে থামাতে পারোনি তুমি? নাকি এতে কিছুই যায় আসে না তোমার?'

'আমি জানতাম না আওরাঙ্গজেব কী করতে যাচ্ছিল।' আস্তে করে বলে উঠল রোশনারা। 'বিশ্বাস করো যদি আমি জানতাম, চেষ্টা করতাম তাকে রুখতে। কিন্তু দারার জন্যে খুব বেশি দুঃখিত হতে বলো না আমায়। আওরাঙ্গজেব যা করেছে সাম্রাজ্যের জন্যেই করেছে।'

'আওরঙ্গজেব সবসময়কার মত শুধু নিজের ভালোটাই দেখেছে যেমন তুমি সবসময় তাই করেছ যা তোমার জন্য ভালো। সিল্ক আর মণি-মুক্তা জড়িয়ে কেন এসেছ? যেন আমি ঈর্ষিত হয়ে উঠি। তোমার কি ধারণা ভাইয়ের রক্ত হাতে মেখে তুমি সাম্রাজ্যের প্রধান রমণী হয়ে উঠলেই আমি হিংসা করব তোমাকে? আমি শুধু আশ্চর্য হয়ে ভাবছি যে কেমন ধরনের

নারী হলে তুমি—কোন দয়া নেই, সহানুভূতি নেই, সচেতনতা নেই—ঠিক তোমার আঙ্গুলের হীরেগুলোর মতই—শক্ত।'

'লজ্জিত হবার মত কিছু করিনি আমি। আমার উপস্থিত যদি তোমার জন্য পীড়াদায়ক হয়ে উঠে, চলে যাবো আমি। যদিও তোমার জন্য কয়েকটা সংবাদ নিয়ে এসেছিলাম।'

'কী সংবাদ?'

'ভ্রাতুষ্পুত্র সুলাইমানকে বন্দি করা হয়েছে।'

তৎক্ষণাৎ শাহজাহানের কথা মনে পড়ে গেল জাহানারার। দুঃখে জর্জরিত হয়ে যাবেন তিনি এ কথা শুনলে। 'কীভাবে' কী হয়েছিল?'

'দারাকে বন্দি করার পর সুলাইমানের বাহিনী তাকে ছেড়ে যায়। সে নিজেও তখন উত্তরে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ধরা পড়ে যায় আওরঙ্গজেবের এক সেনাপতির হাতে। শিকল দিয়ে বেঁধে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। দর্শনার্থীদের কক্ষে ভাইয়ের সামনে হাজির করা হয়। নারীদের অংশ থেকে সব দেখেছি আমি।'

'কী শাস্তি ঘোষণা করেছে আওরঙ্গজেব?' প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল জাহানারা।

'দয়া দেখিয়েছে। গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছে।'

'মুরাদের মত পোস্ত খেতে?'

প্রথমে উত্তর দিল না রোশনারা। এরপর আস্তে করে বলে উঠল, 'আরো একটা ব্যাপার আছে যা তোমার জানা দরকার। মুরাদ মারা গেছে।'

'আফিমের প্রভাবে?'

'না। মুরাদ যে কর্মচারীকে খুন করেছিল, আলী নাকীর ভাইয়ের হাতে। লোকটা আওরঙ্গজেবের কাছে দরখাস্ত দিয়ে জানায় রক্ত অথবা অর্থের মাধ্যমে মৃতের রায় পাবার অধিকার আছে তাদের। ন্যায়বিচার করতে চেয়েছে আওঙ্গজেব। স্বর্ণ দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে লোকটাকে। কিন্তু প্রত্যাখান করে জানের বদলে জান চেয়েছে। আলী নাকীর ভাই।'

'আর আওরঙ্গজেবও রাজি হয়েছে নিশ্চয়।' বলে উঠল জাহানারা। আইনের নামে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দেয়াটা কত সহজ। হয়ত আওরঙ্গজেব নিজেই লোকটিকে এগিয়ে আসতে উৎসাহ দিয়েছে...

'আর কোন উপায় ছিল না আওরঙ্গজেবের। লোকটাকে বলেছিল মুরাদকে ক্ষমা করে দিতে। ভাইসুলভ মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু জনসমক্ষে মুরাদের হত্যার আদেশ দিতে হয়েছে। পরবর্তীতের ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকায় লোকটাকে পুরস্কৃতও করেছে আওরঙ্গজেব। কেননা বিক্রি হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে লোকটা। যেমনটা মুরাদ বলেছে, স্বর্ণ দেখে অনেকেই লোভ সামলাতে পারে না।'

বাকরুদ্ধ হয়ে গেল জাহানারা। যেন বহুদূর থেকে ভেসে এলো রোশনারার কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু এখন যেতে হবে আমাকে। আংটি সম্পর্কে খবর পাঠিয়ে দিও।' সিল্কের মর্মর-ধ্বনি তুলে চলে গেল তার বোন।

তো মুরদাও মারা গেছে...অন্তত পোস্ত খাবার হাত থেকে তো বেঁচে গেছে। কিন্তু বন্দি সুলাইমানের কী হবে, হয়ত এতদিনে পপি খেতে খেতে চলে গেছে অনেক দূর, ধ্বংসের কাছাকাছি... পরিষ্কার হয়ে এলো জাহানারার ভাবনা। মুরাদের জন্য কিছুই করা যায়নি, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রকে এখনো সাহায্য করতে পারবে সে। তৈমুরের আংটির বিনিময়ে আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে কথা নিতে হবে সুলাইমানের কোন ক্ষতি হবে না। পিতাকে যতটা জানে সে, নিশ্চিত মানা করবেন না তিনি।

অধ্যায়-২৪

আগ্রা দুর্গ, জানুয়ারি ১৬৬৬

'আওরঙ্গজেব আমাকে প্রত্যাখান করেছে। আমি ভেবেছিলাম যে মেনে নেবে। লিখেছে যে দক্ষিণে তার অভিযানে অনেক খরচ হয়ে গেছে। তাই বহুমূল্যবান কোন দালান নির্মাণ করতে পারবে না। একজন বৃদ্ধের অতি কল্পনা হিসেবে খারিজ করে দিয়েছে আমার পরিকল্পনা, বলেছে এই ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন না তুলতে...'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল জাহানারা। হৃদয়ের গভীরে জানতে পেরেছিল এটা ঘটার কোন সম্ভাবনাই নেই, তারপরেও আশা করেছিল হয়ত মেনে নেবে আওরঙ্গজেব। বহুদিন ধরেই পিতার স্বপ্ন ছিল নিজের সমাধি হিসেবে তাজের মত কালো মার্বেলের ইমারত তৈরি করা যমুনার ওপাড়ে।

'দুঃখ পেয়ো না।—অন্তত আজকে নিজের জন্মদিনের দিন।' নিজের শ্রেষ্ঠ সিল্ক আর মণিমুক্তি দিয়ে বেশ পরিধান করেছে সাবধানী জাহানারা। রান্নাঘরে বিশেষভাবে নির্দেশ পাঠিয়েছে যেন পিতার পছন্দের পদগুলো তৈরি করা হয়, যদিও জানে তিনি বেশি খান না। খাবারের আগ্রহ দিনেকে দিন কমেই যাচ্ছে। যদিও মন ভরল না শাহজাহানের।

'আওরঙ্গজেব ঠিক কথাই বলেছে। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার মত এত বয়স পর্যন্ত আর কোন মোগল সম্রাটই বেঁচে থাকেননি। সবচেয়ে দীর্ঘজীবী আকবরও মৃত্যুবরণ করার সময়ে আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিলেন।'

‘চুয়াত্তর বছর বয়স এত বেশি কিছু নয়, পিতা....’ কিন্তু বলতে গিয়েও জাহানারা খেয়াল করল শাহজাহানকে কতটা দুর্বল আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। জন্মদিন যতই এগিয়ে আসছিল ততই দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন শাহজাহান। আর অতি ধীরে হলেও গভীরভাবে বোঝা যাচ্ছে বয়সের ছাপ। গত কয়েক সপ্তাহে তো নিজের আরামদায়ক আবাসকক্ষ ছেড়ে বাইরে যাননি বলা চলে, দুর্গের নিচে যমুনার ডান দিকে বাঁকের কাছে তাজমহলের দিকেও তাকাননি।

একদা সৈন্য প্রধান হিসেবে ঘোড়া ছুটিয়ে চলার সময় কত সুদর্শন আর শক্তিশালী দেখাত তার পিতাকে; কিন্তু এখন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সেই পেশীবহুল যোদ্ধার কাঠামো। সময় বড় বেশি কঠিন আচরণ করছে তাঁর সাথে, হয়ত বেশিরভাগ মানুষের সাথেই এমন হয়, কিন্তু তাঁর মত নিষ্ঠুর নয় নিশ্চয়ই আপন রক্ত আর মাংস। শাহজাহানের কারাবাসের সাত বছরের মধ্যে আওরঙ্গজেব একবারও তাঁকে দেখতে আসেনি অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটাও চিঠি লিখেনি। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর শোনা যেত রোশনারার মাধ্যমে...বোনের কাছ থেকেই জাহানারা আর তার পিতা অবশেষে জানতে পেরেছিল যে সাম্রাজের পূর্বাংশের কোথাও হারিয়ে গেছে শাহ সুজা। সুলাইমানের সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে বন্য আরাকানীয় জলদস্যুদের ভূমিতে চলে যায় শাহজাদা আর কখানোই দেখা যায়নি তাকে। একদা একে অন্যের কাছাকাছি থাকা চার ভাইয়ের মাঝে একজনেই শেষপর্যন্ত জীবিত থাকে...আওরঙ্গজেব।

‘তুলা রাশির জাতক হিসেবে আমার জন্ম হয়েছিল...’বলে চললেন শাহজাহান।’ জাহানারা অনুমান করতে পারলো এরপরে কী বলবেন তিনি। আগেও বহুবার এ কথা শুনেছে সে। ‘গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান আমার জন্ম মুহূর্তে ঠিক সে রকম ছিল যেমন ছিল তৈমুরের বেলায়। পিতামহ আমার নাম রেখেছিলেন খুররম “হাসিখুশি”। তিনি বলেছিলেন আমি নাকি ছিলাম “রাজকীয়তার টুপির উপরে একটি রেশমী ফিতা আর সূর্যের চেয়েও বেশি জ্যোতিষ্মান।” ডিভান থেকে চোখ তুলে কন্যার দিকে তাকালেন শাহজাহান আর চেহারায় এমন এক হাসি ফুটিয়ে তুললেন দেখে মনে হল জরা চলে গিয়ে উঁকি দিয়ে গেল সেই আগেকার মানুষটা। জাহানারা খুশি হয়ে উঠল যে অতীত তাঁকে এতটা খুশি করে দেখে।

বর্তমান তো অন্ধকারে ভরা, যদিও আওরঙ্গজেব তাদের কারাবাসে আরাম আয়েশের উন্নতি ঘটিয়েছে। আবাসস্থল আসবাবপত্র আর যথেষ্ট সংখ্যক ভৃত্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা হারিয়ে এসবে কিই বা লাভ হল? প্রায়ই তাকিয়ে দেখে পিতা চেয়ে আছেন যমুনা তীরে তাজমহলের দিকে। তাঁর একান্ত বাসনা ছিল তাজমহলে গিয়ে নিজের হাতে গড়া উদ্যানে ঘুরে বেড়াবেন। কিন্তু প্রতিবারই আওরঙ্গজেব প্রত্যাখান করেছে। দুর্গ ত্যাগের অনুমতি দিতে।

'পিতা, আমাকে সেই গল্পটা আরেকবার বলল—কীভাবে আমার দাদাজানের বাবা আগ্রার রাস্তা দিয়ে ছোট্ট বাচচা হাতির পিঠে চড়িয়ে তোমাকে রাজকীয় মসজিদের বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন লেখাপড়া শুরু করার উদ্দেশ্যে। এটা শুনতে আমার বেশ ভালো লাগে...'

এটা মিথ্যে কথা নয়। জাহানারা পিতার শৈশবের কথা শুনতে সত্যিই মজা পায়, কিন্তু তার চেয়েও শাহজাহান বেশি খুশি হয়ে সেসব দিনের কথা বর্ণনা করতে। এখন পিতার মোলায়েম নিচু স্বর শুনতে গিয়ে নিজের সামনে ঠিক যেন দেখতে পেল সেই ছোট্ট ছেলেটাকে পুরোপুরি চার বছর, চার মাস আর চার দিন বয়সে যেমনটা ছিল ঐতিহ্য—জমকালো সাজে-সজ্জিত আকবরের হাতির ঠিক পাশেই, উত্তেজিত হয়ে চারপাশের উল্লসিত আর গোলাপের পাঁপড়ি ছুড়তে থাকা জনতার দিকে তাকিয়ে...জাহানারার চোখের সামনে ভেসে উঠল, পাগড়ি পরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা হিন্দুর পাশপাশি মুসলমান পণ্ডিতদের দৃশ্য, বিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখে অপেক্ষা করছে শিশুটিকে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য যেন নিজের শিক্ষা জীবন শুরু করতে পারে শাহজাদা।

কিন্তু শাহজাহান তার গল্পের মাত্র মাঝামাঝি পর্যায়ে আসতেই জাহানারা দেখতে পেল চোখ বন্ধ করে ফেললেন তিনি, মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে নড়তে লাগল। গত কয়েকদিন ধরে একটু বেশিই ঘুমাচ্ছেন তিনি। বিরক্ত যাতে না হন তাই নিঃশব্দে নিজের আসন ছেড়ে উঠে গরাদবিহীন জানালার কাছে গেল জাহানারা। প্রথম দিকে নিজের পা জোড়াও মনে হল ভারী, কিন্তু তারপর মনে পড়ল তার নিজেরও বয়স হচ্ছে—এপ্রিল মাসে বয়স হয়ে যাবে বাহান্ন। চুলগুলো, যদিও এখনো বেশ ঘন, বহুবছর ধরে না দেখা কাশ্মিরের তুষারের ন্যায় সাদা হতে শুরু

করেছে। যাই হোক, তাকে কেমন দেখাচ্ছে তাতে আর কিই বা যায় আসে? তাকে দেখার জন্য বেশি কেউ নেই এখন...

জানালা দিয়ে দেখা গেল এক তরুণ উট নিয়ে যমুনা নদীতে নেমে গেছে পানি খাওয়ানোর জন্য, নদীর তীরে ছেলেমেয়েরা ছুটছে, চিৎকার করছে। খুশি হয়ে উঠল জাহানারার মন। তার পরেও বুকের মাঝে চিনচিনে ব্যথা করে উঠল ছেলেমেয়েদের উদ্দামতা আর সহজ-সরল আনন্দ দেখে। সেই তুলনায় তার নিজের অস্তিত্ব কতটা আবদ্ধ আর সংকীর্ণ। তারপরেও বলতে হবে তরুণ বয়সে তার জীবনও পূর্ণ ছিল প্রাণ প্রাচুর্য আর জনগণে—মা, ছয় ভাই-বোন, দরবারের অন্তহীন হৈ-চৈ আর কার্যক্রম, তাদের বিভিন্ন ভ্রমণ, বিভিন্ন পরিচারিকা যারা অবশেষে তার বন্ধু হয়ে গেছে, যেমন সাত্তি আল-নিসা, তাজমহলের মাটিতে এখন নিজের সমাধিতে চির নিদ্রায় শুয়ে আছে... আর অবশ্যই ছিল নিকোলাস ব্যালান্টাইন।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব সাত্তি আল নিসা দুর্গে আসা নিকোলাসের একটা চিঠি চুরি করে এনেছিল। ইংল্যান্ড থেকে এসেছে—ভ্রমণের তারিখ ছিল আরো এক বছর আগেকার। সহজভাবেই লেখা ছিল যে নিকোলাস দেশে পৌঁছে বাস করছে ভাইয়ের জমিদারিতে কিন্তু হিন্দুস্তানের গরম আর রং এর পাশাপাশি দরবারে তার বন্ধুদেরকেও অনেক হারানোর বেদনা অনুভব করছে।

চিঠিটা পড়তে গিয়ে অশ্রুতে ভরে গিয়েছিল জাহানারার চোখ। স্বস্তি পেয়েছে এই ভেবে যে, যাক অবশেষে নিজের ঠাণ্ডা, বৃষ্টিস্নাত দ্বীপে ফিরে যেতে পেরেছে নিকোলাস, কিন্তু প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবে যে লোকটা কি সত্যিই সুখী সেখানে গিয়ে? বিমর্ষতা আর অপূর্ণ আশা তো জীবনেরই অংশ, যেই হোক না কেন শাহজাদী অথবা নিকোলাসের মত অভিযাত্রী অথবা একেবারে নগণ্য গ্রামবাসী সবার বেলাতেই একই কথা খাটে।

হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে গেল জাহানারার। শেষ দিকের শীতের প্রভাতের হালকা আলো এসে পড়েছে ঘরের মাঝে, গরাদের চারপাশে জটিল খোদাইকৃত কারুকাজের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে, হেঁটে

হেঁটে জানালার কাছে গেল জাহানারা, তাকাল বাইরের কুয়াশার দিকে, বছরের এই সময় যমুনা প্রায়ই এভাবে ঢেকে থাকে। হঠাৎ করেই একটু কেঁপে উঠল মন, ঠাণ্ডাতে নয়, যদিও সকালটা বেশ ঠাণ্ডাই, কিন্তু কি যেন মনে হলো। এখনি পিতার কাছে যাওয়া দরকার, দু'সপ্তাহ আগে জন্মদিনের পর থেকে শাহজাহানের শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। কেন এরকম বোধ হচ্ছে সে কথা না ভেবেই পরিচারিকাকে ডেকে দ্রুত পোশাক পরে নিল জাহানারা।

এক ঘণ্টার চার ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ের মাঝে গরম পোশাক পরে আর ওড়নার বদলে চেহারার উপর নরম কাশ্মিরি শাল জড়িয়ে ত্রস্তপায়ে পিতার কক্ষের দিকে ছুটল শাহজাদী। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল দু'জন হারেমের নপুংসক আর অনুসরণ করল তার নিজের দু'জন নারী ভৃত্য। গজদন্ত দিয়ে তৈরি দরজার কাছে পৌঁছে নপুংসকদ্বয় করাঘাত করল হাতে থাকা লাঠি দিয়ে, ভেতর থেকে দরজা খুলে যেতেই সরে দাঁড়াল জাহানারাকে প্রবেশ করতে দেবার জন্য।

'আব্বাজান এখনো উঠেননি?' রুপালি চুলের পাঠান, শাহজাহানের বয়স্ক প্রধান ভৃত্যের কাছে জানতে চাইল জাহানারা।

'হ্যাঁ, মাননীয় শাহজাদী।' বলতে শুরু করল লোকটা আর স্বস্তি ফিরে পেল জাহানারা। 'প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে জেগে গেছেন তিনি যখন আমরা নিত্যকার মত দেখতে এসেছিলাম তাঁকে। জানিয়েছেন যে তিনি উঠতে চান না, কিন্তু ঠিক তাঁর কক্ষের বাইরে গম্বুজাকৃতি মঞ্চে নিচে বিছানা প্রস্তুত করে দিতে যেন বেশি সময় বিশ্রাম নিতে পারেন তিনি।'

'এখনো কি মঞ্চে আছেন?'

'হ্যাঁ মাননীয় শাজহাদী। শয্যা প্রস্তুত করতে খুব বেশি সময় লাগেনি আমাদের। দশ মিনিট আগেও আমি আসার সময় আধো জাগরণে ছিলেন তিনি।'

'আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।'

এখানো মনের মাঝে অদ্ভুত এক অস্বস্তি নিয়ে দামি কার্পেটে মোড়া কক্ষ পার হয়ে বাইরের দিকের দরজা দিয়ে বারান্দার মত জায়টাতে গেল জাহানারা। রেশমের কুশন আর কোলবালিশে হেলান দিয়ে ডিভানে শুয়ে আছেন শাহজাহান। ভোরের ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পেতে গায়ে

জড়িয়েছেন শাল আর নরম উলের কম্বল। হালকা একটু বাতাস এসে মাথা ঢেকে রাখা নানা বর্ণের ছাপঅলা শালের নিচ থেকে বের করে দিল একগুচ্ছ রুপালি চুল, নিচু হয়ে আবারো শালের মাঝে কেশগুচ্ছকে ফেরৎ পাঠালো জাহানারা। প্রথমে মনে হল চোখ আধবোজা অবস্থায় জাহানারার স্পর্শ বা উপস্থিতি কিছুই টের পেলেন না শাহজাহান। কিন্তু ধীরে ধীরে চোখ জোড়া একটু একটু করে খুলে গিয়ে নিবদ্ধ হল দৃষ্টি।

'জাহানারা তুমি?'

'জ্বি, আব্বাজান', পিতার হাত ধরল জাহানারা। কত নরম মনে হল দেহত্বক। হাতের তালু আর লম্বা আঙুল মাংস প্রায় নেই বললেই চলে।

'ভালো। আমি খুশি হয়েছি।'

এক বা দুই মুহূর্তের জন্য দু'জনের কেউই কিছু বলল না। শাহজাহানের হালকা আর দ্রুত নিঃশ্বাস দেখে জাহানারা উপলব্ধি করল যে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভুল বলেনি। পিতার সাথে শেষ দেখা হবার পর গত কয়েক ঘণ্টাতে তাঁর শরীর আরো ভেঙে পড়েছে। এরপরই কন্যার মনের ভয়কে শব্দে পরিণত করলেন শাহজাহান। 'মনে হচ্ছে জীবন যেন ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে আমার কাছ থেকে।' জাহানারার চোখে অশ্রু দেখে বলে চললেন, "কেঁদো না। প্রত্যেক মানুষের জন্যেই মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট আছে আর মাঝে মাঝে তো আমার মনে হয় যে আমি বোধ হয় আমার সময় পার হয়ে চলে এসেছি। কোন ব্যথা নেই। শুধু জীবনীশক্তি নিঃশেষ।' এরপর শক্ত হয়ে গেল শাহজাহানের কণ্ঠস্বর। 'যাবার আগে পাশবালিশের সাথে ভর দিয়ে আমাকে উঁচু করে ধর, যেন তোমার মায়ের সমাধি দেখতে পাই।'

নিজের চোখের অশ্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে জাহানারা পাশপালিশের সাথে হেলান দিয়ে তুলে ধরল পিতার কৃশকায় শরীর—পিছনে গুঁজে দিল আরো কয়েকটি তাকিয়া।

'ধন্যবাদ। এখন আবার তোমার হাত দাও। কিছু কথা অবশ্যই বলতে হবে।'

আরো একবার পিতার হাত নিজের হাতে নিয়ে জাহানারা বুঝতে পারল যে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে লুকোবার কিছু নেই, তাই শুধু মাথা নেড়ে বলল, 'বলেন। আমি শুনছি।'

'হয়ত এটা তার কাছে কোন ব্যাপারই না, তবু আওরঙ্গজেবকে বলো যে আমি তাকে ক্ষমা করেছি...সবচেয়ে বড় কথা অনুনয় করবে যেন তার ও তার পুত্রদের মাঝে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য যা যা সম্ভব করে সে। হিন্দুস্তানে প্রথম আসার পর থেকে এহেন বিদ্বেষ প্লেগের মত ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের রাজবংশে! আমি চেয়েছিলাম এর সমাপ্তি টানেত...কিন্তু অনুতাপের সাথে বলতে হচ্ছে আমি পারিনি।'

'আমি তাঁকে জানাবো, আব্বাজান।' নরম স্বরে বলে উঠল জাহানারা।

'আশা করি আমি খুব বেশি বড় কোন পাপ করিনি। আমি জানি যে অনেক ভুল কাজ করেছি আর অন্য অনেকর চেয়ে বেশিবার করেছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এগুলোর কারণ আমার উচ্চাকাঙ্খা আর অবস্থান অনেকের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা দিয়েছে। এমন নয় যে অন্তরের দিক থেকে বেশি পাপাচারী ছিলাম। যা করেছি তা করেছি আমার স্ত্রী, সন্তান আর রাজপরিবারের প্রতি ভালোবাসার জন্য।'

'আমাদের কেউই আপনার ভালোবাসা নিয়ে সন্দিহান নয়, আব্বাজান। আল্লাহ আপনাকে সকল পাপের জন্য ক্ষমা করবেন। এখানে পৃথিবীতে আমাদের মায়ের জন্য যে সমাধি নির্মাণ করেছেন আপনি, তা আপনার মহৎ ভালোবাসার অতুলনীয় উদাহরণ হিসেবে অন্য সব স্মৃতিকে ছাপিয়ে বেশি দিন টিকে থাকবে।' জাহানারা শুনতে পেল অনিয়মিত হয়ে পড়ল পিতার হৃদস্পন্দন। আরো শক্ত করে ধরল পিতার হাত, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগলেন শাহজাহান। 'শীঘ্রি বেহেশতের উদ্যানে মায়ের সাথে মিলিত হবেন আপনি।'

'আমি দেখতে পাচ্ছি তাকে।' যমুনার কুয়াশা ভেদ করে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা তাজমহলের উপর দৃষ্টি স্থির করে বলে উঠলেন শাহজাহান। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেল নাড়ীর গতি। বুঝতে পেরেই পিতার উপর ভেঙে পড়ল জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারা। উষ্ণ অশ্রুতে পিতাকে ভরিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল তাঁর স্ত্রী, জীবিত আর মৃত ছেলেমেয়ে—এমনকি তার নিজের জন্যও।

এক কি দুই মিনিট পরে পিতার মৃতদেহ আস্তে করে ডিভানে শুইয়ে দিল জাহানারা। উঠে দাঁড়াল, নিজেকে শান্ত করে, শিরদাঁড়া খাড়া করলেন। নিজেকে মনে করিয়ে দিলেন যে সে একজন মোগল। পিতার

জন্য তাঁর প্রাপ্য সমাধির আয়োজন করতে হবে। যদি তিনি নিজের জন্য কালো মার্বেলের সমাধি নাও পেয়ে থাকেন স্ত্রীর সাথে সেই অত্যুজ্জ্বল শুভ্রতায় একত্রিত হতে পারবেন, যে স্তম্ভ তিনি নির্মাণ করেছেন। স্ত্রীর জন্য, তাদের ভালোবাসার জন্য।

ঐতিহাসিক সূত্র

পিতা জাহাঙ্গীরের মত শাহজাহান নিজের কোন স্মৃতিকথা লিখে রেখে যাননি, কিন্তু তাঁর ঘটনাবহুল জীবন সম্পর্কে বিশদ ব্যাখা পাওয়া গেছে বিভিন্ন লেখকের রচনাতে। জাহাঙ্গীর নিজে তরুণ শাহজাহানের একটি চিত্র দিয়ে গেছেন—অথবা সে সময় অনুযায়ী শাহজাদা খুররম যখন তরুণ বয়সে পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন। যখন জাহাঙ্গীর দুর্বল হয়ে পড়ে নিয়মিত লেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, এ দায়িত্ব নিয়ে দেয়া হয় মুতামিদ খানের উপর যে পিতার বিরুদ্ধে শাহজাহানের বিদ্রোহকে তুলে ধরেছে। সম্রাট হিসেবে রাজত্ব শুরু করার পর শাহজাহান আবদুল হামিদ লাহোরীকে দায়িত্ব দেন নিজের শাসনামল লিপিবদ্ধ করার জন্য। কিন্তু প্রতিনিয়ত দুর্বলতার শিকার হয়ে লাহোরী শাহজাহানের রাজত্বকালের কেবলমাত্র প্রথম পঁচিশ বছর তুলে ধরেছেন তাঁর বাদশা-নামাতে। যাই হোক, তাজমহল নির্মাণের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে গেছেন লাহোরী। এ ছাড়াও, পণ্ডিত ইনায়েত খান, রাজকীয় পাঠাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি শাহজাহানের শাসনামলের বিস্তারিত বর্ণনা লিখে গেছেন, শাহজাহাননামা নামক গ্রন্থে। এর পাশাপাশি দরবারের বিভিন্ন লেখা তো রয়েছেই।

বিদেশীরাও এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে গেছে। লিখে রেখে গেছে মোগল দরবারে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সম্পত্তি আর প্রাচুর্য দেখে বিস্ময়ের কথা। ইংরেজ পিটার মান্ডি, ভারতে থেকেছেন ১৬২৮ থেকে ১৬৩৩। তাজমহলের প্রথম দিককার নির্মাণ কাজ দেখেছেন। লিখে গেছেন : 'এই ইমারত... নির্মাণের ব্যয় হচ্ছে অসম্ভব শ্রম এবং অর্থ, তত্ত্বাবধান করা হয় অসাধারণ অধ্যবসায় বজায় রেখে। সোনা, রুপা

সাধারণ উপাদান হলেও মার্বেল আর সাধারণ পাথর দিয়ে হলেও ফুটে উঠেছে অত্যাশ্চর্যভাবে।' ভেনেশীয় অভিযাত্রী নিকোলাও মানুচ্চী শাহজাহানের পরিবারের সংঘর্ষ আর ভাঙন দেখেছেন স্বচক্ষে। তাঁর স্টোরিয়া দো মোগর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন কীভাবে দারা শুকোহ্র হয়ে যুদ্ধ করেছেন আর শেষ ময়দান সামুগড়ের চিত্রও তুলে ধরেছেন নিপুণ হস্তে।

তারপরেও সবসময়কার মত উৎসগুলোকে নাড়াচাড়া করতে হয় সাবধানে। বেতনভুক্ত জীবনীকারেরা কাজের ক্ষেত্রে খানিকটা হলেও সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতেন। কেননা তাদের লেখনীর ক্ষেত্রে প্রশংসার চেষ্টা আর সংঘবদ্ধ প্রচারণা করার উদ্দেশ্য থাকত। কিন্তু মোগল দরবারে বেড়াতে আসা বিদেশীরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। তবে এ ব্যাপারে অতি মাত্রায় আগ্রহ আর স্থানীয় প্রথা ভাষা সম্পর্কে না জানা থাকাতে অনেক কিছুকেই তারা আবার অবহেলাও করত আর সত্যিকারের ঘটনা প্রবাহ বুঝতে অসমর্থ হত। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া একটি তথ্যের ক্ষেত্রে কারো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই আর তা হল শাহজাহান ও মমতাজের মাঝে অবিচ্ছিন্ন বন্ধন, পত্নীর মৃত্যুর পর সম্রাটের ভেঙে পড়া, মমতাজ এবং শাহজাহানের জীবিত ছেলেমেয়েদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হওয়া। বহু পরে শাহজাহান নিজে এসব আবিষ্কার করলেও তখন আর কিছুই করার ছিল না।

এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থগুলোর মতই, প্রধান চরিত্রদের প্রায় সবগুলোই বাস্তব জীবনেও ছিলেন রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে—রাজকীয় মোঘল পরিবার রাজপুত শাসকেরা মোগলদের অত্যন্ত কাছের বিশ্বাসভাজনে যেমন সাত্তি আল-নিসা। যদিও কয়েকটি চরিত্রকে—যেমন নিকোলাস ব্যালান্টাইন যিনি নিজের প্রথম আগমন ঘটিয়েছিলেন দ্য টেইন্টেড থ্রোন-তে, সৃষ্টি করা হয়েছে অন্য কারো অনুকরণে, এক্ষেত্রে নিকোলাও মানুচ্চী আর রাজপুত শাহজাদা অশোক সিংয়ের চরিত্রটাও সেরকম। প্রধান ঘটনা আর যুদ্ধ সমূহ সত্যিকারেই সংঘটিত হয়েছিল; যদিও বর্ণনা করার সুবিধার্থে সময়গুলোকে কখনো-সখনো খানিকটা পরিবর্তন করেছি। এছাড়া কিছু ঘটনাকে এড়িয়েও গেছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর মহান আর বিশাল রাজবংশের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোকেই গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা।

গবেষণার জন্য অনেক জায়গাই টেনে নিয়ে গেছে আমাকে। যেখানে ফুটে আছে শাহজাহান আর মমতাজের ভালোবাসার কথা, ট্রাজেডির কথা যা কিনা পরবর্তী প্রজন্মেই নড়বড়ে করে দেয় রাজপরিবারের ভিত। দক্ষিণে ভ্রমণ করার ক্ষেত্রে শাহজাহান আর মমতাজের সর্বশেষ ভ্রমণ পথটাকেই বেছে নিয়েছিলাম। যে পথ ধরে তাঁরা একসাথে গিয়েছিলেন তাপ্তি নদীর ধারে বোরহানপুরের অভিশপ্ত সেই প্রাসাদে। এখানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব জরিপ অফিসের কর্মচারি আমাকে দেখিয়েছে যে কক্ষে মমতাজ মারা গেছেন বলে সকলের বিশ্বাস, সেই কক্ষ। নদীর ওপাড়ে, চারপাশে ক্ষেত, জায়নাবাদ উদ্যান খুঁজে পেয়েছি আমি। জায়গাটা মোগলদের পুরোন শিকার স্থান—এখানে এখনো টিকে আছে বারদারি মঞ্চ যার নিচে মমতাজের মৃতদেহ অস্থায়ী ভাবে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

আগ্রা দুর্গ, যেখানে সম্রাজ্ঞি হিসেবে নিজের জীবনের খানিকটা সময় কাটিয়ে গেছেন মমতাজ, এখনো বহন করছে। রাজপরিবারের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের চিহ্ন, মার্বেলের স্নানঘর হাম্মাম, যেখানে বয়ে চলেছে গোলাপের পানি আর তৈজসপত্র, বহু স্তম্ভঅলা ব্যক্তিগত দর্শনার্থীদের কামড়ায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে শাহজাহানের কথা, রত্নপাথরে সজ্জিত, ন্যায়বিচারের বর্ষণ করছেন প্রজাদের উপর অন্যদিকে একইভাবে জ্বলজ্বলে মমতাজ তাকিয়ে আছেন পেছনের খোদাই করা পর্দার ফাঁক দিয়ে। দুর্গের মার্বেলের বারান্দাগুলোতে—যমুনা নদী দেখার জন্য নির্মাণ করেছিলেন শাহজাহান, ভাগ্যক্রমে যেটি তাঁরই কারাকক্ষে পরিণত হয়। সাদা মার্বেলের উপর খোদাই করা ফুলগুলোর রং এখনও ঠিক সেরকমই পরিষ্কার আর উজ্জ্বল রয়েছে যেমনটা পাথরের উপরে পাতা আর পাপড়িগুলো তৈরি করেছিলেন কারিগররা। তাই মার্বেলের মেঝে আর পিলারগুলো স্পর্শ করলেই অন্য রকম একটা অনুভূতির স্বাদ পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে মনোহর হচ্ছে ব্রোঞ্জের চাঁদোয়া সমেত অষ্টভুজ টাওয়ার, এখানে মেঝের ঠিক মাঝখানে আছে মার্বেলের খোদাই করা একটি সাঁকো স্তম্ভ আর দেয়ালের মাঝে আছে আইরিস সহ অন্যান্য অসম্ভব দৃষ্টিনন্দন উজ্জ্বল সব লতানো ফুলের সমারোহ।

কল্পনার চোখে ভেসে উঠেছে কারাবাসের সময় টাওয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা শাহজাহানের চিত্র, তাকিয়ে আছেন তাজমহলের দিকে, বাতাসে

ভেসে চলে যাচ্ছেন যমুনার বাঁকে আর শেকসপিয়ারের ট্রয়লাসের মত মৃত মমতাজের কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে তাঁর আত্মা।

ঘুরে বেরিয়েছি শাহজাহানের মাহতাব বাগে, তাঁর চন্দ্রআলোর উদ্যান, যেখানে বসে তাজমহলের বিমর্ষ রূপ উপভোগ করতেন তিনি। আর অবশ্যই ফিরে গেছি তাজ'-এর কাছে। অনেকবারই দেখা হলেও সবসময় অত্যাশ্চর্য মনে হয়েছে। হোক সেটা সূর্যোদয়ের সময় যখন সকালের কুয়াশাতে মনে হয় পুরোপুরি অপার্থিব; অথবা সূর্যাস্তের সময়—যখন গম্বুজের চারপাশে জড়িয়ে থাকে বেগুনি ছায়া; অথবা চাঁদের রুপালি আলো, সবসময়েই অসাধারণ তাজ। মতভেদ আছে কেন এটি এত নিপুণ। শিল্পের ছোঁয়া, সমাধি, সবকিছুই নিজ নিজ কাজ করেছে তারপরেও এর জাদুর মূল মন্ত্র হলো ভালোবাসা আর হারানোর নিদর্শন স্তম্ভ এই তাজমহল।

পাদটীকা

অধ্যায় ০১

১৬২৬ সালের শুরুতে জানুয়ারিতে সিংহাসনে আসীন হন শাহজাহান আর নিজ রাজত্বকালে বহুবারই গুপ্তঘাতকদের প্রচেষ্টার মুখোমুখি হয়েছিলেন। জন্মগ্রহণ করেছেন ১৫৯২ সালের জানুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখে। পত্নী মমতাজ ছিলেন এক বছরের ছোট। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ১৬১২ সালে।

উত্তপ্ত কয়লা গলাধরণ করে মৃত্যুবরণ করেন খসরুর স্ত্রী জানী।

শাহজাহানের দরবার কবিগণ মমতাজের বহু প্রশস্তি গীতি রচনা করে গেছেন; এ গ্রন্থে উল্লিখিত কবিতা সহ, যেটি নেয়া হয়েছে কলিম এর বাদশানামা থেকে।

দাক্ষিণাত্য সংকট, যার কারণে দক্ষিণে ছুটে যান শাহজাহান, শুরু হয়েছিল ১৬২৯ এর শেষ দিকে।

অধ্যায় ০২

ভারতের পুরাতত্ত্ব জরিপ অধিদপ্তর বর্তমানে কাজ করছে বোরহানপুর প্রাসাদ দুর্গটি সংরক্ষণের কাজে।

অধ্যায় ০৩

বোরহানপুরের চারপাশের দুর্ভিক্ষ ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। শাহজাহানের ইতিহাসবিদ লিখে গেছেন 'গত বছর ধরে কোন বৃষ্টিপাত হয়নি... আর খরার অবস্থা দাঁড়িয়েছে বিশেষভাবে প্রকট...ছাগলের মাংসের বিনিময়ে

বিক্রি হচ্ছে কুকুরের মাংস আর মৃতদেহের (মানুষের) হাড়ের গুঁড়ো মেশানো হচ্ছে ময়দাতে আর বিক্রি হচ্ছে (রুটি তৈরির জন্য)... হতাশার মাত্রা এত বেড়ে গেছে যে মানুষ একে অন্যকে গোগ্রাসে গিলছে, প্রিয়তমাকে এনে দিচ্ছে পুত্রের মাংস।' প্রজাদের সাহায্যের নিমিত্তে কর মওকুফ করে দিয়েছিলেন শাহজাহান। এছাড়া বোরহানপুর আর অন্যান্য শহরে নোঙ্গরখানা খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেখানে রুটি আর ঝোল বিলিয়ে দেয়া হত ক্ষুধার্তের মাঝে, আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতি সোমবার দুঃস্থদের মাঝে ৫০০০ রুটি বিতরণের জন্য।

অধ্যায় ০৪

রোবহানপুর দুর্গের প্রাসাদের মার্বেল হাম্মামের ছাদে এখন নাজুক সব দেয়ালচিত্র ফুটে আছে। এখানে উষ্ণ সুগন্ধি পানিতে স্নান করতেন মমতাজ। সন্তান গর্ভ ধারণকালের খানিকটা সময় মমতাজ দারা শুকোহ্ ও নাদিরার বিয়ের পরিকল্পনা করে কাটিয়েছেন, শাহজাহানের সৎভাই পারভেজের কন্যা ছিল নাদিরা। বুদ্ধিদীপ্ত এই সম্পর্কের মাধ্যমে রাজপরিবারের ক্ষত নিরাময়েরও আশা হয়ত করেছিলেন মমতাজ। যাই হোক না কেন এর কারণ তাঁর স্বামী ও পুত্র এতে একমত হয়েছিলেন আর শাহজাহান জমকালো উৎসবের নির্দেশ দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বার্তাবাহক পাঠিয়ে দেন আগ্রাতে।

১৬৩১ সালের ৭ জুন মৃত্যুবরণ করেন মমতাজ। গওহর আরা ছিল তাঁর চতুর্দশ সন্তান যাদের মাঝে মাত্র সাতজন এ উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্র, বেঁচে ছিলেন পুর্নবয়স পর্যন্ত।

কয়েকজন পুরাতাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন যে তারা খুঁজে পেয়েছে সেই কক্ষ, যেখান থেকে তাপ্তি নদী দেখা যায়। এ কক্ষে মৃত্যুবরণ করেছেন মমতাজ।

অধ্যায় ০৫

মমতাজের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু যে শাহজাহানের শারীরিক এবং আবেগিক জগতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল তা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন 'জীবনীকারেরা।

শাহজাহানের হতাশা তুলে ধরে ফুটিয়ে তুলেছেন যে মানব জীবনের সুখময় মুহূর্ত কতটা ক্ষণস্থায়ী এমনকি একজন সম্রাটের জন্যও : 'হায়! এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া বড়ই অস্থির। আর এর আয়েশি গোলাপি মুহূর্তগুলোও কাঁটায় পরিপূর্ণ। পৃথিবীর আস্তাকুঁড়ে, মর্মবেদনার ধুলাবিহীন বহে না কোন বাতাস; আর দুনিয়াতে মানুষের ভিড়ে আনন্দ নিয়ে কেউ কোন আসন গ্রহণ করতে পারে না দুঃখ ভরা মনে এটি শূন্য করা ব্যতীত। কতটা গভীরভাবে শোকাকূল হয়ে গিয়েছিলেন সকলে তা লিখে গেছেন জীবনীকারেরা, তুলনা করেছেন তাঁর 'রাতের আঁধার কাটিয়ে দেয়ার মত রত্ন আর বহুমূল্য পোশাকের' সাথে 'প্রভাতের মত সাদা পোশাক' এর—শাহজাহানের সময়কার সবচেয়ে নন্দিত কবি লিখে গেছেন : 'হিন্দ'তে তাঁর পোশাক শুভ্র করে তুলেছে চোখের জলে, শুভ্র হচ্ছে শোকের রং।'

একইভাবে, একটা মাত্র রাতেই শাহজাহানের কেশ শুভ্র হয়ে যাবার কথাও লিখে গেছেন তারা। এমনকি তিনি নাকি পরিত্যাগের জন্য মনস্থির করে ফেলেছিলেন। সে সময়টা এমন এক সময় ছিল যখন বিবাহকে বর্তমানের মত কোন বন্ধন মানা হত না। কিন্তু তখনো শাহজাহান, যিনি কিনা প্রত্যহ নিজের দরবার পঞ্জীকে মুসাবিদা ও অনুমোদন দান করতেন, নিম্নের অনুভূতিকে মঞ্জুর করে গেছেন :

তাহাদের দু'জনার মধ্যকার বন্ধুত্ব ও ঐকতান এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল যা কখনো কোন শাসক শ্রেণির স্বামী-স্ত্রী অথবা সাধারণ জনগণের মাঝে দেখা যায়নি। আর এটি শুধুমাত্র রক্ত-মাংসের শরীর সম্পর্কিত কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, ছিল অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও আনন্দময় অভ্যাস, যার ভেতর এবং বাহির পুরোটাই পরিপূর্ণ ছিল শুভ আর যা কিছু ভালো তা দ্বারা। মহান এই ভালোবাসা, স্নেহ, সৌহার্দ্র প্রাচুর্য আর পরিপূরকতার কারণ ছিল উভয়ের মধ্যকার শারীরিক আর আত্মিক মেলবন্ধন।

শাহজাহানের শোকাতুর হৃদয়ের বিলাপ সম্পর্কে লেখা হয়েছে :

'যদিও অতুলনীয় দাতা আমাদেরকে এতটা দিয়ে ভরে দিয়েছেন : তারপরেও যে ব্যক্তির সাথে এসব সহভাগিতা করতে চাই সে-ই চলে গেল।'

মমতাজের মৃতদেহ আগ্রায় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দারা ও জাহানারাকে দিয়েছিলেন শাহজাহান। একজন দরবার কবি এ উপলক্ষ্যে লিখে গেছেন, 'বেদনার নীল' ছেঁয়ে ফেলেছিল পুরো ভূমিকে।

অধ্যায় ০৬

তাজমহলের স্থাপত্য নকশার কৃতিত্ব নিয়ে দাবি উঠেছে বহু পক্ষ থেকে। কিন্তু সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রার্থী সম্ভবত উস্তাদ আহমাদ লাহোরি। ১৯৩০ সালের দিকে একজন গবেষক আবিষ্কার করেছেন অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে লাহোরি পুত্রের লেখা একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি। সেখানে লাহোরিকে দিল্লির লাল দুর্গ ও তাজমহলের স্থাপত্যবিদ হিসেবে দাবি করা হয়েছে। ঘটনা যাই থাক না কেন, শাহজাহানের জীবনী রচয়িতাগণ উল্লেখ করে গেছেন যে সম্রাট নিজে নকশার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। স্থাপত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত উঁচু সমঝদার ছিলেন শাহজাহান—যে কারণে, তাঁর তরুণ বয়সে, পিতা জাহাঙ্গীর তাকে প্রশংসা করে গেছেন।
ইংরেজি শব্দ 'প্যারাডাইস' এর সহজ অনুবাদটি নেয়া হয়েছে পুরাতন ফারসী শব্দ 'পারিডেজা' থেকে, অর্থ দেয়াল ঘেরা উদ্যান। উদ্যান আর অন্তহীন কবিতার একটি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় খ্রিস্টান এবং ইসলাম উভয়ের মাঝে, যেহেতু ওল্ড টেস্টামেন্ট আর মধ্যপ্রাচ্যেই উভয়ের শিকড় প্রোথিত। দ্য বুক অব জোনোসিস-এ লেখা আছে : '...উদ্যানে পানি দেয়ার জন্য এডেন থেকে প্রবাহিত হয়েছে একটি নদী আর সেখান থেকেই বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে চারটি মাথার।'
তাজমহলের জন্য যে জায়গা নির্বাচন করেছেন শাহজাহান তা আগ্রা দুর্গ থেকে দেড় মাইল দূরে। আগ্রা দুর্গের কাছে নদীতে ডান হাতি তীব্র বাঁকের মুখে নিম্ন অববাহিকাতে অবস্থিত, ফলে যমুনা এখানে এসে খানিকটা দুর্বল হয়ে গেছে। আম্বারের রাজা ছিলেন এর মালিক যিনি কিনা আনন্দচিত্তে সম্রাটকে প্রদান করেন এ ভূমি। যাই হোক, ইসলাম ঐতিহ্যে মমতাজ মহলের মত নারী, যারা কিনা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁরা শহীদ আর তাই তাদের সমাধিস্থান তীর্থস্থান হিসেবে পরিগণিত হবে। ঐতিহ্য আরো দাবি করে যে এক্ষেত্রে কোন ধরনের পীড়নমূলক উপাদান থাকতে পারবে না—সত্যি হোক না হোক—এহেন

পবিত্র ভূমির স্থান নির্বাচনে। আর তাই শাহজাহান রাজাকে একটি নয়—চারটি পৃথক সম্পত্তি দিয়ে গেছেন এ জায়গার বিনিময়ে। এছাড়াও আম্বারের রাজা নিজ খনি মাকরানা থেকে মার্বেল সরবরাহ করেছেন শাহজাহানকে।

অধ্যায়-০৭

১৬৩২ সালের জুন মাসে আগ্রায় ফিরে আসেন শাহজাহান যেন ব্যক্তিগতভাবে তদারক করতে পারেন তাজমহল নির্মাণের কাজ। ইংরেজ পিটার মান্ডি সম্রাজ্ঞীবিহীন রাজকীয় সরবরাহের প্রত্যাবর্তন চাক্ষুষ করে লিখে গেছেন, এটি ছিল 'সবচেয়ে সুন্দর একটি প্রদর্শনী।'

লাহোরির মতে, ১৬৩২ সালের জানুয়ারিতে তাজমহল সাইটে কাজ শুরু হয়। তখনো শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। তাজমহলের খোদাইকৃত রত্ন সদৃশ্য নকশা বিস্মিত করে তুলেছিল সমসাময়িকদেরকে।

'একজন দরবার কবি লিখে গেছেন : মার্বেলের উপর তারা এত সুন্দর করে পাথরের ফুল স্থাপন করেছেন যে সুগন্ধের দিক থেকে না হলেও রঙের দিকে থেকে সেগুলো ছাড়িয়ে গেছে আসল ফুলকে।' রত্ন বিশেষজ্ঞ হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে চল্লিশটিরও উপরে ভিন্ন জাতের রত্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এদের মাঝে বেশির ভাগই শাহজাহান নিজে পছন্দ করে দিয়েছেন। ফরাসী গহনাকার জ্যা-ব্যাপ্টিস্ট তাভারনিয়ার, সম্রাটের রত্ন জ্ঞান দেখে অভিভূত হয়ে গেছেন। লিখে গেছেন যে, 'মহান মোগল রাজ্যে পাথর সম্পর্কে এতটা অসাধারণ জ্ঞান আর কারো ছিল না।'

তাজমহলের নির্মাণ কাজ করা কারিগরেরা পাথরের উপর নিজেদের চিহ্ন খোদাই করে রেখে গেছেন। ভারত পুরাতত্ত্ব জরিপ অধিদপ্তর আড়াইশোর বেশি চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন—তারা, চতুর্ভুজ, তীর আর এমনকি পদ্মফুল।

শাহজাহানের তাজমহল নির্মাণ সম্পর্কিত ও পৃথিবীর মাঝে তিনি যে স্বর্গ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন সেটির পুরো ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহ আর তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে জানতে পড়ুন অ্যা টিয়ারড্রপ অন দ্য চিক্ অব টাইম নামে ডায়ানা অ্যান্ড মাইকেল প্রিস্টনের নন-ফিকশন গ্রন্থটি।

দারা শুকোহর বিবাহের আংশিক বর্ণনা নেয়া হয়েছে 'লাহোরি'র বাদশানামা থেকে—শুকোহ্র এটি শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম

দশকে আঁকা চুয়াল্লিশটি চিত্রকর্মের একটি, যেগুলো সংরক্ষিত আছে রয়্যাল লাইব্রেরি অব উইন্ডসর ক্যাসেলে।

....হাতির যুদ্ধ যেখানে নিজের শীতল সাহস তুলে ধরেছিল আওরঙ্গজেব তা একটি সত্যি ঘটনা।

অধ্যায়-০৮

চিত্রকরদের মাঝে একমাত্র আমানত খানকে নিজের নাম তাজ-এর উপর স্বাক্ষর করার অনুমতি দিয়েছিলেন শাহজাহান। দুইটি স্থানে পরিস্ফুট হয়ে আছে এ স্বাক্ষর সমাধিস্থানের অন্তর্ভাগে দক্ষিণ খিলানের উপর আর এই খিলানের নিচের দিকে।

মোগল দরবারে আসা ইউরোপীয় দর্শনার্থীরা শাহজাহানের উন্মাদ যৌন আনন্দের কথা লিখে গেছেন, নিজের আবেগিক ক্ষতি মেটানোর জন্য শারীরিক আনন্দে মেতে উঠেছিলেন তিনি। ভেনেশীয় মানুচ্চি বর্ণনা করে গেছেন, মীনা বাজারে শাহজাহানের সুযোগ সৃষ্টির কথা : 'সেই আট দিনে প্রতিদিন দু'বার করে স্টল পরিদর্শন করতেন সম্রাট বসতেন বহু তাতার রমণী বহনকৃত ছোট একটি সিংহাসনে, চারিপাশে ঘিরে থাকত অসংখ্য তত্ত্ববধায়িকা, স্বর্ণের এনামেল করা লাঠি হাতে নিয়ে হাঁটত তারা। আরো থাকত অসংখ্য নপুংসক, দর-কষাকষির কাজ করত; এছাড়া নারী সংগীতজ্ঞের দলও থাকত। দৃঢ় মনোযোগে পার হয়ে যেতেন শাহজাহান; তাকিয়ে দেখতেন কোন বিক্রেতা তাঁর মনহরণ করে নিয়েছে কিনা। তাহলে সে দোকানে গিয়ে, নম্রভাবে কথা বলে কিছু জিনিস নির্বাচন করে দিতেন। পাশাপাশি এও আদেশ দিতেন যেন যত মূল্য দাবি করবে তত মূল্যই যেন পরিশোধ করা হয়।

এরপর সম্রাট সম্মতিসূচক ইশারা দিয়ে চলে গেলে তত্ত্বাবধায়িকা, এই কাজে খুবই পটু, খেয়াল রাখত যেন নারীকে তারা পেয়ে যায়। আর সময় মত সেই নারীকে হাজির করা হত সম্রাটের কাছে।

অধ্যায়-০৯

শাহজাহান প্রকৃতই আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যে নিজের রাজকীয় প্রতিনিধি আর শাহ সুজাকে বাংলাতে আর ওড়িষ্যাতে সুবেদার নিযুক্ত করেছিলেন।

১৬৪৪ সালের চৌঠা এপ্রিল এক ঘটনায় মারাত্মকভাবে পুড়ে যায় জাহানরা। এ সম্পর্কে ইনায়েত খান লিখে গেছেন :

...শাহজাদীর বুকের পোশাকের কিনার কক্ষের মাঝখানে জ্বলতে থাকা বাতির উপর দিয়ে চলে যায়। প্রাসাদের নারীরা যে পোশাক পড়ত তা তৈরি হত খুবই নাজুক কাপড় দিয়ে আর সুগন্ধি তেল মাখানো হত, তাই আগুন ধরার সাথে সাথে জ্বলন্ত শিখায় পরিণত হয় পুরো পোশাক। কাছাকাছি থাকা চারজন সেবাদাসী তৎক্ষণাৎ আগুন নিভানোর চেষ্টা করলে তাদের পোশাকেও ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ফলে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সবকিছু এত দ্রুত ঘটে যাওয়ায়, সতর্কঘণ্টা বাজার পূর্বেই, পানি ঢালার আগে, পিঠ, হাত আর শরীরের উভয় পাশ মারাত্মকভাবে পুড়ে যায় এই অসাধারণ সুন্দরী নারীর।

এটা আমার নিজস্ব ধারণা যে মদ আর আফিমের ঘোরে জাহানারাকে মমতাজ বলে ভুল করেছিলেন শাহজাহান। মোগল দরবারে আসা কয়েকজন বিদেশি শাহজাহান আর জাহানারার মধ্যে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের রটনা শুনেছেন বলে দাবি করেছেন। পিটার মান্ডি লিখে গেছেন : 'মহান মোগলদের কন্যরা কখনো বিবাহ করতে পারত না...বাকিদের মাঝে শাহজাহান, চিমিনি বেগম (জাহানারা), অসম্ভব সুন্দরী বলে দাবি করেছেন অনেকেই, তার সাথে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন (আগ্রাতে জনসমক্ষে সকলেই এই রটনা নিয়ে আলোচনা করত) কয়েক বারই দু'জনকে একত্রে দেখা গেছে।' যাই নিকোলাসও মানুচ্চি, যিনি কিনা রাজপরিবারের বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন এই রটনার গল্পকে বাজে কথা হিসেবে উড়িয়ে দিয়েছেন, বলেছেন যে জাহানারা 'অসম্ভব মমতা আর পরিশ্রম দিয়ে, পিতার দেখভাল করত, তাই—'এ কারণেই সাধারণ মানুষ পিতার সাথে তার শারীরিক সম্পর্ককে ইশারা করে গালগল্প তৈরি করে।' অন্যদিকে এ ব্যাপারে দাপ্তরিক উৎস সমূহ পুরোপুরি নিশ্চুপ ছিল।

অধ্যায়-১০

প্রকৃতই একজন ফরাসী ডাক্তার লিখে গেছেন যে হাতের মাঝে রত্ন পাথরের দড়ি পেঁচিয়ে থাকায় রোগীর নাড়ি খুঁজে পাওয়া পুরোপুরি অসম্ভব ছিল।

অধ্যায়-১১

এক লাখ হচ্ছে একশত হাজার। সমসাময়িক অনেকেই তাজমহল নির্মাণে বিশাল ব্যয়ভার নিয়ে মন্তব্য করে গেছেন। অন্যদিকে শাহজাহানের মাহতাব বাগের কথা সকলেই ভুলে ছিল। পলির স্তরের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল এর সাঁকো আর মঞ্চগুলো। ১৯৯০ সালের দিকে পুরাতাত্ত্বিক গণ প্রমাণ উন্মোচন করেন যে এ উদ্যান তাজমহল ভবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমান সময়ে বাগানগুলোকে পুনরায় সৃষ্টি করা হয়েছে। সংরক্ষণবাদীরা ১০,০০০ গাছ আর গুল্ম ঝাড় রোপন করে, এর মাঝে কড়া সুগন্ধঅলা সাদা চম্পা ফুলও রয়েছে—ম্যাগনোলিয়া জাতের সদস্য যেটি কিনা রাতে ফোটে—ফুলের বেডগুলোতে আবারো শোভা বর্ধন করছে অত্যন্ত রঙিন গাঁদা, পানশি, নাস্টারটিয়াম প্রভৃতি ফুলের দ্বারা।

দারার নতুন প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষে যেতে আওরঙ্গজেবের অস্বীকৃতির সংবাদ দিয়েছে একজন সভাসদ। বিভিন্ন উৎসগুলোও এ ব্যাপারে একমত যে জাহানারার আগুন লাগার ঘটনার পর থেকে বিভিন্ন বাক-বিতণ্ডার মাধ্যমে পিতার অনুগ্রহ লাভ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে আওরঙ্গজেব, পিতা-পুত্রের সম্পর্কে'ও চিড় ধরে। তির্যকভাবে লাহোরি লিখে গেছেন যে আওরঙ্গজেব 'অসৎসঙ্গ ও সংকীর্ণমনা সঙ্গীদের খপ্পরে' পড়েছিল। এর কয়েক বছর পরে আওঙ্গজেব জাহানারার কাছে এক পত্রে এ সম্পর্কে আরো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশা তুলে ধরে। যেখানে আওরঙ্গজেব লিখেছিল যে, 'আমি জানতাম যে আমার জীবনকে লক্ষ্য করা হয়েছে (শত্রূদের উদ্দেশ্যে); পরিষ্কার বোঝা যায় যে তার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিকে সন্দেহ করেছিল যে ছিল দারা, পিতার প্রিয়তম আর আওঙ্গজেবের চোখে ধর্মদ্রোহী। বিভিন্ন ঘটনাতেও এর স্বপক্ষে মত পাওয়া গেছে যে জাহানারা শাহজাহানের কাছে আওরঙ্গজেবের হয়ে মধ্যস্থতা করেছিল।

অধ্যায়-১২

শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে গুজরাটে পাঠিয়ে মধ্য এশিয়ার দায়িত্বভার দিয়েছিলেন কনিষ্ঠ ও অনভিজ্ঞ মুরাদের উপর।

অধ্যায় ১৩

সমরকন্দের দিকে অগ্রসর হতে ও এটি দখল করতে মুরাদ ব্যর্থ হলে পর শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে দায়িত্ব দেন। আওরঙ্গজেবও পরাজিত হয়। যেটিকে শাহজাহানের শাসনামলের প্রথম বাধা হিসেবে গণ্য করা হয়।

অধ্যায়-১৪

জাহাঙ্গীরের আমলে পারস্যবাসী কান্দাহার দখল করে নেয়। পরবর্তীতে ১৬৩৮ সালে শাহজাহান পুনরায় এটি দখল করে নেন। ১৬৪৯ এর ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় শাহ আব্বাসের সেনাবাহিনী আবার এ শহরকে অধিকার করে নিলে পর শাহজাহানের পদক্ষেপ সমূহ বিফলে যায়—এর একটির নেতৃত্বে ছিল দারা শুকোহ্।

মোগলরা আর কখনোই কান্দাহারের উপর কর্তৃত্ব আরোপ করতে পারেনি।

অধ্যায়-১৫

একটি যুদ্ধের চূড়ান্ত সময়ে বস্তুত সত্যিকারের অর্থেই দেখা গিয়েছিল যে আওঙ্গজেব মাদুর বিছিয়ে হাঁটু গেড়ে নামাজ পড়া শুরু করেছিলেন।

বিদেশী পর্যটক যেমন ফ্রানকোয়েজ বার্নিয়ার শাহজাহান প্রেমিকদের সম্পর্কে রটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন; যাদের উপর ভয়ংকরভাবে প্রতিশোধ নিতেন শাহজাহান উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একজনকে কড়াইতে জীবন্ত সিদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন সম্রাট। যাই হোক, বিবাহ করার সুযোগ না পাওয়াতে প্রেমিক নির্বাচন করেছিল জাহানারা এহেন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অধ্যায়-১৬

ইনায়েত খান লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে ১৬৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন শাহজাহান; কনিষ্ঠ তিন পুত্র, নিজেদের বহুদূরের প্রদেশ সমূহে থেকেই সিংহাসন দখল করার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। কেউই শাহজাহানের সুস্থতার কোন প্রমাণ ছড়ানোর অনুমতি দেয়নি। মানুচ্চি দারার সমর্থক—পরবর্তীতে দাবি করেছেন যে

আওরঙ্গজেব নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন শাহজাহান জীবিত আছেন এরকম কোন সংবাদ দাক্ষিণাত্যে না পৌঁছাতে পারে। পত্র পুড়িয়ে ফেলার পাশাপাশি তাদের বাহকেরও তৎক্ষণাৎ মুণ্ডু কর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন আওরঙ্গজেব।

অধ্যায়-১৭

মুরাদ প্রকৃতই সেনাবাহিনীকে আদেশ দিয়েছিলেন মিরাট লুটপাট করার জন্য। যেন সিংহাসনের জেতার লড়াইয়ে অংশ নেবার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী ক্রয় করে সাহায্য পেতে পারেন। নিজের অর্থমন্ত্রী আলী নাকীকে খুন করেছিলেন মুরাদ—যা কিনা পরবর্তীতে তার পতনের জন্য দায়ী হয়।

দারার পুত্র সুলাইমান আর আম্বারের রাজপুত্র সেনাপতি জয় সিং, বেনারসের কাছে বাহাদুর নামক জায়গায় শাহ সুজাকে পরাজিত করে ১৬৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এরপর গঙ্গা ধরে পালিয়ে যায় শাহ সুজা। পিছু ধাওয়া করতে নিজেকে দমন করতে পারেননি সুলাইমান।

আওরঙ্গজেব আর মুরাদ মারওয়ানের মহারাজা যশয়ন্ত সিংয়ের নেতৃত্বে রাজকীয় মোগল সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় ধর্মতে ১৬৫৮ সালের পনেরই এপ্রিল।

অধ্যায়-১৮

দারা চেষ্টা করেছিল চম্বল নদী পার হয়ে আওরঙ্গজেব আর মুরাদের সেনাবাহিনীকে বাধা দেয়ার জন্য। কিন্তু একটি অখ্যাত আর অরক্ষিত দুর্গ নদী হেঁটে পার হয়ে দ্রুত পৌঁছে যায় যৌথবাহিনী।

অধ্যায়-১৯

সামুগড় যুদ্ধ, আগ্রার পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় ১৬৫৮ সালের উনত্রিশে মে তারিখে। সত্যিকারভাবেই যুদ্ধ যখন তার পক্ষে যাচ্ছিল এমন এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে হাতি থেকে নেমে আসে দারা। মানুচ্চি, যিনি কিনা দারার সেনাবাহিনীতে লড়ছিলেন। লিখে গেছেন যে : 'মনে হয়েছিল যেন বিজয়কে ঠেলে ফেলে দিল দারা'। খলিলউল্লাহ খানের বিশ্বাসঘাতকতার গল্পও সত্যি।

অধ্যায়-২০

দুঃখে উন্মত্ত ও উদ্বিগ্ন শাহজাহান রাজকীয় কোষাগার দারার সামনে উন্মুক্ত করে দেয়ার আদেশ পাঠিয়েছিলেন দিল্লির সুবাদারের কাছে। বস্তুত একেবারে সময় মতই আগ্রা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল দারা। পরের দিন আগ্রা থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে দারার উদ্দেশে রওনা দেয়া মানুচ্চি দেখতে পায় আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা আটকে দিয়েছিল রাস্তা। তারা মানুচ্চিকে জানায় যে ইতিমধ্যেই সরকার বদলে গেছে আর 'আওরঙ্গজেব বিজয়ী হয়েছে।'

মালিক জিউয়ান নিজের জীবনের জন্য দারার কাছে ঋণী থাকলেও বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে আওরঙ্গজেবের হাতে তুলে দেয়।

দারার স্ত্রী নাদিরা যেভাবে একজন রাজাকে নিজের স্তন ধোয়া পানি পান করার জন্য প্রস্তাব করে তা পুরোপুরি সত্যি; যদিও ব্যক্তি হিসেবে মালিক জিউয়ান ছিল না, দারা ও তার পলায়ন পর্বের শুরুতে অন্য কোন রাজার সাথে এ ঘটনা ঘটে। ডায়রিয়া ও অতিরিক্ত ক্ষয়রোগে মৃত্যুবরণ করে নাদিরা।

বন্দি করার পর আওরঙ্গজেব সিপির আর দারাকে নোংরা একটি হাতির উপর চট বিছিয়ে ঘুরিয়ে আনে দিল্লির রাস্তায় রাস্তায়। এই অমর্যাদাকর শোভাযাত্রা অবলোকন করেছেন ফরাসী বার্নিয়ার।

বাস্তব জীবনে, ১৬৫৯ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে জনসমক্ষে নয়, নিজের কারাকক্ষে দারার মস্তক ছিন্ন করা হয়। দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধির চারপাশে অবস্থিত মঞ্চে সমাধিস্থ করা হয় দারাকে।

অধ্যায়-২১

এ ব্যাপারে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, প্রথমদিকে আওরঙ্গজেবের সাথে হাত মিলিয়েছিল রোশনারা। দরবারে যা ঘটছে তার প্রধান উৎস দাতা হিসেবে আওরঙ্গজেবের পক্ষে কাজ করত রোশনারা, বিশেষ করে শাহজাহানের অসুস্থতার সময়টুকুতে। আওরঙ্গজেব সত্যিকারভাবেই আগ্রা দুর্গের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা কেটে দিয়েছিল।

মানুচ্চি স্মৃতিচারণ করে জানিয়েছেন যে প্রতিশোধপরায়ণ আওরঙ্গজেব দারার ছিন্ন মস্তক পাঠিয়েছিলেন শাহজাহানের কাছে।

অধ্যায়-২২

সত্যিকারভাবেই প্রতারণার মাধ্যমে মুরাদকে বন্দি করেছিল আওরঙ্গজেব। এরপর কম্পাসের চারদিকে চারটে হাতি পাঠিয়ে দিয়েছিল যেন মুরাদের বাহিনী তার পিছু নিতে না পারে। পরবর্তীতে নিজের অর্থমন্ত্রী আলী নকীকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় মুরাদকে।
১৬৫৮ সালের একুশে জুলাই সাধারণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথমবারের মত নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন আওরঙ্গজেব। এর প্রায় এক বছর পর ১৬৫৯ সালের পাঁচই জুন তাঁর জ্যোতির্বিদদের ভাষ্য অনুযায়ী অত্যন্ত শুভদিন—দ্বিতীয় ও অত্যন্ত জাঁকমজকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অধ্যায়-২৩

আওরঙ্গজেবকে দেয়ার পরিবর্তে নিজের মুক্তা মাটিতে মিশিয়ে দেয়া শাহজাহানের গল্পটি পুরোপুরি সত্য।
এটা আমার কল্পনা যে শাহজাহান সুলাইমানের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। যাই হোক না কেন তিনি সফল হননি। আওঙ্গজেবের নির্দেশে সুলাইমানকে প্রথমে পোস্ত খাইয়ে জ্যোম্বি বানিয়ে ফেলা হয়, ধীরে ধীরে যা তাকে হত্যা করে ফেলে। বহু বছর ধরে কারাগারে রাখার পর নিজের এক কন্যার সাথে দারার অন্য পুত্র সিপিরের বিবাহ দেয় আওরঙ্গজেব।
আরাকানের জলদস্যু রাজা'র ভূমিতে শেষ শোনা গিয়েছিল শাহ সুজার নাম, বাংলা পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এ অঞ্চলেই সে নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে বেশির ভাগেরই বিশ্বাস।

অধ্যায়-২৪

কারাগারের পুরো সময়টুকুতে পিতার সঙ্গী ছিলেন জাহানারা। এ সময় আওরঙ্গজেবের সাথে কখনোই দেখা হয়নি শাহজাহানের। যদিও শাহজাহানের কারাভোগের প্রথম বছরে পিতা-পুত্র পত্র বিনিময় করেছিলেন। শাহজাহানের পক্ষ থেকে পুরোটাই ছিল ভর্ৎসনা আর আওরঙ্গজেবের পক্ষ থেকে আসে ধর্মীয় আর আত্মপক্ষ সমর্থন সুলভ

উত্তর। এক চিঠিতে আওরঙ্গজেব লিখেছিলেন যে, 'আমি বুঝতে পেরেছি যে জাহাপনা ভালোবাসেন, তবে আমাকে নয়—এ থেকেই বহু দিন ধরে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবার যে অনুভূতি তার সূত্র পাওয়া যায়।

ফরাসী জ্যা ব্যাপটিস্ট তাভারনিয়ারের এর লেখনীই একমাত্র প্রমাণ যে শাহজাহান নিজের সমাধি হিসেবে কালো মার্বেলের তাজমহল নির্মাণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। তাভারনিয়ার লিখে গেছেন যে, 'শাহজাহান নদীর অপর তীরে নিজের সমাধি নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন; কিন্তু পুত্রদের সাথে যুদ্ধ এ পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেয়। পূর্বে সাদা মার্বেলের সাথে সংগতি রেখে কালো মার্বেলের ইমারতের কথা বলেছিলেন শাহজাহান। যদি তিনি নিজের তাজমহল নির্মাণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে থাকেন, তাহলে নিশ্চিত যে এক্ষেত্রে স্থান হিসেবে বেছে নিতেন মাহতাব বাগ অথবা চন্দ্র আলোর উদ্যান। পুরাতত্ত্ববিদগণ মাহতাব বাগে এরকম কোন ইমারতের ভিত্তি খুঁজে না পেলেও এ পরিকল্পনা যে শাহজাহানের সাথে খাপ খায় না—তা নয়। কেননা শিল্পের বিশাল সমঝদার ছিলেন তিনি। এছাড়া সাদা মার্বেলের সাথে কালোর বৈপরীত্য ভালোবাসতেন তিনি। এই উদাহরণের সত্যতা নির্ণীত হয়েছে যখন তিনি ১৬৩০ সালে মমতাজ মহলের মৃত্যুর ঠিক পূর্বে কাশ্মীরের শ্রীনগরের শালিমার বাগানে নির্মাণ করেন কালো মার্বেলের মঞ্চ। তাজমহলের মাঝেও কালো মার্বেল অসংখ্যবার ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চারটি মিনারের প্রতিটি সাদা মার্বেলের ব্লক একে অন্যের সাথে কালো মার্বেল খোদাই করে জোড়া লাগান হয়েছে, সমাধি সৌধের স্তম্ভমূলের চারপাশের নিচু দেয়ালে খোদাই করা আছে একই উপাদান আর সমাধি স্তম্ভের কাঠামো আর ক্যালিগ্রাফী উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে কালো মার্বেল—পানির ওপারে কালো তাজ আর বিশেষ কোন অবস্থানন্তর প্রাপ্তি ঘটাতো? যাই হোক, সত্যিটা হয়ত আর কখনোই জানা হবে না আমাদের। যেটা পরিষ্কার তা হল তাজমহলে সমাধিস্থ হবার কোন ইচ্ছে ছিল না তাঁর, শুধুমাত্র মমতাজের জন্য এটির নকশা করেছিলেন তিনি। ভবনের একেবারে মাঝখানে আছে মমতাজের জমকালো পাথরের শবাধার। শাহজাহানের সমাধি পড়ে গেছে একপাশে, পুরো নকশাতে একমাত্র বিসদৃশ উপাদান। মমতাজের সমাধির চারপাশের কালো-সাদা

টাইলের বর্ডারের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে এটি, আবারো, সবিস্তারে বর্ণনা পেতে দেখুন অ্যা টিয়ারড্রপ অন দ্য চিক্ অব টাইম।

১৬৬৬ সালের ২২ শে জানুয়ারির প্রথম প্রহরে মৃত্যুবরণ করেন শাহজাহান। স্থান, আগ্রা দুর্গ। বিশাল রাজকীয় কোন শেষকৃত্যের অনুমোদন দান করেননি আওরঙ্গজেব। আদেশ দিয়েছিলেন যেন নীরবে তাজমহলের মাটির নিচের সমাধি স্থানে মমতাজের পাশে সমাধিস্থ করা হয় তার পিতাকে।

প্রধান চরিত্রসমূহ

শাহ্জাহানের পরিবার

মমতাজ মহল (প্রাক্তন আরজুমান্দ বানু), শাহজাহানের পত্নী।
জাহানারা, শাহ্জাহান এবং মমতাজের জ্যেষ্ঠ জীবিত কন্যা
দারা শুকোহ, শাহজাহান আর মমতাজের জ্যেষ্ঠ জীবিত পুত্র
শাহ সুজা, শাহ্জাহান ও মমতাজের জীবিত দ্বিতীয় পুত্র
রোশনারা, শাহ্জাহান ও মমতাজের দ্বিতীয় জীবিত কন্যা
আওরঙ্গজেব শাহজাহান ও মমতাজের তৃতীয় জীবিত পুত্র
মুরাদ, শাহ্জাহান ও মমতাজের কনিষ্ঠ জীবিত পুত্র
গওহর আরা, শাহজাহান ও মমতাজের কনিষ্ঠ কন্যা।
নাদিরা, দারা শুকোহ্‌র পত্নী
সুলাইমান, দারা শুকোহ্‌র জ্যেষ্ঠ পুত্র
সিপির, দারা শুকোহ্‌র কনিষ্ঠ পুত্র
জাহাঙ্গীর, শাহজাহানের পিতা
আকবর, শাহ্জাহানের পিতামহ
হুমায়ুন, শাহজাহানের প্রপিতামহ
খসরু, শাহজাহানের সৎভাই ও জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র
পারভেজ, শাহজাহানের সৎভাই ও জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র
শাহরিয়ার শাহজাহানের সৎভাই ও জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র
মেহরুন্নিসা (নূরজাহান আর নূরমহল নামেও পরিচিত) জাহাঙ্গীরের সর্বশেষ পত্নী ও মমতাজ মহলের ফুফু।
আসফ খান, মমতাজ মহলের পিতা ও মেহরুন্নিসার ভাই
জানি, খসরুর বিধবা পত্নী
ইসমাইল খান, জানির ভ্রাতুষ্পুত্র

রাজকীয় গৃহস্থালি আর দরবারের সদস্যবৃন্দ।
সাত্তি আল-নিসা, মমতাজের বিশ্বস্ত ও পরবর্তীতে জাহানারার বন্ধু
আসলান বেগ, শাহজাহানের বয়স্ক পরিচারক
তুহিন রায়, পারস্যের শাহ্ আব্বাসের দরবারে মোগল কূটনীতিক
উস্তাদ আহমাদ, তাজমহলের স্থপতি
নাসরীন, রোশনারার প্রাক্তন কর্মচারী ও জাহানারার সেবাদাসী
আলী নকী, গুজরাটের রাজস্বমন্ত্রী

শাহজাহানের প্রধান সেনানায়ক আর কর্মকর্তাগণ
অশোক সিং, শাহজাহানের বন্ধু ও রাজপুত শাহজাদা
নিকোলাস ব্যালান্টাইন, ইংরেজ ও মোগল দরবারের প্রাক্তন ইংরেজ কূটনীতিকের আর্দালি
কামরান ইকবাল, আগ্রা দুর্গের সেনানায়ক।
আহমেদ আজিজ, দাক্ষিণাত্যের সেনাপতি
আবদুল আজিজ, আহমেদ আজীজ পুত্র
জাফির আব্বাস, আহমেদ আজিজের সেকেন্ড ইন কমান্ড।
মহবত খান, শাহজাহানের রাজত্ব কালের প্রথম দিককার কমান্ডার-ইন-চিফ
মালিক আলী, শাহজাহানের আস্তাবলের পরিচালক
সাদিক বেগ, বালুচির জ্যৈষ্ঠ উপদেষ্টা রায় সিং, রাজপুত এবং শাহজাহানের প্রধান গুপ্তচরদের অন্যতম সুলাইমান খান, একজন কর্মকর্তা
মাওয়ানের রাজা যশয়ন্ত সিং
খলিলউল্লাহ্ খান, উজবেক উপদেষ্টা
আম্বারের রাজা জয় সিং
দিলীর খান, আফগান সেনাপতি
রাজা রাম সিং রাঠোর, একজন রাজপুত শাসক

অন্যান্যরা
মালিক জিউয়ান, দারা শুকোহ্ ও তার পুত্রের বিশ্বাসঘাতক।
মাখদুমী খান, আগ্রা দুর্গের প্রশাসক ও শাহজাহানের কারারক্ষী।
ইতিবর খান, আওরঙ্গজেবের প্রধান নপুংসক, পরবর্তীতে শাহজাহানের কারারক্ষী।

—